অবক্ষয়কাল

অধিকারের মোড়কে বিকৃতির আন্দোলন

আসিফ আদনান

অবক্ষয়কাল

অধিকারের মোড়কে বিকৃতির আন্দোলন

আসিফ আদনান

সূচিপত্র

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, বিধানদাতা নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু এক আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

ভূমিকা

৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ইটালির ক্যাম্পানিয়া অঞ্চল।

শহরটা ছিল আজকের দিনের নেইপলসের কাছাকাছি। এক পাশে সমুদ্র, গাঢ় নীল আর শান্ত। অন্য পাশে পাহাড়, তার গা ঘেঁষে থাকে সবুজ জলপাই গাছের বহর। ওপরে আকাশ; উজ্জ্বল, বিস্তৃত। মাঝখানে পম্পেই।

চোখ ধাঁধানো এই নাগরিক সভ্যতার শুরু খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে পৌঁছে যায় খ্যাতির শিখরে, হয়ে উঠে সমকালীন বিশ্বের অন্যতম অভিজাত নগরী। রাজকীয় ভিলা, চোখ ধাঁধানো সব স্থাপত্য, আর বিচিত্র নকশার ফোয়ারা দিয়ে সাজানো ছিল শহরটা। বিশাল বিশাল মন্দির বানানো হয়েছিল রোমান দেবতা জুপিটার আর অ্যাপোলোর সম্মানে। ঘর আর বাজারে পূজা হতো দেবতা ডায়োনাইসাসের। পম্পেইয়ের মাটিতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের আঙ্গুর ফলতো। ওখানকার আঙ্গুরমদের সুনাম ছিল পুরো রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে। ডায়োনাইসাস মদ আর মত্ততার দেবতা। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল শহরের লোকের।

আমোদপ্রমোদের জন্য ছিল অ্যাম্পফিথিয়েটার। গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই, হিংস্র পশু শিকার, রথের প্রতিযোগিতা, নাটক—উৎসবের নানা আয়োজন হতো সেখানে। পম্পেই ছিল একাধারে ব্যবসা, সংস্কৃতি, পর্যটন আর বিনোদনের কেন্দ্র। নাগরিক জীবনের সব উপকরণ মজুত ছিল সেখানে।

তবে এসব ছাপিয়ে উঠে আসতো আরেকটা পরিচয়। প্রায় বিশ হাজার অধিবাসীর এই শহরে সময় যেন একটু দ্রুত ছুটত। সবসময় আবেগ, উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের উঁচু তারে বাঁধা থাকতো জায়গাটা। শহরের মোড়ে মোড়ে ছিল মদের দোকান আর পতিতালয়। অবাধ, মুক্ত যৌনতা ছিল পম্পেইয়ের সংস্কৃতি। ঘরের দেয়াল, বাগানে ফোয়ারার নকশা, গণস্নানাগারের ছাদ—সব জায়গাতে ছিল পর্নোগ্রাফিক ছবি। সেইসব ছবিতে ফুটে উঠতো সমকাম, উভকাম আর গণযৌনতার দৃশ্য। পম্পেইয়ের যৌনতার বাজারে সব বৈধ ছিল। হাত বাড়ালে মিলতো সবই। নিজেকে হারিয়ে

ফেলার পর খুঁজে পেয়ে আবারও হারিয়ে ফেলার জন্যই যেন তৈরি হয়েছিল শহরটা। আর তাই এখানে মন্ত্রমুগ্ধের ছুটে আসতো নানা দেশ থেকে নানান রকমের মানুষ। তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের কেন্দ্র ছিল পম্পেই।

তবে চাঁদের বুকে কালিমার মতো একটা সমস্যা ছিল। দিগন্ত আড়াল করে থাকা ভিসুভিয়াস পর্বত। প্রায় ১৭ বছর আগে, ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এই ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পম্পেই। ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছিল আগের চেয়েও আকর্ষণীয়, আরও মনোমুগ্ধকর রূপে।

৭৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রায় পুরোটা বছরটা জুড়ে ভিসুভিয়াসের হম্বিতম্বি চলছিল। হঠাৎ মাঝরাতে গর্জে উঠে অস্তিত্ব জানান দিতো। হালকা ভূমিকম্প নাড়া দিয়ে যেত মাঝেমধ্যে। ধীরে ধীরে ভূমিকম্পের সংখ্যা বাড়লো, কমলো মাঝখানের বিরতি। একসময় দেখা গেল ছাইরঙ্গা ভিসুভিয়াস পর্বতের ওপরটা ধোঁয়াতে ঢেকে গেছে। কিন্তু ততদিনে অভ্যাস হয়ে গেছে পম্পেইয়ের লোকেদের। ভিসুভিয়াসের তর্জনগর্জনকে খুব একটা গুরুত্ব দিলো না তারা। জীবন্ত আগ্নেয়গিরিকে পাশে রেখে জীবনের চেনা স্রোতের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে লাগলো।

আর তারপর... একদিন সকালে ব্যাপারটা ঘটলো।

প্রচণ্ড শক্তিতে সেকেন্ডে পনেরো লক্ষ টন গলিত পাথর, গুড়ো হয়ে যাওয়া আকরিক আর তরল আগুন ছুড়ে দেওয়া হলো মাটি থেকে প্রায় ২১ মাইল উঁচুতে। নিঃসরিত হলো হিরোশিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমার চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি তাপশক্তি। প্রথম বিস্ফোরণের সময় তাপমাত্রা পৌঁছে গেল ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মারা গেল হাজারো মানুষ। প্রচণ্ড তাপের কারণে সৃষ্ট থার্মাল শকে, তীব্র খিচুনিতে, তাদের শরীরগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেঁকে গেল। তারপর সব চাঁপা পড়লো ২১ ফিট গভীর আগ্নেয় ছাইয়ের নিচে।

আগুনের নদীর নিচে সমাধি হলো পম্পেইয়ের। রাতারাতি উধাও হয়ে গেল প্রাণবন্ত জনপদ। এভাবেই কেটে গেল দেড় হাজার বছর কিংবা আরও বেশি। তারপর হঠাৎ একদিন কোনো এক রাজার প্রাসাদ বানাতে গিয়ে পম্পেইয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেল একদল নির্মাণশ্রমিক। শুরু হলো হারানো শহরের খোঁজ।

ভিসুভিয়াসের লাভা আর ছাই প্রস্তরীভূত করে ফেলেছিল পম্পেইকে। পুরু ছাই আর আগ্নেয় পাথরের প্রলেপে অবিকল সংরক্ষিত ছিল সবকিছু। বিচিত্রভাবে তরল আগুন যেন জমিয়ে রেখেছিল শহরটাকে। মাটি খুঁড়ে প্রথম যেসব নিদর্শন পাওয়া গেল, তার মধ্যে ছিল পম্পেইয়ের আদিম উল্লাসের পর্নোগ্রাফিক চিত্রকর্ম।

***

পম্পেইয়ের ঘটনা দুইভাবে দেখা যায়।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে পম্পেই এক রোমান ট্র্যাজেডি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে প্রাণবন্ত এই নগরী। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিশ্বের। প্রগতিশীল ও সেক্যুলার মানুষদের।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, পম্পেইয়ের এই পরিণতি জনপদের লোকেদের সীমালঙ্ঘন আর অবক্ষয়ের শাস্তি। ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অগ্নিসমাধির শহর হিসেবে পরিচিত হবে পম্পেই। তার অস্তিত্ব মুছে গেছে, রয়ে গেছে ধ্বংসের শিক্ষা।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পম্পেই ধ্বংসের সাথে সেখানকার মানুষের যৌনতার কোনো সম্পর্ক নেই। যৌনতা মানুষের জীবনযাত্রার কেবল একটা অনুষঙ্গ। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের সাথে এর যোগসূত্র খুঁজে বের করা অযৌক্তিক। একটা সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপার, আরেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর সবাই জানে, দুটো একেবারেই আলাদা জিনিস। পম্পেইয়ের অধিবাসীরা যদি কোনো ভুল করে থাকে তবে সেটা হলো, দিনের পর দিন ভিসুভিয়াসের গর্জনকে উপেক্ষা করা। শিক্ষা নিতে হলে এখান থেকে নেওয়া উচিৎ।

অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী পম্পেইয়ের মিল খুঁজে পাবে কুরআনে বর্ণিত এক সম্প্রদায়ের ঘটনার সাথে। কুরআনে নবী লূত আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। তাঁকে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যারা যৌন বিকৃতিতে আসক্ত ছিল। এ জনপদের পুরুষেরা একে অপরের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতো। নবীর সব শিক্ষা আর হুশিয়ারি তারা তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেছিল। মহান আল্লাহ ভয়ঙ্কর আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেন। কুরআন ও হাদীসে এই আযাবের বর্ণনা এসেছে।

প্রথমে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর পুরো জনপদকে শূন্যে তুলে উলটো করে সজোরে ছুড়ে ফেলা হয় মাটিতে। আর তারপর শুরু হয় আসমান থেকে উত্তপ্ত পাথরবৃষ্টি। বিরামহীন আযাব। এই সম্প্রদায় আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মকে উলটে দিয়েছিল। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতার বদলে বিকৃত যৌনতাকে বেছে নিয়েছিল তারা। তাই শাস্তি হিসেবে তাদের জনপদকে উলটে দেওয়া হয়।

> 'সুতরাং আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং ভীতিপ্রদর্শনের পরিণাম।'[১]

সবশেষে মৃত সাগরের পাড়ে পড়ে ছিল কওমে লূত; মৃত ও অভিশপ্ত।

কুরআন ও হাদীসে পম্পেইয়ের ঘটনা নিয়ে আলোচনা আসেনি। তাই যৌন অবক্ষয় আর সীমালঙ্ঘনের কারণেই যে এ নগরী ধ্বংস হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা

[১] আল কুরআন, তরজমা, সূরা আল-ক্বামার, ৩৯

যায় না। তবে কওমে লূতের সাথে পম্পেইয়ের মিলগুলো একজন বিশ্বাসীর চোখ এড়িয়ে যাবে না। একজন বিশ্বাসী বলবে, স্থান-কাল আলাদা হলেও অদ্ভুত মিল আছে দুটো ঘটনার মধ্যে। একই ধরনের সীমালঙ্ঘন, অনেকটা একই ধরনের শাস্তি। একই শিক্ষা।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বারবার আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠবে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ, অতীতকে বোঝা এবং বর্তমানের মূল্যায়ন, দুটোর জন্যেই। কারণ অতীতে যা হয়েছিল, আজ তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আজ পৃথিবীর প্রায় তিন ডজন দেশে দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারীর মধ্যে 'বিয়ে' আইনি ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার বৈধতা দিয়েছে প্রায় ১৩০টি দেশ। স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের আলাপ তুলে বাকি দেশগুলোকেও একই পথ বেছে নেওয়ার চাপ দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।

মানুষ আজ পোশাকের মতো পরিচয় বদলাচ্ছে। পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করছে, নারীদের পোশাক পরে তাদের জন্য নির্ধারিত টয়লেট বা অন্য কোনো স্থানে হাজির হয়ে যাচ্ছে এবং সেই দাবি মেনেও নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এ ব্যাপারগুলো কেবল মেনে নেয়নি; বরং শিক্ষা, মিডিয়া এবং রাজনীতির মাধ্যমে এগুলো প্রচার করছে। স্কুলে শেখানো হচ্ছে সমকাম, উভকাম, ইচ্ছেমতো পরিচয় বদলানো—সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যের ক্ষতি না করে যেকোনো কিছু করার অধিকার আছে মানুষের। বিকৃত যৌনতার প্রচারণাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে মার্কিন সরকার। সিএনএন জানাচ্ছে, বাংলাদেশের মতো জায়গাতেও এসব প্রতিষ্ঠার জন্য লাখ লাখ ডলার খরচ করছে অ্যামেরিকা।

প্রতিদিন যেন একটু একটু করে পম্পেইয়ের মতো হয়ে ওঠছে আমাদের পৃথিবী। মৃত সাগর পাড়ের শহরগুলোর সাথে আমাদের দূরত্ব কমছে ক্রমশ। এই জনপদগুলোর বাসিন্দারা শুধু কিছু 'কাজ' করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা সেই কাজগুলোর প্রচার আর উদ্‌যাপন করেছিল। বৈধতা আর অজুহাত তৈরি করেছিল। ঠিক একই ব্যাপারটা ঘটছে আমাদের সভ্যতায়। তবে অতীতে যা হয়েছিল একেকটা শহর আর জনপদে, তা এখন হচ্ছে একেকটা দেশ আর মহাদেশ জুড়ে।

অথচ আজ থেকে একশো বছর আগে এ ব্যাপারগুলো অকল্পনীয় ছিল। বিকৃতির এই অভূতপূর্ব প্রসার ও স্বীকৃতি যে আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে আজ সেটা পরিচিত এলজিবিটি অধিকার আন্দোলন (LGBT Rights Movement) নামে।[২] দেড়

[২] এলজিবিটি (এলজিবিটি) একটি গুচ্ছ শব্দ (acronym) যেখানে L দ্বারা লেসবিয়ান (lesbian) বা নারী সমকামী, G দ্বারা গে (Gay) বা পুরুষ সমকামী, B দ্বারা বাইসেক্সুয়াল (bisexual) বা উভকামী এবং T দ্বারা ট্রান্সজেন্ডার বোঝানো হয়।

শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে আজকের এই সাফল্য অর্জন করেছে তারা।

এই বই এলজিবিটি আন্দোলন নিয়ে। এ আন্দোলনের ইতিহাস, বংশগতি, বিবর্তন, তত্ত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে এ বইয়ের আলোচনা। একজন মুসলিম হিসেবে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র ইসলাম। বইটি সেই অবস্থান থেকেই লেখা। তবে আন্দোলনের ইতিহাস এবং বংশগতির আলোচনা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন পশ্চিমা এবং সেক্যুলার সোর্স থেকে। ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ এসেছে বইয়ের শেষ ভাগে।

***

অনেকে বলতে পারেন, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা ইসলামে হারাম, বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করাও হারাম। ব্যস, কথা তো এখানেই শেষ। এ নিয়ে সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার বই লেখার কী দরকার? অল্প কিছু বিকৃত চিন্তার মানুষ এসব জঘন্য কাজ করে বেড়ায়। এসব নিয়ে বেশি কথা বললে, এগুলো আরও বেশি ছড়াবে।

এখানে দুটো বিষয় বোঝা জরুরি। প্রথমত, এলজিবিটি স্রেফ অল্প কিছু বিকৃতকামী মানুষের আন্দোলন না। যদি তাই হতো, তাহলে এই আন্দোলন এত বিস্তৃত, এত প্রভাবশালী হয়ে ওঠতো না। আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত, এ নিয়ে এত শোরগোল, এত আয়োজন দেখতাম না আমরা। এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত অল্প কিছু মানুষ, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রবল ক্ষমতাধর কিছু গোষ্ঠী।

দ্বিতীয়ত, এটি নিছক কিছু দাবি আদায়ের আন্দোলন না। এই আন্দোলনের একটি মতাদর্শিক দিক আছে। আছে সভ্যতাগত তাৎপর্য। যৌন বিকৃতির এই মতবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে আধুনিক পশ্চিমা দর্শন ও জীবনবোধের। এ কারণেই আজ 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' হতে হলে এলজিবিটি অধিকারকে সমর্থন দেওয়া বাধ্যতামূলক। মতাদর্শিক এই দিকটি বোঝা প্রয়োজন।

এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট, খুব সংক্ষেপে দুই-তিন পৃষ্ঠার মধ্যে তা লিখে ফেলা সম্ভব—এ-কথা সত্য। তবে, যারা জীবনের সব অক্ষে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করেন, ঐ আলোচনা কেবল তাদের জন্যই যথেষ্ট হবে। যারা এমন না, যারা আধিপত্যশালী সংস্কৃতি ও শাসনব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত, আধুনিকতার নানা বিশ্বাসকে যারা চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, হুকুম-আহকামের বর্ণনা কিংবা ফাতওয়া তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাদের মনে প্রশ্ন থেকে যাবে।

যৌন বিকৃতি আজ একটা বৈশ্বিক প্রকল্প। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পলিসিকে এটি প্রভাবিত করছে। এই প্রকল্পের মোকাবিলা করতে হলে, এই মতবাদকে প্রশ্ন করতে হলে, নিজের অবস্থানের সমর্থনে কথা বলতে হলে, এ আন্দোলনের ইতিহাস ও বংশগতি সম্পর্কে জানতে হবে। স্পষ্ট

ধারণা থাকতে হবে ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমা জীবনদর্শনের পার্থক্য ও দ্বন্দ্বের ব্যাপারেও।

***

বইটি লিখতে গিয়ে নোংরামির অনেক বীভৎস ইতিহাস, বর্ণনা আর তত্ত্ব ঘাঁটতে হয়েছে। ব্যাপারটা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। অনেক ধোয়ামোছার পর, অনেক কিছু আড়াল করে, বাদ দিয়ে, সেইসব তথ্যের সামান্য কিছু অংশ এই বইতে আনা হয়েছে। তারপরও কিছু অধ্যায়ে বিকৃতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার দিকে তাকানোর অভিজ্ঞতা সুখকর হবার কথা না। বিশেষ করে 'প্লেগ' অধ্যায়ের আলোচনা। তাই পাঠকের কাছে শুরুতেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে এই বাস্তবতাগুলো তুলে আনা প্রয়োজন ছিল। অধিকার আর স্বাধীনতার মুখরোচক বুলির আড়ালে ঠিক কোন ধরনের আচরণ আর জীবনের স্বীকৃতি চাওয়া হচ্ছে, তা কীভাবে সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করে, তা আমাদের জানা দরকার।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এলজিবিটি জীবনযাত্রার বাস্তবতাকে সুকৌশলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা হয়েছে। সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে বানোয়াট একটা ছবি। কাজটা করা হয়েছে পরিকল্পিত প্রোপাগ্যান্ডার অংশ হিসেবে; যার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন তৈরি করা এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়া। এজন্য কাজে লাগানো হয়েছে অ্যাডভারটাইযিং আর মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সব কৌশল। এই আন্দোলনের স্ট্র্যাটিজিস্টদের লেখায় সরাসরি এসব কথা উঠে এসেছে।[৩] তাই কুৎসিত হলেও বাস্তবতাকে চিনে রাখা দরকার। তা না হলে খুব সহজেই আমরা প্রভাবিত হবো, প্রতারিত হবো, ফাঁদে পা দেবো। যেমনটা হয়েছে পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে।

সত্য যতই অপ্রিয় কিংবা অস্বস্তিকর হোক, প্রকাশ করতে হবে। কারণ, নীরবতার জন্য যে মূল্য দিতে হবে তা অনেক, অনেক চড়া। মহান আল্লাহ সত্য প্রকাশে কখনো সঙ্কোচবোধ করেন না। মুসলিম হিসেবে আমাদেরও করা উচিত না।

***

এ বইয়ের আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের আলোচনা 'সমকামী আন্দোলনের' ইতিহাস এবং প্রধান তাত্ত্বিকদের নিয়ে।

এলজিবিটি আন্দোলনের সবচেয়ে আগ্রাসী অংশ, 'ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অংশে। পশ্চিমা দেশগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়ন হচ্ছে, এ অংশের

---

[৩] দেখুন, অধ্যায় ৬, এলজিবিটি

শেষে আলোকপাত করা হয়েছে তা নিয়ে।

তৃতীয় ভাগের আলোচনা এলজিবিটি মতবাদের সাথে আধুনিক জীবনদর্শনের সম্পর্ক এবং এ দুইয়ের সাথে ইসলামের সংঘাত নিয়ে। বিশ্বাসের মৌলিক কাঠামো, উৎস এবং পার্থক্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইসলামের আলোকে এলজিবিটি আন্দোলনের মূল্যায়ন এসেছে এই অংশে।

সবশেষে আলোচনা এসেছে এলজিবিটি আন্দোলন সভ্যতাগত তাৎপর্য নিয়ে।

***

বইটির কাজে নানা জন নানাভাবে সহায়তা করেছেন। পারিবারিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও কয়েকটি অধ্যায়ের শারঈ দিকগুলো দেখে দিয়েছেন মুফতি আবদুর রহমান ভাই। টানা কয়েক রাত জেগে বইয়ের প্রুফ আর পৃষ্ঠাসজ্জার কাজ করে দিয়েছে আসাদুল্লাহ আল গালিব। প্রচ্ছদ নিয়ে দিনের পর দিন সময় দিয়েছে ওমর ইবনে সাদিক। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিশেষভাবে শুকরিয়া জানাই অনুজ এনামুল হোসেইনকে, প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে তার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও পরামর্শ জানানোর জন্য। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

যদি এ বইয়ের মাঝে কল্যাণকর কিছু থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি, সেটা একান্তই আমার। ইখলাস, নিয়্যাত ও আমলের সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ তাঁর এই অক্ষম বান্দার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন, এতে বারাকাহ এবং সাফল্য দান করুন। আমীন।

নিশ্চয়ই সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

আসিফ আদনান

রমাদান ১৪৪৫, মার্চ ২০২৪

এই সব ক্লেদাক্ত জীবন

আপনার প্রাণের কসম! নিশ্চয়ই তারা উন্মত্ত নেশায় আত্মহারা হয়ে পড়েছিল।

[১৫:৭২]

অধ্যায় ১

পরিচয় নির্মাণ

জার্মানির উত্তরপশ্চিম অঞ্চল। উত্তর সাগর আর এমস নদীর মাঝখান দিয়ে, পূর্ব ফ্রিসিয়ার বুক চিরে সোজা এগিয়েছে এমস-জেইড খাল। আকাশ থেকে দেখলে খালটাকে চকচকে রূপালী ফিতার মতো মনে হবে। ৭২ কিলোমিটার লম্বা এ জলপথের দুপাশে ছড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজ তৃণভূমি, উঁচুনিচু ছোট পাহাড় আর ছবির মতো সুন্দর গ্রাম।

এমনই এক গ্রাম ওয়েস্টারফেল্ড। ঘনসবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা গ্রামটার সরু রাস্তাগুলো খোয়া বিছানো। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাজানো একই নকশার উজ্জ্বল রঙের অনেকগুলো বাড়ি। বসন্তে রকমারি ফুলের সমারোহ, হেমন্তে শুকনো পাতার উড়োউড়ি, আর শীতে তুষারের শুভ্র চাদরমোড়া—অদ্ভূত সৌন্দর্য ঘিরে আছে গ্রামটাকে। আমাদের গল্পের শুরু এই গ্রামে।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে, ১৮২৫ সালে এ গ্রামেই জন্ম হয় এক শিশুর। বাবা-মা নাম রাখে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস। নাম রাখার সময় তারা কি ভেবেছিলেন, এই নাম একদিন ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে? অনেক অনেক বছর পরও তাকে নিয়ে চলবে আলোচনা আর সমালোচনা? হয়তো। সন্তান বড় হয়ে নাম করবে, এমন ইচ্ছা অনেক বাবা-মা'র মনে সুপ্ত থাকে। তবে দূরতম কল্পনাতেও সম্ভবত তারা আঁচ করতে পারেননি, তাদের এই সন্তান একদিন বিকৃতি আর অন্ধকারের এক সভ্যতাবিধ্বংসী মতবাদের গোড়াপত্তন করবে।

উলরিখস সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, বাবা ছিল সরকারি স্থপতি। তার শৈশব কেটেছিল বিশাল এক এস্টেটে। একমাত্র ছেলে হওয়াতে দু'বোনের চাইতে মায়ের আদর কিছুটা বেশিই বরাদ্দ থাকতো তার জন্য। আদরের আতিশয্য আর মায়ের মনের অজানা আশঙ্কার ভিড়ে গ্রামের অন্যদের সাথে খুব একটা মেলামেশা হতো না তার। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, ছেলেবেলা থেকেই উলরিখস বেড়ে উঠে লাজুক এবং কিছুটা অমিশুক হয়ে।

এভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে। মারা যায় উলরিখসের বাবা। তার

বয়স তখন দশ। চৌদ্দ বছর বয়সে হাই স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে। প্রথম বছরেই শান্ত, চাঁপা স্বভাবের উলরিখসকে বাগে পেয়ে ধর্ষণ করে স্কুলের এক পুরুষ প্রশিক্ষক।[৪] কৈশোরের এ নির্জন আগ্রাসনের চিহ্ন আজীবন বয়ে বেড়াবে উলরিখস। এই চিহ্নের প্রতিক্রিয়া লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অগণিত মানুষের জীবন।

স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ১৮৪৪ সালে উলরিখস পাড়ি জমায় গটিনগেন শহরে। আইনজীবী হবার জন্যে পড়াশোনা শুরু করে। তেমন কোনো অঘটন ছাড়াই কেটে যায় দুই বছর। তারপর জেগে উঠে অন্ধকারের স্রোত। ১৮৪৬-এ স্থানীয় এক বলনাচের আসরে কিছু স্কুল ছাত্রের ওপর নজর পড়ে তার। ইউনিফর্মপরা কিশোরদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে উলরিখস। যে বয়সে সে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, এই ছাত্রদের বয়স ছিল তার কাছাকাছি।[৫] ঐ রাতের পর অনেকটা হুট করেই উলরিখস সিদ্ধান্ত নেয় গটিনগেন থেকে বার্লিন চলে যাবার। হঠাৎ নেওয়া এ সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্ক আছে সেই সময়কার বার্লিন নগরীর বিশেষ এক 'সুখ্যাতি'র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই পতিতাবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠে বার্লিন। এ শহরের নিষিদ্ধ পল্লীগুলোর 'সুনাম' ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপে। নারীদেহের পাশাপাশি অল্প বয়সী পুরুষ দেহও দেদারসে বিক্রি হতো বার্লিনে। এই শহরেই শুরু হয় কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের জীবনের অন্ধকার অধ্যায়। দিনের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবোধ ছাত্র উলরিখস, রাতের বেলায় উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে বার্লিনের নিষিদ্ধ পল্লীতে। ঐ এলাকাগুলোতে, যেখানে আনাগোনা গরিব, বালক, আর ভবঘুরে কিশোরদের। টাকার বিনিময়ে তারা শরীর বিক্রি করত, আর তা কিনতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসতো ক্রেতারা। উলরিখস ছিল পরের দলে। পুরুষ দেহের খদ্দের ছিল সে।

বার্লিনের অন্ধকার এ দিকের বর্ণনা পাওয়া যায় উইলহেল্ম স্টিবারের লেখা 'Prostitution in Berlin and Its Victims' (বার্লিনে পতিতাবৃত্তি এবং এর শিকার) বই থেকে। ১৮৬০ এর দশকে প্রুশিয়ার[৬] প্রধানমন্ত্রীর সহকারী এবং দুর্ধর্ষ গুপ্তচর হিসেবে ইউরোপজুড়ে ব্যাপক পরিচিতি পাবেন স্টিবার। তবে তার আগে ঝানু এই

[৪] Making Queer History. Karl Heinrich Ulrichs, - https://tinyurl.com/aj7dk9mr

[৫] Vier Briefe von Karl Heinrich Ulrichs (Numa Numantius) an seine Verwandten, p 45. Edited by Magnus Hirschfeld. Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1: 36–70. Reprint in Forschungen 1994. As quoted in, Kennedy, Hubert C. Karl Heinrichs Ulrichs: Pioneer Of The Modern Gay Movement. Peremptory Publications, 2005.

[৬] আজ যে দেশটাকে আমরা জার্মানি নামে চিনি ১৮৭১ সালের আগে সেটা একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ১৮০৬ সালের আগে এটি ছিল অনেকগুলি স্বতন্ত্র ও আলাদা রাজ্যের সমষ্টি। যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল প্রুশিয়া। ১৮১৫ সালে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলি একটি কনফেডারেশন গঠন করে, যা স্থায়ী হয় ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। ১৮৭১ সালে অটো ফন বিসমার্কের অধীনে জার্মানি একত্রিত হয়। উইলহেল্ম স্টিবার ছিল বিসমার্কের একান্ত সহকারী।

গোয়েন্দা দায়িত্ব পালন করেছিলেন বার্লিনের পুলিশ বিভাগের প্রধান হিসেবেও। বার্লিনের নাড়িনক্ষত্র জানা ছিল তার। শহরের পুরুষ পতিতাদের ব্যাপারে স্টিবার লিখেছিলেন:

> '...বিশেষত, পেডেরাস্টি (বালককামিতা) যদি বর্তমান হারে চলতে থাকে, তাহলে এক সময় হয়তো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অগণিত হতভাগা এই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এসংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা আর তদন্ত প্রতি বছর আমাদের ফৌজদারি আদালতে আসে। শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা আছে যেখানে নিয়মিত এই দানবরা সমবেত হয়। কিছু লোক; তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম হবে না, এখানে দেহব্যবসা করে। এদের মধ্যে সাধারণ সৈন্যদের সংখ্যাই বেশি। অল্প কিছু দিন আগে পুলিশ এ ধরনের একটি বেশ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে।[৭]

মজার ব্যাপার হলো, যে বছর হুট করে উলরিখস বার্লিন চলে গেলো, সেই ১৮৪৬ সালেই প্রকাশিত হয় উইলহেল্ম স্টিবারের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ।

বার্লিনে এক বছর কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যায় উলরিখস এবং ১৮৪৮ সালের শেষ দিকে চাকরি শুরু করে। হ্যানোভার রাজ্যের সিভিল সার্ভিসে, সরকারপক্ষীয় উকিল হিসেবে। চাকরির প্রথম চার বছরে বেশ কয়েকবার বদলির আবেদন করে উলরিখস। আবেদন মঞ্জুরও হয়। পরে জানা যাবে, নিজের বিকৃত যৌনাচারের কথা জানাজানি হবার ভয়েই বারবার বদলির আবেদন করতো সে। ১৮৫৩ সালে এক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সহকারী বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে।

তারপর ক্রমশ অবনতি হতে থাকে উলরিখসের। ধীরে ধীরে বিকৃতির ক্ষুধা আরও বাড়ে, নিজেকে সামলাতে পারে না সে। গোপন অভিসারগুলো রাতের সীমানা পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে দিনে। উন্মত্ত নেশা তাকে আত্মহারা করে তোলে। শহরের লোকেরা বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে, সহকারী বিচারক মহোদয়কে প্রায়ই সরাইখানা, অন্ধকার গলি আর শহরের 'খারাপ' এলাকার আশেপাশে 'সন্দেহজনক' লোকেদের সান্নিধ্যে দেখা যায়। ছোট শহরে কথা চাপা থাকে না। শুরু হয় কানাঘুষা। শেষমেশ অভিযোগ আসে উলরিখসের দপ্তরে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৈরি করা সরকারি নথিতে লেখা হয়,

> 'সহকারী বিচারক উলরিখসকে প্রায়ই নিম্নশ্রেণির লোকেদের সাথে এমন পরিস্থিতিতে দেখা যায়, যা থেকে ঘনিষ্ঠতার আভাস মেলে... উলরিখস অন্য পুরুষদের সাথে বিকৃত লালসা চর্চা করে বলে একটি গুজব আমার কানে

---

[৭] Stieber, Wilhelm. Die Prostitution in Berlin und ihre Opfer: nach amtl. Quellen u. Erfahrungen; in historischer, sittlicher, medizinischer und polizeilicher Beziehung beleuchtet. Hofmann, 1846. p 209

এসেছে।'

এ নথিতে রাষ্ট্রীয় আইনজীবী আরও লেখেন, প্রথম দিকে তিনি এ অভিযোগ বানোয়াট মনে করেছিলেন। কিন্তু পুলিশের এক কর্মকর্তা অভিযোগগুলোর সত্যতার প্রমাণ দেন। স্টেইট অ্যাটর্নী উপসংহার টানেন,

> '...উলরিখস নামীয় ব্যক্তি এখানে এবং তার পূর্ববর্তী পদগুলোতে থাকার সময় পুরুষদের সাথে বিকৃত লালসা চর্চা করেছেন; তথ্যপ্রমাণের আলোকে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।'

পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলি প্রতিবেদন আকারে হ্যানোভারের বিচার মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার আগেই বিষয়টা জানতে পারে উলরিখস। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র জমা দেয়। এ ঘটনার পর পেশাদারি জীবনকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয় সে। ১৮৯৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর কোনো চাকরি করতে দেখা যাবে না তাকে। বাকিটা জীবন সে কাটিয়ে দেবে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া কিছু সম্পত্তি আর তার সাথে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের আয় মিলিয়ে।

টাকার কষ্ট না থাকলেও চাকরি ছাড়ার পর সম্মানের অভাব অনুভব করে উলরিখস। নিজের বিকৃতি এভাবে সবার সামনে চলে আসার লজ্জা কুরে কুরে খায় তাকে। দুটো পথ খোলা ছিল তার সামনে। সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে বিকৃত যৌনাচার ছেড়ে বেছে নিতে হবে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন। অথবা সম্মানের আশা বাদ দিয়েই চালিয়ে যেতে হবে বিকৃতি।

কিন্তু ততদিনে উলরিখস ঠিক করে ফেলেছে, যাই হোক না কেন, এ 'মজা' সে ছাড়তে পারবে না। বিকৃত আনন্দের নেশায় পুরোদস্তুর মজে গেছে সে। সংযমের বদলে একে পুরোদমে উপভোগ করার দিকেই তার ঝোঁক। কিন্তু বিকৃতি ছাড়তে না পারলে বাকিটা জীবন কাটাতে হবে সমাজের চোখে অপরাধী হয়ে। অন্ধকার আর ছায়ার মাঝামাঝি স্যাঁতস্যাঁতে যে জায়গাটা, যেখানে বসবাস সমাজের অপরাধী আর নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষদের, থাকতে হবে ঐখানটায়। নিজের খায়েশ মেটাতে হবে গোপনে, সভ্য সমাজের চোখের আড়ালে। এই সংকটের মুখোমুখি হয়ে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস এমন এক সিদ্ধান্ত নেয়, যা থেকে জন্ম হয় যৌন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের এক আন্দোলনের। যে আন্দোলন আজ—উলরিখসের মৃত্যুর প্রায় ১৩০ বছর পর—ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব জুড়ে।

উলরিখস ঠিক করে, সে কোনোটাই ছাড়বে না। তার লাগবে সবকিছু, সবটুকুই। সে সমাজের কাছ থেকে সম্মান চায়, আবার নিজের বিকৃত আনন্দও বুঝে পেতে চায় ষোলো আনা। আর দুটো এক সাথে পাবার একমাত্র উপায় হলো সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক—আরও স্পষ্ট করে বললে, পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গমকে—সমাজের

চোখে গ্রহনযোগ্য করে তোলা। একে আইনি বৈধতা দেওয়া।

বাকিটা জীবন নিরলসভাবে নিজের বিকৃত যৌনাচারকে বৈধ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে উলরিখস। আর এ কাজটা করতে গিয়ে গ্রহণ করবে অভূতপূর্ব এক কৌশল। আবিষ্কার করবে নতুন এক পরিচয়।

গোড়াপত্তন

চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হবার পর নিজের বিকৃতিকে সমাজের চোখে বৈধ, গ্রহণযোগ্য এবং শেষপর্যন্ত সম্মানজনক করে তোলার সংকল্প করে উলরিখস। সেই সময়কার আইনে সব ধরনের 'সডোমি' বা পায়ুসসঙ্গম অপরাধ বলে গণ্য হতো। জার্মান আইনের যে ধারায় এ নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছিল, সেটা পরিচিত ছিল 'প্যারাগ্রাফ ১৭৫' নামে। উলরিখস এই আইন বাতিলের দাবি তোলে। নিজের দাবির পক্ষে হাজির করে অদ্ভুত এক যুক্তি। উলরিখস বলে, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রাকৃতিক। কিছু মানুষ এভাবেই জন্মায়। মানুষের মধ্যে নারী আছে, পুরুষ আছে, আবার আছে তৃতীয় আরেক শ্রেণি। এই তৃতীয় শ্রেণির মানুষরা হলো,

> '...এমন পুরুষ যারা অন্য পুরুষদের কামনা করে। তাদের দেহ পুরুষের হলেও আত্মা নারীর। গর্ভাবস্থা থেকেই তারা এভাবে বেড়ে ওঠে।'[৮]

উলরিখসের যুক্তি সহজ। সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যেহেতু জন্মগত, তাই পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গম অপরাধ হতে পারে না। প্যারাগ্রাফ ১৭৫, অর্থাৎ পায়ুসঙ্গম বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে। উলরিখস এই 'তৃতীয় লিঙ্গের' নাম দেয় আরনিং (Urning), আর এই অবস্থার নাম ইউরেনিয়ান (Uranian)। শব্দগুলো গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বিখ্যাত 'সিম্পোসিয়াম' রচনাবলি থেকে ধার করা।

১৮৬৩ থেকে বেনামে প্রকাশিত লিফলেট ও পুস্তিকার মাধ্যমে 'তৃতীয় লিঙ্গ' তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করে উলরিখস। এসব লেখার শেষে বিকৃত যৌনতাকে মেনে নেওয়ার এবং প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের দাবি থাকতো। ১৮৬৭ সালে অনাহূত অতিথির মতো মিউনিখে জার্মান আইনজ্ঞদের (জুরিস্ট) এক সম্মেলনে হাজির হয় উলরিখস। এক সকালে সম্মেলনের মঞ্চে উঠে পায়ুসঙ্গম বিরোধী আইন বাতিলের প্রস্তাব তোলে। বলে, এই আইনের কারণে এমন কিছু মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে, যারা নিজেদের 'প্রাকৃতিক তাড়না' চরিতার্থ করছে কেবল। উপস্থিত আইনজ্ঞরা দুয়ো দিয়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলেও, উলরিখস এটাকে দেখে নিজের বড়সড় এক বিজয় হিসেবে।

এরপর নিজ নামে লিখতে শুরু করে উলরিখস। পাশাপাশি শুরু করে অন্যান্য 'আরনিং'-দের সংঘটিত করার চেষ্টা। কখনো সংঘ বানানো, কখনো ম্যাগাজিন

[৮] Hubert. Ulrichs. 1988

ছাপানো, চলে নানা তৎপরতা। কিন্তু কোনোটাই তেমন সাড়া পায় না। তবে এসব করতে গিয়ে জার্মানির বাইরের 'সমমনা' বেশ কিছু লোকের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠে তার। এদের মধ্যে একজন ছিল কার্লো মারিয়া কার্টবেনি নামে হাঙ্গেরির এক লেখক। ১৮৬৮ সালে উলরিখসকে লেখা এক চিঠিতে 'আরনিং' আর 'ইউরেনিয়ান' শব্দগুলোর বদলে ভিন্ন দুটো শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করে কার্টবেনি—হোমোসেক্সুয়াল আর হেটোরোসেক্সুয়াল। সমকামী এবং অসমকামী। এ শব্দগুলো তুলনামূলক বেশি 'বৈজ্ঞানিক' এবং 'পেশাদারি' শোনায়। তাই শেষমেশ এগুলোই প্রচলিত হয়ে যায়।

১৮৬০ এর দশকের শেষ দিকে নিজের 'আন্দোলন'-এর অগ্রগতি নিয়ে উলরিখস বেশ আশাবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু পরপর দুটো ধাক্কা এসে অগ্রগতি থামিয়ে দেয়। ১৮৬৯ সালে ৫ বছরের এক ছেলেকে বলাৎকারের অভিযোগে গ্রেফতার হয় কার্ল উইলহেল্ম ভন ড্যাস্ট্রো নামে এক জার্মান নাগরিক।[৯] এ ঘটনা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় সমাজে। এই মামলার নানা অগ্রগতি ফলাও করে প্রচার করে পত্রিকাগুলো। তল্লাশী করতে গিয়ে ভন ড্যাস্ট্রোর কাছে মেলে উলরিখসের লেখা বই - মেমনন।[১০] মিডিয়াতে আসে, উলরিখসের চিন্তার অনুসারী ছিল ভন ড্যাস্ট্রো। এতে করে উলরিখসের কার্যক্রম বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। জনমত আগে থেকেই ইতিবাচক ছিল না, এবার একেবারে বিরুদ্ধে চলে যায়।

ঠিক পরের বছর, ১৮৭০ সালে বিসমার্কের অধীনে জার্মানির একীভূতকরণ হয়। একত্রিত করা হয় সব আইন। প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিল তো হয়-ই না; বরং যেসব রাজ্যে আগে আইন ছিল না, সেখানেও আইন করে পায়ুসঙ্গমকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করা হয়।

উলরিখস বুঝতে পারে, হঠাৎ করে সব স্রোত তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। পরের দশ বছরে স্থিমিত হয়ে আসে তার লেখালেখি। শেষমেশ আন্দোলনের আশা বাদ দিয়ে ১৮৮০ সালে স্থায়ীভাবে ইতালিতে চলে আসে সে। আর সেখানেই ১৮৯৫ সালে ৭০ বছর বয়সে মারা যায় কার্ল হাইনরিখ উলরিখস। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে উলরিখসের সম্ভবত ধারণাও ছিল না, তার জ্বালানো স্ফুলিঙ্গ পরের শতাব্দীতে কত বড় দাবানলের রূপ নেবে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌনতা এবং 'বিয়ে' আজ পশ্চিমা বিশ্বে বৈধ। শুধু বৈধ বললে কম বলা হবে, বিকৃত যৌনতা আজ পশ্চিমে রীতিমতো প্রশংসিত ও

[৯] Herzer, Manfred. "Zastrow-Ulrichs-Kertbeny. Erfundene Identitäten im 19. Jahrhundert." Männerliebe im alten Deutschland. Verlag rosa Winkel, Berlin (1992).

[১০] Memnon: The Sexual Nature of Men-Loving Urnings, ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত উলরিখসের [illegible]।

উদ্‌যাপিত। মিডিয়া, পাঠ্যবই, সরকার—সবাই একে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরছে নানাভাবে। পশ্চিমা সরকারগুলো প্রভাব খাটিয়ে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বাকি বিশ্বকে চাপ দিচ্ছে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে। অথচ এক সময় পুরো পশ্চিমা বিশ্বে পায়ুসঙ্গম ছিল আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অপরাধ থেকে প্রকাশ্যে উদ্‌যাপিত হবার এই যে পরিবর্তন, তা এসেছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অ্যামেরিকাতে শুরু হওয়া 'সমকামী অধিকার আন্দোলন'-এর মাধ্যমে। উলরিখসের ধ্যানধারণা এই আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে।

কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের অ্যাকটিভিসম সেসময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণার সূচনা করে। আজ বহুল ব্যবহৃত হলেও, সেই সময়ে এই ধারণাগুলো ছিল প্রায় আনকোরা। তার গড়ে তোলা ভিত্তির ওপরেই এগিয়ে যায় প্রথমে জার্মানি, আর তারপর অ্যামেরিকার 'সমকামী অধিকার আন্দোলন'। উলরিখসের তত্ত্বগুলো এক সময় 'সমকামী আন্দোলন'-এর সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই উলরিখস গুরুত্বপূর্ণ। উলরিখসের চিন্তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলোর দিকে তাকানো যাক।

প্রথমত, বিকৃত যৌনতাকে সে জন্মগত এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরে। কোনো কিছুকে প্রাকৃতিক বলার অর্থ সেটাকে স্বাভাবিক বলা। জন্মগত বলার অর্থ সেটা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। 'তৃতীয় লিঙ্গ' তত্ত্বের মাধ্যমে উলরিখস দাবি করে, কিছু মানুষের দেহ পুরুষের হলেও আত্মা নারীর, তাই তারা 'পুরুষপ্রেমী'। তারা এভাবেই জন্মেছে। আর জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কাউকে দোষী বলা ঠিক না। জন্মের ওপর তো কারও হাত থাকে না। পরে আমরা দেখতে পাবো, মার্কিন সমকামী আন্দোলন এবং হাল আমলের ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ, দুটোর বিকাশেই মৌলিক অবদান রেখেছে উলরিখসের এই বানোয়াট তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্ব।

দ্বিতীয়ত, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতাকে আলাদা পরিচয়ের ভিত্তি বানালো উলরিখস। একটা নির্দিষ্ট ধরনের যৌন আচরণকে একটা পরিচয় বানিয়ে ফেললো। সেই সময়ে পুরুষে পুরুষে বিকৃতকামের ব্যাপারটা একেবারে অপরিচিত ছিল না। পুরুষ পতিতাদের ভালোরকমের আনাগোনা ছিল সমাজে। তবে এ ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—এগুলো জঘন্য অপরাধ, নৈতিক স্খলন আর বিকৃত আকাঙ্ক্ষার কারণে কিছু লোক এসব কাজ করে।

পুরুষে পুরুষে যৌনতা আলাদা পরিচয়ের ভিত্তি ছিল না। তখনকার পুরুষ পতিতা এবং তাদের খদ্দের, কেউই নিজেদের 'আরনিং' বা 'সমকামী' বলে আলাদা একটা শ্রেণি মনে করতো না। এদের অনেকেরই স্ত্রী-সন্তান ছিল, অনেকের ছিল প্রেমিকা। উলরিখস নিজে এক চিঠিতে এ-কথা স্বীকার করে লিখেছিল, বার্লিনের পুরুষ

পতিতারা আরনিং না।[১১] সমলিঙ্গের সাথে যৌনতাকে স্বতন্ত্র একটা পরিচয় বানিয়ে ফেলার কৃতিত্ব তাই পুরোপুরিভাবে উলরিখসের। নতুন এ পরিচয় তৈরি করে দেয় নতুন ধরনের রাজনীতির ভিত্তি।

তৃতীয়ত, উলরিখসের দেওয়া তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা থেকে হোমোসেক্সুয়াল-হেটেরোসেক্সুয়াল, সমকামী-অসমকামী বিভাজনের উদ্ভব হয়। এর আগে এ ধরনের কোনো শ্রেণিবিভাগ ছিল না। আরনিং সংক্রান্ত শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে 'সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন'[১২] বা যৌন অভিমুখের (যৌন রুচি) ধারণাও চালু করে উলরিখস।

আপাতভাবে এ ব্যাপারগুলোকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু এভাবে উলরিখস আসলে পুরো আলোচনার ছকটাই পালটে দিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, উলরিখসের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটা আইন বাতিল করা। যে আইনে বলা হচ্ছে পায়ুসঙ্গম দণ্ডনীয় অপরাধ। অর্থাৎ তার দাবি ছিল, পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দেওয়ার।

কোনো একটা কাজ অপরাধ গণ্য হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে ঐ কাজের নৈতিকতা এবং ব্যক্তি-পরিবার-সমাজের ওপর ঐ কাজের প্রভাবসহ নানা বিষয়ের ওপর। কিন্তু উলরিখস সেই দিকে গেলোই না। কারণ, আলোচনা এভাবে এগুলে পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দেওয়া যাবে না। কাজটা ভালো না মন্দ, সেই আলাপের বদলে সে ব্যাপারটাকে নিয়ে আসলো পরিচয় আর অধিকারের প্রশ্ন হিসেবে। ব্যবহার করলো ব্যক্তি স্বাধীনতা আর অধিকারের যুক্তি। ১৮৭০-এ প্রকাশিত এক প্যামফ্লেটে উলরিখস লিখলো,

> একজন আরনিং-ও মানুষ। তারও জন্মগত অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। তার যৌনতা প্রকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার। আইনপ্রণেতাদের কোনো অধিকার নেই প্রকৃতিকে ভেটো দেওয়ার। তাদের কোনো অধিকার নেই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেওয়ার, তাদের অধিকার নেই প্রকৃতি যাদের মধ্যে এই তাড়না তৈরি করেছে সেইসব জীবন্ত প্রাণীদের নির্যাতন করার।[১৩]

কোনো আচরণের নৈতিকতা ও বৈধতার প্রশ্নকে উলটে দিয়ে অধিকারের প্রশ্ন বানিয়ে ফেলা, সমকামী নামে একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করা, আর সে পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু হিসেবে অধিকার দাবি করে বসা—উলরিখসের সবচেয়ে বড়

---

[১১] Hirschfeld. Vier Briefe. 1899, p. 46.

[১২] **Sexual orientation** বা যৌন অভিমুখ দ্বারা যৌন রুচি বা আকর্ষণ বোঝানো হয়। এটি আধুনিক যৌনতত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী মানুষের দেহ আর তার যৌন অভিমুখ আলাদা। স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক যৌনতা বলে কিছু নেই। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যারা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো তারা সমকামী। যারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তারা অসমকামী। যারা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারা উভকামী। শ্রেণিগতভাবে সবগুলো একই পর্যায়ের।

[১৩] "Karl Heinrich Ulrichs" in Gay & Lesbian Biography (London: St. James Press, 1997), pages 436-439.

কৃতিত্ব। যদিও বেঁচে থাকতে এ কৌশলের সফলতা সে দেখে যেতে পারেনি। কিন্তু হুবহু একই কৌশল ব্যবহার করে অ্যামেরিকায় শুরু হওয়া 'সমকামী আন্দোলন' তার দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে ফেলেছে তার মৃত্যুর মোটামুটি একশো বছরের মধ্যে।

তবে এ কাজটা তারা করেছে ধাপে ধাপে।

প্রথমে ধাপে, অল্প কিছু মানুষ তাদের ঐচ্ছিক যৌন আচরণকে একটা পরিচয় (সমকামী) বানিয়ে নিয়েছে। বলেছে সমকামীরা একটা বিশেষ শ্রেণির মানুষ। সমকামিতা জন্মগত, এর ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

দ্বিতীয় ধাপে, কৃত্রিম এই পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের তারা 'সংখ্যালঘু এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়' হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বলেছে—সমকামী হবার কারণে তারা বৈষম্যের শিকার। তারা স্বাধীনভাবে 'ভালোবাসতে' পারছে না।

তৃতীয় ধাপে, বিকৃত যৌনকর্মের বৈধতার কথা সামনে এনেছে অধিকারের প্রশ্ন হিসেবে। যারা 'সমকামী' তাদেরও অন্য দশজনের মতো অধিকার আছে। 'আপনি সমকামিতা অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু আরেকজনের তা করার অধিকার আছে।'

চতুর্থ ধাপে, বিকৃত যৌনতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে স্বাভাবিক হিসেবে।

এভাবে 'আচরণ' থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে সমকামিতার বৈধতাকে দেখানো হয়েছে অধিকারের প্রশ্ন হিসেবে। এবং এ কৌশলে বাজিমাত হয়ে গেছে। বিকৃত যৌনতাকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে পুরো পশ্চিমা বিশ্বে। এই কৌশলেই আজ বাংলাদেশেও 'যৌন অধিকার', 'যৌন সংখ্যালঘু', 'যৌন বৈচিত্র্য'–এর মতো শব্দ ব্যবহার করে চলছে বিকৃত যৌনতার পক্ষে প্রচারণা। তর্কের এ পুরো কাঠামোটাই উলরিখসের কাছ থেকে নেওয়া।

বিকৃতি না কি অধিকার?

সমকামীরা সংখ্যালঘু, সুবিধাবঞ্চিত। বৈষম্যের শিকার। স্রেফ সেকেলে ধ্যানধারণার কারণে সমাজ সমকামীদের অধিকার দিচ্ছে না—কথাগুলো আজ খুবই পরিচিত। আমাদের সমাজেও। কিন্তু এ পুরো আলোচনার প্রথম ধাপটাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে বাকি সব কিছু। 'সমকামীরা' বলে, তারা স্বাভাবিক মানুষদের সমান অধিকার চায়। স্বাভাবিক মানুষ (ওদের ভাষায় 'হেটেরোসেক্সুয়াল' বা 'অসমকামী') যা কিছু করতে পারে, সেটা করতে দিতে হবে তাদেরকেও। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ঐচ্ছিক যৌন আচরণের বিষয়টা বাদ দিলে অন্য সব দিক দিয়ে বাকি সবার মতো একই অধিকার আছে তাদের। শিক্ষা, চাকরি, নাগরিকত্ব, উত্তরাধিকার—কোনো দিকেই কেউ কিন্তু তাদের বাধা দিচ্ছে না। 'সংখ্যালঘু', 'সুবিধাবঞ্চিত' বা 'বৈষম্যের শিকার' হবার ব্যাপারটা দেখা দিচ্ছে 'সমকামী' নামে

আলাদা একটা পরিচয় তৈরি করার কারণেই। যতক্ষণ না তারা একটা নির্দিষ্ট কাজ করছে, ততক্ষণ তাদের সাথে বাকি দশ জনের মতোই আচরণ করা হচ্ছে। তাহলে বৈষম্য কোথায়?

আসলে 'সমকামীরা সমান অধিকার চায়' বলার অর্থ হলো, তারা তাদের যৌনকর্মের স্বাভাবিকীকরণ চায়। বৈধতা চায়, গ্রহণযোগ্যতা চায়, চায় নৈতিক সমর্থন। তারা স্বীকৃতি চায়। যদিও বিষয়টাকে তারা অধিকারের মোড়কে সামনে আনছে, কিন্তু তাদের আসল মনোযোগ নির্বিঘ্নে বিকৃত যৌনাচার করার দিকে।

ভেবে দেখুন, উলরিখস নানা তত্ত্ব কপচেছে ঠিক, কিন্তু দিনশেষে তার মূল দাবি কী ছিল? পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দিতে হবে, এই তো! ১৯৬০ এর দশকে অ্যামেরিকার সমকামী আন্দোলনের প্রধান দাবিও ছিল একই। বাংলাদেশে যারা 'সমকামী অধিকারের' কথা বলে, সেইসব এনজিও, অ্যাকটিভিস্ট আর তাদের অর্থায়ন করা পশ্চিমাদের দাবিও হলো দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।[১৪] যেখানেই সমকামী আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেখানেই তাদের প্রধান দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গমের বৈধতা।

নৈতিকতার প্রশ্নকে পরিচয় আর অধিকারের আলাপ বানিয়ে ফেলার এই যে কৌশল, সেটা ব্যবহার করে প্রায় যেকোনো অপরাধ এবং অনৈতিকতাকে স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলা সম্ভব। একটা উদাহরণ দিই।

ধরুন, অনেক মানুষ মাদক ব্যবহার করে। মাদক ব্যবহার না করলে তারা মানসিক অবসাদে এমনকি ডিপ্রেশনে ভোগে। ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। এ ধরনের মানুষরা দাবি করলো, জন্মগত বা পরিবেশগত বা মনস্তাত্ত্বিক কিছু কারণে মাদক ব্যবহারের প্রতি তাদের ঝোঁক আছে। তারপর তারা 'মাদকসেবীদের অধিকার আন্দোলন' শুরু করলো। বলতে লাগলো,

> অনেক মানুষের জন্মগতভাবে অবিস বা ওভারওয়েইট হবার প্রবণতা থাকে। আমাদের জন্মগতভাবে মাদক ব্যবহারের প্রবণতা আছে। এর ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু মাদকসেবী হবার কারণে আমাদের অনেক লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়। সমাজে আমাদের গাঞ্জুটি, হেরোইনচি, বাবাখোর, ডাইলখোর ইত্যাদি নেতিবাচক নামে ডাকা হয়। আমরা প্রকাশ্যে বলতে পারি না, আমরা মাদকসেবী। সংখ্যালঘু হিসেবে বৈষম্যের শিকার হই। যদি নিজের

---

[১৪] বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষ, নারী বা পশুর সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম করে, তবে তাকে দুই বছর কারাদণ্ড দেওয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে; যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে। ২০০৯ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশি-বিদেশি এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠন ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। দেখুন: অধ্যায় ১৮, বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা

পরিচয় প্রকাশ করি তাহলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। অফিসে জানলে ছাঁটাই করে দেয়। আমাদের নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে হয়।

মাদক কেনার সময় কিংবা খাবার সময় ধরা পড়লে পুলিশ আমাদের জেলে নিয়ে যায়। ঘুষ নেয়। সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়লে তারা গণপিটুনি দেয়। পরিবার থেকে আমাদের অনেক খারাপ খারাপ কথা বলে। সবসময় আমরা একটা লজ্জা, মানসিক কষ্টের মধ্যে থাকি। আমরা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি।

এই যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি চাই। আমরাও তো মানুষ, আমরাও অন্য দশ জনের মতো স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। আমরা আমাদের অধিকার চাই। আপনার ভালো না লাগলে আপনি মাদক ব্যবহার করবেন না। কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতে দিন। আমরা তো কারও ক্ষতি করছি না!

আমাদের অধিকারবঞ্চিত করা হলে সেটা হবে বৈষম্য, নিপীড়ন এবং প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ। সমাজের মানুষের সেকেলে চিন্তাভাবনার কারণে আমরা কি সারাটা জীবন এই দুঃসহ কষ্ট সয়ে যাবো? আমরা মাদকসেবীরা অমাদকসেবীদের মতো সমান অধিকার চাই।

এ অবস্থানকে কি আমরা যৌক্তিক মনে করবো? এ ধরনের যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য? মাদক ব্যবহারের বিষয়টাকে এখানে অধিকারের প্রশ্ন বানানো হচ্ছে। কিন্তু আপত্তিটা অধিকারের জায়গাতে না। আপত্তিটা মাদকের ব্যবহার নিয়ে। অর্থাৎ কাজটা নিয়ে। তাহলে এটা কি নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন না কি ভালো-মন্দ আর বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন? মাদকসেবীরা ঠিক কোন দিকে অধিকারবঞ্চিত হচ্ছে?

বিকৃত যৌনাচারকে অধিকারের প্রশ্ন বানানোর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। শুধু মাদক বা সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা না, এই কৌশল ব্যবহার করে মোটামুটি যেকোনো কাজকে অধিকারের প্রশ্ন বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

- যে কাজটা অবৈধ (পশুকাম, অজাচার বা অন্য কিছু), সেটার ভিত্তিতে প্রথমে একটা পরিচয় তৈরি করবেন (মাদকসেবী, পশুপ্রেমী, অজাচারপ্রেমী ইত্যাদি)।[১৫]
- তারপর এই বানোয়াট পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের সুবিধাবঞ্চিত, সংখ্যালঘু শ্রেণি দাবি করবেন।
- তারপর অধিকারের দাবি তুলবেন।

ব্যস, কেল্লাফতে!

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা একটা কাজ, একটা নির্দিষ্ট আচরণ। আচরণ কিংবা বিকৃতি,

---

[১৫] কেউ কেউ এখানে কনসেন্ট বা 'সম্মতি' নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। এসব প্রশ্নের নিরসনের জন্য দেখুন, অধ্যায় ২২, ব্যবচ্ছেদ

পরিচয়ের ভিত্তি হতে পারে না। কিন্তু এই সত্যকে বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাইয়ের মাধ্যমে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। পুরো আলোচনাটাকে নিজেদের তৈরি করা ছকে নিয়ে যেতে পেরেছে বিকৃত যৌনাচারের সমর্থকেরা। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর এই প্রচণ্ড কার্যকরী কৌশল, নতুন এই পরিচয় আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রায় পুরোটাই কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের।

পরিচয়ের রাজনীতি

সমকামী এবং অসমকামী—এই শব্দ আর শ্রেণিবিভাগগুলো যে চিরন্তন না; বরং নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক লক্ষ্য সামনে রেখে তৈরি করা—এ সত্য স্বীকার করেন অনেক সমকামী অ্যাকটিভিস্ট আর গবেষকও। গত পঞ্চাশ বছরে 'সমকামী', 'গে' এবং 'লেসবিয়ান'-এর মতো ধারণাগুলোর ইতিহাস নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।[১৬] এর বেশিরভাগই করেছে এমন সব মানুষ, যারা নিজেদের 'সমকামী' বলে পরিচয় দেয়। এ গবেষণাগুলোর সারমর্ম তুলে ধরে মনোবিজ্ঞানী ড. শার্লিট প্যাটারসন 'ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি'-তে লিখেছেন,

> পরিচয়ের ব্যাপারে সামসময়িক যে ধারণা, তা তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুনির্দিষ্ট সমকামী পরিচয়ের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশ কিছু মানুষ প্রকাশ্যে নিজেদেরকে গে, লেসবিয়ান বা উভকামী বলে পরিচয় দেওয়ার এই ব্যাপারটা তুলনামূলক সাম্প্রতিক। গে, লেসবিয়ান এবং উভকামী[১৭], এই পরিচয়গুলি আমাদের বর্তমান সময়ের একটা ঘটনা।[১৮]

জার্নাল অফ সেক্স রিসার্চে প্রকাশিত আর্টিকেলে গবেষক শার্লিন মুয়েলেনহার্ড লিখেছেন,

> সমকামী-অসমকামী এই শ্রেণিবিভাগ সামাজিকভাবে নির্মিত। এসব শব্দের কোনো সর্বজনীন, বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা নেই। আসমানে এমন কোনো স্বর্ণ-মোড়ানো অভিধান নেই, যা এগুলোর প্রকৃত সংজ্ঞা ধারণ করে আছে। এই শব্দ আর শ্রেণিবিভাগ আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি।[১৯]

---

[১৬] গে (Gay), যে পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। লেসবিয়ান (Lesbian), যে নারী অন্য নারীর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়।

[১৭] বাইসেক্সুয়াল (Bisexual), উভকামী। যে নারী বা পুরুষ উভয় লিঙ্গের সাথে যৌনতায় অভ্যস্ত।

[১৮] Patterson, Charlotte J. "Sexual orientation and human development: An overview." Developmental Psychology 31, no. 1 (1995): 3. p.3

[১৯] Muehlenhard, Charlene L. "Categories and sexuality." Journal of Sex Research 37, no. 2 (2000): 101-107.

সমকামী অ্যাকটিভিস্ট জেফরি উইকসের ভাষায়,

> আমরা আজকাল মনে করি সময় আর ইতিহাসের সীমানার বাইরে 'সমকামী' শব্দটার একটা অপরিবর্তনীয় অর্থ আছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ইতিহাসের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের ফসল, সাংস্কৃতিক নিদর্শন—যা তৈরি করা হয়েছে একটা বিশেষ ধারণা প্রকাশ করার জন্যে।[২০]

অধ্যাপক লিসা ডুগ্যান এবং ন্যান হান্টার লিখেছে,

> লেসবিয়ান এবং গে ইতিহাসবিদরা পুরুষ সমকামী আন্দোলন (গে লিবারেশন) এবং সমকামী নারীবাদের (লেসবিয়ান ফেমিনিসম) উৎস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ময়কর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। প্রত্যেক সময় ও স্থানে নীরব, নিপীড়িত, সংখ্যালঘু সমকামী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুঁজে পাবার বদলে তারা আবিষ্কার করেছেন, 'সমকামী' পরিচয় আসলে পাশ্চাত্যের একটি সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক নির্মাণ।
>
> যেমন, জেফরি উইকস, জনাথন ক্যাটয এবং লিলিয়ান ফেইডারম্যান এই পরিচয়গুলোর উৎস খুঁজে পেয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। একইভাবে, কীভাবে এই পরিচয়গুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলোতে সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি তৈরি করেছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন জন ডি'এমিলিও, অ্যালান বারোবি এবং বাফালো মৌখিক ইতিহাস প্রকল্প।[২১]

সমকামী অধ্যাপক গিলবার্ট হার্ডট; যিনি স্যান ফ্রানসিসকো স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ সেক্সুয়াল স্টাডিসের প্রতিষ্ঠাতা, বলছেন—

> গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক বক্তব্যে মানুষ এবং আচরণের ক্ষেত্রে 'সমকামী-অসমকামী' পরিভাষাগুলোর ব্যাপক প্রয়োগ কেবল বিংশ শতাব্দীতেই হয়েছে। এবং মূলত তা করা হয়েছে যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য... ষাটের দশকে যৌন স্বাধীনতার আন্দোলন যখন শক্তিশালী হতে শুরু করে, তখনই দেখা গেল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেদের 'সমকামী' বলতে শুরু করেছে। তারপর এই পরিচয়গুলো অন্যান্য সমাজে রফতানি করা হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কারণ, যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে (পাশ্চাত্যে) এই পরিচয়গুলোর উদ্ভব ঘটেছে, সেগুলো ঐসব উন্নয়নশীল সমাজগুলোতে

---

[২০] Weeks, Jeffrey. Coming Out: Homosexual Politics in Britain from the Nineteenth Century to the Present. Quartet Books. London, Melbourne, & New York, 1977) p. 3.

[২১] Duggan, Lisa, and Nan D. Hunter. Sex wars: Sexual dissent and political culture. Routledge, 2014. p.151-152.

অনুপস্থিত।[২২]

নিরেট বাস্তবতা হলো 'সমকামী ব্যক্তি' বা 'অসমকামী ব্যক্তি' বলে আসলে কিছু নেই। কিছু মানুষ সমকামী হয়ে জন্মায় বাকিরা জন্মায় অসমকামী হয়ে, নারী আর পুরুষের বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গ আছে—এসব কথাবার্তা একেবারেই ভিত্তিহীন। 'সমকামিতা' কোনো সহজাত বৈশিষ্ট্য না। সত্যিকারের কোনো পরিচয় না। এটা স্রেফ বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তৈরি রাজনৈতিক পরিচয়। 'সমকামিতা'র সবচেয়ে বড় প্রচারকরাও একথা জানে।

আর্কিটাইপ

কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের আরেকটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। আধুনিক 'সমকামী' চরিত্রের মৌলিক একটা ছাঁচ তার মধ্যে পাওয়া যায়। তার মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা দেখা যায়, যা পরবর্তীতে 'সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট'-দের মাধ্যমে অতি পরিচিত হয়ে উঠবে।

উলরিখস প্রথম কৈশোরে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। এ অভিজ্ঞতা তার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। পুরুষের দেহে নারী আত্মা, তৃতীয় লিঙ্গ, আরনিং-ইউরেনিয়ান এর মতো আবোলতাবোল যুক্তি আর তত্ত্ব সে তৈরি করে একটা লজ্জাজনক সত্যকে ঢাকার জন্য। আর সেই সত্য হলো, চৌদ্দ বছর বয়সে যে রাক্ষুসে লালসার বলি তাকে হতে হয়েছিল, একসময় নিজের ভেতরেও সে ঐ একই লালসা আবিষ্কার করে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার বদলে উলরিখস তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে এর অজুহাত তৈরিতে। আজ যারা নিজেদের সমকামী বলে পরিচয় দেয়, তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ শৈশবের যৌন নির্যাতনের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। এবং উলরিখসের মতোই তাদের 'সমকামিতা'র পেছনেও এই অভিজ্ঞতা বড় একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। যদিও তাদের অনেকেই এ কথা স্বীকার করতে চায় না।[২৩]

উলরিখসের চরিত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব চোখে পড়ার মতো। গুরুতর পরিণতির কথা জানা সত্ত্বেও, সরকারি অফিসার পদে থাকা অবস্থাতেই বারবার সে ছুটে গেছে

---

[২২] Herdt, Gilbert. "Same Sex, Different Cultures: Exploring Gay and Lesbian Lives." (1998) p.7.

[২৩] Lenderking, William R., Cheryl Wold, Kenneth H. Mayer, Robert Goldstein, Elena Losina, and George R. Seage. "Childhood Sexual Abuse Among Homosexual Men: Prevalence And Association With Unsafe Sex." Journal of General Internal Medicine 12, no. 4 (1997): 250-253. Doll, Lynda S., Dan Joy, Brad N. Bartholow, Janet S. Harrison, Gail Bolan, John M. Douglas, Linda E. Saltzman, Patricia M. Moss, and Wanda Delgado. "Self-Reported Childhood And Adolescent Sexual Abuse Among Adult Homosexual And Bisexual Men." Child Abuse & Neglect 16, no. 6 (1992): 855-864. Tomeo, Marie E., Donald I. Templer, Susan Anderson, and Debra Kotler. "Comparative Data Of Childhood And Adolescence Molestation In Heterosexual And Homosexual Persons." Archives of Sexual Behavior 30 (2001): 535-541.

অন্ধকার গলি আর নিষিদ্ধ পল্লীর পুরুষ পতিতাদের কাছে। নিজের বিপজ্জনক আচরণ সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বারবার মানুষের চোখে ধরা পড়েছে, এবং তা জেনেও একই কাজ করে গেছে।

উলরিখসের জন্য নিজের বিকৃত লালসা পূরণ করতে পারাটা যথেষ্ট ছিল না। নিজের লজ্জাকে উলটে ফেলে সমাজের দিকে তাক করে বিকৃতির স্বীকৃতি চেয়ে বসেছিল সে। তার যা ইচ্ছে তাই সে করবে, আর সমাজকে সেটা মেনে নিতে হবে, বৈধতা দিতে হবে, সম্মান করতে হবে। ভারমুক্ত মনে পাপ করার জন্যে পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে। এ লক্ষ্যে উৎসর্গ করেছিল নিজের জীবনের কয়েক দশক।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, যেকোনো মূল্যে নিজেদের খেয়ালখুশিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা, স্বীকৃতি পাবার তাড়না এবং এ লক্ষ্য অর্জনে একাগ্রতার এই বৈশিষ্ট্যগুলো এখনকার বড় বড় 'সমকামী অ্যাকটিভিস্ট'-দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় পুরোদমে।

***

কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের স্বচ্ছলতা ছিল, সম্মান ছিল। তার সুযোগ ছিল নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার। সুযোগ ছিল কৈশোরের বলাৎকারের অভিজ্ঞতা থেকে বের হয়ে এসে সুস্থ জীবনযাপনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিকৃতিকে বেছে নেয়। নিজের কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করার বদলে সে সিদ্ধান্ত নেয় একে সঠিক প্রমাণ করার। নফসের লাগাম টেনে ধরার বদলে নিজের একান্ত পাপকে পুরো সমাজে স্বাভাবিক করে তোলার প্রতিজ্ঞা করে সে।

প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিল করতে ব্যর্থ হয় উলরিখস। তবে সমকামী আন্দোলনের রক্তবীজ রোপন করে যায় সে। তার চিন্তা ও লেখনী থেকে প্রভাবিত হয়ে এক প্রজন্ম পর আধুনিক পৃথিবীর প্রথম সমকামী অধিকার আন্দোলন শুরু হয় বার্লিনে।

অধ্যায় ২

বার্লিন ব্যাবিলন

ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের জন্ম পোল্যান্ডের এক ইহুদি পরিবারে, ১৮৬৮ সালে। যে বছর উলরিখসের কাছে লেখা চিঠিতে 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটা প্রস্তাব করেছিল হাঙ্গেরিয় লেখক কার্ল মারিয়া কার্টবেনি, সেই বছর। ব্যাপারটাকে কাকতালীয়ই বলতে হবে।

বিকৃত যৌনাচারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য 'আরনিং' বা 'সমকামী' নামে নতুন এক পরিচয় আবিষ্কার করেছিল কার্ল হাইনরিখ উলরিখস। তবে তার কার্যক্রম সীমিত ছিল লেখালেখি আর তত্ত্বের মধ্যে। এই চিন্তাধারাকে কাজে পরিণত করার কৃতিত্ব ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের। উলরিখসকে যদি 'সমকামী' পরিচয়ের জনক বলা হয়, তবে হার্শফেল্ডকে বলতে হবে 'সমকামী আন্দোলন'-এর জনক।

ছাত্রজীবনে উলরিখসের লেখনী ও চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে হার্শফেল্ডকে। এসব লেখা পড়ে 'সমকামী অধিকার'-এর জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় সে। তার এই আগ্রহের পেছনে অবশ্য আরেকটা কারণ ছিল। উলরিখসের মতো হার্শফেল্ডও ছিল বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত।

পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ১৮৯৬ সালে ডাক্তার এবং 'যৌন গবেষক' হিসেবে বার্লিনে প্র্যাকটিস শুরু করে হার্শফেল্ড। আর এখানেই ১৮৯৭ সালে তৈরি করে পৃথিবীর প্রথম সমকামী অধিকার সংস্থা Scientific Humanitarian Committee বা 'বৈজ্ঞানিক মানবিক কমিটি', সংক্ষেপে এসএইচসি।[২৪] মোটাদাগে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল চারটি,

১. কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের দর্শন ও কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
২. প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিল করার মাধ্যমে পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গমকে আইনি বৈধতা দেওয়া।[২৫]
৩. সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার কারণে গ্রেফতার হওয়া লোকেদের আইনি

---

[২৪] জার্মান, Wissenschaftlich-humanitäres Komitee

[২৫] Steakley, James D. The homosexual emancipation movement in Germany. Ayer Company Pub, 1993

সাহায্য দেওয়া।

৪. সমকামিতাকে একটি মেডিকেল সমস্যা হিসেবে উপস্থিত করা।[২৬]

এর মধ্যে চতুর্থটা হার্শফেল্ডের নিজস্ব চিন্তার ফসল। উলরিখস 'তৃতীয় লিঙ্গ' তত্ত্ব অনুযায়ী 'সমকামী'রা পুরুষের দেহে আটকা পড়া নারী সত্ত্বা। কিছুটা বদলে নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মোড়ক চাপিয়ে এই তত্ত্বের নিজস্ব একটা সংস্করণ হাজির করে হার্শফেল্ড। তবে এসবের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই একই, পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দেওয়া।

প্রথম সমকামী আন্দোলন

এসএইচসি'র মাধ্যমে জার্মানিতে আধুনিক পৃথিবীর প্রথম সমকামী আন্দোলন গড়ে তোলে ম্যাগনাস হার্শফেল্ড।[২৭] উলরিখসের তত্ত্বগুলোকে সুচারুভাবে আন্দোলনে পরিণত করে। হাল আমলের এলজিবিটি আন্দোলন যেসব কৌশল ব্যবহার করে সফল হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই হার্শফেল্ড এবং এসএইচসির কাছ থেকে ধার করা। হার্শফেল্ডের সংগঠনের কার্যক্রম ছিল বহুমুখী। সংক্ষেপে কয়েকটি দিক সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

রাজনীতি : এসএইচসি'র স্লোগান ছিল 'বিজ্ঞানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার'। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে—

- সমকামিতার ব্যপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন
- প্রচারণার মাধ্যমে সামাজিকভাবে একে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, এবং
- প্রচলিত আইনে পরিবর্তন এনে বিকৃত যৌনতার বৈধতা তৈরি

এই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে এসএইচসি কাজ শুরু করে। ১৮৯৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের জন্য ক্রমাগত জার্মান সংসদে আবেদন দায়ের করে যায় তারা। প্রতিবারই তা নাকচ হয়। জার্মান সংসদের কাছে পেশ করা এসএইচসি'র এই আবেদনকে আধুনিক সমকামী অধিকার আন্দোলনের প্রথম ইশতেহার ও সংবিধান মনে করা হয়।[২৮] হালের এলজিবিটি আন্দোলন প্রায় হুবহু একই কৌশল ব্যবহার করে। যেকোনো দেশে 'সমকামী আন্দোলন' এর প্রধান লক্ষ্য হয় এনজিও এবং রাজনৈতিক লবিয়িংয়ের মাধ্যমে পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দেওয়া।

---

[২৬] Bianco, David. What Was The Scientific Humanitarian Committee? Washington Blade, August, 1997

[২৭] Goltz, D. (2008). Lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer movements. Battleground: women, gender, and sexuality, 2, 291-298.

[২৮] Petition to the Reichstag (1897), in We Are Everywhere: A Historical Sourcebook of Gay and Lesbian Politics, ed. Mark Blasius and Shane Phelan (New York, London: Routledge, 1997), 135–37.

তবে হার্শফেল্ড আর এসএইচসি'র কর্মকাণ্ড এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিকৃত যৌনতার পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন পাওয়ার জোর চেষ্টা চালায় তারা। সফলও হয়। প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের দাবিকে সমর্থন করে জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টি। এই দাবিকে বানিয়ে নেয় নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ।[২৯] বিশ্বজুড়ে প্রগতিশীল বা বামপন্থী দলগুলো আজও যৌন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে সক্রিয় সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। বিকৃত যৌনতাকে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জুড়ে দেওয়ার কৃতিত্বটাও হার্শফেল্ডের।

প্রচারণা : হার্শফেল্ড বুঝতে পেরেছিল, বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দিতে হলে আগে জনমত তৈরি করতে হবে। তাই প্রচারণাকে সে খুব গুরুত্ব দিতো। তার উদ্যোগে ১৯০৩ সালে 'প্রোপাগ্যান্ডা কমিশন' গঠন করে এসএইচসি। এ কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিকৃত যৌনতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা। জার্মানি জুড়ে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ করে এসএইচসি। আয়োজন করে সেমিনার আর বক্তৃতা। সাধারণ জনগণের পাশাপাশি বিশেষভাবে টার্গেট করে লিফলেট পৌঁছে দেয় সরকারি কর্মকর্তা, চিকিৎসক, আইনজীবী, অধ্যাপক এবং স্কুল শিক্ষকদের কাছে।

এসএইচসির আরেকটা কৌশল ছিল প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের পক্ষে 'বিশিষ্ট নাগরিক'দের সাক্ষর জোগাড় করা। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদসহ মোট ছয় হাজার সাক্ষর জড়ো করে ফেলে তারা।[৩০] একই জিনিস সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা আধুনিক এনজিওগুলোও করে। যদিও একশো বছর আগের তুলনায় এখন কাজের দক্ষতা এবং সুক্ষতা বেড়ে গেছে অনেকগুণ।

নারীবাদ : নারীবাদী আন্দোলনের সাথে 'সমকামী আন্দোলন' এর সম্পর্ক তৈরি করে হার্শফেল্ড। সেই সময়কার জার্মানিতে নারীবাদীদের সবচয়ে উগ্র ধারার প্রতিনিধিত্ব করছিল হেলিনা স্টকারের নেতৃত্বাধীন বিএফএম নামের সংগঠন। ১৯১১ সাল থেকে তাদের সাথে কাজ করতে শুরু করে এসএইচসি। হার্শফেল্ড এবং স্টোকার, দুজনেরই বিশ্বাস ছিল নারীবাদী আর সমকামী আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। স্টোকারের নেতৃত্বে নারীবাদীরা প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের পক্ষে অবস্থান নেয়, অন্যদিকে হার্শফেল্ড এবং এসএইচসি অবস্থান নেয় গর্ভপাতের বৈধতার পক্ষে। এছাড়া জার্মানিতে যখন প্যারাগ্রাফ ১৭৫ কে সম্প্রসারিত করে দুজন নারীর মধ্যে যৌনতাকে বেআইনি করার কথা ওঠে, তখন শক্তভাবে এর বিরোধিতা করে হার্শফেল্ডের আন্দোলন।[৩১]

---

[২৯] Beachy, Robert. Gay Berlin: Birthplace of a modern identity. Alfred a Knopf Incorporated, 2014. Chapter 3

[৩০] প্রাগুক্ত।

[৩১] Dose, Ralf. Magnus Hirschfeld: The Origins Of The Gay Liberation Movement.

আজও নারীবাদী এবং সমকামী আন্দোলনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। হাল আমলের ট্রান্সজেন্ডারবাদের অনেক ধারণার উদ্ভব নারীবাদ এবং সমকামী অধিকার আন্দোলনের মিশ্রণ থেকে।

মিডিয়া : মিডিয়ার শক্তিকে পুরোদমে কাজে লাগায় হার্শফেল্ড। আধুনিক অ্যাকটিভিস্টদের বহু আগেই সে মিডিয়ার গুরুত্ব ধরতে পেরেছিল। জনমত তৈরিতে দক্ষভাবে কাজে লাগিয়েছিল মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে। যৌন গবেষক হিসেবে 'বিশেষজ্ঞ' মতামত নিয়ে মিডিয়াতে হাজির হবার সব সুযোগ লুফে নিতো হার্শফেল্ড। উকিলদের সাথে যোগসাজসে বিভিন্ন হাইপ্রোফাইল মামলায় বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে ঢুকিয়ে দিতো নিজের নাম। ভরা আদালতে, উৎসুক সাংবাদিকদের সামনে নিজের বানোয়াট তত্ত্বগুলো চালিয়ে দিতো গম্ভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে। তার উদ্যোগে এবং প্রযোজনায় ১৯১৯ সালে তৈরি হয় সমকামিতার পক্ষে প্রথম সিনেমা। 'Anders als die Andern' (অন্যদের চেয়ে আলাদা) নামের এ সিনেমায় প্রযোজনা এবং চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি নিজ ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিল হার্শফেল্ড। এসব কলাকৌশল কাজে লেগেছিল। গবেষক রবার্ট বীচি তার 'গে বার্লিন' বইতে হার্শফেল্ডের কৌশলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লিখেছেন,

> রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার আনার নতুন এক পদ্ধতির মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন হার্শফেল্ড। তার প্রস্তাবনা ছিল, জার্মান সমকামীদের দুর্দশা কমাতে হলে মিডিয়া-স্যাভি[৩২] অ্যাক্টিভিসমের সাথে সংযোগ ঘটাতে হবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাণ্ডিত্যের।
>
> ...বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলকে হার্শফেল্ড নিপুণভাবে (প্রচারণার) হাতিয়ার বানাতেন, পাশাপাশি বার্লিনের সেইসময়কার লিবারেল মিডিয়াকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। এসএইচসি'র প্রাথমিক সাফল্যের পেছনে হার্শফেল্ডের এসব কলাকৌশলের বড় ভূমিকা ছিল।[৩৩]

অপবিজ্ঞান : 'সমকামিতা'-কে জন্মগত প্রমাণ করতে গিয়ে হার্শফেল্ড একেকসময় একেক তত্ত্ব প্রচার করত, যার সবগুলিই পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আসলে বিজ্ঞানের বদলে আন্দোলনের সফলতাই ছিল তার কাছে বড় কথা। তাই বাছবিচার না করে যেটা নিজের অবস্থানের পক্ষে কাজে লাগানো যায় সেটাই লুফে নিতো হার্শফেল্ড।

মজার ব্যাপার হলো, এখনকার এলজিবিটি আন্দোলনের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা

NYU Press, 2014. p 46

[৩২] মিডিয়া-স্যাভি : মিডিয়ার কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে প্রভাবিত করার দক্ষতা।

[৩৩] Beachy. Gay Berlin

যায়। 'সমকামিতা'কে জন্মগত প্রমাণ করতে গিয়ে আধুনিক অ্যাক্টিভিস্টরা বেশ কিছু ভুয়া গবেষণা প্রচার করেছে। এর মধ্যে সাইমন লাভেই এবং ডীন হেইমারের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জন বলেছিল 'সমকামী'দের মস্তিস্ক 'অসমকামী'-দের চেয়ে আলাদা। দ্বিতীয় জন দাবি করেছিল, জিনগত প্রভাবের কারণে কিছু মানুষ সমকামী হয়। দুটো দাবিই পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।[৩৪] উল্লেখ্য, হার্শফেল্ডের মতো এ দুই গবেষকও ছিল 'সমকামী'।

'বিকৃতির বৈজ্ঞানিক অজুহাত তৈরি আর যৌন বিকৃতির মেডিকালাইযেশান,[৩৫] দুই ক্ষেত্রেই হার্শফেল্ড ছিল অগ্রণী ভূমিকায়।

যৌন গবেষণা : হার্শফেল্ডের আগ্রহ কেবল সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা নিয়ে ছিল না। ১৯১৯ এর মার্চে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অল্প কয়েক মাস পর, বার্লিনে 'ইন্সটিটিউট ফর সেক্সুয়াল সায়েন্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সে। গবেষণার নামে যৌন বিকৃতির অজুহাত আর সেগুলির সামাজিকীকরণের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করাই ছিল এই ইন্সটিটিউটের কাজ। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনেই ১৯২০ এর দশকে সর্বপ্রথম কথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করা হয়।

উলরিখসের পর সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সম্ভবত হার্শফেল্ড। দুটো আন্দোলনের উত্থানেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল তার। ইতিহাসবিদ রিচার্ড প্ল্যান্ট—যিনি নিজেকে 'সমকামী' বলে পরিচয় দেন—লিখেছেন,

> হার্শফেল্ডের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা কঠিন। তিনি বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন...তিনি ছিলেন একটি যৌন গবেষণামূলক ইন্সটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, যা ছিল সে সময়ে একেবারেই অনন্য, অদ্বিতীয়...[৩৬]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বার্লিনে আধুনিক পৃথিবীর প্রথম সমকামী অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। প্রায় সাত দশক পর গুরুতর এক সংকটের মুহূর্তে হার্শফেল্ডের কলাকৌশলগুলোর প্রায় হুবহু অনুকরণ শুরু করবে অ্যামেরিকান সমকামী আন্দোলন, এবং সফল হবে। অন্যদিকে তার দেওয়া বানোয়াট তত্ত্বগুলো হয়ে ওঠবে ট্রান্সজেন্ডারবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তবে সেই সাফল্য দেখে যাওয়ার সুযোগ হবে না হার্শফেল্ডের।

---

[৩৪] Nimmons, David. "Sex and the Brain." Discover 15, no. 3 (1994): 64-71.
Lambert, Jonathan. "No 'Gay Gene': Study Looks At Genetic Basis Of Sexuality." (2019): 14-15.

[৩৫] যৌন বিকৃতিকে নৈতিকতার প্রশ্নের বদলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিণত করা।

[৩৬] Plant, Richard. The Pink Triangle: The Nazi War Against Homosexuals. New York, Henry Holt and Company, 1986.

লোকচক্ষুর অন্তরালে

সমাজের সামনে হার্শফেল্ড নিজেকে উপস্থাপন করতো সম্মানিত চিকিৎসক, আর নির্মোহ গবেষক হিসেবে। কিন্তু তার ব্যক্তিজীবনের ছবিটা ছিল একেবারেই আলাদা। বার্লিনের 'সমকামী'দের মধ্যে হার্শফেল্ড পরিচিত ছিল 'টান্টে' (আন্টি) ম্যাগনেশিয়া বা *'ম্যাগনেশিয়া খালা'* নামে। কার্ল গীব নামের এক যুবক ছিল তার 'প্রেমিক'। বার্লিনের ইনস্টিটিউটে একই সাথে থাকতো দুজন। হার্শফেল্ডের এক সময়কার সহকর্মী ইলেন বেইকগার্ড, তার ডাইরিতে কার্ল গীযের ব্যাপারে লিখেছিল, 'কার্ল ছিল ঐ বাড়ির গৃহিনী।'[৩৭] গীযের পাশাপাশি আর অনেকের সাথে, বিশেষ করে তার ইনস্টিটিউটে গবেষণা শিখতে আসা ছাত্রদের সাথে যৌনসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল হার্শফেল্ডের। এ ইনস্টিটিউটে বসতো নানান বিচিত্র চরিত্র আর বিকৃতির আসর।

একবার হার্শফেল্ডের সাথে দেখা করতে তার ইন্সটিটিউটে গিয়েছিল আরেক সমকামী অ্যাকটিভিস্ট হান্স ব্লিউয়ার। সেখানকার অবস্থার বর্ণনা তার জবানিতেই শোনা যাক।

> আমাকে 'ওয়াইয ম্যান অফ বার্লিন' (অনেকে তাকে এ নামেই ডাকতো) এর স্টাডিতে নিয়ে যাওয়া হলো। দেখতে পেলাম সিল্ক মোড়ানো সোফার ওপর, তুর্কিদের মতো পা ভাঁজ করে এক লোক বসে আছে। ঠোঁটগুলো ফোলাফোলা, চোখদুটো আধখোলা, সেখানে ম্লান কামুকতার ছাপ। আমার দিকে মাংসল একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা নিজের পরিচয় দিলো ড. হার্শফেল্ড বলে...
>
> (পরে এসএইচসি'র মিটিংয়ে) সবার আগে আমাকে সম্ভাষণ জানালো গভীর মোটা কণ্ঠের এক করপোরাল; তবে তার পরনে ছিল মহিলাদের পোশাক... 'একজন তথাকথিত ট্র্যান্সভেস্টাইট!' ড. হার্শফেল্ড বলে উঠলেন। তারপর সেই করপোরালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
>
> তারপর অনিন্দ্য সুন্দর এক কিশোর হাজির হলো...'একজন হারমাফ্রোডাইট... এক কাজ করুন না, আগামীকাল অফিস আওয়ারে আমার এখানে চলে আসুন। তখন ওকে নগ্ন দেখতে পাবেন'... হার্শফেল্ড বললো।
>
> ষাটোর্ধ এক ভদ্রলোক ষোলো বছরের এক কিশোরের সামনে তীব্র কামনাভরা এক কবিতা আবৃত্তি করলো...আমি লরেন্টের দিকে ফিরে বললাম, 'বলুন তো, আপনার কি মনে হচ্ছে না আমরা একটা পুরোদস্তুর পতিতালয়ে বসে আছি?'[৩৮]

---

[৩৭] Dose. Magnus Hirschfeld. p 28

[৩৮] Mills, Richard. "The German Youth Movement." In Leyland, Winston (Ed.). Gay Roots: Twenty Years of Gay Sunshine: An Anthology of Gay History, Sex, Politics, and Culture. San Francisco, Gay Sunshine Press, 1989. p 160.

হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটের বিচিত্র বর্ণনা উঠে এসেছে অ্যাংলো-অ্যামেরিকান লেখক ক্রিস্টোফার ইশারউডের আত্মজীবনীতে। ইশারউড লিখেছেন, হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটে অভিজাত ডাইনিং হলের পাশেই দেখা যেত চাবুক, শেকল আর যৌন নির্যাতনের নানা যন্ত্রপাতি সাজানো কক্ষ। এসব যন্ত্রপাতি নিয়মিত রোগীদের 'থেরাপি'তে ব্যবহার হতো। আয়োজন করা হতো নানান প্রদর্শনী। বলে রাখা ভালো, ইশারউড নিজেও সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ছিল।[৩৯] এই যদি হয় অতিথিদের সামনের রূপ, তাহলে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই প্রতিষ্ঠানে ঠিক কী ধরনের আসর বসতো, তা বোঝাই যায়।

তবে হার্শফেল্ড আর তার ইনস্টিটিউটের এই চেহারাটার ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষই জানতো না। সমাজের সামনে সম্মানিত ডাক্তার আর গবেষক হিসেবে তিন দশক ধরে সুচারুভাবে শক্তিশালী এক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল হার্শফেল্ড। সাফল্যের দিক থেকে আগের বা সামসময়িক কেউ-ই তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি। কে জানে, এ আন্দোলন নির্বিঘ্নে চলতে থাকলে হয়তো অ্যামেরিকার বদলে জার্মানিই হতো বৈশ্বিক 'সমকামী আন্দোলন'-এর কেন্দ্র। কিন্তু হঠাৎ করে উলটো দিকে বইতে শুরু করলো জার্মান সমাজের স্রোত। খুব দ্রুত বদলে গেল রাজনীতির পটভূমি। ফসকে বেড়িয়ে গেল হাতের নাগালে চলে আসা বিজয়। পরিবর্তনের এক বিপজ্জনক পাকচক্রে নিজেকে আবিষ্কার করলো হার্শফেল্ড। তার আন্দোলন মুখোমুখি হলো এক প্রবল প্রতিপক্ষের।

পেন্ডুলাম ফিরে আসে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির অবস্থা ছিল ভয়াবহ। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সমস্যা তো ছিলই, তবে সেগুলোর চেয়েও তীব্র হয়ে উঠেছিল সামাজিক অবক্ষয়। সব ধরনের বিকৃতির আসরে পরিণত হয়েছিল বার্লিন। আগুনের কাছে ছুটে আসা পোকার মতো পুরো পশ্চিমা বিশ্ব থেকে হুড়মুড় করে বার্লিনে ছুটে আসতো এক বিশেষ ধরনের পর্যটক। নিষিদ্ধ সুখের খোঁজে। সেই সময়কার বার্লিনের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে জার্মান সেনাদের মধ্যে যৌনতাবাহিত নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিকে বৈধ করে দেয় সরকার। সেনারা যাতে নিরাপদে ও বিনামূল্যে 'প্রয়োজন মেটাতে' পারে, তার জন্য অনুমোদিত পতিতালয় ব্যবহারের কুপন চালু করা হয় সেনাবাহিনীতে। বার্লিনের রাস্তাগুলো ভরে যায় পতিতা দিয়ে। সব রকমের, সব বয়সের। শুধু রাস্তা না, দেহ ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে

[৩৯] Isherwood, Christopher. Christopher And His Kind.1929-1939, Farrar, Straus, & Giroux, New York, 1976. P. 17-19.

শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ক্যাবারে,[৪০] ক্লাব, রেস্টুরেন্ট—সর্বত্র শুরু হয় পতিতাদের প্রকাশ্য আনাগোনা। এই অবস্থান নিয়ে সেই তখনকার বিখ্যাত সাংবাদিক হান্স অস্টওয়াল্ড মন্তব্য করেছিলেন, অধিকাংশ নাচের হলগুলি পতিতাবৃত্তির হাট ছাড়া আর কিছুই না।[৪১]

পতিতাবৃত্তি কেবল নারীদের মধ্যে সীমিত ছিল না। যেমনটা আমরা গত অধ্যায়ে দেখেছি, পুরুষ পতিতাদের ব্যাপারে বিশেষ 'সুখ্যাতি' ছিল বার্লিনের। প্রথম মহাযুদ্ধের পরের বছরগুলোতে এ সুখ্যাতি বেড়ে যায় বহু গুণে। রাস্তা থেকে শুরু করে ক্যাফে, ক্যাসিনো, রেস্টুরেন্ট আর নাচের হলগুলোতে নারীদের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ে পুরুষ পতিতাদের উপস্থিতি। এছাড়া হার্শফেল্ডদের আন্দোলনের বদৌলতে এমন কয়েক ডজন ম্যাগাজিন গজিয়ে ওঠে, যেগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পুরুষে পুরুষে যৌনতা। প্রকাশ্যে খোলা রাস্তায় বিক্রি হওয়া এসব ম্যাগাজিনে নিজেদের বিশেষ 'সেবা'র বিজ্ঞাপন দিতো পুরুষ পতিতারা।

ইউরোপে পতিতাবৃত্তির হালচাল নিয়ে সেই সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন অ্যামেরিকান সমাজবিজ্ঞানী অ্যাব্রাহ্যাম ফ্লেক্সনার। গবেষণায় বার্লিনকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন ইউরোপে পুরুষ পতিতাদের 'প্রধান হাট' হিসেবে।[৪২] দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের বছরগুলোতে বার্লিনে নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল ফরাসি পরিচালক জন রেনওয়ার। বার্লিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে রেনওয়া মন্তব্য করেছিলেন,

> দুই যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়টাতে বার্লিনের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত বিনোদন ছিল বক্সিং আর সমকামিতা। সডোম আর গমোরাহর পুনর্জন্ম হয়েছিল বার্লিনে।[৪৩]

বার্লিনের এ বাস্তবতা তিন শব্দে ফুটিয়ে তুলেছিল ক্রিস্টোফার ইশারউড। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত বার্লিনের অবক্ষয়ে বুঁদ হয়ে থাকা ইশারউড তার আত্মজীবনীতে লিখেছিল, 'বার্লিন মানেই ছেলে...'।[৪৪]

পতিতাবৃত্তিতে নামানো হয়েছিল শিশুদেরকেও। পকেটে যথেষ্ট পয়সা আর কোথায় খুঁজতে হবে, তা জানা থাকলে বার্লিনে মিলতো সবই। সুলভ মূল্যে বিক্রি হতো

---

[৪০] রেস্তোরাঁ, হোটেল, বার কিংবা নাইট ক্লাবের অতিথিদের সামনে আয়োজিত বিশেষ ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান।

[৪১] D.G. Hewitt. 17 Reasons Why Germany's Weimar Republic Was a Party-Lovers Paradise. History Collection, 2018.

[৪২] Flexner, Abraham. Prostitution in Europe. Vol. 2. New York: Century Company, 1914. p. 31

[৪৩] Renoir, Jean. "My life and my films." (1974)., pp. 95, 96.
সডোম ও গমোরাহ : নবী লূত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় এর বসবাস ছিল সডোম ও গমোরাহ নামের দুটি শহরে। এ দুটি শহর আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

[৪৪] Isherwood, Christopher and His Kind, pp. 2–4.

যেকোনো ধরনের, যেকোনো বয়সের শরীরের ওম। অনেক সময় এক সাথে বিক্রি হতো যুবতী মা আর পুরোপুরি কিশোরী না হয়ে ওঠা মেয়ের 'সার্ভিস'। নোবেল বিজয়ী কথাসাহিত্যিক থমাস মানের বড় ছেলে ক্লাউস মান তার আত্মজীবনীতে বার্লিনকে নিয়ে লিখেছিলেন,

> 'আমাকে দেখো!' গর্জন করে বলে রাইখের রাজধানী। 'আমি ব্যাবিলন, শহরদের মধ্যে দানব! একসময় আমাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল: এখন আমাদের কাছে আছে রাতের জীবনের সবচেয়ে নষ্ট, সবচেয়ে উন্মত্ত আয়োজন। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! আমাদের অতুলনীয় অনুষ্ঠানগুলো মিস করবেন না যেন!
>
> এ হলো প্রুশিয়ান ছন্দে সডোম আর গমোরাহ। মিস করবেন না আমাদের বিকৃতির সার্কাস, হরেক রকম পাপের দোকান! নিত্যনতুন লাম্পট্য আর বেলেল্লাপনার গল্প।'[৪৫]

বার্লিন ছিল সবদিক থেকে উদার! পাপের এ নগরীতে পানির দামে মিলতো সব রকমের সুখ। যৌন বিকৃতির সাথে সাথে হরেক রকমের মাদক আর পর্নোগ্রাফিতে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল বাজার। ক্লাব আর ক্যাবারগুলোতে এক ছাদের নিচে কিনতে পাওয়া যেত সবই।

এ কারণেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপ-অ্যামেরিকার শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, আর সব জাতের প্রগতিশীলদের বড়সড় একটা মিলনমেলা হয়ে উঠেছিল এই শহর। বছরে অন্তত এক বার বার্লিনে সময় কাটিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক অঙ্গনের রথী-মহারথীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ স্থায়ীভাবে থাকতেও শুরু করে দিয়েছিল বার্লিনে।

বার্লিনের এই 'সুখ্যাতি'র পেছনে পুরো কৃতিত্ব হার্শফেল্ড আর এসএইচসি'র, তা বলা যাবে না। এর পেছনে ছিল বেশ অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক ফ্যাক্টর। তবে অবক্ষয় ও বিকৃতির মাত্রা এত তীব্র হয়ে ওঠা, সমাজের নৈতিকতার বোধ এভাবে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পেছনে হার্শফেল্ডদের মতো লোকেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে।

এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা, সমাজের মূল্যবোধ দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়া এই অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে জার্মানিতে উত্থান ঘটে নতুন এক আন্দোলনের। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক বা ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট নামের এ আন্দোলনের নেতা হিসেবে মঞ্চে আবির্ভূত হয় খ্যাপাটে চোখের এক অস্ট্রিয়ান। নাম তার অ্যাডলফ হিটলার।

[৪৫] Mann, Klaus Heinrich Thomas. The Turning Point: Thirty-Five Years in this Century, the Autobiography of Klaus Mann. Plunkett Lake Press, 2019.

বার্লিনের ক্যাবারে, পর্নোগ্রাফি এবং পতিতা ব্যবসার বড় একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করতো ইহুদিরা। অবক্ষয়ের এ সংস্কৃতির সবচেয়ে কট্টর সমর্থকের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য একটা অংশ ছিল ইহুদি ব্যবসায়ী। এমন বিভিন্ন কারণে হিটলার ও তার দল ইহুদিদের জার্মান সমাজের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে।

হার্শফেল্ড ছিল একদিকে ইহুদি, অন্যদিকে যৌন স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রচারক। শুরু থেকেই নাৎসিরা তাকে নিশানা বানায়। যে বছর নাৎসি পার্টি গঠিত হয়, সেই ১৯২০-এই অন্য এক জাতীয়তাবাদী দলের কর্মীরা বেধড়ক পেটায় হার্শফেল্ডকে। ১৯৩০ নাগাদ হার্শফেল্ডসহ আরও অনেকে বুঝতে পারে, নাৎসিরা ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে। জার্মানিতে থাকার আর সুযোগ নেই। সম্ভাব্য গন্তব্যের খোঁজ শুরু করে হার্শফেল্ড। সে বছরই আমন্ত্রণ আসে অ্যামেরিকাতে বক্তব্য দেওয়ার। দেশ ছাড়ার এই সুযোগ লুফে নেয় সে।

১৯৩৩ সালে জার্মানির ক্ষমতায় আসে নাৎসি পার্টি। অ্যাডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর মনোনীত হয়। ক্ষমতায় আসার চার মাসের মাথায় হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটে হামলা করে নাৎসি পার্টির ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। তুমুল ভাঙচুর আর স্টাফদের ধরে ধরে পেটানোর সময় তারা স্লোগান দেয়, 'Brenne Hirschfeld' (হার্শফেল্ডকে পুড়িয়ে মারো)! এ ঘটনার চার দিন পর, ১৯৩৩ এর ১০ই মে ইনস্টিটিউটের সব বইপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এক সাথে পুড়িয়ে ফেলে নাৎসিরা। কুখ্যাত বই পোড়ানো অভিযান শুরু হয় হার্শফেল্ডের বই দিয়ে। সেইদিন বিকেলে পুলিশ এসে ঘোষণা করে, সেক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জার্মানির বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যায় হার্শফেল্ড। তবে এরপর আর জার্মানি ফেরা হবে না তার। এ ঘটনার দু বছর পর ১৯৩৫ সালে নির্বাসিত অবস্থায় ফ্রান্সে মৃত্যু হবে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের।

***

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অধঃপতনের সর্বনিকৃষ্ট বিন্দুকে স্পর্শ করেছিল বার্লিন। পরিণত হয়েছিল ব্যাবিলন আর সডোম নগরীর এক অশ্লীল মিশ্রণে। পাপের এ নগরীতে ম্যাগনাস হার্শফেল্ড গড়ে তুলেছিল আধুনিক পৃথিবীর প্রথম সমকামী আন্দোলন। তার হাতেই গোড়াপত্তন হয়েছিল তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির। অল্প সময়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা হার্শফেল্ডের চিন্তা ও আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল তীব্র এক প্রতিক্রিয়ার। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি ভেঙ্গে পড়ে হার্শফেল্ডের আন্দোলন। নাৎসিদের পেশাদার এবং নিখুত ধ্বংসযজ্ঞের কল্যাণে জার্মানিতে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলা দূরের কথা, প্রকাশ্যে সমকামিতার পক্ষে কাজ চালানোও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থা বজায় থাকে হিটলারের

মৃত্যু আর নাৎসিদের পতনের প্রায় বিশ বছর পরও।

শুধু জার্মানি না, এ আন্দোলনের জন্য অনুর্বর হয়ে পড়ে পুরো ইউরোপের যুদ্ধবিদ্ধস্ত মাটি। আন্দোলনের পরের অধ্যায় তাই শুরু হবে আটলান্টিকের ওপারে, অ্যামেরিকায়। সেই অ্যামেরিকার দিকেই এখন আমরা দৃষ্টি ফেরাবো। তবে অ্যামেরিকায় সমকামী আন্দোলনের আলোচনা শুরুর আগে আরেকজন ডক্টরকে নিয়ে কথা বলতে হবে আমাদের। বিকৃতির ইতিহাসে প্রভাবের দিক থেকে হার্শফেল্ডকে অনায়াসে টেক্কা দেওয়ার মতো অবস্থান রাখা এই ডক্টরের নাম কিনসি। ডক্টর অ্যালফ্রেড চার্লস কিনসি।

অধ্যায় ৩

কলুষতার কারিগর

১৯৪৮ সালে অ্যামেরিকার ঠিক মাঝখানে একটা বোমা ফাটালেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অ্যালফ্রেড কিনসি। অল্প কিছুদিন আগেই জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি শহরে দু দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল অ্যামেরিকা। স্রেফ ক্ষমতা জাহির করার জন্য ঠান্ডা মাথায় খুন করেছিল দুই লক্ষের বেশি মানুষ।

তবে ড. কিনসির ফাটানো বোমা ছিল অন্য ধরনের। সরাসরি মানুষ মারা না পড়লেও এই বিস্ফোরণে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে অসংখ্য পরিবার। আজও মার্কিন সমাজ সেই বিস্ফোরণের রেশ টেনে চলেছে। শুধু মার্কিনীরা না, ড. কিনসির বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় প্রভাব অ্যামেরিকার সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ভুগছে সবাই। কিনসির ফাটানো বোমার ক্ষতির মাত্রা হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে ফেলা পারমাণবিক বোমাগুলোর তুলনায় বেশিই হবে, সব হিসেব মেলানোর পর তা বলা যায় অনায়াসেই।

পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ এক অধ্যাপক কীভাবে এত কিছু শুরু করলো? ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক।

অ্যালফ্রেড চার্লস কিনসির জন্ম ১৮৯৪ সালে অ্যামেরিকার নিউ জার্সিতে। কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের মৃত্যুর এক বছর আগে। কিনসি ডক্টরেট করেছিল যুলজিতে (প্রাণীবিদ্যা)। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বোলতা বা ওয়াস্প। কিন্তু ত্রিশের দশকের শেষ দিকে মানবীয় যৌনতা নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক। ১৯৩৮ সালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিয়ে নিয়ে একটা কোর্স পড়াতে শুরু করে কিনসি।

যুলজির অধ্যাপককে কেন বিয়ে নিয়ে ক্লাস নিতে বলা হবে, আর কেনই বা অধ্যাপক সাহেব মহাআগ্রহে যৌনতা নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠবেন, তা একটা রহস্য। এ রহস্যের স্পষ্ট উত্তর আজও মেলেনি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, কিনসির গবেষণায় সমর্থন যোগাতে এসময় ব্যাগভর্তি টাকা নিয়ে হাজির হয় রকাফেলার ফাউন্ডেশন নামে অত্যন্ত ধনী এবং ক্ষমতাশালী এক প্রতিষ্ঠান। ব্যস! অল্প কয়েকদিনের মধ্যে যুলজিস্ট কিনসি বনে যান সেক্স বিশেষজ্ঞ। রকাফেলারদের ফান্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের

পৃষ্ঠপোষকতা আর একদল গবেষক নিয়ে কাজে লেগে যান তিনি।

পরের পনেরো বছর ধরে কয়েক হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার নেয় কিনসি আর তার দল। তাদের যৌনজীবনের নাড়িনক্ষত্র জেনে নেয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সব তথ্য সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরে পরিসংখ্যান হিসেবে। এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ হয় দুই পর্বে। প্রথম পর্ব ১৯৪৮ সালে, Sexual Behavior in the Human Male শিরোনামে। পরের পর্ব, Sexual Behavior in the Human Female, বের হয় পাঁচ বছর পর ১৯৫৩-তে।

ড. কিনসির গবেষণা যৌনতার ব্যাপারে অ্যামেরিকার মনোভাব বদলে দেয়। কাপিয়ে দেয় মার্কিন সমাজের মূল্যবোধের ভিত। কিনসি তার দুটি বইয়ে দাবি করে, আমরা যেগুলোকে বিকৃত যৌনতা বলি আসলে সেগুলো ধারণার চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত। সমাজের বহু লোক সমকামিতা, উভকামিতা, বহুগামিতাসহ অনেক কিছু করে বেড়ায়। যদিও লোকলজ্জার ভয়ে সেটা তারা গোপন রাখে। নিজের এই দাবির পক্ষে বিভিন্ন পরিসংখ্যান পেশ করে কিনসি। সে বলে,

- অ্যামেরিকার ৮৫% পুরুষের বিয়ের আগে যৌনসঙ্গমের অভিজ্ঞতা হয়।
- পুরুষদের ১০% সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। ৩৭% কমসেকম জীবনে একবার এমন সম্পর্ক করে।
- ৬৯% পুরুষ পতিতাদের কাছে যায়, পরকীয়া করে প্রায় ৪৫% এর মতো।
- নারীদের ২৬% পরকীয়া করে।
- পুরুষদের প্রায় ৮% পশুর সাথে যৌন সম্পর্ক করে।

পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কিনসি উপসংহার টানে, মানুষের যৌনতা নির্দিষ্ট কোনো কাঠামোতে আবদ্ধ না। এখানে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। যৌনতা ক্রমপরিবর্তনশীল, রংধনুর মতো বৈচিত্র্যময়। রংধনুর একপ্রান্তে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা, অন্য প্রান্তে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। এ দুয়ের মাঝে আছে শিশুকামিতা, পশুকামিতা, উভকামিতা থেকে শুরু করে নানা কিছু। সমাজের একেক জন মানুষ এই বর্ণালীর একেক অবস্থানে থাকতে পারে। আবার একজন মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করতে পারে বর্ণালীর বিভিন্ন জায়গায়। বেশিরভাগ মানুষের অবস্থান বর্নালীর মাঝামাঝি, অর্থাৎ উভকামিতায়। কিন্তু সমাজ, সংস্কার ও ধর্মের চাপিয়ে দেওয়া নৈতিকতার কারণে মানুষ তার সহজাত প্রবণতা চেপে রাখে। একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে অথবা নিজের যৌনজীবন গোপন রেখে সমাজের প্রচলন অনুযায়ী পরে থাকে স্বাভাবিকতার মুখোশ।

কিনসির এই গবেষণা ঠিক কতটা বিস্ফোরক ছিল, তা বুঝতে হলে সেই সময়কার মার্কিন সমাজের অবস্থাটা আগে একটু জেনে নিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ

হবার পরের এ সময়টাতে মার্কিন সমাজ ছিল গভীরভাবে রক্ষণশীল। সমাজের নীতিনৈতিকতা অন্তত বাহ্যিকভাবে খ্রিস্টধর্মীয় শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বিবাহবহির্ভূত যৌনতা ছিল মোটাদাগে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। লিভ টুগেদার বা অবিবাহিত নারীপুরুষের এক সাথে থাকা ছিল সমাজে অপরিচিত একটা বিষয়। এসব যে একেবারেই হতো না, তা না। তবে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এগুলো গোপন রাখাই ছিল প্রচলন। শুধু তাই না, যৌনতার সাথে জড়িত যেকোনো বিষয় খোলাখুলি আলোচনার ব্যাপারে মার্কিন সমাজের তীব্র অনীহা ছিল। ষাটের দশকের আগে রেডিও বা টেলিভিশনে প্রেগন্যান্ট বা গর্ভবতী শব্দটাও সরাসরি উচ্চারণ করা হতো না। সব ধরনের পর্নোগ্রাফি ছিল নিষিদ্ধ। এমনকি যেসব উপন্যাসে যৌনতার খুব বেশি খোলামেলা বর্ণনা থাকতো, সেগুলো বিক্রি করাও ছিল বেআইনি।

সমাজে একটা কসমোপলিটান অংশ যৌনতার ব্যাপারে অতশত নিয়ম মানতো না। তারা এগুলোকে সেকেলে মনে করত। বরাবরের মতো এই ধরনের মানুষদের বড় একটা অংশ ছিল শিল্পী, সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীরা। নিউইয়র্ক কিংবা শিকাগোর মতো বড় বড় শহরগুলোতে তাদের আনাগোনা। তবে তারা সংখ্যালঘু। সামাজিকভাবে তাদের চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। বেশিরভাগ অ্যামেরিকান ছিল রক্ষণশীল।

এ ধরনের একটা সমাজের জন্য ড. কিনসির বক্তব্যগুলো মেনে নেওয়া খুব কঠিন ছিল। মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল এসব কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার। কিন্তু কিনসির গবেষণা জুড়ে ছিল অগণিত পরিসংখ্যান। তার ব্যাখ্যা আর উপসংহার এসেছে পরিসংখ্যানের আলোকে। আর নিরেট পরিসংখ্যান উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই কিনসির বক্তব্যকে অপছন্দ করলেও ঠিক কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায়, সেটা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছিল না কেউ।

ওদিকে প্রকাশিত হবার আগ থেকেই কিনসির গবেষণা নিয়ে ব্যাপক জল্পনাকল্পনা শুরু হয় অ্যামেরিকার প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে। প্রকাশের পরপর এই বই নিয়ে আলোচনা ছাপা হতে থাকে পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায়। অল্প ক'দিনের মধ্যে জায়গা করে নেয় বেস্টসেলার বইয়ের তালিকায়। রাতারাতি সেলিব্রিটি বনে যায় কিনসি। দেশজুড়ে তার বক্তৃতার আয়োজন করে রকাফেলার ফাউন্ডেশন। 'বিশিষ্ট যৌন বিশেষজ্ঞের' কথা শুনতে হাজির হয় হাজার হাজার মানুষ।

১৯৫৩-তে যখন বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, ততদিনে ড. কিনসির নামটা অ্যামেরিকার ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে গেছে বললে খুব একটা ভুল হবে না। আগেরবারের মতো এবারও চলে ব্যাপক প্রচারণা। দেশের গণ্ডি পেড়িয়ে কিনসির লেকচার আয়োজন করা হয় ইউরোপে। জনপ্রিয়তার চেয়েও অনেক বেশি গুণে বাড়ে কিনসির প্রাতিষ্ঠানিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাব। এই প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

কিনসির গবেষণার ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন আসে যৌনতা সম্পর্কিত শিক্ষা, আইন এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও। আধুনিক যৌন শিক্ষা এবং সেক্স সম্পর্কে চিকিৎসকদের সার্বিক চিন্তা দাঁড়িয়ে আছে কিনসির গড়া ভিত্তির ওপর। তার গবেষণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয় পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের প্রথাবিরোধী অ্যাক্টিভিস্ট, লেখক, শিল্পী আর গবেষক। নিজ নিজ জায়গা থেকে অবাধ যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে তারা। গড়ে উঠে বিভিন্ন আন্দোলন। মার্কিন সমাজের মূল্যবোধের কাঠামো দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পড়ে, তারপর নতুন করে গড়ে উঠে কিনসির গড়া ছাঁচে। মার্কিন সাম্রাজ্যের পৃথিবীবিস্তৃত প্রভাবের মাধ্যমে সে কাঠামো ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে।

কিন্তু ড. কিনসি কি সঠিক ছিলেন? যে গবেষণার ভিত্তিতে যৌনতার আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে, সেটা আসলে কতটা নির্ভুল ছিল? কিনসি কি নির্মোহ গবেষক হিসেবে মার্কিন সমাজের সামনে আয়না তুলে ধরেছিলেন কেবল? না কি নির্দিষ্ট এক তুলিতে এঁকেছিলেন সমাজের এক বিকৃত ছবি?

পরিসংখ্যান

বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন একবার বলেছিলেন, জগতে মিথ্যা তিন প্রকারের: মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা, আর ডাহা মিথ্যার থেকেও বড় মিথ্যা হলো পরিসংখ্যান। কিনসির গবেষণার ক্ষেত্রে মার্ক টোয়েনের এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য।

মিডিয়া, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রকাফেলার ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকেরা কিনসিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিল একজন নির্মোহ, নিরপেক্ষ গবেষক হিসেবে। তথ্য-উপাত্তের পাহাড় সেঁচে সত্যের কাছে পৌঁছানোই যার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি মানুষকে বুঝতে চান, মানুষের যৌনতার সত্যিকার চেহারা দেখতে চান। এর বাইরে তার আর কোনো এজেন্ডা ছিল না।

কিন্তু প্রায় প্রতিটা দিক থেকে এ ছবিটা ছিল বানোয়াট। কিনসির গবেষণা, তার গবেষণা দল, তার পরিবার এবং ব্যক্তি কিনসি—প্রতিটাতে ছিল গভীর অন্ধকারে ভরা নানা দিক। প্রথমে তার গবেষণার কথাই বলা যাক। নির্মোহ, নিরপেক্ষ গবেষণার বদলে শুরু থেকেই কিনসি অগ্রসর হয়েছিল এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। নিজের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ইচ্ছেমতো পরিসংখ্যানে গড়মিল করতে আপত্তি ছিল না তার।

কিনসির গবেষণাতে মারাত্মক পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। সে যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, তাদের বিশাল একটা অংশ ছিল ধর্ষক, শিশু ধর্ষক, পতিতা, সমকামী, সমকামী পুরুষ পতিতা এবং যৌন অপরাধের কারণে কারাভোগকারী লোকজন। কিনসি ইচ্ছে করে এই মানুষগুলোকে গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছিল, যাতে বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত মানুষদের অনুপাত বেশি দেখানো যায়। তারপর বলেছিল, এটাই সমাজের সাধারণ মানুষের আচরণের চিত্র।

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন। ধরুন, 'বাংলাদেশে চুরি' শিরোনামের গবেষণায় একশো জন মানুষের ওপর জরিপ চালানো হলো। তারপর জেলে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো ৬০ জন চোরের। এক্ষেত্রে জরিপের ফলাফলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের প্রায় ৬০-৭০% মানুষের মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে। কিনসি ঠিক এ কাজটাই করেছিল।

কিনসি এবং তার দল মোট ১৮,০০০ মানুষের যৌনজীবন নিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। কিন্তু বই দুটিতে পরিসংখ্যান এনেছিল মাত্র ৯৫০০ জনের। অর্থাৎ, মোট তথ্যের অর্ধেকের মতো সে বাদ দিয়েছিল।[৪৬] অন্য দিকে প্রথম বইয়ে যাদের তথ্য আনা হয়েছিল সেই ৪৫০০ জন পুরুষের মধ্যে ১২০০ থেকে ১৪০০ জনই ছিল যৌন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত। তার মানে হলো শেষ পর্যন্ত কিনসি যেসব মানুষের পরিসংখ্যান সামনে এনেছে তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল বিকৃত যৌনতায় আসক্ত অথবা যৌন অপরাধে অভিযুক্ত।[৪৭] কিনসির গবেষণার এই দুরবস্থা নিয়ে চিকিৎসা বিষয়ক বিখ্যাত জার্নাল ল্যানসেটের এক লেখায় বলা হয়েছিল, 'স্বাভাবিক' যৌন আচরণের সমীক্ষা করতে গিয়ে কিনসি জরিপ করেছেন প্রচুর সংখ্যক কারাবন্দি এবং যৌন অপরাধীদের নিয়ে, যদিও তাদের আচরণ স্বাভাবিক যৌন আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে না।[৪৮]

এ ধরনের আরও অনেক গুরুতর সমস্যা ছিল কিনসির গবেষণায়। তার গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত ত্রুটির সমালোচনা করেছিলেন বিখ্যাত অ্যামেরিকান মনোবিদ অ্যাব্রাহাম মাসলৌ। বলেছিলেন, কিনসি তার গবেষণায় সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি।[৪৯] ১৯৫৪ সালে কিনসির নানা ভুল নিয়ে আলাদা একটা প্রতিবেদনই প্রকাশ করেছিল অ্যামেরিকান পরিসংখ্যান সংস্থা। কিনসির সবচেয়ে বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থের লেখক, জেমস জৌনসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথমে এ প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছিল কিনসির দেওয়া পরিসংখ্যান স্রেফ অর্থহীন।[৫০] কিন্তু রকাফেলার ফাউন্ডেশনের চাপে পড়ে এ বক্তব্য বদলানো হয়। তবে পরিবর্তিত বক্তব্যও ইতিবাচক ছিল না। সেখানে বলা হয়েছে,

> কিনসির গবেষণায় সিলেকটিভ স্যাম্পলিংসহ বিভিন্ন পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে।

---

[৪৬] Karlen, Arno. "Sexuality and homosexuality: A new view." (1971), p. 456.

[৪৭] Kinsey, Alfred C., Wardell R. Pomeroy, and Clyde E. Martin. "Sexual behavior in the human male." Saunders. (1948). p. 392.

[৪৮] The Lancet, "Really, Dr. Kinsey?" March 2, 1991, p. 547.

[৪৯] Letter from Maslow to Amram Scheinfeld, April 29, 1970. On file in the Archives of the History of American Psychology, University of Akron, Ohio. See reprint in Reisman, et al, Kinsey, Sex and Fraud, p. 221.

[৫০] Jones, James H. Alfred C. Kinsey: A Life. WW Norton & Company, 2004: 638-648, 653-665, 683

> ভুলের মাত্রা অজানা।
>
> যাদের তথ্য নেওয়া হয়েছে তারা সাধারণ মার্কিন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ জনসংখ্যা থেকে একেবারেই আলাদা। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে অ্যামেরিকার শ্বেতাঙ্গ পুরুষের আচরণের ব্যাপারে উপসংহার টানা অত্যন্ত কঠিন।[৫১]

সমস্যা কেবল এখানে না। কিনসি তার গবেষণার প্রশ্নগুলো কখনো প্রকাশ করেনি। যার অর্থ হলো, তার ফলাফল সঠিক কি না, তা যাচাই করার জন্য ঐ গবেষণা পুনরাবৃত্তির কোনো সুযোগ সে রাখেনি।[৫২] কিনসি এবং তার গবেষণার অসঙ্গতি এবং অবৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী এবং পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. অ্যালব্যার্ট হবস লিখেছিলেন,

> কিনসি, তার যৌন আচরণ সংক্রান্ত গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনটি শর্তের প্রত্যেকটি লঙ্ঘন করেছেন। তিনি বারবার এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন তার কোনো হাইপোথিসিস[৫৩] নেই। তার ভাষায়, তিনি 'কেবল তথ্যগুলো উপস্থাপন করেছেন'। কিন্তু যেকোনো সজাগ পাঠকের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, কিনসির দ্বিমুখী হাইপোথিসিস ছিল। তিনি যৌন আচরণের ব্যাপারে ভোগবাদী ও জান্তব একটি ধারণা প্রচার করেছেন উদগ্রীবভাবে। আর তা করতে গিয়ে কারসাজি করেছেন পরিসংখ্যান নিয়ে। একইসাথে তিনি ক্রমাগত যৌন আচরণের ব্যাপারে সব ধরনের ধর্মীয় ও প্রচলিত ধারণার নিন্দা করে গেছেন।
>
> ...কিনসি কেবল নিজের হাইপোথিসিস গোপন করেননি; বরং যে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে উপসংহার টেনেছেন সেগুলো উপস্থাপন করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এছাড়া তার সব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তি ছিল যে প্রশ্নাবলী, তাও তিনি প্রকাশ করেননি। উপরন্তু, কিনসির নিজের উপস্থাপিত তথ্য থেকেই তার টানা উপসংহারের বিপরীত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।[৫৪]

---

[৫১] Cochran, William G., Frederick Mosteller, and John W. Tukey. "Statistical problems of the Kinsey report." Journal of the American Statistical Association 48, no. 264 (1953): 673-716. A Report of the American Statistical Association Committee to Advise the National Research Council Committee for Research in Problems of Sex, The American Statistical Association, Washington, DC, 1954.

[৫২] Terman, Lewis M. "Kinsey's" Sexual Behavior in the Human Male": some comments and criticisms." (1948): 443-459

[৫৩] হাইপোথিসিস (hypothesis) বা অনুকল্প অর্থ পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষণার আগেই গবেষণার উত্তর সম্পর্কে গৃহীত অস্থায়ী সিদ্ধান্ত। হাইপোথিসিস সাময়িক অবস্থান, যা গবেষণার মাধ্যমে গৃহীত বা বাতিল হতে পারে।

[৫৪] Albert H. Hobbs, unpublished manuscript, quoted in Reisman, Judith A. Kinsey: Crimes & Consequences: the Red Queen & the Grand Scheme. Institute for Media Education, 1998.

পরিসংখ্যানকে ইচ্ছেমতো ঘষামাজা করেছিল কিনসি। জরিপ থেকে পাওয়া উত্তর বদলে নিয়েছিল, যাতে নিজের মনমতো উপসংহারের সাথে তা মেলানো যায়। অনেক ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের দেওয়া জবাবের বদলে কিনসি ও তার দল ঐ উত্তর লিখেছিল যা তাদের কাছে 'সঠিক মনে হয়েছিল'।[৫৫] এভাবে আর যাই হোক গবেষণা হয় না। বাস্তবতা হলো নির্মোহ, নিরপেক্ষ গবেষণার ধারেকাছেও ছিল না কিনসি। শুরু থেকেই তার গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে।

যৌনতার ব্যাপারে মার্কিন সমাজের 'দমনমূলক মনোভাব'-সমালোচনা করে এর জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধকে দায়ী করেছিল কিনসি। জীবনিকার জেমস জৌনসের ভাষায়,

> মানবীয় যৌনতাকে অপরাধবোধ আর দমনমূলক মনোভাব থেকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কিনসি। তিনি প্রথাগত নৈতিকতাকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন, হালকা করতে চেয়েছিলেন সংযমের নিয়মকে... তার প্রতিটি জাগ্রত ঘণ্টা কেটেছে যৌনতার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আইন পরিবর্তনের চেষ্টায়।[৫৬]

কিনসির ঘনিষ্ঠ সহচর এবং সহলেখক ওয়ারডেল পমেরয় খোলাখুলি বলেছে,

> কিনসির এক 'মহাপরিকল্পনা' ছিল। বিয়ে আর পরিবারকেন্দ্রিক মূল্যবোধের বদলে মার্কিন সমাজকে 'ফ্রি লাভ' (অবাধ যৌনতা)-এর মূল্যবোধের দিকে নিয়ে যাবার স্বপ্ন ছিল তার।[৫৭]

কিনসির মূল উদ্দেশ্যের কথা আরও স্পষ্টভাবে বলেছে তার এককালীন সহকর্মী গেরশোন লেগম্যান,

> কিনসির উদ্দেশ্য ছিল সমকামিতা এবং নির্দিষ্ট কিছু যৌন বিকৃতিকে সমাজে 'সম্মানজনক' করে তোলা। তার এ উদ্দেশ্য খুব একটা গোপনও ছিল না।[৫৮]

কিনসি নির্মোহ গবেষক ছিল না। সে কাজ করছিল নির্দিষ্ট এক এজেন্ডা নিয়ে।

কিন্তু কেন কিনসি উঠেপড়ে লেগেছিল যৌনতার 'ভোগবাদী, জান্তব' ধারণার প্রচারে? সমকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনতাকে সমাজের চোখে সম্মানজনক করে তোলার পেছনে কী স্বার্থ ছিল তার?

এ প্রশ্নগুলো জবাব পেতে হলে আমাদের যেতে হবে অ্যালফ্রেড কিনসির অন্ধকার

---

[৫৫] Reisman, Judith A. Kinsey: Crimes & Consequences

[৫৬] Jones. Alfred C. Kinsey, Preface, xii

[৫৭] Pomeroy, Wardell Baxter. Dr. Kinsey and the institute for sex research. Yale University Press, 1982: p 155.

[৫৮] Legman, Gershon. "The Horn Book: Studies in Erotic Folklore and Bibliography." (1964). p 125. Marotta, Toby. "The politics of homosexuality." 1981, p. 340.

জীবনের আরও গভীর অন্ধকার এক কক্ষের ভেতরে।

অবিশ্বাস্য কদর্যতা

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মিডিয়াতে ঝকঝকে তকতকে একটা ইমেজ তৈরি করা হয়েছিল কিনসির। প্রতিটা ফটো প্রকাশের আগে তাকে দেখিয়ে অনুমোদন নিতে হতো। সাক্ষাৎকারগুলো হতো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, যেখানে সবগুলো প্রশ্ন আগে থেকে বাছাই করা থাকতো। এক দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে অ্যালফ্রেড কিনসিকে মার্কিন সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল কেতাদুরস্ত, বো টাই পরা, মধ্যবিত্ত ছাপোষা প্রফেসর হিসেবে। কিন্তু কিনসির জীবন কোনো অর্থেই স্বাভাবিক ছিল না। তার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন ছিল অবিশ্বাস্য কদর্যতায় ভরা।

কিশোর বয়স থেকেই স্কাউটিংয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল কিনসির। ছেলেপেলে নিয়ে নির্জন বনে সময় কাটাতে পছন্দ করতো সে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকরি পাবার পরও এ অভ্যাস সে চালু রাখে। ছাত্রদের নিয়ে প্রায়ই কিনসি বেরিয়ে পড়ত নানা ধরনের ক্যাম্পিং বা হাইকিং ট্রিপে। এসব ট্রিপে কী হতো, কিনসির গুণমুগ্ধ জীবনিকার জেমস জৌনসের কাছ থেকে তা জানা যাক।

> কিনসি ছাত্রদের সাথে গোসল করত...ক্যাম্পে ন্যাংটো ঘুরে বেড়াতো...(তার এক ছাত্র বলেছে) 'দেখা যেত উনি সবার সামনে বাথরুম করছেন... হয়তো দেখা গেল আমাদের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন।'[৫৯]

একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের এমন আচরণ কী স্বাভাবিক? অধ্যাপক বাদ দিন, কোনো সুস্থ মানুষ কি এমন করে? কিন্তু কিনসি, মহান ড. কিনসি এসব করে বেড়াতো নির্বিকারভাবে। যৌনতার ব্যাপারে সব ধরনের নীতি এবং মূল্যবোধকে কিনসি 'দমনমূলক' মনে করত। হয়তো কিনসির কাছে ছাত্রদের উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে বাধ্য করানো ছিল প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ'? হয়তো। তবে এমন আচরণের আরেকটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। বিকৃত চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য নিজের অবস্থানকে কাজে লাগিয়েছিল কিনসি। ১৯৯৬ সালে এক ডকুমেন্টারির জন্য দেওয়া সাক্ষাৎকারে কিনসির আরও কিছু বিচিত্র আচরণের কথা জানিয়েছে জীবনিকার জেমস জৌনস। যা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়।

> দু'জন ছাত্র ছিল, ব্রেইল্যান্ড এবং কুনস। কিনসি ছিল তাদের সুপারভাইজার। এটা ১৯৩৪/৩৫ এর কথা। তাদের সাথে কিনসির বেশ কিছু ঘটনা আছে... কিনসির একটা নগ্ন ফটো আছে। ঐ ট্রিপে তারা সবাই একসাথে হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়েছিল। গণ হস্তমৈথুন। পুরো ট্রিপ জুড়ে এই দুই ছাত্র কিনসির নাগালের

---

[৫৯] Jones, James H. Alfred C. Kinsey: A Life. WW Norton & Company, 2004, pp. 273-283

> বাইরে থাকার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল...

(ব্রেইল্যান্ডের স্ত্রী) অ্যালফ্রেড কিনসিতে পছন্দ করতো না। (সে বলেছিল), ওরা ছিল মিসিসিপি থেকে আসা দুটো অল্পবয়সী ছেলে, অ্যালফ্রেড কিনসি ওদের ক্ষতি করেছে।[৬০]

ঠিক কীভাবে নিজের ছাত্রদের ক্ষতি করেছিল অ্যালফ্রেড কিনসি? ছাত্রদের আর কী কী করতে বাধ্য করেছিল সে?

এ প্রশ্নের উত্তর আঁচ করা যায় নিজের গবেষণা দলের সদস্যদের সাথে কিনসির আচরণের বর্ণনা থেকে। কিনসির রিসার্চ টিমের সদস্য হতে হলে তার কথা মতো বিভিন্ন ধরনের বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত হতে হতো। এটাই ছিল অলিখিত নিয়ম। নিজের দলের পুরুষ সদস্যদের সাথে; বিশেষ করে সহলেখক ওয়ারডেল পমেরয় আর ক্লাইড মার্টিনের সঙ্গে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক করতো কিনসি। গবেষণা দলের একজন সদস্য, ভিনসেন্ট নৌলিস কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিল। কারণ, কিনসি তার সাথে সেক্স করার জন্য নৌলিসকে চাপ দিচ্ছিল।[৬১]

তবে কেবল এতটুকুতে সাধ মিটত না কিনসির। তার বিকৃতির ব্যপ্তি ছিল আরও ভয়াবহ। কিনসির সহকর্মী ওয়ারডেল পমেরয়ের কথা শোনা যাক,

> আমাদের গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে (একটা বিষয়ে) কিনসি কিছুটা অধৈর্য বোধ করতে শুরু করলেন। (যৌনতার ব্যাপারে) আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম তা ছিল সেকেন্ডহ্যান্ড। অন্য যেকোনো স্কলারের মতো কিনসির মধ্যেও সরাসরি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের আকুল আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিল... একদিন কিনসির মাথায় আসলো, আমরা যা নিয়ে গবেষণা করছি, সেটা আমাদের সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ।[৬২]

গবেষণার বিষয়বস্তু 'সরাসরি পর্যবেক্ষণ' করার জন্যে নিজ ঘরের চিলেকোঠাকে পর্নোগ্রাফি স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলো কিনসি। অন্য সব কিছুর মতো এ কাজটার পক্ষেও দিলো সেই একই অজুহাত, বিজ্ঞান আর গবেষণা। কিনসির বন্ধু আর্ল মার্শ এবং গেবহার্ড এই 'গবেষণা'র বর্ণনা দিয়েছে এভাবে,

> কিনসি ঠিক করলো, সে তার বাসার চিলেকোঠায় লোকেদের যৌনমিলনের ভিডিও করবে। এর মধ্যে কয়েকটাতে (ভিডিও) আমি ছিলাম... আমাদের অনেকেই ছিল। সব কিছু অবশ্য গোপনীয়তার সাথে হচ্ছিল... জানাজানি হলে

---

[৬০] "Secret Histories: Kinsey's Paedophiles," Yorkshire Television, August 10, 1998. https://www.youtube.com/watch?v=UVC-1d5ib50

[৬১] প্রাগুক্ত।

[৬২] Pomeroy, Dr. Kinsey and the Institute for Sex Research, p. 174.

আমাদের (গবেষণার) ফান্ডিং হারাতে হতো।[৬৩]

এক পর্যায়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই সাউন্ডপ্রুফ একটা স্টুডিও বানিয়ে নেয় কিনসি। গবেষণার নামে চলতে থাকে বিকৃত যৌনতা আর সেগুলো ক্যামেরায় ধারণ। গবেষণার 'আকুল আকাঙ্ক্ষা'র কারণে অনেক ভিডিওতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে থাকতো কিনসি নিজেই। বাধ্য করতো নিজের স্ত্রী-কেও। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই স্টুডিওতে কিনসির স্ত্রীর সাথে তার সহকর্মীদের যৌনমিলনের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছিল।

সহকর্মীদের স্ত্রীদেরকেও 'গবেষণায়' অংশ নিতে বাধ্য করতো কিনসি।[৬৪] রিসার্চ টিমের সদস্য ক্লাইড মার্টিনের স্ত্রী অ্যালিসের ভাষ্যমতে, তার স্বামী এবং অন্যদের সাথে ক্যামেরার সামনে যৌনতায় লিপ্ত হবার জন্য 'জঘন্য ধরনের চাপ' দিচ্ছিল কিনসি। অ্যালিস মার্টিনের ভাষায়, 'আমার মনে হচ্ছিল এটার ওপর ইনস্টিটিউটে আমার স্বামীর চাকরি নির্ভর করছে।'[৬৫]

পর্নোগ্রাফি নিয়ে অসুস্থ মুগ্ধতা ছিল কিনসির। গবেষণার নামে পর্নোগ্রাফি বানানোর পাশাপাশি অন্যদেরকে পর্নোগ্রাফি দেখানোরও বাতিক ছিল তার। একটা উদাহরণ দিই। কিনসির একটা বিখ্যাত ফটো আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ৬-৭ জন শিশু পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। বয়স দশের আশেপাশে। তাদের চেহারায় ভয় আর বিস্ময়। দু হাত পকেটে পুরে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিনসি। তার চোখও পর্দার দিকে। মুখে হাসি, চোখে আনন্দ আর চাপা উত্তেজনা। ছবিটা তোলা হয়েছে সামনে থেকে, তাই পর্দায় কী দেখানো হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।[৬৬]

তবে এই তথ্য পাওয়া গেছে, কিনসির আরেক জীবনীকার জনাথন গ্যাথর্ন হার্ডির কাছ থেকে। ঠিক কী দেখে শিশুরা ভয় পেয়েছিল আর কিনসির চোখে আনন্দ ফুটে উঠেছিল, তা জানার পর বিখ্যাত এই ছবিকে রীতিমতো ভয়ঙ্কর মনে হতে শুরু করে। গ্যাথর্ন হার্ডি জানাচ্ছেন, সেই অন্ধকার রুমে শিশুদের বড় পর্দায় দুটো সজারুর যৌনমিলনের ভিডিও দেখানো হচ্ছিল। গবেষণার নামে এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল কিনসি।[৬৭] পর্নোগ্রাফি নিয়ে তার অসুস্থতার মাত্রাটা আশা করি বুঝতে পারছেন। কিনসির তত্ত্বের ভিত্তিতে যৌন শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের নামে

---

[৬৩] The British Broadcasting Company, Biographies, "Reputations," August 14, 1996, story of Alfred C. Kinsey. https://tinyurl.com/yc2cpt6b

[৬৪] Jones, Alfred C. Kinsey. p. 607. Mona Charen, "Unmasking Kinsey," The Courier-Journal, October 20, 1997.

[৬৫] "Secret Histories: Kinsey's Paedophiles," Yorkshire Television, Jones, p. 607.

[৬৬] আগ্রহীরা ছবিটি দেখতে পারেন এই লিংক থেকে, https://tinyurl.com/kinsey-kids

[৬৭] Gathorne-Hardy, Jonathan. Sex the measure of all things: A life of Alfred C. Kinsey. Indiana University Press, 2000. p. 347.

মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের পর্নোগ্রাফিক ভিডিও দেখানোর চল শুরু হয়।[৬৮] বিজ্ঞানের মোড়কে জড়িয়ে নিজের অসুস্থতা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার।

টেবিল ৩৪

তবে কিনসির সবচেয়ে দানবীয় অপরাধ, সবচেয়ে জঘন্য সীমালঙ্ঘন ছিল শিশুদের ওপর। 'শিশুদের যৌন আচরণের' ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের নামে শিশু ধর্ষকদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে কিনসি। তার 'বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা' অনুযায়ী শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন চালায় এই অপরাধীরা। তারপর পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে 'গবেষণার তথ্য-উপাত্ত' পাঠিয়ে দেয় কিনসির কাছে। 'সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন দা হিউম্যান মেইল' বইয়ের নিরীহ চেহারার এক তথ্য সারণীতে এই নারকীয় অপরাধের প্রমাণ দিয়েছে কিনসি নিজেই। টেবিল ৩৪ নামের এ সারণীতে বলা হয়েছে,

- ৪ বছর বয়সী এক শিশুর চব্বিশ ঘণ্টায় ছাব্বিশ বার 'অরগ্যাসম[৬৯]' হয়েছে।
- ৭ বছর বয়সী শিশুর তিন ঘণ্টায় সাত বার 'অরগ্যাসম' হয়েছে।
- ২ বছর বয়সী শিশুর ৬৫ মিনিটে 'অরগ্যাসম' হয়েছে ১০ বার।
- ১১ মাস বছর বয়সী এক শিশুর এক ঘণ্টায় 'অরগ্যাসম' হয়েছে দশ বার।
- ৫ মাস বয়সী শিশুর তিন বার অর্গ্যাসম হয়েছে, সময় অজানা।[৭০]

এই 'অরগ্যাসম'গুলোর সময় শিশুদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তাও সযত্নে লিখে রেখেছে কিনসি ও তার দলবল। শিশুদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ছিল 'কান্না', 'চিৎকার', 'খিঁচুনি' এবং 'বেহুশ হয়ে যাওয়া'। একটা ৫ মাসের শিশুর অরগ্যাসম কীভাবে হয়? কোন অবস্থায় একটা ২ বছর বয়সী শিশু কান্না করে, চিৎকার করে আর বেহুশ হয়ে যায়? কী ধরনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবার পর একটা ৭ বছরের শিশুর খিঁচুনি শুরু হয়?

ঘড়ি ধরে ধরে যৌন নিপীড়ন চালানো হয়েছিল এই নিষ্পাপ শিশুদের ওপর। ধর্ষণের সময় তাদের চিৎকার, কান্না আর খিঁচুনিকে 'অরগ্যাসমের লক্ষণ' বলে চালিয়ে দিয়েছিল কিনসি। শুধু তাই না, ১৬১ পৃষ্ঠাতে কিনসি লিখেছে, এ ধরনের 'অভিজ্ঞতা' থেকে শিশুরা 'সুনিশ্চিতভাবে আনন্দ লাভ করে'। কিনসি কি এই শিশুদের ওপর চালানো যৌন নির্যাতনের সময় উপস্থিত ছিল? তা না হলে শিশুদের 'সুনিশ্চিত আনন্দ' পাবার কথা সে জানলো কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কিনসি নিজেই। ১৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছে,

---

[৬৮] Mark, Alexandra, and Vernon H. Mark. "Pied Pipers of Sex. Plainfield." (1981).

[৬৯] যৌনমিলনের সময় অর্জিত শীর্ষ বা চরমসুখ।

[৭০] Kinsey. Human male. p 180

'আমাদের (সাক্ষাৎকার দেওয়া) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে নয়জন (শিশুদের মধ্যে) এ ধরনের অরগ্যাসম লক্ষ্য করেছেন। এই প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কারও কারও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ থাকায়, তারা ব্যক্তিগত ডায়েরিসহ অন্যান্যভাবে তথ্য সংরক্ষণ করেছেন, যা তারা পরে আমাদের হাতে দিয়েছেন। তাদের কাছ থেকে আমরা ৩১৭ জন প্রাক-কিশোরদের তথ্য পেয়েছি...'

অর্থাৎ কিনসি এবং তার দলবল এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল নয়জন শিশু ধর্ষকের কাছ থেকে। শিশু ধর্ষকরা তাদের চালানো যৌন নির্যাতন আর ধর্ষণের বর্ণনা কিনসিকে লিখে পাঠাচ্ছিল, আর কিনসি সেগুলো বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে। শত শত শিশুর ধর্ষণে সায় দিয়েছিল কিনসি।

কিনসির সাথে যোগাযোগ থাকা এমনই একজন 'টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' শিশু ধর্ষক ছিল জার্মানির ফ্রিটয ভন ব্যালুসেক। সাবেক এই নাৎসি অফিসার যৌন নিপীড়ন চালিয়েছিল কমপক্ষে ১০০ শিশুর ওপর। পঞ্চাশের দশকে শিশু ধর্ষণের দায়ে ব্যালুসেকের নামে মামলা হয়। জার্মান মিডিয়াতে তোলপাড় শুরু হয় তাকে নিয়ে। তদন্ত করতে গিয়ে হদিস মেলে কিনসির সাথে ব্যালুসেকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের। তার বাসায় পাওয়া যায় কিনসির চিঠি। সেই সময়কার জার্মান পত্রপত্রিকার কিছু খবর দেখা যাক।

আদালতের কাছে চারটি ডায়েরি পেশ করা হয়েছে। ডায়েরিগুলোতে মোট একশো জন শিশুর বিরুদ্ধে ব্যালুসেক তার অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। মার্কিন যৌন গবেষক কিনসির কাছে সে নিয়মিত এই বিশদ বিবরণগুলো পাঠাতো। কিনসি এতে খুব আগ্রহী ছিল, ব্যালুসেকের সাথে সে নিয়মিত যোগাযোগ চালিয়ে যায়। [জার্মান দৈনিক National-Zeitung, মে ৫, ১৯৫৭]

কিনসি এই শিশুকামী অপরাধীর (ব্যালুসেক) কাছে সুনির্দিষ্টভাবে বিকৃত যৌনকর্ম সম্পর্কিত তথ্য জানতে চেয়েছিল। মামলার বিচারক ড. বার্গারের মতে, ব্যালুসেককে ধরিয়ে দেওয়া কিনসির দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করার বদলে কিনসি তার সাথে যোগাযোগ চালিয়ে গেছে। [Berliner Zeitung, মে ১৬, ১৯৫৭]

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ব্যালুসেককে খুঁজে বের করার জন্য কিনসির সাথে যোগাযোগ করেছিল ইন্টারপোল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার অজুহাতে ইন্টারপোলকে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায় কিনসি।[৭১] ব্যালুসেকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরে থাক, কিনসি বরং তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। হ্যাঁ, ঠিকই

---

[৭১] Kinsey's Paedophiles. Yorkshire Television.

পড়েছেন। নির্যাতিত হওয়া একশো শিশুকে নিয়ে কিনসির মাথাব্যথা ছিল না। তার মাথাব্যথা ছিল ধর্ষক ব্যালুসেককে নিয়ে। জার্মান এক পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

> (ব্যালুসেক) তার সব কুকীর্তির পরিসংখ্যান তৈরি করে সেগুলো অ্যামেরিকান যৌন গবেষক কিনসির কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন আকারে পাঠায়। জবাবে এক চিঠিতে 'আপনাকে ধন্যবাদ' বলার পর আরেকটি কথা যুক্ত করে কিনসি, 'সাবধানে থাকবেন'। [TGSP, মে ১৬, ১৯৫৭]

মামলা চলাকালীন কিনসিকে নিয়ে সরাসরি ব্যালুসেককে প্রশ্ন করেন বিচারক। ব্যালুসেক গর্ব ভরে কিনসির সাথে যোগাযোগের কথা স্বীকার করে। সেইসাথে জানায় 'শিশুদের নিয়ে গবেষণা'র ক্ষেত্রে কিনসি ছিল তার রোলমডেল।

> বিচারক বার্গার : আমার মনে হচ্ছে আপনি কিনসিকে ইমপ্রেস করতে এবং তাকে বিভিন্ন 'তথ্য' সরবরাহ করার জন্যে এই শিশুদের জোগাড় করেছিলেন।
>
> ব্যালুসেক : কিনসি নিজেই আমাকে এটা করতে বলেছিল। [Neuess Deutschland, মে ১৭, ১৯৫৭][৭২]

অর্থাৎ কিনসি শুধু ধর্ষণে সায় দেয়নি, শুধু ধর্ষককে নিরাপদে রাখেনি; বরং সে ধর্ষণে উদ্বুদ্ধও করেছিল।

'সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন দা হিউম্যান ফিমেইল' বইতেও ২ থেকে ১৫ বছর বয়সী কন্যা শিশুদের ওপর চালানো নির্যাতনের তথ্যকে বিজ্ঞানের মোড়কে তুলে ধরেছিল কিনসি। শিশু ধর্ষকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দাবি করেছিল শিশুরা না কি জন্মগতভাবেই, এমনকি গর্ভে থাকা অবস্থা থেকেই যৌনতায় সক্ষম! বয়ঃসন্ধির আগ থেকেই, একদম ছোট ছোট শিশুদের সাথেও যৌনতা স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার। অভিভাবকদের উচিত ছোটবেলা থেকেই শিশুদের হস্তমৈথুন করানো এবং মিলেমিশে হস্তমৈথুন করা! কিনসি আরও বলেছিল, কমবয়স্ক শিশুরা বয়স্ক সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং উপকারী যৌনমিলন করতেই পারে, এবং এমন করা উচিত।[৭৩] তার মতে, শিশুদের সাথে যৌনতা নিয়ে বিপত্তি বাধে আইন আর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এছাড়া এতে অন্য কোনো সমস্যা নেই!

কিনসির বিষাক্ত চিন্তা কীভাবে দশকের পর দশক বিভীষকার জন্ম দিয়েছে তার উদাহরণ দিয়ে আলোচনা শেষ করি। যৌন নিপীড়নের শিকার যেসব শিশু কিনসির

---

[৭২] জার্মান পত্রিকার ইংরেজি অনুদিত উদ্ধৃতি থেকে নেওয়া। ইংরেজি নেওয়া হয়েছে Reisman, Kinsey: Crimes & Consequences থেকে।

[৭৩] বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্ধৃতির জন্য দেখুন, Reisman, Judith A., and Edward W. Eichel. Kinsey, sex and fraud, 1990. বিশেষ করে Male Child Sexuality এবং Female Child Sexuality, এ দুটি অধ্যায়।

কাছে স্রেফ 'পরিসংখ্যান' ছিল, তাদেরই একজন এসথার। এসথারের বাবা তাকে নিপীড়ন করত, আর নিয়মিত চিঠিপত্র চালাচালি করতো কিনসির সাথে। এসথারের অভিজ্ঞতা শোনা যাক।

> আমার বাবা কিনসি ইনস্টিটিউটের কাছে কিছু প্রশ্নোত্তর পাঠিয়েছিল... আমার ওপর যে যৌন নির্যাতন সে চালাচ্ছিল সেটা নিয়ে... ব্যাপারটা ১৯৩৮ এর দিকে শুরু হয়, আমার বয়স তখন চার... তার একটা ক্যামেরা ছিল যেটা সে প্রায়ই ব্যবহার করত... আমার মনে আছে একবার (সে যখন যৌন নির্যাতন করছিল) ক্যামেরা চলছিল, আর সে শুধু বলছিল, 'আরে ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই!'।
>
> (বড় হবার পর) আমি একজন মনোবিদের কাছে গেলাম। কিন্তু দেখলাম মনোবিদ আমাকে কিনসির মিথ্যাচারগুলোই শোনাচ্ছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম কিনসি ইনস্টিটিউট-ই মনোবিদদের শিক্ষা দিচ্ছে।
>
> ...তারা আমাকে এবং আমার মতো অন্য শিশুদের স্রেফ ব্যবহার করেছে। মিথ্যার স্বার্থে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেখা খুব জঘন্য অনুভূতি। এবং তারা এটাকে টিকিয়ে রাখছে... শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন তাদের চোখে খারাপ কিছু না। তাই তারা এতে বাধা দেয়নি, বরং তারা চেয়েছিল এই নির্যাতন চলুক...[৬]

পরিসংখ্যান নিয়ে কারচুপি, ছাত্রদের ওপর চালানো যৌন নিপীড়ন, সহকর্মীদের সাথে বিকৃত যৌনতা, নিজের সহকর্মী ও কর্মচারীদের বিকৃত যৌনতায় বাধ্য করা, সেগুলো ক্যামেরায় ধারণ করা, শিশু ধর্ষণে সমর্থন—কিনসির অপরাধের তালিকা অনেক লম্বা। কিনসির জীবন ও গবেষণার এসব দিক জানার পর কোনো বিচারেই তাকে নির্মোহ, নিরপেক্ষ গবেষক বলা যায় না।

২০০৪ এর এপ্রিলে পাঁচ বছরের গবেষণার পর অ্যামেরিকান ৫০ রাজ্য থেকে বাছাই করা ২৪০০ জন আইনপ্রণেতা সিদ্ধান্ত দেন—অ্যালফ্রেড কিনসির গবেষণা বানোয়াট ছিল। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। কিনসির ভুয়া গবেষণার প্রভাবে বদলে গেছে ৫০টির বেশি আইন, বদলে গেছে যৌনতার ব্যাপারে অ্যামেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি, কিনসির চিন্তার ওপর গড়ে উঠেছে আধুনিক যৌন শিক্ষার ভিত্তি।[৭৫]

---

[৭৪] "Kinsey's Paedophiles," আরও দেখুন, Reisman, Judith A. Kinsey: Crimes & Consequences, সপ্তম অধ্যায়।

[৭৫] Jeffrey, Linda. "Restoring Legal Protections for Women and Children: A Historical Analysis of the States Criminal Codes." The State Factor: Jeffersonian Principles in Action (2004)

উত্তরাধিকার

অ্যামেরিকার ষাটের দশকের যৌন বিপ্লব, আধুনিক যৌন শিক্ষার সিলেবাস, যৌনতা সংক্রান্ত আইন, মূল্যবোধ এবং সামগ্রিকভাবে যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমা সভ্যতার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে অ্যালফ্রেড কিনসির চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে কিনসির এমন কিছু চিন্তার তালিকা দেখা যাক –

- সব ধরনের যৌন কামনা এবং আচরণের স্বাধীনতা (আইনি বৈধতা) থাকা উচিৎ।
- প্রত্যেক মানুষের যৌন বিনোদনের (পর্নোগ্রাফি ও পতিতাগমন) অধিকার আছে।
- মানুষ স্বাধীনভাবে যৌন আচরণ বেছে নেবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না।
- ব্যক্তিজীবনে যৌন আচরণের কারণে আইনি বা সামাজিক হয়রানি করা যাবে না।
- ইচ্ছেমতো গর্ভপাতের অধিকার থাকা উচিৎ।
- যৌনতার ব্যাপারে আইন এবং ট্যাবু নিয়মিত ভাঙ্গা হয়, কাজেই এগুলোর বিরুদ্ধে আইন বাতিল করা উচিৎ।
- শারীরিক, মানসিক এবং যৌন স্বাস্থ্যের জন্য শৈশব থেকে হস্তমৈথুন করা গুরুত্বপূর্ণ।
- বিয়ের আগে একজন মানুষ যৌনতা নিয়ে যত বেশি 'এক্সপেরিমেন্ট' করবে, তার বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সফল হবার সম্ভাবনা তত বাড়বে। এতে করে সমাজে বিভিন্ন যৌনরোগ এবং যৌনতা-সংক্রান্ত সমস্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাবে।
- শিশুরা জন্মের পর থেকেই যৌনতায় সক্ষম।
- অজাচার (ইনসেস্ট) নিষিদ্ধ হবার কোনো মেডিকেল বা অন্য যৌক্তিক কারণ নেই।
- মানবজাতি সহজাতভাবে উভকামী। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে যৌন সংযম, অসমকামিতা এবং বিয়েকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা মেনে নেয়।
- সব ধরনের পায়ুকাম এবং বিকৃত যৌনতা প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর।
- সব ধরনের যৌনতা সমান। তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হোক, পুরুষ আর বালকের মধ্যে হোক, মানুষ আর পশুর মধ্যে হোক—এর মধ্যে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বলে কিছু নেই।[৭৬]

---

[৭৬] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Reisman, Judith A. Sexual Sabotage: How One Mad Scientist Unleashed A Plague Of Corruption And Contagion On America. WND Books.

কথাটা কয়েকবার বলেছি, আবারও বলি। আধুনিক যৌন শিক্ষা, যৌনতার মতবাদ এবং সেক্স সম্পর্কে চিকিৎসকদের সার্বিক চিন্তা পরিচালিত হচ্ছে কিনসির গড়া ভিত্তির ওপর। যৌনতা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের আজকের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠেছে আলফ্রেড কিনসির এই দুই বিখ্যাত 'থিসিসের' ওপর ভর করে।

যৌন বিপ্লব, পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি এবং সমকামিতাসহ বিভিন্ন বিকৃত যৌনতার আন্দোলনকে কিনসির গবেষণা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে। তার এই গবেষণা ভূমিকা রেখেছে পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাভিচার, বহুগামিতা আর গর্ভপাতের মহামারি তৈরিতে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার ধ্বংসের পেছনে রেখেছে সুদূরপ্রসারী অবদান।

কিনসির কলুষিত চিন্তার প্রভাব পশ্চিমা বিশ্বে সীমিত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে, আমাদের সমাজেও। আমাদের সমাজের চিকিৎসক ও মনোবিদ থেকে শুরু করে গর্ভপাত ক্লিনিকগুলোর লক্ষ লক্ষ গ্রাহক—'ভালোবাসা তো কোনো নিয়ম মানে না', কিংবা 'সবারই একটা অতীত আছে' বলে যিনার সাফাই গাওয়া তরুণ ও তরুণী, মানব ও মানবীরা—কিনসির কুৎসিত বিষ আকণ্ঠ পান করেছে সবাই।

কিনসির দীক্ষা প্রচারিত হচ্ছে আমাদের স্কুলগুলোতে। কিনসির চিন্তাধারার ভিত্তিতে ষাটের দশকে অ্যামেরিকার দুটি এনজিও; SIECUS[৭৭] এবং প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড (Planned Parenthood), 'যৌন শিক্ষা' কারিকুলাম তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এই শিক্ষাক্রম প্রথমে অ্যামেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোতে গৃহীত হয়, তারপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। বর্তমানে কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন[৭৮] (CSE) নামে যৌন শিক্ষার যে কারিকুলাম বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে, তা তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে SIECUS ও প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রমের অধীনে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে যৌন শিক্ষার যে অংশগুলো যুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো এসেছে এই CSE থেকে, যার ভিত্তি হলো অ্যালফ্রেড কিনসির কলুষিত চিন্তা।[৭৯]

অ্যালফ্রেড কিনসির প্রভাব আসলে কতটুকু, তা বোঝার জন্য সমালোচকদের ব্যাপারে টক শো উপস্থাপক এবং কিনসির একনিষ্ঠ ভক্ত ফিল ডনাহিউয়ের এই উদ্ধৃতি যথেষ্ট হবার কথা,

---

2010 এবং Grossman, Miriam. You're Teaching My Child What?: A Physician Exposes the Lies of Sex Ed and How They Harm Your Child. Simon and Schuster, 2009.

[৭৭] SIECUS-The Sexuality Information and Education Council of the United States যৌন শিক্ষা নিয়ে কাজ করা পৃথিবীর প্রধান এনজিও। অ্যামেরিকায় প্রতিষ্ঠিত।

[৭৮] কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন(CSE)- সমন্বিত যৌন শিক্ষা

[৭৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, অধ্যায় ১৮, বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা

> মনোরোগবিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন ফ্রয়েড, তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে যেমন ম্যাডাম কুরি, পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আইনস্টাইন, তেমনি যৌনতার ক্ষেত্রে কিনসি। সেক্সোলজিস্টদের পুরো এক প্রজন্ম গড়ে উঠেছে কিনসির (চিন্তার) ওপর। আর আজ এরা (কিনসির সমালোচকরা) এসে বলছে কিনসি ছিল একটা বিকৃত বুড়ো! এটা তো (কিনসির সমালোচনা করা) আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ভুল বলার মতো...[৮০]

কিনসি নিষিদ্ধ যৌন আচরণকে স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য করতে চেয়েছিল। কাজটা সে করেছিল বানোয়াট পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। পরকীয়া, সমকামিতা, শিশুকামিতা—এই কাজগুলোকে মানুষ পাপ মনে করতে পারে। তবে অনেকেই এসব করে। এসব করেও দিব্যি মানুষ সুস্থ জীবনযাপন করছে। সমাজও ভেঙে পড়ছে না। কারও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আর অনেক মানুষ যেহেতু এসব করছেই, তাই এগুলোকে বেআইনি বানিয়ে রাখা কতটা যৌক্তিক?

কারচুপির পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছিল কিনসি। তার কৌশল ছিল সহজ কিন্তু কার্যকরী।

অ্যালফ্রেড কিনসি ছিল চরম বিকৃত মানসিকতার এক দানব। তার কাছে গবেষণা ছিল নিজের বিকৃতি সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার। কিনসি আসলে মার্কিন সমাজের সামনে আয়না তুলে ধরেনি, ধরতে চায়ওনি। সে নিজের চেহারায়, নিজের বিকৃত ছাঁচে গড়তে চেয়েছিল মার্কিন সমাজকে। রকাফেলার ফাউন্ডেশনের মতো রহস্যময় পৃষ্ঠপোষকদের কল্যাণে তার বিকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে অ্যামেরিকা, তারপর সারা বিশ্বে।

***

গত অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের তৈরি জার্মান সমকামী আন্দোলন গুড়িয়ে দিয়েছিল নাৎসিরা। তবে সুযোগসন্ধানী ভাইরাসের মতো এ আন্দোলনের রেশ ততদিনে পৌঁছে গিয়েছে অ্যামেরিকাতে। কিন্তু আধুনিক সমকামী আন্দোলনের সফলতা কেন অ্যামেরিকাতেই আসলো, কেন এ মাটিই এ আন্দোলনের জন্য এতটা উর্বর প্রমাণিত হলো, তা বোঝার জন্য অ্যালফ্রেড কিনসিকে নিয়ে জানা জরুরি ছিল।

যৌন বিপ্লব আর সমকামী আন্দোলন সম্ভব হয়ে ওঠার জন্য যে পরিবেশ দরকার ছিল, প্রয়োজন ছিল যেসব চলকের উপস্থিতি, সেগুলো তৈরি করে দিয়েছিল কিনসি। খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ থেকে অবাধ যৌনতার প্রতি মার্কিন সমাজের যে পরিবর্তন, তার পেছনে একক ব্যক্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা সম্ভবত তারই। তাকে ছাড়া

---

[৮০] As quoted in, Reisman, Judith A. Kinsey: Crimes & Consequences

যৌন বিপ্লব এবং সমকামী আন্দোলন হয়তো এত দ্রুত এতটা সফল হতো না। আর তাই আন্দোলনের আলোচনায় যাবার আগে ড. কিনসির গল্পটা জেনে নিতে থামতে হয়েছিল আমাদের। এবার চলুন, আন্দোলনের গল্পে যাওয়া যাক।

অধ্যায় ৪

আন্দোলন

১৯২৪ সাল। ম্যাগনাস হার্শফেল্ড তার যৌন গবেষণা কেন্দ্রের কাজ নিয়ে পুরোদমে ব্যস্ত। ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর কুখ্যাত 'মাইন ক্যাম্ফ' বই লেখায় হাত দিয়েছে জেলবন্দী অ্যাডলফ হিটলার। হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বায়োলজি বই লিখছে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ সহকারী অধ্যাপক অ্যালফ্রেড কিনসি। এমন সময় শিকাগোতে গড়ে উঠলো অ্যামেরিকার প্রথম 'সমকামী' সংগঠন। মূল উদ্যোক্তা ছিল হেনরি গারবার নামে এক জার্মান-অ্যামেরিকান। অ্যামেরিকার প্রথম সমকামী আন্দোলনের শেকড় ছিল জার্মান।

হেনরি গারবারের জন্ম ১৮৯২ সালে, জার্মানির ব্যাভারিয়ায়। উন্নত জীবনের আশায় ১৯১৩ সালে অ্যামেরিকায় পাড়ি জমায় তার পরিবার। পরের বছর শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সাড়ে তিন বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলার পর মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে সংঘাতে প্রবেশ করে অ্যামেরিকা। যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। মার্কিন সরকার সাফ-সাফ জানিয়ে দেয়, গারবারের মতো জার্মানদের সামনে দুটো পথ খোলা। 'শত্রু দেশের অভিবাসী নাগরিক' হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়া, অথবা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া জার্মানির বিরুদ্ধে। আনুগত্যের এ পরীক্ষায় গারবার বেছে নেয় দ্বিতীয় পথটি।

হেনরি গারবারের প্রাথমিক জীবন নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া না গেলেও এটুকু নিশ্চিত যে, মার্কিন বাহিনীর সৈনিক হিসেবে জার্মানি যাবার আগেই বিকৃত যৌনতায় আসক্ত ছিল সে। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার অভ্যাস ছাড়াতে গারবারকে মানসিক হাসপাতালেও ভর্তি করিয়েছিল তার পরিবার। তবে পরিবারের চাপে হাসপাতালে ভর্তি হলেও বিকৃত যৌনতা ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না গারবারের।

সেনাবাহিনীতে নাম লেখানোর পর গারবারের পোস্টিং হয় জার্মানির কোব্লেনটস শহরে। রাইন নদীর পাড় ঘেঁষা এ শহরেই কাটে পরের তিন বছর। নানা ছুটিছাটায় বেশ ক'বার যাতায়াত হয় বার্লিনেও। পাপের শহর বার্লিনে গারবারের পরিচয় ঘটে অন্ধকারের নতুন গভীরতার সাথে। বার্লিনের সাথে অ্যামেরিকার জীবন মেলাতে

গিয়ে অবাক হয় সে বারবার। অ্যামেরিকায় যা অপরাধীর মতো লুকিয়েচুরিয়ে করতে হতো, বার্লিনে তা হয় সবার সামনে। রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে। অ্যামেরিকায় বিকৃতিকে গোপন করতে হতো, বার্লিনে বিকৃতি উদ্‌যাপিত হয়।

ধীরে ধীরে বার্লিনের সমকামী জগতের সাথে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠে গারবারের। সে পরিচিত হয় ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের চিন্তা ও আন্দোলনের সাথে। বিকৃত কামনাকে বৈধ বানাবার যে ব্যাধি তাড়িত করেছিল উলরিখস আর হার্শফেল্ডকে, যে ব্যাধি এক সময় আচ্ছন্ন করে ফেলবে অ্যালফ্রেড কিনসিকে, বার্লিনে সেই একই তাড়না বাসা বাঁধে গারবারের মন ও মস্তিষ্কে। হার্শফেল্ডের এসএইচসি'র মধ্যে পেয়ে যায় অনুসরণীয় মডেল। ১৯২৪ সালে দেশে ফিরে এসএইচসি'র আদলে গড়ে তোলে 'সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস'। উদ্দেশ্য সেই একই, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতাকে বৈধতা দেওয়া, পায়ুকাম বিরোধী আইন রহিত করা, সংঘবদ্ধ করা সমমনাদের। এ সংগঠনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় অ্যামেরিকার প্রথম 'সমকামী' ম্যাগাজিন 'ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ফ্রিডম' (বন্ধুত্ব ও স্বাধীনতা)। জার্মান পূর্বসূরীর মতো গারবারও বিকৃত যৌনতাকে উপস্থাপন করে মানবাধিকার আর স্বাধীনতার প্রশ্ন হিসেবে।

কিন্তু এক বছরের মাথায় ভেস্তে যায় গারবারের উদ্যোগ। অল্পবয়সী বালকদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ১৯২৫ সালে গারবারসহ 'সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস'-এর তিন নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শিকাগোর পত্রিকাগুলোতে প্রচুর লেখালেখি হয় এই কেলেঙ্কারি নিয়ে। মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে একসময় ছাড়া পেলেও নতুন করে কাজ শুরু করার আর সাহস পায় না গারবার। তার আন্দোলনের অকাল সমাপ্তি ঘটে।[৮১]

তবে আন্দোলনে সফল না হলেও অ্যামেরিকার উর্বর মাটিতে বিষাক্ত এ বীজ বোনার কৃতিত্ব দিতে হবে হেনরি গারবারকেই। ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের এই ভাবশিষ্যের হাত ধরেই কার্ল হাইনরাইখ উলরিখসের স্বপ্ন আর প্রকল্প আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে পৌঁছে যায় অ্যামেরিকায়। একসময় এখান থেকেই শুরু হবে এমন এক আন্দোলন, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে পুরো বিশ্বে, সাফল্য আর ব্যাপ্তিতে যা ছাড়িয়ে যাবে উলরিখস আর হার্শফেল্ডের দূরতম কল্পনাকেও। নতুন এই আন্দোলনের সূচনা হবে গারবারের ব্যর্থ প্রকল্পের অবসানের পঁচিশ বছর পর, বিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যবিন্দু, ১৯৫০ সালে।

---

[৮১] Katz, Jonathan. "Gay American history: Lesbians and gay men in the USA: A documentary." (1976). Kepner, Jim, and Stephen O. Murray. "Henry Gerber (1895-1972): Grandfather of the American gay movement." In Before Stonewall, pp. 24-34. Routledge, 2014.

আন্দোলন

১৯৪৮ সালে যখন অ্যালফ্রেড কিনসির প্রথম বই প্রকাশিত হচ্ছে, হ্যারি হেই তখন একজন দাম্পত্য জীবনের দশম বছরে পা রাখা পুরুষ। কার্ল উলরিখসের মতো হ্যারি হেইয়েরও প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হয় চৌদ্দ বছর বয়সে, পঁচিশ বছরের এক নাবিকের সাথে। সেই থেকে তাকে পেয়ে বসে বিকৃত যৌনতার নেশা। তবে স্বাভাবিক জীবনযাপনের চেষ্টা করেছিল হ্যারি হেই। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে বিয়েও করেছিল ছাব্বিশ বছর বয়সে। খুব একটা যে সফল হয়েছিল তা বলা যাবে না। তার নিজের ভাষ্যমতে, বিয়ের বয়স দু বছর পেরোবার আগেই স্ত্রীর অজান্তে নিষিদ্ধ পল্লীতে সমকামীদের 'স্পট'গুলোতে আবারও যাতায়াত শুরু করেছিল সে। কিন্তু নিজের আচরণের অস্বাভাবিকতা আর নৈতিকতার প্রশ্ন ভাবাতো তাকে। একদিকে বিকৃতির আসক্তি অন্যদিকে বিবেকের প্রতিবাদ, টানাপোড়েন চলছিল তার ভেতর। হেইয়ের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব ছিল।[৮২]

কিন্তু অ্যালফ্রেড কিনসির 'সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন দা হিউম্যান মেইল' প্রকাশিত হবার পর বদলে যায় সবকিছু। আমরা আগেই জেনেছি, এ বইতে কিনসি ঘোষণা করে যৌনতা রংধনুর বর্ণালীর মতো বৈচিত্র্যময়। সমাজ যেগুলোকে বিকৃত যৌনতা বলে তা সবই আসলে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, নির্দোষ। বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা বলে কিছু নেই। সমস্যা আসলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে। নিজের দাবির পক্ষে কিনসি হাজির করে কারচুপিভরা পরিসংখ্যান। বলে, সমাজ যাই বলুক না কেন, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেক বেশি প্রচলিত।

কিনসির বই পড়ার পর মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায় হ্যারি হেইয়ের চিন্তায়। স্বাভাবিক জীবনযাপনের সব চেষ্টা বাদ দিয়ে বিকৃতিকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরার সিদ্ধান্ত নেয় সে। মাঠে নেমে পড়ে বিকৃত যৌনতাকে বৈধ করে তোলার লক্ষ্যে। কিনসির তত্ত্বের সৈনিকে পরিণত হয় হ্যারি হেই। শুরু হয় ঐ আন্দোলন, যা একসময় পরিচিতি পাবে এলজিবিটি নামে, যার বিষাক্ত জাল ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবী জুড়ে।[৮৩]

উলরিখস, হার্শফেল্ড এবং গারবার, তিন জনের কারোরই বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু হ্যারি হেই ছিল পোড় খাওয়া কমিউনিস্ট। আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির সব কলাকৌশল তার নখদর্পণে। নিজের সাংগঠনিক দক্ষতা আর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে সুচারুভাবে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সমকামী আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলে হ্যারি হেই। ১৯৪৮ সাল থেকে সমমনাদের গোপনে সংঘটিত

---

[৮২] Bullough, Vern L. "Harry Hay (1912-)." In Before Stonewall, pp. 73-82. Routledge, 2014. Loughery, John. "The other side of silence: Men's lives and gay identities: A twentieth-century history." (1998).

[৮৩] Hay, Harry. Radically gay: Gay liberation in the words of its founder. Beacon Press (MA), 1996.

করতে শুরু করে সে। নীরবে নেটওয়ার্ক তৈরি করে অ্যামেরিকার বিভিন্ন শহরের 'সমকামী'দের নিয়ে। বেড়ে উঠতে থাকে গোপন বিষবৃক্ষ।

নিরাপত্তার খাতিরে প্রথম দিকে কাজ চলে গোপন সেল কাঠামোর আদলে। কোনো এলাকায় জনা তিনেক আগ্রহী 'সমর্থক' পাওয়া গেলেই তৈরি হয়ে যায় একেকটা সেল। প্রত্যেক সেল আলাদা, এক সেলের লোকেরা চেনে না অন্য কোনো সেলের সদস্যকে। সেলের নেতাদের সাথে সম্পর্ক রাখে হেই নিজে আর তার হাতেগোনা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগী। সাংগঠনিক কাঠামোর এ মডেল সে নেয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে।[৮৪] প্রথম দিকের এই গোপনীয়তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু বছর পর হেই বলবে :

> (আমরা সেলগুলোকে) আন্ডারগ্রাউন্ড এবং পৃথক রেখেছিলাম, যাতে কোনো এক দল অন্য সব সদস্যদের পরিচয় জানতে না পারে।[৮৫]

এভাবে দু'বছর ধরে মাঠ তৈরির পর, ১৯৫০-এ সেলগুলোর সম্মিলিত রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'দা ম্যাটাচিন সোসাইটি (The Mattachine Society)', নেতৃত্বে হ্যারি হেই। এই সংগঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল,

- সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আগ্রহী পুরুষদের একত্রিত করা।
- অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আদলে সমকামীদের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
- সামাজিকভাবে সচেতন সমকামীদের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা।
- শোষণের শিকার সমকামীদের নানা রকমের সহায়তা দেওয়া।[৮৬]

অ্যামেরিকাতে এসময় সমকামীদের আরও বেশ কিছু সংগঠন ছিল। তবে সেগুলোর সাথে গুরুত্বপূর্ণ দুটো পার্থক্য ছিল ম্যাটাচিন সোসাইটির। দুটোর কৃতিত্বই দিতে হয় হ্যারি হেইকে। প্রথম পার্থক্য সাংগঠনিক। অন্যান্য সংগঠনগুলো ছিল অনেকটা বন্ধুবান্ধবের ঘরোয়া আড্ডা কিংবা এলাকার স্পোর্টস ক্লাবের মতো। গোছানো কোনো কাঠামো কিংবা কর্মপন্থা ছিল না তাদের। মার্কিন সমকামীদের মধ্যে পেশাদারী মনোভাব, সুনির্দিষ্ট কাঠামো, এবং রাজনৈতিক দক্ষতার চল শুরু করে ম্যাটাচিন সোসাইটি।

দ্বিতীয় পার্থক্যটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সমকামী সংগঠনগুলো ছিল রাজনৈতিকভাবে সতর্ক। তারা মনে করত, নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে দেখানোর বদলে সমকামীদের উচিৎ সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করে, লেখালেখি আর প্রচারণার মাধ্যমে

[৮৪] d'Emilio, John. Sexual politics, sexual communities. University of Chicago Press, 2012. p. 62

[৮৫] Katz, Gay American History, 410

[৮৬] Ibid

এগোনো, ধাপে ধাপে। এমন অবস্থানের পেছনে কারণও ছিল। সমকামিতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। ১৯৫২ সালে অ্যামেরিকান সাইকায়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকাভুক্ত করে। পরের বছর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নির্বাহী আদেশ দিয়ে জানিয়ে দেয়, 'যৌন বিকৃতি'র অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে যোগ দিতে পারবে না। সতর্কভাবে আগানোর পক্ষে যুক্তি ছিল অনেক।

কিন্তু হ্যারি হেইয়ের ভাবনা একেবারেই আলাদা। মার্ক্সিস্ট বিশ্লেষণের আদলে সমকামীদের সে চিত্রিত করে সমাজের শোষিত শ্রেণি হিসেবে। তার চোখে সমকামীরা একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যারা সমাজের নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্যের শিকার। বৈষম্য দূর করতে হলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আর মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। সমাজের ছাঁচে নিজেকে বদলালে চলবে না, বদলে দিতে হবে সমাজকেই। কেবল লেখালেখি আর বক্তৃতাতে কাজ হবে না, সামাজিক আন্দোলন তৈরি করে রাস্তায় নেমে চাপ প্রয়োগ করতে হবে সমাজ ও সরকারের ওপর। হ্যারি হেইয়ের সঙ্গে অন্যান্য সংগঠনগুলোর মতভেদের মিল পাওয়া যায় বামপন্থী রাজনীতির সংস্কারপন্থী আর চরমপন্থী ধারার মধ্যেকার মতপার্থক্যে।

শুরু থেকেই ভিন্ন পথে আগায় ম্যাটাচিন সোসাইটি। সাড়াও মেলে প্রচুর। ১৯৫০ এ আত্মপ্রকাশের পর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ম্যাটাচিন সোসাইটির নেটওয়ার্ক। বড় বড় শহরগুলোতে গড়ে উঠে স্বতন্ত্র শাখা। ১৯৫৩ সাল নাগাদ কেবল ক্যালিফোর্নিয়াতেই সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০০-এর কাছাকাছি। হ্যারি হেইদের দেখাদেখি ১৯৫৫ সালে স্যান ফ্রানসিসকো শহরে চালু হয় অ্যামেরিকার প্রথম লেসবিয়ান সংগঠন—ডটারস অফ বিলটিস (Daughters of Biltis)।[৮৭]

নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা নিয়ে বিরোধের জের ধরে ১৯৫৩ সালে ম্যাটাচিন সোসাইটি ছেড়ে যায় হ্যারি হেই ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা। ততদিনে মার্কিন সমকামী আন্দোলনের মূল কাঠামো এবং ভিত্তিপ্রস্তর দাঁড়িয়ে গেছে। হ্যারি হেই-এর দর্শন ও কর্মপদ্ধতি ছড়িয়ে গেছে অ্যামেরিকার আনাচেকানাচে। গড়ে উঠতে শুরু করেছে বহু আঞ্চলিক সংগঠন। ১৯৬১ সালে ইলিনয় রাজ্যে পায়ুসঙ্গমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। এটা ছিল কার্যত সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার শামিল। একই বছর সমকামিতার ব্যাপারে ইতিবাচক একটি ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয় ক্যালিফোর্নিয়ার এক টিভি চ্যানেলে।

আন্দোলন যখন অল্প অল্প করে সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছে, ঠিক তখন দিগন্তে দেখা দেয় এক প্রগাঢ় পরিবর্তনের আভাস। সমাজব্যাপী শুরু হয় পরিবর্তনের স্রোত। সেই স্রোতের পায়ে পায়ে আসে এমন এক ঝড়, যা মার্কিন সমাজের পাশাপাশি

[৮৭] Loughery. The other side of silence. (1998)

বদলে দেবে পুরো বিশ্বকেই। যৌন বিপ্লব নামের এ ঝড়ের উত্তাল বাতাসে পাল তুলে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে মার্কিন সমকামী আন্দোলন।

এক প্রগাঢ় পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরাশক্তি এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে অ্যামেরিকার। এ সময়কার মার্কিন প্রজন্মকে বলা হয় 'গ্রেটেস্ট জেনারেশান' বা 'শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম'। ১৯০০ থেকে ১৯২০ এর মাঝে জন্ম নেওয়া এই প্রজন্ম মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিল, সচল রেখেছিল যুদ্ধকালীন অর্থনীতির চাকা। এ প্রজন্ম পরিশ্রমী, বাস্তবমুখী। তাদের নৈতিকতার ভিত্তি খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক প্রগাঢ় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঝড় বদলে দেয় সবকিছু।

পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আগের প্রজন্মের চিন্তা ও মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করতে শুরু করে। এ দশকের শুরুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আলোড়ন তোলে 'বিট প্রজন্মে'র লেখক আর কবিরা। আমরা অনেকেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গ এবং একাত্তর নিয়ে তার লেখা কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর নাম শুনেছি। এই গিনসবার্গ ছিলেন 'বিট প্রজন্ম' নামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঘোষিত নেতা। গিনসবার্গ, উইলিয়াম বারোস, নীল ক্যাসিডি এবং জ্যাক ক্যারুয়াকের মতো বিট প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকরা মার্কিন সমাজের খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। বিট প্রজন্মের অনেকেই ছিল বিকৃত যৌনতা এবং বিভিন্ন ধরনের মাদকে আসক্ত। তাদের লেখায় জোরালোভাবে উঠে আসে প্রথাবিরোধিতা, মাদকের ব্যবহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আগ্রহ, অশ্লীলতা আর অবাধ যৌনতার কথা। বিট প্রজন্মের মাধ্যমে জনপ্রিয় হতে শুরু করা ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটবে ষাটের দশকের তরুণদের চিন্তা ও কাজে।

বিট প্রজন্মের চিন্তা যখন অল্প অল্প করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, তখন হিউ হেফনার নামে এক তরুণ সাইকোলজি গ্র্যাজুয়েট চালু করে 'প্লেবয়' নামের এক ম্যাগাজিন। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত পর্নোগ্রাফিক এই ম্যাগাজিনের প্রধান আকর্ষণ নগ্ন নারীদেহের ছবি, প্রধান মেসেজ 'সেক্স কেবলই বিনোদন', এবং প্রধান ক্রেতা তরুণ ও যুবকরা। প্লেবয় ম্যাগাজিনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মার্কিন তরুণের কাছে পৌঁছে যায় অবাধ যৌনতার বার্তা। গল্প, প্রবন্ধ এবং স্যাটায়ারের মাধ্যমে ব্যাভিচারের পাশাপাশি সমকামিতাকেও স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরার কাজ করে এই ম্যাগাজিন। মার্কিন সমাজে নগ্নতা এবং অবাধ যৌনতার স্বাভাবিকীকরণে অসামান্য ভূমিকা রাখে প্লেবয়। হ্যারি হেইয়ের মতো হিউ হেফনারও ছিল কিনসির গুণমুগ্ধ ভক্ত। পরে হেফনার গর্ব করে বলবে,

> 'কিনসিকে যদি যৌন বিপ্লবের গবেষক বলা হয়, তাহলে আমি হলাম কিনসির ক্যানভাসার।'[৮৮]

নানামুখী প্রভাবে এসময় এক প্রগাঢ় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল মার্কিন সমাজ। ক্রমশ যৌনতা নির্ভর হয়ে উঠছিল শিল্প, সাহিত্য, পত্রিকা, বিনোদন জগৎ। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল সমাজের মূল্যবোধের গাঁথুনি। 'শ্রেষ্ঠ' প্রজন্মের পিতামাতার সন্তানেরা বেড়ে উঠছিল জীবন ও নৈতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পঞ্চাশের দশকের মার্কিন সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৫৬ সালে লেখা এক বইতে সমাজবিজ্ঞানী ড. পিটিরিম সরোকিন লিখবেন,

> মার্কিন সমাজ যৌনতা নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে... আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায় যৌনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে... যৌনতার ক্রমবর্ধমান জোয়ার আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে।[৮৯]

পরিবর্তনের আলাদা আলাদা সব স্রোত এক মোহনায় এসে মিলিত হতে শুরু করে ষাটের দশকে। ক্রমেই শক্তিশালী হয় সমাজ রূপান্তরের প্রক্রিয়া। এ দশকের শুরুতে মাদক ব্যবহারের গুণাগুণ নিয়ে রীতিমতো ক্যাম্পেইন করতে শুরু করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিকাল সাইকোলজির চাকরিচ্যুত প্রফেসর টিমোথি লিয়েরি। বেদবাক্যের মতো তার কথা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। প্রায় একই সময়ে সুপরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ পপ-রক ব্যান্ড বিটলসকে নিয়ে তীব্র উন্মাদনা তৈরি করে মিডিয়া। 'বিটলম্যানিয়া'-র হাত ধরে আসে রক মিউসিকের বিপ্লব। বিভিন্ন ব্যান্ডের গানের লিরিকে উচ্চারিত হয় সেক্স, ড্রাগস আর রক অ্যান্ড রৌলের মন্ত্র। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার পেছনে ছুটতে থাকা ইঁদুর দলের মতোই অবক্ষয়ের বাঁশিওয়ালাদের পেছন পেছন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছুটতে শুরু করে তরুণ প্রজন্ম।

এর সাথে যুক্ত হয় মার্কিন সমাজকে তোলপাড় করে তোলা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত। মার্কিন সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দেয় বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা নাগরিক অধিকার আন্দোলন। কাছাকাছি সময়ে জোরালো হয়ে উঠে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী এবং নারী অধিকার নিয়ে আন্দোলন। তরুণদের বড় একটা অংশ এসব আন্দোলনে জোরালো সমর্থন দেয়। আগেকার প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা আর তাদের গড়ে তোলা সমাজব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় তাদের মধ্যে। বাপ-দাদাদের যে প্রজন্ম যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র আর বর্ণবাদী বৈষম্যমূলক সমাজ

---

[৮৮] ড. জুডিথ রাইসম্যানের কাছে লেখা হেফনারের ব্যক্তিগত চিঠি। উদ্ধৃত হয়েছে এখানে, Judith Reisman, "Exposing Pornography's Addictive, Destructive Effects," Human Events Online, December 16, 2003

[৮৯] Sorokin, Pitirim Alexandrovitch. "The American sex revolution." (1956). 19

গড়ে তুলেছে, তাদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস আর মূল্যবোধের ওপর আসলে কতটুকু ভরসা করা যায়? এ প্রশ্ন বারবার নাড়া দেয় তাদের মন ও মস্তিষ্কে। শত শত বছরের দাসপ্রথা আর বর্ণবাদের গন্ধ শরীর থেকে মুছে ফেলতে উদগ্রীব হয়ে উঠে তারা।

এই ব্যগ্রতা কাজে লাগিয়ে প্রথাবিরোধিতা, বাধভাঙ্গা, আর আগের প্রজন্মের নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করার বার্তা নিয়ে শুরু হয় কাউন্টার-কালচার নামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টবাদে বিশ্বাসী অ্যামেরিকাতে হঠ্যাৎ করেই যেন আগ্রহ তৈরি হয় প্রাচ্যের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। ফ্যাশনেবল হয়ে উঠে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম আর তাওবাদের[১০] নানা সংস্করণ। স্যাটানিসম নামে নতুন এক ধর্মের ঘোষণা দিয়ে বসে অ্যান্টন ল্যাভেই নামে রহস্যময় এক লোক। বলে শয়তান হলো মুক্তির প্রতীক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পৌরাণিক বীর।

ভাঙ্গনের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠে চারদিকে। সব বাঁধন আলগা হয়ে এক সুতোয় এসে ঠেকে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ অ্যামেরিকা এবং পশ্চিমা সভ্যতা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায়, যেখানে পালাবদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর তাই অবধারিতভাবেই আসে বিপ্লব।

যৌন বিপ্লব

বিপ্লব। আগাগোড়া রোমাঞ্চ আর সম্ভাবনাভরা এই শব্দটাতে মিশে আছে বহু জীবনের স্বপ্ন, আবেগ আর ট্র্যাজেডি। বিপ্লব বলতে সাধারণত আমরা সমাজ ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকে বোঝাই। যে পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে; সত্যি করে বললে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আসে সহিংসতার মাধ্যমে। শব্দটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে রাজপথের তীব্র আন্দোলন, ক্যারিশম্যাটিক নেতার বক্তব্য, রক্তে জোয়াড় তোলা সহস্র কণ্ঠের স্লোগান। আমরা কল্পনা করি, সংঘাত, সহিংসতা, রক্ত আর ক্ষমতাসীনের উৎখাতের চিত্র।

'যৌন বিপ্লব' আসলে এই অর্থে কোনো বিপ্লব ছিল না। এ 'বিপ্লবে' রাজপথের উত্তপ্ত আন্দোলন ছিল না, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ছিল না, ছিল না গভীর কোনো জীবনবোধ। এই 'বিপ্লব' শাসনব্যবস্থার উৎখাত করেনি, ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণের কাঠামোও ভেঙ্গেচুড়ে দেয়নি। উলটো এই 'বিপ্লব' এনেছে মানুষকে পোষ মানাবার, ঘুম পাড়াবার, আত্মমগ্ন করার নতুন নতুন কলকব্জা।

এই বিপ্লবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো যৌনতার ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনা। তবে পরিবর্তনের এ স্রোত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়নি। এই বিপ্লবের মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে, ধাপে ধাপে। কিনসি, হেফনার, লিয়েরি, পপ কালচার আর কাউন্টার কালচারের মতো নানা গুঁটিকে কাজে লাগিয়ে ওপর

[১০] তাওবাদ (Taoism): একটি ঐতিহ্যবাহী চীনা ধর্ম।

থেকে দক্ষ হাতে বিষাক্ত বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজে। অল্প কিছু মানুষ সূক্ষ্ম এবং সুচারুভাবে সভ্যতাকে ঠেলে দিয়েছে আদিম এক অন্ধকারের মুখে। যৌন বিপ্লবের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নারী ও পুরুষকে বার্তা দেওয়া হয়েছে,

> সেক্স কেবল আনন্দের জন্য। এর জন্য বিয়ের কী দরকার? ভালোবাসারই বা কী সম্পর্ক এর সাথে? এসব ভেবে কেন বোকার মতো বঞ্চিত করছো নিজেকে? ধর্ম, প্রথা, সমাজের কথা ভুলে যাও। ওসব ভণ্ডামি কেবল, তলে তলে সবাই সব-ই করে। সাহসী হও। যা ইচ্ছে করো, যখন ইচ্ছে করো, যার সাথে ইচ্ছে করো। খোলাখুলি করো, করো গর্বের সাথে। তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অধিকার নেই কারও।

সমাজের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ; বিশেষ করে তরুণরা এই বার্তা গ্রহণ করে নেয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে বিবাহপূর্ব এবং বিবাহবহির্ভূত যৌনতা, গর্ভপাত আর ডিভোর্স। যৌনতাকে খোলামেলাভাবে তুলে ধরতে শুরু করে মিডিয়া, সহজলভ্য হয় পর্নোগ্রাফি, ছাপ পড়ে সমাজে। বদলে যেতে থাকে পোশাক, আচরণ, আর মূল্যবোধ। সেই সাথে বদলায় বিকৃত যৌনতার প্রতি মনোভাব।

আগে পর্নোগ্রাফি, যিনা কিংবা সমকামিতার সাথে জড়িত ছিল লজ্জা, অপরাধবোধ। অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও কিছু বিষয় নিষিদ্ধ ছিল, কিছু সীমানা মেনে চলা হতো। যৌন বিপ্লব সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সব নীতিনৈতিকতা ছুড়ে ফেলে অ্যামেরিকা আলিঙ্গন করে নেয় ফ্রি সেক্সের মন্ত্র। তৈরি হয় সব ধরনের যৌনাচার আর বিকৃতির অবাধ প্রচলনের দর্শন।

এই পরিবর্তন সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় সমকামী আন্দোলনের সামনে। তারা এবার জোরেশোরে বলতে শুরু করে, যৌনতা যদি বিয়ে, প্রজনন আর নৈতিকতা থেকে মুক্ত হয়, যৌনতা যদি কেবল নিজের আনন্দের জন্য হয়, তাহলে সেটা কেবল নারী আর পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? দু'জন পুরুষ কিংবা দু'জন নারীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্কে সমস্যা কোথায়?

একবার এভাবে চিন্তা করতে শুরু করলে নারীপুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা আর সমলিঙ্গের মধ্যে বিকৃত যৌনতাকে এক মাপকাঠিতে দেখাটা খুব একটা কঠিন মনে হয় না। আর দুটোর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য যদি না-ই থাকে, তাহলে কেন একটাকে গ্রহণ করা হবে আর অন্যটাকে বানিয়ে রাখা হবে নিষিদ্ধ?

বিবর্তন

হ্যারি হেইয়ের হাত ধরে অ্যামেরিকার সমকামী আন্দোলনের কাঠামো তৈরি হয় পঞ্চাশের দশকে। এ আন্দোলন পরিপক্ক হয়ে উঠতে শুরু করে উত্তাল ষাটের

দশকে। সামাজিক আন্দোলনগুলো, বিশেষ করে নাগরিক অধিকার এবং নারীবাদী আন্দোলন সমকামীদের চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সিভিল রাইটস মুভমেন্ট বা নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মূল দাবি ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের সমান অধিকার। সংখ্যালঘু এবং ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার হবার কারণে কৃষ্ণাঙ্গদের বিশেষ সুবিধার দেওয়ার কথাও বলেছিল তারা। সমান্তরাল সময়ে নারী-পুরুষের বিভেদ মুছে দেওয়ার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিল নারীবাদী আন্দোলন। তারা বলেছিল, হাজার হাজার বছর ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবার কাঠামোর হাতে শোষিত হয়েছে নারী। এখন পরিবর্তনের সময়। নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে, ভেঙ্গে ফেলতে হবে শোষণের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো।

সমকামীরা এ দুই আন্দোলনের ভাষা ও কৌশল অনুকরণ করতে শুরু করে। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অনুকরণে নিজেদের সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরে। পাশাপাশি কাজে লাগায় এ আন্দোলন থেকে শেখা বিক্ষোভ, মিছিল আর পিকেটিং এর মতো কৌশলগুলো। নারীবাদী আন্দোলন থেকে তারা নেয় শোষক আর শোষিতের বয়ান। নারীবাদ বলত, নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণের শিকার। সমকামীরা বলতে শুরু করে, সমকামীরা 'অসমকামী' সমাজের বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার।

নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে সমকামী আন্দোলনের, বিশেষ করে লেসবিয়ান বা নারী সমকামীদের আন্দোলনের মিল ছিল আরও বেশ কিছু জায়গায়। দুটোরই উদ্দেশ্য ছিল সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা। দুটোই পরিবার নামের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী। এছাড়া নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত অনেকেই ছিল লেসবিয়ান বা অন্য নারীর সাথে যৌনতায় আসক্ত। তাদের অনেকে বলত, 'নারীবাদ হলো তত্ত্ব আর লেসবিয়ানিসম তার প্রয়োগ'।[২১] নারীবাদ ও সমকামিতার এই মিশ্রণ থেকেই দুই দশক পর উদ্ভব ঘটবে কুইয়ার থিওরি নামে বিচিত্র এক তত্ত্বের, যা থেকে জন্ম নেবে হাল আমলের ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ। তবে সে গল্প শোনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু অধ্যায়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর ভরবেগ কাজে লাগিয়ে বিকৃত যৌনতার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে মনোযোগী হয় সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা। তারা বলতে শুরু করে,

সমকামীরা সংখ্যালঘু, সমকামীরা নির্যাতিত,

সমকামীদের অধিকার চাই!

---

[২১] Baird, Vanessa, The No-Nonsense Guide to Sexual Diversity (Oxford,2007), 29

স্টোনওয়ালের দাঙ্গা

নানা ডামাডোলের ভেতর সমকামী আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে রাজপথে আসতে শুরু করেছে, ঠিক তখন ঘটে স্টোনওয়ালের দাঙ্গা। নিউইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজ এলাকার কুখ্যাত এক বারের নাম স্টোনওয়াল। জায়গাটা সমকামীদের মদ খাওয়া, নাচানাচি আর অভিসারের আখড়া। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এখানে থাকতো নারী সাজা পুরুষ আর কিশোরদের নাচগান।[৯২] অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর আর তাদের ব্যাপারে 'আগ্রহী' সমকামীদের নিয়মিত আড্ডা বসতো স্টোনওয়ালে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের বারে মোটামুটি নিয়ম করে পুলিশের রেইড পড়ত। তবে কখনোই গুরুতর কিছু হতো না। অল্প কিছু লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে যেত পুলিশ, থানা থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিতো, বাড়ি পাঠিয়ে দিতো বাকিদের।

কিন্তু ১৯৬৯ এর ২৮ জুন ভোররাতে নিয়মের ব্যাতয় ঘটলো। সেই রাতে পুলিশ রেইডের সময় হঠাৎ সহিংস হয়ে উঠলো সমকামীরা। প্রথমে তারা পুলিশের দিকে ময়লা-আবর্জনা ছোড়া শুরু করলো। তারপর ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিলো পুলিশের গাড়িতে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে রণক্ষেত্রে পরিণত হলো পুরো এলাকা। পরের পাঁচ দিন পুরোদস্তুর দাঙ্গা চললো নিউইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজে।

স্টোনওয়াল দাঙ্গা, এ নিয়ে মিডিয়া কাভারেজ এবং সমাজের সামগ্রিক আবহাওয়া সমকামী আন্দোলনের জন্য এক চমৎকার সুযোগ নিয়ে হাজির হলো। অন্য আন্দোলনগুলোর অনুকরণে সমকামী সংগঠনগুলোও রাজপথের কর্মসূচি আর আইনি লড়াইয়ে মনোযোগ দিলো।[৯৩] নিজেদের আন্দোলনকে তুলে ধরলো বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের অংশ হিসেবে। বললো—কৃষ্ণাঙ্গ, নারী, সমকামী—সবার আন্দোলন এক সুতোয় গাঁথা। সবার লড়াই শোষণের একই কাঠামোর বিরুদ্ধে। তাই সবার অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলতে হবে। যে কৃষ্ণাঙ্গ অধিকারের পক্ষে বলে কিন্তু সমকামী অধিকারের ব্যাপারে চুপ, যে নারী স্বাধীনতার সমর্থক কিন্তু সমকামের স্বাধীনতার বিপক্ষে, সে হয় বিভ্রান্ত অথবা হিপোক্রেট কিংবা ধর্মান্ধ। এ সময়কার সমকামী আন্দোলনের অবস্থানের সারমর্ম পাওয়া যায় সমকামী অ্যাকটিভিস্ট ফ্র্যাঙ্ক ক্যামিনির নিচের বক্তব্যে,

> কোন কোন ক্রোমোসম আর জিনের কারণে গায়ের চামড়া কালো হয়, কিংবা নিগ্রোদের গায়ের চামড়া কীভাবে সাদা বানানো যায়, তা নিয়ে তো আমি কাউকে দুশ্চিন্তা করতে দেখি না। ইহুদিবিদ্বেষ দূর করার জন্য সব ইহুদিকে খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলার প্রতি তো কারও আগ্রহ দেখি না... আমরা আমাদের

---

[৯২] এদের ক্রসড্রেসার বা ড্র্যাগ কুইন বলা হয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে অধ্যায়গুলোতে।

[৯৩] Bernstein, 'Identities and Politics', 549

> নিজ নিজ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে আগ্রহী—নিগ্রো হিসেবে অথবা ইহুদি হিসেবে অথবা সমকামী হিসেবে। কেন কেউ নিগ্রো হয়, কেন কেউ ইহুদি হয় কিংবা কেন কেউ সমকামী হয়, এই প্রশ্নগুলো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। একইভাবে আমাদেরকে শ্বেতাঙ্গ, খ্রিষ্টান কিংবা অসমকামীতে রূপান্তর করা যাবে কি না, সে প্রশ্নও অপ্রাসঙ্গিক।[১৪]

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। কৃষ্ণাঙ্গ, ইহুদি এবং নারীদের মতো সমকামীরাও একটা আলাদা গোষ্ঠী। তারাও বৈষম্য আর নির্যাতনের শিকার। সমকামিতা গায়ের রঙ কিংবা বংশপরিচয়ের মতোই একটা ব্যাপার। কালোদের যেমন কেউ সাদা হতে বলে না, তেমনি সমকামীদেরও নিজেদের বদলাতে বলা উচিৎ না। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংখ্যালঘুদের যথাযথ অধিকার দেওয়া। বর্ণ, লিঙ্গ এবং যৌনতাকে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখানোর ব্যাপারটার শুরু এভাবেই। আজ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মানবাধিকারের নামে বিকৃত যৌনতার বৈধতার আলাপ টানে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকার, এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থা। কিন্তু এখানে বড়সড় একটা ফাঁকি আছে।

চামড়ার রং, জন্মগত দেহ বা জাতিগত পরিচয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এর ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু নিজের আচরণ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া যৌন আচরণের সাথে তাই স্রষ্টাপ্রদত্ত চামড়ার রঙের তুলনা হয় না। মানুষ সাদা, কালো, হলুদ কিংবা বাদামী চামড়া নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু কেউ চোর বা ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। মানুষ এগুলো হয়ে ওঠে। এগুলো জন্মগত বৈশিষ্ট্য না, ঐচ্ছিক আচরণ। নিজের সিদ্ধান্তে একজন মানুষ চোর কিংবা ধর্ষক হয়, ঠিক যেমন নিজের সিদ্ধান্তে একজন মানুষ সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়।

কিন্তু চতুরভাবে বিষয়গুলোকে এক করে দেখায় সমকামী আন্দোলন। উলরিখসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমলিঙ্গের সাথে যৌনকর্মের নৈতিকতা ও বৈধতার প্রশ্নকে পরিণত করে অধিকার, স্বাধীনতা আর সমতার প্রশ্নে। সমকামিতার সমর্থনকে জুড়ে দেয় মুক্তচিন্তা আর প্রগতিশীলতার সাথে। এ কৌশল অত্যন্ত সফল হয়।

সাফল্য

স্টোনওয়াল দাঙ্গার পর সমকামী অধিকার আন্দোলনকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় না। বিজয় আসতে থাকে একের পর এক। স্টোনওয়াল দাঙ্গার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্কে পদযাত্রা কর্মসূচি আয়োজন করে তারা। একে ইতিহাসের প্রথম 'প্রাইড প্যারেড' মনে করা হয়।[১৫]

---

[১৪] Long, Michael G. (2012). Martin Luther King Jr., Homosexuality, and the Early Gay Rights Movement: Keeping the Dream Straight?. Palgrave Macmillan. pp. 124–26.

[১৫] প্রাইড প্যারেড (Pride parade) বা গৌরব পদযাত্রা। বিকৃত যৌন সংস্কৃতির উৎসব হিসেবে পালনের

বড় একটা সফলতা আসে এর তিন বছর পর, ১৯৭৩-এ। সে বছর অ্যামেরিকান সাইকায়েট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ) মানসিক রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দেয়। আসলে বলা উচিৎ, বাদ দিতে বাধ্য হয়। এ সিদ্ধান্ত নির্মোহ বিশ্লেষণ কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ছিল না। ১৯৭০ থেকে টানা তিন বছর এপিএ-এর ওপর ব্যাপক চাপ তৈরি করে সমকামী অ্যাকটিভিস্টরা। মনোবিদদের আনুষ্ঠানিক মিটিংয়ে হুট করে ঢুকে পড়া, মাইক কেড়ে নিয়ে তারস্বরে গালিগালাজ, বাইরে দাঁড়িয়ে স্লোগানবাজিসহ নানাভাবে গন্ডগোল চালাতে থাকে অ্যাক্টিভিস্টরা। এভাবে কয়েক বছর চলার পর অ্যাক্টিভিস্টদের ক্যাম্পেইনিং, লবিয়িং আর তীব্র রাজনৈতিক চাপের মুখে শেষমেশ দাবি মেনে নেওয়া হয়।[২৬] সমকামী অ্যাকটিভিস্ট এবং গবেষক ড. সাইমন লাভেই এর ভাষায়,

> সমকামীদের অ্যাকটিভিসম-ই হলো সেই শক্তি, যা এপিএ-কে বাধ্য করেছিল সমকামিতাকে (মানসিক রোগের) তালিকা থেকে বাদ দিতে।[২৭]

এপিএ-এর সিদ্ধান্তের পর আরও জোরালো হয়ে উঠে সমকামিতার বৈধতার দাবি। সমকামিতা যদি রোগ না হয়, তাহলে সমকামীদের চিকিৎসার কথা বলা হবে কেন? সমকামিতা যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে সমকামী যৌন আচরণকে বাঁধা দেওয়ার যুক্তি কী?

পরের বছর, ১৯৭৪ সালে মিশিগানের নগর কাউন্সিলের সদস্য পদ অর্জন করে সমকামী নারী ক্যাথি কোযাচেঙ্কো। ৭৭-এ মার্কিন কোর্টের রায়ে বলা হয়, সমকামিতাকে এখন থেকে আর 'নৈতিক স্খলনের' চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হবে না।[২৮] ১৯৭৮ সাল নাগাদ প্রকাশ্য সমকামীদের জন্য ৮৫% সরকারি চাকরি উন্মুক্ত হয়ে যায়।[২৯] একই বছর ডেমোক্রেট পার্টির রাজনীতিবিদ হার্ভে মিল্ক ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের প্রথম প্রকাশ্য সমকামী পুরুষ হিসেবে প্রাদেশিক পর্যায়ে রাজনৈতিক পদ পায়। সমকামের বৈধতার প্রশ্ন ছিল হার্ভে মিল্কের নির্বাচনী প্রচারণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মিল্কের অনুরোধে অ্যাকটিভিস্ট গিলবার্ট বেইকার আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে রংধনু রঙের পতাকা বানায়। সর্বপ্রথম এ পতাকা ব্যবহার করা হয় ৭৮-এর প্রাইড প্যারেডে। কালক্রমে এই রংধনু পতাকা বিকৃত যৌনতার আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রতীকে পরিণত হবে। স্টোনওয়াল দাঙ্গার দশ বছরের মাথায় সফলতার তুঙ্গে

কর্মসূচি।

[২৬] Satinover, Jeffrey. "The" Trojan Couch": How the Mental Health Associations Misrepresent Science." Narth. com (2005).

[২৭] LeVay, Simon. Queer science: The use and abuse of research into homosexuality. MIT press, 1996.

[২৮] Bernstein, 'Identities and Politics', 551

[২৯] প্রাগুক্ত।

পৌঁছায় আন্দোলন। ১৯৭৯-তে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার অধিকারের দাবিতে জাতীয় পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে প্রায় এক লক্ষ মানুষ।

এই অর্জনগুলোর কৃতিত্ব এককভাবে সমকামী আন্দোলনের না। মার্কিন সমাজ এ সময়টাতে গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বদলে যাচ্ছিল সমাজের নৈতিকতা আর মূল্যবোধের কম্পাস। ধর্ম, সমাজ, সংযমের বদলে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল ব্যক্তির সুখ, স্বাধীনতা আর চাওয়াপাওয়ার প্রশ্ন। সমকামী আন্দোলন ঐতিহাসিক এই সন্ধিক্ষণকে কাজে লাগিয়েছিল। তাদের কৃতিত্ব ছিল রূপান্তরের এ সন্ধিক্ষণকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারা এবং সময়ের স্পন্দন বুঝে যথাযথ কৌশল ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার মধ্যে। অনুকূলে হাওয়া বইছিল, সে বাতাসে পাল তুলে দিতে পেরেছিল তারা।

যৌন বিপ্লব এসে নৈতিকতার সব সীমানা টেনেহিঁচড়ে উপড়ে ফেললো। ব্যাভিচার, লাম্পট্য, বহুগামিতা, গর্ভপাতের হার বাড়লো। বাড়লো সমকামিতাকে সামাজিক ভাবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা। বিস্ফোরণ ঘটলো মাদক ব্যবহারে। স্যান ফ্রানসিসকো, নিউইয়র্ক, মায়ামির মতো শহরগুলো যেন নব্য বার্লিন হবার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করলো। বিকৃত যৌনতার আখড়ায় পরিণত হলো শহরগুলো।

পুরো সত্তরের দশক জুড়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চললো সমকামী আন্দোলনের বিজয়রথ। মনে হলো খুব দ্রুতই বুঝি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে আন্দোলন। কিন্তু ঠিক তখন, নিয়ন অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলো রহস্যময় এক ছায়া। বিপ্লব আর আন্দোলনের অবাধ স্বাধীনতার দেখানো পথে সহসা এসে হাজির হলো এক অভূতপূর্ব মহামারি—যার জন্ম, বিকাশ ও বিস্তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বিকৃত যৌনতার সাথে। দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো ভয়াল এক প্লেগ...

অধ্যায় ৫

প্লেগ

আবির্ভাব

সত্তরের দশকের শেষ দিকে বিচিত্র একটা প্যাটার্ন দেখতে পেলেন মার্কিন ডাক্তাররা। অদ্ভুত সব রোগ নিয়ে তাদের চেম্বারে হাজির হচ্ছে কিছু রোগী। তাদের রোগগুলো বিচিত্র এবং দুর্লভ। কাপোসি'স সারকোমা নামে বিরল জাতের ত্বকের ক্যানসার, এর আগে যা কেবল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পুরুষদের মধ্যে কালেভদ্রে দেখা যেত। নিউমোসিসটিস নিউমোনিয়া নামে নিউমোনিয়ার এমন এক সংস্করণ যাতে এর আগে আক্রান্ত হয়েছে কেবল আফ্রিকান শিশুরা। এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া আর পরজীবীর কারণে পেটের সমস্যা যেগুলো গবাদিপশুকে আক্রান্ত করে, মানুষকে না। এই রোগগুলোর যেকোনো একটা একসাথে কয়েকজন রোগীর হওয়াটাই বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু ডাক্তাররা দেখলেন রোগগুলো দেখা দিচ্ছে এক সাথে, জোট বেঁধে।

এছাড়া রোগীদের প্রায় সবার মধ্যে হালকা জ্বর, ক্রনিক ডায়রিয়া, রক্তস্বল্পতা, ঘুমের মধ্যে ঘামা, দ্রুত ও তীব্রভাবে ওজন কমা, হাতে পায়ে ফাঙ্গাসজনিত ইনফেকশন এবং লিম্ফ নোড ফুলে যাবার মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে।[১০০] কোনো ওষুধে কাজ হচ্ছে না। ইনফেকশন সারছে না, জ্বর কমছে না, থামছে না ডায়রিয়া। লাভ হচ্ছে না অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও। উলটো দিন দিন রোগীদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। রহস্যময় কোনো কারণে মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়েছে এই রোগীদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। অথচ এরা সবাই পুরুষ, বয়স ত্রিশের নিচে, এর আগে ইমিউন ডিসঅর্ডারে[১০১] ভোগার ইতিহাস নেই কারও।

ডাক্তাররা রীতিমতো হতভম্ব। কেন এমন হচ্ছে? পরস্পর সম্পর্কহীন বিরল এই রোগগুলো কেন ঝাঁক বেধে আক্রমণ করছে? আর কেনই বা কাজ হচ্ছে না কোনো ওষুধে? বোঝা গেল না কিছুই। তবে খুঁজতে খুঁজতে রোগীদের মধ্যে আরও কিছু মিল

---

[১০০] Lymph Node (লিম্ফ নোড) বা লসিকাগ্রন্থি। লিম্ফ নোডগুলি মানবদেহের লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের (লসিকাতন্ত্রের) অংশ। লিম্ফনোডগুলো সারা শরীর জুড়ে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে থাকে। যখন শরীরে সংক্রমণ বা টিউমার হয়, তখন লিম্ফ নোডগুলি ফুলে যায়।

[১০১] শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিকঠাকভাবে কাজ না করা।

পেলেন ডাক্তাররা। রোগীদের সবাই—

- সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত পুরুষ
- তারা নিয়মিত বহু, বহু লোকের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, এবং
- তারা বিভিন্ন বিকৃত ও চরম যৌন আচরণে অভ্যস্ত

অল্প কিছু দিন পর আরও একটা মিল পাওয়া গেল। রোগীরা সবাই মারা যাচ্ছে। আর তারপর... ব্যাপারটা ছড়াতে শুরু করলো।

প্রথম দিকে এ ধরনের রোগীদের দেখা যাচ্ছিল নিউইয়র্ক আর লস অ্যাঞ্জেলিসে। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যে মায়ামি, স্যান ফ্রানসিসকো, হিউস্টন, বোস্টন এবং ওয়াশিংটনেও বাড়তে লাগলো রোগীদের আনাগোনা। এই প্রতিটা শহর ছিল সমকামিতার প্রতি উদার মনোভাবের জন্য 'বিখ্যাত'। বুনো বার্লিনের একেকটা আধুনিক প্রতিচ্ছবি।

ডাক্তার এবং গবেষকরা বুঝতে পারলেন, বিচিত্র এই অসুখগুলো আসলে নতুন কোনো এক রোগের উপসর্গ। এমন এক ব্যাধি, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুরোপুরি ধসিয়ে দেয়। রহস্যময় এই ব্যাধি সংক্রামক। তীব্র গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ছে সমকামী পুরুষের মধ্যে। ১৯৮১ সালে অ্যামেরিকার রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থার (সিডিসি) এক প্রতিবেদনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো, 'সমকামী পুরুষদের মধ্যে রহস্যজনক এক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে'। ১৯৮৩ নাগাদ এ রোগে আক্রান্ত হবে স্যান ফ্রানসিসকোর প্রায় অর্ধেক সমকামী পুরুষ।[১০২] রোগ ধরা পরার এক বছরের মধ্যে মারা যাবে এদের কমপক্ষে ৪০%।

ডাক্তাররা এ রোগের নাম দিলেন গে রিলেটেড ইমিউন ডেফিশিয়েন্সি, সংক্ষেপে গ্রিড (GRID)। লম্বা এ নামটার বাংলা দাঁড়ায় অনেকটা এরকম, 'সমকামী পুরুষ সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ ঘাটতি'। তবে পত্রপত্রিকার পাতায় এবং লোকমুখে জনপ্রিয় হয়ে উঠে আরেকটা নাম- *গে প্লেগ*, সমকামীদের মহামারি। পরে এই মরণব্যাধি বিশ্বজুড়ে কুখ্যাতি পাবে এইডস নামে।

বংশগতি

এইডসের উৎপত্তি কীভাবে হলো, এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনো জবাব পাওয়া যায়নি আজও। তবে এ নিয়ে আছে বিভিন্ন তত্ত্ব। একটা বিখ্যাত তত্ত্ব হলো এ রোগের শুরু আফ্রিকার এক জাতের বানরের মধ্যে। কোনো একভাবে বানর থেকে এসআইভি বা সিমিয়ান ইমিওনো ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে আফ্রিকার মানুষদের দেহে। ব্যাপারটা ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। এখন যে জায়গাটাকে কঙ্গো বলা হয়, সেখানে।

---

[১০২] AIDS Oral History Project, The AIDS Epidemic in San Francisco: The Medical Response, 1981-1984, AIDS Demographics, http://tinyurl.com/m2t97dm5

মানুষের শরীরে ঢুকে এই ভাইরাস পরিণত হয়েছে এইচআইভি বা হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাসে। তারপর একসময় পৌঁছে গেছে পশ্চিমা বিশ্বে। বর্তমানে এটাই এইডসের উৎপত্তির ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্ব।

তবে এ তত্ত্বকে অনেকে, বিশেষ করে অ্যাফ্রিকান বিশেষজ্ঞরা, বর্ণবাদী বলেছেন। তাদের চোখে এই তত্ত্ব পশ্চিমাদের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই না। ভাবখানা এমন যে, বানর আর আফ্রিকার কালো মানুষদের মধ্যে পার্থক্য তো খুব একটা বেশি না, তাই বানরের অসুখ তাদের মধ্যে এসেছে! আফ্রিকান বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তোলেন, হাজার হাজার বছর ধরে আফ্রিকার মানুষরা এই বানরদের আশেপাশে থেকেছে। বিংশ শতাব্দীতেই কেন 'বানরের ভাইরাস' মানুষের শরীরে এসে এইচআইভি-তে পরিণত হলো? আর শতাব্দীর শুরুতেই যদি এ রোগের জন্ম হয়ে থাকে তাহলে কেন প্রায় ৭০ বছর পর মহামারি দেখা দিলো? তাও আবার পশ্চিমে? আফ্রিকানদের অনেক শতাব্দী ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়াআসা, সেখানে কেন কিছু হলো না? পশ্চিমারা বলার আগে অ্যাফ্রিকানরা কেন এ রোগের ব্যাপারে জানতো না কিছুই? প্রশ্নগুলো তুলেছেন আরও অনেকে।[১০৩]

আরেক তত্ত্ব অনুযায়ী, এই ভাইরাস বানরের কাছ থেকেই এসেছে তবে দোষটা আফ্রিকানদের না, পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গদের। পঞ্চাশের দশকে পোলিও ভ্যাকসিন তৈরিতে শিম্পাঞ্জিদের শরীর থেকে নেওয়া টিস্যু ব্যবহার করা হয়েছিল। কোনো এক পর্যায়ে শিপাঞ্জির শরীরে থাকা ভাইরাস চলে আসে ভ্যাকসিনের মধ্যে। মধ্য আফ্রিকায় যখন ব্যাপকভাবে এ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, তখন মানুষের শরীরে ঢুকে সেই ভাইরাস পরিণত হয় এইচআইভি-তে। পার্থক্য থাকলেও, এ দু' তত্ত্বের মধ্যে মিল আছে একটা। দুটোই মনে করে এইডসের প্রধান কারণ এইচআইভি। আর এ ভাইরাসের উৎপত্তি বানরের মধ্যে।

তৃতীয় আরেক তত্ত্ব বলে, এইচআইভি এইডসের পেছনে একমাত্র কারণ না। এইচআইভি একটা কো-ফ্যাক্টর। অর্থাৎ শুধু এইচআইভি থাকলেই এইডস হবে না। এইডস হতে হলে উপস্থিত থাকতে হবে আরও বেশ কিছু উপাদান। অবাধ যৌনতা, তীব্র বহুগামিতা, মাদক ও ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার, উশৃঙ্খল জীবনযাপন, কিংবা অন্য কোনো কারণে যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মক রকমের দুর্বল হয়ে গেছে, কেবল তাদের শরীরেই মরণব্যাধি এইডস তৈরি করতে পারে এইচআইভি।

---

[১০৩] Harrison-Chirimuuta, Rosalind J., and Richard C. Chirimuuta. "AIDS From Africa: A Case Of Racism Vs. Science?" In AIDS in Africa and the Caribbean, pp. 165-180. Routledge, 2019. Sabatier, Renee, and Jon Tinker. "Blaming Others: Prejudice, Race And Worldwide AIDS." In Blaming Others: Prejudice, Race And Worldwide AIDS, pp. vii-168. 1988. Harrison-Chirimuuta, Rosalind J. "AIDS from Africa: Western Science Or Racist Mythology?", In Western Medicine As Contested Knowledge, pp. 46-68. Manchester University Press, 2017.

এ কারণেই এ রোগের প্রথম ব্যাপক সংক্রমণ ধরা পড়েছে অ্যামেরিকার সমকামী পুরুষদের মধ্যে, আফ্রিকায় না। বিকৃত জীবনযাত্রা আর যৌনবাহিত নানা রোগের প্রভাবে মার্কিন সমকামীদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে তাদের দেহে বাসা বেঁধেছে এইডস।[১০৪]

এসব তত্ত্বের মধ্যে কোনটা সঠিক হবার সম্ভাবনা বেশি, তা নিয়ে আলোচনায় যাবো না আমরা। তবে এইডসের উৎস যাই হোক না কেন, এ রোগের বিস্ফোরণ ঘটেছিল অ্যামেরিকার সমকামী পুরুষদের মধ্যে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরে ব্লাড ট্রান্সফিউশান[১০৫], ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহার, এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হওয়া পুরুষদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ রোগ ছড়াতে শুরু করে। এইডস ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ছিল মার্কিন সমকামী পুরুষদের যৌন আচরণ ও জীবনযাত্রা। এইডসের ইতিহাস নিয়ে অ্যাকাডেমিক আলোচনায় বারবার এ বাস্তবতা উঠে এসেছে।

মির্কো গেরমেক ছিলেন একাধারে ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদ। আধুনিক সময়ে চিকিৎসার ইতিহাস নামক শাস্ত্র প্রতিষ্ঠায় যারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, ভদ্রলোককে তাদের অন্যতম মনে করা হয়। ফরাসি এ গবেষকের বিখ্যাত বই, 'এইডসের ইতিহাস'। নানা পুরস্কার পাওয়া এ বইতে গেরমেক লিখেছেন,

> সত্তরের দশকে ক্লাব, বার, ডিস্কো, বাথহাউস, সেক্সশপ, ট্রাভেল এজেন্সি এবং সমকামী ম্যাগাজিনের অস্বাভাবিক রকমের বিস্তার ঘটে। এর সুবাদে সমকামীরা এমন সব বৈচিত্র্যময় যৌন আচরণে লিপ্ত হবার সুযোগ পায়, যেগুলোর সাথে আগেকার সময়ের কার্যকলাপের কোনো তুলনা চলে না।[১০৬]

গেরমেক যে কথাটা রেখে-ঢেকে বলেছেন, সেটাই আরও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে সমকামী অ্যাকটিভিস্ট জেফরি উইকসের কলমে। তিনি লিখেছেন,

> অনেক আগে থেকেই বহুগামিতাকে সমকামী পুরুষদের বৈশিষ্ট্য মনে করা হতো। তবে সত্তরের দশকে এর মাত্রা এক লাফে অনেকদূর বেড়ে যায়। এর কারণ হলো অ্যামেরিকার সব বড় বড় শহরে এসময় বাথহাউস এবং ব্যাক-রুম বারের মতো প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠে। এসব স্থাপনার মূল উদ্দেশ্যই

[১০৪] Sonnabend, Joseph A., Steven S. Witkin, and David T. Purtilo. "A multifactorial model for the development of AIDS in homosexual men." Annals of the New York Academy of Sciences 437 (1984): 177-183. Root-Bernstein, R. S. "Non-HIV immunosuppressive factors in AIDS: a multifactorial, synergistic theory of AIDS aetiology." Research in Immunology 141, no. 8 (1990): 815-838. Root-Bernstein, Robert S. "Five myths about AIDS that have misdirected research and treatment." Genetica 95 (1995): 111-132.

[১০৫] Blood Transfusion, রক্ত সঞ্চারণ। অসুস্থ রোগীকে রক্ত দেওয়া।

[১০৬] Grmek, Mirko D. History of AIDS: Emergence and origin of a modern pandemic. Princeton University Press, 1990. p. 168-169.

> ছিল অপরিচিত সমকামী পুরুষদের অবাধ যৌনতায় লিপ্ত হবার সুযোগ করে দেওয়া। অ্যামেরিকা থেকে এগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে অন্যান্য জায়গাতেও—টরেন্টো থেকে প্যারিস, আমস্টার্ডাম থেকে সিডনি...।[১০৭]

প্লেগ ও বিপ্লব

যৌন বিপ্লব আর সমকামী আন্দোলনের প্রভাবে 'উদার' হচ্ছিল সমাজ। উদারতার সুবাদে নিয়মিত বহু অপরিচিত লোকের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হবার সুযোগ পাচ্ছিল সমকামীরা। এর প্রভাবও পড়ছিল। সত্তরের দশকের শুরু থেকেই সমকামী পুরুষদের মধ্যে জ্যামিতিক হারে বাড়ছিল সিফিলিস, ক্ল্যামিডিয়া আর গনোরিয়ার মতো যৌনতাবাহিত রোগ। সমকামী পুরুষদের মধ্যে অনেকটা মহামারি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল হেপাটাইটিস বি। এসব রোগ বাড়ার পেছনে যৌনসঙ্গীর সংখ্যা একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে বড় প্রভাব ছিল সমকামীদের বিকৃত যৌনতারও। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এইডস গবেষক, প্রফেসর রবার্ট রুট-বার্নস্টেইন তার বিখ্যাত বই 'রিথিংকিং এইডস'-এ লিখেছেন,

> সমকামী আন্দোলনের সফলতার পর সমকামীদের মধ্যে বহুগামিতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। পরিবর্তন আসে তাদের যৌন আচরণেও। এসব আচরণের ফলে সমকামীদের মধ্যে মলদ্বারের যখম, মাদকের ব্যবহার, বিভিন্ন ভাইরাস, ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবীজনিত সংক্রমণ আগেকার দশকগুলোর তুলনায় অনেকগুণে বেড়ে যায়।[১০৮]

'যৌন আচরণের পরিবর্তন'গুলো ঠিক কী ধরনের এবং সেগুলোর প্রভাব কেমন ছিল তার একটা উদাহরণ দিই। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে ক্রমাগত বিভিন্ন পেটের সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছিল সমকামীরা। ক্রনিক সমস্যা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেট ব্যাথা, ডায়রিয়া চলতেই থাকতো তাদের। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল না। কেন?

এ রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে ডাক্তাররা দেখলেন পেটের এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, যখন মানব-বর্জ্যের মধ্যে থাকা কিছু পরজীবী বা প্যারাসাইট মানুষের মুখে চলে যায়। বুঝতেই পারছেন, ন্যূনতম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা হলে আধুনিক সময়ে ছোট্ট শিশু ছাড়া সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা প্রায় হয় না বললেই চলে। কিন্তু সমকামীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। তারা এমন সব বিকৃত কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত, যেগুলোর কারণে মোটামুটি নিয়মিতভাবে তাদের মুখে মানুষের বিষ্ঠা পৌঁছে যায়। কোন ধরনের আচরণের ফলে এবং কীভাবে তা হয়, ব্যাখ্যা করলাম না।

---

[১০৭] Weeks, Jeffrey. Sexuality and its discontents: Meanings, myths, and modern sexualities. Routledge and Kegan Paul, London, 1988. p. 47-48.

[১০৮] Rethinking AIDS: The Tragic Cost of Premature Consensus. (The Free Press. New York, 1993) pp. 290-291.

স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় সমকামীদের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বহুগুণে বেশি ছিল এবং এখনো আছে। এটাই নিরেট বাস্তবতা। তাই ঠিক যে সময়টাতে পশ্চিমা বিশ্ব বিকৃত যৌনতাকে মেনে নিতে শুরু করলো, সেই সত্তরের দশকের শুরু থেকেই বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো সমকামীদের মধ্যে। বিকৃত জীবনযাত্রা সমকামীদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল করে ফেলেছিল। তাদের শরীরগুলো পরিণত হয়েছিল হরেক রকমের জীবাণু আর অসুখের আতুরঘরে। বিষয়টি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন নোবেল বিজয়ী মার্কিন বায়োকেমিস্ট ক্যারি মুলিস। তিনি লিখেছেন,

> উটের পিঠে অতিরিক্ত বোঝা চাপালে সে পড়ে যায়। সত্তরের দশকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বহুগামী পুরুষ একে অপরের সাথে শারীরিক সম্পর্ক লিপ্ত হচ্ছিল। বিভিন্ন মাদক ব্যবহার করছিল। তাদের জীবনযাত্রা ছিল উশৃঙ্খল। মানুষের দেহে বাসা বাঁধতে পারে এমন প্রায় সব সংক্রামক জীবাণুর সংস্পর্শে আসার ভালো রকমের সম্ভাবনা ছিল একজন শহুরে সমকামী পুরুষের... দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লড়াই করবে। কিন্তু এক সময় নিরেট সংখ্যার বিচারেই সে পরাজিত হবে, ভেঙ্গে পড়বে। একজন সমকামী পুরুষ যদি বছরে তিনশো জনের সাথে যৌন সম্পর্ক করে এবং এই তিনশো জনের প্রত্যেকে যদি বছরে আরও তিনশো জনের সাথে যৌন সম্পর্ক করে, তাহলে তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নব্বই হাজার গুণ বেড়ে যায়।[১০৯]

আর অবাধ এ বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘনের হাত ধরেই আসে এইডস মহামারি। সমকামী লেখক ও চিত্রনির্মাতা গ্যাব্রিয়েল রোটেলোর ভাষায়,

> এইচআইভি সংক্রমণ বৃদ্ধির পেছনে প্রধান কারণ ছিল একাধিক সঙ্গীর সাথে পায়ুসঙ্গম... সমকামী পুরুষদের অনেকে বছরে কয়েক ডজন, এমনকি শত শত সঙ্গীর সাথে পায়ুসঙ্গমে লিপ্ত হতো। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। একের-পর-এক যৌনতাবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়া, বারবার অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য ওষুধের ব্যবহার, মাদক ব্যবহার এবং অন্যান্য আচরণজনিত সমস্যার কারণে সমকামীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সামষ্টিকভাবে কমে গিয়েছিল।[১১০]

বছরে তিনশো জন যৌনসঙ্গীর ব্যাপারটা পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে। কিন্তু সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা আসলে অস্বাভাবিক না। একজন সমকামী এইডস রোগীর জীবনযাত্রার ব্যাপারে অল্প কিছুটা ধারণা নেওয়া যাক। মাইকেল ক্যালেন ছিল একজন সমকামী অ্যাকটিভিস্ট এবং প্রথমদিককার এইডস রোগী।

---

[১০৯] Mullis, Kary. Dancing naked in the mind field. Vintage, 1998. p. 182

[১১০] In Gillis, J. Roy. "Sexual Ecology: AIDS, and the Destiny of Gay Men." The Canadian Journal of Human Sexuality 6, no. 4 (1997): 335-338.

তার জীবনযাত্রার বর্ণনা দেখুন,

> আমার হিসাবে আনুমানিক ৩০০০ লোক আমার সাথে পায়ুসঙ্গম করেছে... সপ্তাহে কমপক্ষে এক বার আমি বাথহাউসে যেতাম, কখনো কখনো দু'বার। প্রতিবার কমপক্ষে চার জনের সাথে সেক্স করতাম... পরিচিত একটা বইয়ের দোকান ছিল, সেটার পেছনের রুমে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিন জনের সাথে সেক্স করতাম। এভাবে কেটেছে পাঁচ বছর। এছাড়া অন্যান্য পার্টি আর গণযৌনতা তো ছিলই...
>
> আমার বয়স যখন সাতাশ, ততদিনে আমার—গনোরিয়া, সিফিলিস, হেপাটাইটিস এ ও বি, হেপাটাইটিস নন-এ, হেপাটাইটিস নন-বি'র মতো বিভিন্ন রোগ হয়ে গিয়েছে। সেই সাথে ছিল বিভিন্ন পরজীবী সংক্রমন যেমন অ্যামেবায়েসিস, জিয়ারডিয়া, শিগেলা, ই. হিস্টোলিটিকা, হারপিস সিমপ্লেক্স টাইপ ১ ও ২। আরও ছিল যৌনাঙ্গের ফোঁড়া, আচিল, মনোনিউক্লিউসিস, সাইটোমেগালোভাইরাস আর সবশেষে ক্রিপ্টোস্পোরিডিওসিস[১১১]।[১১২]

কী ধরনের মনস্তত্ত্ব, কোন ধরনের তাড়না থেকে মানুষ এমন বিকৃত জীবনযাপনে আকৃষ্ট হতে পারে, তার একটা আভাস পাওয়া যায় গ্যাব্রিয়েল রোটেলোর নিচের কথাগুলো থেকে,

> (এসময়) বহু সঙ্গীর সাথে পায়ুসঙ্গমকে উৎসাহিত করা হতো। এটা স্বাধীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রীতিমতো উদযাপিত হতো... কে কোন কোন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তা গর্বের সাথে ঘোষণা করতো সমকামীরা... এগুলো একজন স্বাধীন সমকামী হবার প্রতীক হয়ে উঠেছিল... এই 'স্বাধীনতা' ছিল (এইচআইভি) ভাইরাসটার জন্য লাল গালিচা বিছানো রাজপথের মতো।[১১৩]

সমকামীদের কাছে পায়ুসঙ্গম ছিল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড! বিকৃতির অর্থ ছিল স্বাধীনতা! ষাটের দশক জুড়ে প্রচারিত স্বাধীনতা আর অধিকারের বুলির ফলাফল ছিল এমনই।

এইডস যে যৌন বিপ্লব আর সমকামী আন্দোলনের ফসল, এ বাস্তবতার সোজাসাপ্টা স্বীকারোক্তি ফুটে উঠেছে লেসবিয়ান নারী এবং অ্যাকাডেমিক ক্যামিল পা'লিয়ার কথায়। তিনি বলছেন,

> স্টোনওয়াল থেকে এইডসের দূরত্ব ছিল মাত্র ১২ বছরের। এইডস শুন্য

---

[১১১] পরজীবী এবং ভাইরাসজনিত বিভিন্ন যৌনতাবাহিত রোগ। সাধারণত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

[১১২] Berkowitz, Richard. Stayin'alive: the invention of safe sex; a personal history. Westview, 2003.

[১১৩] Gillis. Sexual Ecology. p. 89.

থেকে উদয় হয়নি। এটি ছিল যৌন বিপ্লবের সরাসরি ফলাফল... যদিও এ নিয়ে অনেক প্রোপাগ্যান্ডা হয়েছে, কিন্তু (বাস্তবতা হলো) পশ্চিমা বিশ্বে এইডস সমকামী পুরুষদের রোগ, অদূর ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।[১১৪]

পা'লিয়া ভুল বলেননি। তার বক্তব্যের তিন দশক এবং এইডস মহামারির সূচনার চার দশক পর, আজও এইডস প্রধানত সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের রোগ।

তার মানে এই না যে, অন্যদের এইডস হয় না। হয়। যেমনটা আমরা আগেই বলেছি ব্লাড ট্রান্সফিউশান, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকের ব্যবহার এবং উভকামী পুরুষদের মাধ্যমে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেও এইডস ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যে ধরনের ব্যাপক ও তীব্র যৌন বিকৃতি থেকে এইডস মহামারির সূচনা, স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় সমকামী পুরুষের এইডস আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ১৯ গুণ বেশি।[১১৫] অ্যামেরিকার সবচেয়ে সমকামবান্ধব শহরের অন্যতম লস অ্যাঞ্জেলিসের জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে প্রতি ৪টা এইআইভি কেইসের মধ্যে তিনটাই সরাসরি সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষের সাথে যুক্ত। এমন পুরুষরা এ শহরের জনসংখ্যার মাত্র ৭%, কিন্তু এইডস আক্রান্তদের ৭৫%।[১১৬] এটা ২০০৬ সালের কথা, বর্তমান পরিসংখ্যান থেকে খুব একটা আলাদা চিত্র পাওয়া যায় না। ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী অ্যামেরিকাতে প্রতি বছর যত এইচআইভি পসিটিভ রোগী ধরা পড়ে, তার মধ্যে কমপক্ষে ৭০% হলো সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত পুরুষ।[১১৭] গত চল্লিশ বছরে অ্যামেরিকাতে যত মানুষ এইডসে মারা গেছে, তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত।[১১৮] এ বাস্তবতা সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরাও জানে ও বোঝে। মার্কিন সমকামী অ্যাকটিভিস্ট ম্যাট ফোরম্যান ২০০৮-এর এক বক্তব্যে বলে,

বন্ধুরা, দেশের এইডস আক্রান্ত মানুষদের ৭০% হয় সমকামী অথবা উভকামী পুরুষ। এইডস সমকামী পুরুষদের রোগ, এ সত্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের এটা মেনে নিতে হবে এবং বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে।[১১৯]

---

[১১৪] Paglia, Camille. Vamps & tramps: New essays. Vintage, 1994. p. 68.

[১১৫] UNAIDS, Gap Report 2014. http://tinyurl.com/429ukey8

[১১৬] "HIV is a gay disease. Own It. End It". Pinknews.com, Oct 02, 2006

[১১৭] Centers for Disease Control and Prevention, HIV and Gay and Bisexual Men: HIV Incidence. http://tinyurl.com/vajy8k5z
HIV.gov, U.S. Statistics (2023). http://tinyurl.com/46kb8z68

[১১৮] Centers for Disease Control and Prevention. "HIV surveillance reports." Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (2010).

[১১৯] Top "Gay" Organization Comes Clean: "HIV is a gay disease." LifeSiteNews.com, February 14, 2008

আগুনের আলো নিলে জ্বালাও নিতে হয়। যৌন বিপ্লব আর সমকামী আন্দোলন স্বাধীনতার নামে যে দানবীয় শক্তিকে লেলিয়ে দিয়েছিল সমাজে, এইডস মহামারি তারই ফসল। এইডস হলো উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসি আর হ্যারি হেইদের স্বপ্নের যৌক্তিক উপসংহার। মির্কো গেরমেকের ভাষায়—

> 'মার্কিন সমকামীরাই ঐ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, যা চূড়ান্ত এক প্রান্তসীমা অতিক্রম করার মাধ্যমে এইডস মহামারিকে সম্ভব করে তুলেছিল।'[১২০]

বাঁধভাঙ্গা বিকৃতি

সমকামীরা আসলে কেমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, যার কারণে মহামারি হলো? এইডসের জন্য সমকামীদের দোষী সাব্যস্ত করা কি আসলেই ঠিক? না কি ব্যাপারটা ভিকটিম ব্লেইমিং?

প্রশ্নগুলো অনেকের মাথায়ই আসতে পারে। উত্তর পেতে হলে এ ধরনের লোকেদের জীবনযাত্রার ব্যাপারে স্পষ্ট একটা ধারণা পেতে হবে আমাদের। অনেকেই মনে করেন, স্বাভাবিক মানুষ যৌনতাকে যেভাবে দেখে, সমকামীরাও সেভাবেই দেখে। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, তারা আকর্ষণবোধ করে সমলিঙ্গের প্রতি। এ ধারণা ভুল। একেবারেই ভুল।

সমকামীদের বিকৃত জীবনযাত্রা স্বাভাবিক মানুষের চোখের আড়ালে থাকে। এ সুযোগে সুচারু প্রোপাগ্যান্ডা চালিয়ে সমকামীদের আর দশজন মানুষের মতো করে উপস্থাপন করে মিডিয়া। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সমকামীদের যৌন জগৎ এবং এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই কদর্য, একজন স্বাভাবিক মানুষ যা কল্পনা করতেও হিমশিম খেয়ে যাবে। তাদের এ ক্লেদাক্ত, পূতিগন্ধময় জীবনের বাস্তবতা না বুঝলে এইডস মহামারির পেছনে সমকামী আন্দোলন আর যৌন বিপ্লবের 'অবদান' ঠিক কতটুকু, তা পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হবে না। তাই পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিকৃত এ জগতের আরও কিছু বাস্তবতা তুলে ধরছি।

এইডস ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সমকামীদের জীবনযাত্রা কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল, তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো বাথহাউস। বাথহাউসগুলো ছিল এইডস সংক্রমণের প্রধান কেন্দ্র। শব্দটা অনেকের কাছে অপরিচিত ঠেকতে পারে, তাই সহজে বলি। আমাদের দেশে যেমন পাবলিক টয়লেট আছে, তেমনি অনেক পশ্চিমা দেশে পাবলিক গোসলখানা বা স্নানাগার আছে। এগুলোকেই বাথহাউস বলে। বাথহাউসগুলোতে এক সাথে অনেক মানুষ গোসল করার জন্য বড় বড় চৌবাচ্চা থাকে, আলাদা শাওয়ার থাকে, আবার সুযোগ থাকে প্রাইভেট রুম ভাড়া নেওয়ার।

সত্তরের দশকে মার্কিন সমকামী পুরুষদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা ছিল এই

---

[১২০] Grmek. History of AIDS, 1990. p. 168

বাথহাউসগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের ভেতরে নিয়ন আলো-আঁধারিতে অবিশ্বাস্য সব বিকৃতিতে মেতে উঠতো তারা। এইডস মহামারির একদম প্রথম বছরগুলো থেকে রোগীদের নিয়ে কাজ করা ডাক্তার জন যিগলার বাথহাউসগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> আমি বেশ কিছু রোগীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাদের অনেকেই নিজেদের যৌন জীবন নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলেছিল। তারা কী করত... বাথহাউসে গিয়ে দশ থেকে বিশজনের সাথে সেক্স করত... বহু সঙ্গীর সাথে বিভিন্ন অস্বাভাবিক যৌন আচরণ চলত, প্রায় সব ধরনের শারীরিক তরলের আদানপ্রদান হতো বহু লোকের মধ্যে, বারবার... কেউ কাউকে চেনে না, সব কিছু অন্ধকারে হতো।[১২১]

বাথহাউসগুলো ছিল অবাধ ও বিকৃত যৌনতার আখড়া। প্রাইভেট রুমগুলোতে অল্প কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে অনেকের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতো সমকামীরা। মানুষের ভিড়, অস্পষ্ট নিয়ন আলো, আর মাদকের উত্তেজনায় একে অপরের চেহারা দেখারও সুযোগ হতো না। তাদের অন্ধকার অবয়বের সাথে লেপ্টে থাকতো এইডসের গাঢ় ছায়া। শুরুর দিককার এইডস রোগীদের নিয়ে কাজ করা আরেকজন ডাক্তার, সেলমা ড্রিটযের বক্তব্য থেকে বাথহাউসগুলোর ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

> এইডস সংক্রমণের এক নাম্বার কেন্দ্র ছিল বাথহাউসগুলো... ওখানে আলাদা (প্রাইভেট) রুম থাকতো। এগুলোকে ওরা বলতো 'অরজি রুম'। রুমগুলোতে আলো প্রায় নেই বললেই চলে, একেকটা রুমে দশ, পনেরো, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ জন পর্যন্ত নগ্ন পুরুষ নাচানাচি করতো এবং এখানে অন্য সবকিছুও হতো। এ কারণেই অনেক সমকামী পুরুষ (রোগী) আমাদের কাছে এসে বলতো, 'কার কাছ থেকে এটা (ভাইরাস) আমার শরীরে এসেছে, আমি জানি না। আমি তার চেহারা দেখিনি।'[১২২]

স্বাধীনতার গল্প

যেকোনো ছোঁয়াচে রোগের বেলায় নিয়ম হলো আক্রান্তদের কাছ থেকে রোগ যেন অন্যদের মধ্যে না ছড়ায়, সে ব্যবস্থা নেওয়া। এজন্যই কোনো শিশুর হাম কিংবা চিকেন পক্স হলে তাকে স্কুলে পাঠাতে বারণ করা হয়। সে স্কুলে গেলে তার সংস্পর্শে

---

[১২১] The AIDS Epidemic in San Francisco: The Medical Response, 1981-1984, Vol. IV, John L. Ziegler, AIDS in the Gay Community. http://tinyurl.com/3m5zp2y3

[১২২] AIDS Oral History Project, The AIDS Epidemic in San Francisco: The Medical Response, 1981-1984, Vol. I, Selma K. Dritz, The Aids Epidemic, The Medical Advisory Committee on AIDS, San Francisco Department of Public Health, The Bathhouses. http://tinyurl.com/uwptvjaj

এসে অন্য শিশুরাও আক্রান্ত হবে, আর রোগ প্রায় জ্যামিতিক হারে ছড়াতে থাকবে। এইডস সংক্রমণ থামানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সমকামী পুরুষদের অসুস্থ ও অবাধ যৌনতা থামানো। বাথহাউসগুলো বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু তা করা গেল না। বাধ সাধলো 'স্বাধীনতা'।

সমকামীদের যখন যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হলো, তারা রীতিমতো ফুঁসে উঠলো। এটাকে তারা দেখলো 'স্বাধীনতার ওপর আঘাত' আর 'অধিকার লঙ্ঘন' হিসেবে। এসব সমকামীদের কাছে বিকৃত আচরণে মেতে ওঠা, রাতের পর রাত কয়েক হালি অজানা লোকের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া আর একের-পর-এক যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়া ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশ। 'পবিত্র' অধিকার। এ স্বাধীনতা তারা ছাড়তে রাজি না। সমকামীদের এই মনস্তত্ত্বের একটা খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় সমকামী পুরুষ নার্স, স্টিফেন কারের স্মৃতিচারণ থেকে। সে বলছে,

> আমার মনে আছে, ১৯৭৯ সালে সমকামীদের মধ্যে যৌনতাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে শিকাগোতে একটা জাতীয় কনফারেন্স হয়েছিল। কিং হৌমস নামে সিয়াটলের একজন ডাক্তার সেই কনফারেন্সে বলেছিলেন, 'যেসব সমকামী পুরুষ অনেক বেশি যৌনতায় লিপ্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে'। (এ কথার জন্যে) আমরা তখন তাকে 'সমকামবিদ্বেষী'-সহ নানা কিছু ডেকেছিলাম।[১২৩]

সতর্ক হওয়া দূরে থাক, যারা সাহায্য করার চেষ্টা করছিল উলটো তাদেরকেই দোষারোপ করছিল সমকামীরা। এমনকি বিপদের মাত্রা আঁচ করতে পেরে যেসব সমকামী অ্যাকটিভিস্ট সংযম আর সতর্ক হবার কথা বলেছিল তাদেরকেও শুনতে হয়েছিল গালিগালাজ, শিকার হতে হয়েছিল ব্যক্তি আক্রমণের। এইডস মহামারির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রগুলোর একটা; স্যান ফ্রানসিসকোতে নগর কর্তৃপক্ষ যখন ডাক্তারদের পরামর্শে বাথহাউসগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিলো, সমকামীরা তখন উদোম গায়ে ছোট্ট টাওয়াল প্যাচিয়ে হাজির হয়ে গেল পিকেটিং আর বিক্ষোভ করতে। নগর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে তারা তুলনা করলো নাৎসিদের গ্যাস চেম্বারের সাথে! [১২৪]

বিকৃত যৌনতার কারণে সমকামীরা মারা যাচ্ছিল, কিন্তু এ সত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না তারা। তাদের চোখে ডাক্তারদের পরামর্শ ছিল 'ভিকটিম ব্লেইমিং', গবেষকদের সতর্কতাবাণী ছিল 'সমকামবিদ্বেষ'। যেন পুরো সমাজ দোষী, সবাই

---

[১২৩] AIDS Oral History Project, Phase 2, Vol. II, Gary Stephen Carr, Pre 1981 Cases. http://tinyurl.com/yc3cxtw9

[১২৪] AIDS Oral History Project. The AIDS Epidemic in San Francisco: The Medical Response, Selma K. Dritz, http://tinyurl.com/muz24ua2

তাদের বিরোধী, কেবল তারাই বঞ্চিত, নির্দোষ আর পরিস্থিতির শিকার। বাস্তবে এই বিকৃতি, অসুস্থতা আর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল তারা নিজেরাই।

আত্মরতি

এইডস মহামারির ইতিহাসের দিকে তাকালে সমকামী জীবনযাত্রার আরেকটা ভয়ঙ্কর দিক আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। সমকামীরা প্রচণ্ড রকমের আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে ছাড়া অন্য সবার ও সবকিছুর প্রতি গভীর উপেক্ষা আর বেপরোয়া মনোভাব কাজ করে তাদের মধ্যে। ডাক্তার, গবেষক এবং অ্যাকটিভিস্টদের আলোচনায় এ বাস্তবতার প্রমাণ উঠে এসেছে বারবার। এইডস হয়েছে, এ রোগের চিকিৎসা নেই, তাদের মাধ্যমে অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে—এসব কথা জানার পরও সমকামীরা আগের মতোই বিকৃত যৌনাচার চালিয়ে গেছে। ভয়াবহ বিপর্যয় টেনে এনেছে কেবল মার্কিন সমাজ না, বরং পুরো মানবজাতির ওপর। শুধু তাই না, অবিশ্বাস্য মনে হলেও সমকামীদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের মধ্যে এইডস ছড়িয়েছে।

এই বিচিত্র মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সম্ভবত গ্যাইটেন ডুগাস। এ অধ্যায়ে এতক্ষণ আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, তার প্রায় সবকিছুর প্রতিফলন পাওয়া যায় ডুগাসের জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে। এয়ার হোস্টেস হওয়ার সুবাদে কানাডিয়ান এই যুবকের যাতায়াত ছিল নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জিলিস, স্যান ফ্রানসিসকো, ভ্যাংকুভার, টরেন্টোসহ বিভিন্ন শহরে। এসব শহরের বাথহাউসগুলোতে নিয়মিত তাকে দেখা যেত। ডাক্তারদের কাছে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা শুরু করে ডুগাস। দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে আনুমানিক ২৫০০ পুরুষের সাথে সে যৌন সম্পর্ক করে।[১২২]

তারপর তার এইডস ধরা পড়ে এবং সে একাই এইডস সংক্রমণের একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়। অ্যামেরিকার প্রথম ২৬০ জন এইডস রোগীর মধ্যে কমপক্ষে ৪০ জনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল গ্যাইটেন ডুগাসের। এই চল্লিশ জনের সবাই ডুগাসের সাথে অথবা তার কোনো যৌনসঙ্গীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছিল। ডাক্তাররা যখন তাকে সাবধান করে, তখন তার প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর। গ্যাইটান ডুগাসের সাথে ড. সেলমা ড্রিটযের কথোপকথনের অভিজ্ঞতা শোনা যাক। ড. ড্রিটয বলছেন,

> গ্যাইটেন ডুগাস আমার কাছে আসলো। আমি বললাম,
>
> দেখো, এই সবগুলো রোগী তোমার মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে, আমাদের

---

[১২২] Gladwell, Malcolm. The tipping point: How little things can make a big difference Little, Brown, 2006. p 21

কাছে প্রমাণ আছে। তোমার এইডস হয়েছে, এটা সংক্রামক অসুখ এবং তুমি এ রোগ ছড়াচ্ছ। তুমি এখন ব্যাপারটা জানো... এখন তোমার এসব বন্ধ করতে হবে...

ডুগাস : বোকার মতো কথা বলবেন না, এটা আমার জীবন; আমার যা ইচ্ছা আমি করবো।

আমি : কিন্তু তুমি অন্যদের মধ্যে এইডস ছড়াচ্ছো!

ডুগাস : আমার হয়েছে। তাদেরও হোক।

আমি : তোমার এসব বন্ধ করতে হবে...

ডুগাস : তুই **** খা!

তারপর সে চলে গেল। আমি তাকে এরপর আর দেখিনি।[১২৬]

পুরোপুরি আত্মমগ্ন যৌন উন্মাদ জন্তু ছাড়া আর কারও পক্ষে অন্যের জীবনের ব্যাপারে এমন নির্বিকার ও নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব না। বারবার সতর্ক করার পরও ডুগাস ডাক্তারদেরর কথা কানে তো তোলেইনি; বরং তাদের সামনেই সগর্বে ঘোষণা দিয়ে বলেছে,

চললাম আমি বাথহাউসে! এ নিয়ে আপনাদের কিচ্ছু করার নেই। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবার অধিকার আমার আছে।[১২৭]

অন্যান্য সমকামীদের মধ্যেও এ ধরনের অসুস্থ মনোভাব ছিল। এমন একটা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন ড. মারকাস কৌনান্ট,

আমার একজন রোগী ছিল, কমবয়সী পিএইচডি করা বিজ্ঞানী... তার এইডস হয়েছিল। একদিন সে আমার ক্লিনিকে বসে আছে, তাকে দেখে বেশ অধৈর্য মনে হচ্ছিল। আমি বললাম, দুঃখিত, একটু দেরি হয়ে গেল। আপনাকে অধৈর্য মনে হচ্ছে, কোনো সমস্যা?

রোগী : একটু তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয়, আমি বাথহাউসে যাবো...

আমি : দাঁড়ান, দাঁড়ান! আপনার পিএইচডি আছে। তার মানে কেউ না কেউ মনে করেছে আপনার মাথায় পর্যাপ্ত বুদ্ধি আছে। তাহলে আপনি কী মনে করে এখনো বাথহাউসে যাচ্ছেন?

রোগী : আমি এতে কোনো সমস্যা দেখি না। আমার ধারণা বাথহাউসেই আমি

---

[১২৬] AIDS Oral History Project. Selma K. Dritz, The Aids Epidemic, Gaetan Dugas and the Cluster Study, http://tinyurl.com/mptyvwsc

[১২৭] Ibid

(এইডস) আক্রান্ত হয়েছি। তাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমার এটা (এইডস) হয়েছে হোক, আমি সেক্স করে যাবো।

আমি : যাদের সাথে সেক্স করছেন তাদের কি জানাচ্ছেন যে, আপনার এইডস হয়েছে?

রোগী : না। আমার মতে এটার (এইডস) ব্যাপারে জানা, এই রোগ যে তাদের হতে পারে এটা বোঝার মতো বুদ্ধি তাদের থাকা উচিৎ। এটা যতটুকু আমার দায়িত্ব ততটুকু তাদেরও।[১২৮]

বিখ্যাত ব্রিটিশ রক ব্যান্ড কুইনের গায়ক ফ্রেডি মার্কারিও ছিল সমকামী। ১৯৯১ সালে সে এইডসে মারা যায়। আক্রান্ত হবার পর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, অসুখের কারণে সে তার আচরণ বদলেছে কি না। জবাবে ফ্রেডি মার্কারি বলেছিল,

'ফা* ইট! আমি সবার সাথে (এখনো) সবকিছু করছি, ডার্লিং!'[১২৯]

এমন ঘটনা অনেক। আশির দশক থেকে এইডস নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করা প্যাট্রিক ডিক্সন তার বই, 'দা ট্রুথ অ্যাবাউট এইডস'-এ নিচের উদাহরণগুলো এনেছেন,

- নিউইয়র্কে ঘুরতে গিয়ে অপরিচিত এক পুরুষের সাথে রাত কাটায় এক সমকামী। সকালে উঠে দেখে তার রুমের আয়নাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা : 'এইডস আক্রান্তদের দলে স্বাগতম!'
- লন্ডনের এক কিশোর পতিতাকে পুলিশ আটক করে। কারণ, সে রীতিমতো জেদ ধরে অন্যদের আক্রান্ত করছিল।
- ব্রিটেনের এক জরিপ অনুযায়ী এইডস আক্রান্ত হবার ব্যাপারে জানার পরও সমকামী রোগীদের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ অবাধ যৌনাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা ইচ্ছে করে অন্যদের আক্রান্ত করছিল।[১৩০]

মনে রাখবেন, এ ঘটনাগুলো এমন এক সময়ে ঘটছিল, যখন এইডস মহামারির বয়স দশ বছরের বেশি হয়ে গেছে। এ রোগের ভয়াবহতা নিয়ে ততদিনে কারও মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। না জানার, না বোঝার অজুহাত নেই। জেনেবুঝে এমন আচরণকে পৈশাচিক ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

বিশেষণটা কি একটু বেশি কড়া মনে হচ্ছে? যদি মনে হয়, তাহলে দয়া করে নিচের

---

[১২৮] AIDS Oral History Project, The AIDS Epidemic in San Francisco: The Medical Response, 1981-1984, Vol. II, Marcus A. Conant, The Aids Epidemic, The Bathhouse Episode. http://tinyurl.com/26mrkwd5

[১২৯] Richards, Matt, and Mark Langthorne. Somebody to Love: The Life, Death, and Legacy of Freddie Mercury. Weldon Owen, 2018.

[১৩০] Dixon, P. (1994). The Truth About AIDS. Finland: Kingsway Publications Ltd.

কথাগুলো পড়ুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন, ঠিক কোন ধরনের প্রাণী এমন আচরণ করতে পারে।

গ্যাইটেন ডুগাস কীভাবে ইচ্ছে করে অন্যদের এইডস আক্রান্ত করার চেষ্টা করত, তা নিয়ে ড. মারকাস কৌনান্টের কথা শোনা যাক,

> সে (ডুগাস) স্যান ফ্রানসিসকোতে আসতো আর বিভিন্ন লোকের সাথে সেক্স করত। সেক্স করার সময় আলো নিভিয়ে রাখত, আর শেষ হবার পর বাতি জ্বালিয়ে দিতো। (ততদিনে) তার সারা গা কাপোসি সারকোমার (ত্বকের ক্যান্সার) ঘা দিয়ে ভরে গেছে। বাতি জ্বালিয়ে সে বলতো, 'আমি মারা যাচ্ছি, আমার গে ক্যানসার হয়েছে, সম্ভবত তোমারও হবে।'
>
> তারপর সে চলে যেত। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তার মনোভাব ছিল অত্যন্ত বিকৃত।
>
> তার (ডুগাসের) এক বন্ধুর সাথে আমি কথা বলেছি। শহরে আসলে ডুগাস এই বন্ধুর বাসায় উঠত। এই বন্ধুর বক্তব্য হলো, ডুগাস সেক্স নিয়ে একেবারে মোহাচ্ছন্ন, একেবারে বাতিকগ্রস্থ ছিল। তার কাছে জীবন মানেই সেক্স। শুধু সেক্স করার জন্যই যেন তার বেঁচে থাকা।[১৩১]

এক অর্থে গ্যাইটেন ডুগাসকে আধুনিক সমকামী আন্দোলনের প্রতীক বলা যায়। দশকের পর দশক ধরে সমকামীরা যে ধরনের জীবনযাত্রা তৈরি করেছিল, নিজেদের আচরণের পক্ষে যেসব সাফাই আর বুলি আওড়েছিল, যে ধরনের মানুষ আর মনস্তত্ব গড়ে তুলেছিল, গ্যাইটেন ডুগাস ছিল তার সবকিছুর মিশেল। ডুগাস কোনো ব্যতিক্রম কিংবা দুর্ঘটনা ছিল না; সে ছিল সীমালঙ্ঘন আর বিকৃতিতে মগ্ন এ আন্দোলনের প্রতিমূর্তি।

গ্যাইটেন ডুগাস মারা যায় ১৯৮৪ সালে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তার মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরও সেই একই মনস্তত্ব বহাল তবিয়তে টিকে আছে। সবচেয়ে রক্ষণশীল হিসেব অনুযায়ী অর্ধেকের কাছাকাছি মার্কিন সমকামী পুরুষ (৪৮%), জীবনে ১০ জনের বেশি লোকের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। ১৭% এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ত্রিশের বেশি। আর ১০% সমকামী পুরুষের যৌনসঙ্গীর সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যায়।[১৩২]

সমকামী পুরুষদের একটা অংশ আজও রোগের কথা গোপন রেখে অন্যদের আক্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। আরেক দল নিত্যনতুন রোমাঞ্চ খুঁজতে খুঁজতে

---

[১৩১] AIDS Oral History Project. Vol. II, Marcus A. Conant, The Aids Epidemic, Gaetan Dugas. http://tinyurl.com/3n4sewm5

[১৩২] The General Social Survey by NORC at the University of Chicago. Data between 2008 and 2018. https://gssdataexplorer.norc.org/, (requires creating an account).

একসময় এইডস নিয়ে ফ্যান্টাসিতে আসক্ত হয় এবং সক্রিয়ভাবে এইডস আক্রান্ত হবার চেষ্টা করতে থাকে। এই আচরণগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা পরিভাষাও আছে সমকামীদের মধ্যে। যারা আক্রান্ত হতে চায়, তাদের নাম 'বাগ চেসার' (bug chaser), যারা অন্যদের আক্রান্ত করে তাদের নাম 'গিফটগিভার' (gift giver)।

***

ষাট আর সত্তর দশকে স্বাধীনতা, মুক্তি আর অধিকারের দাবি তুলেছিল সমকামী আন্দোলন। সুন্দর শব্দগুলোর আড়ালে লুকিয়ে ছিল ভয়াবহ কদর্যতা আর পূতিগন্ধময় জীবনযাত্রা। মার্কিন সমাজ যখন নৈতিকতার বাঁধনকে খুলে ফেললো, অবাধ যৌনতাকে মেনে নিতে শুরু করলো, যখন অ্যামেরিকার মেট্রোপলিটান শহরগুলো ১৯২০-এর দশকের বার্লিনের চেয়েও তীব্র পাপের শহর হয়ে উঠলো, তখনই এক নিখুঁত ঝড়ের রূপ নিয়ে দৃশ্যপটে হাজির হলো এইডস। এমন এক মরণব্যাধি, যার বিকাশ ও বিস্তৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সমকামীদের অসুস্থ জীবনযাত্রা। পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব চালালো এইডস। তারপর মহামারির থাবা পৌঁছে গেল পশ্চিমের বাইরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে, বিশেষ করে আফ্রিকায়। প্রথম পনেরো বছরে এ রোগে মারা গেল ৪৬ লাখের বেশি মানুষ।[১৩৩] মহামারির চার দশক শেষে এখন পর্যন্ত মৃতের মোট সংখ্যা ৪ কোটির বেশি।[১৩৪]

সমকামীদের জীবনের কদর্যতা উপচে পড়ে গ্রাস করলো পুরো সমাজ ও সভ্যতাকে। সযত্নে আড়াল করে রাখা বিকৃতিগুলো ডাক্তার আর সাংবাদিকদের কল্যাণে একটু একটু করে প্রকাশ পেতে শুরু করলো। সমকামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দানা বাঁধলো বিরোধিতা। হুমকির মুখে পড়লো ষাট আর সত্তরের দশকের অর্জন। তবে হুমকির সাথে সাথে এলো নতুন সম্ভাবনা।

ঐতিহাসিক এ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সমকামী আন্দোলনের চেহারা আমূল বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলো এক দল অ্যাক্টিভিস্ট। তাদের তত্ত্বাবধানে আন্দোলন এমন এক পথ বেছে নিল, যে পথ ধরে পরের তিন দশকে তারা পৌঁছে যাবে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে। সংকটের মুখোমুখি হয়ে সমকামী আন্দোলন এসময় ধারণ করলো এক নতুন রূপ ও নাম—এলজিবিটি অধিকার আন্দোলন।

---

[১৩৩] UNAIDS The first 10 years 1996-2007, https://tinyurl.com/nhfdkjbv

[১৩৪] WHO. HIV Data. https://tinyurl.com/537f2ubk

অধ্যায় ৬

এলজিবিটি

১৯৮৮ এর ফেব্রুয়ারিতে ভার্জিনিয়ার ওয়ারেনটন শহরে অ্যামেরিকার সমকামী সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতা আর অ্যাক্টিভিস্টদের নিয়ে এক কনফারেন্স হয়। আসলে কনফারেন্সে না বলে যুদ্ধবৈঠক বলাই ভালো। কীভাবে আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখা হবে, আগামী দিনগুলোতে কী হবে রণকৌশল, তা নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে সারা দেশ থেকে হাজির হয় দুশোর কাছাকাছি অ্যাক্টিভিস্ট, তাত্ত্বিক ও নেতা।

ভার্জিনিয়ার সেই যুদ্ধবৈঠকে সবার মনোযোগ কেড়ে নেয় মার্শাল কার্ক আর হান্টার ম্যাডসেন নামে দুই হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েটের প্রস্তাবনা। কার্ক একজন মনোবিজ্ঞানী, তখন গবেষণা করছে নিউরোসাইকিয়াট্রি নিয়ে। ম্যাডসেনের পিএইচডি রাজনীতির ওপর, তবে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে সে বেছে নিয়েছে মার্কেটিং আর জনমত পরিবর্তনকে। সোজা ভাষায়, ম্যাডসেনের স্পেশালিটি প্রোপাগ্যান্ডা। যুদ্ধবৈঠকের মাস তিনেক আগে, ৮৭-এর নভেম্বরে *'গাইড'* ম্যাগাজিনে এই দু'জনের লেখা, 'The Overhauling of Straight America' শিরোনামের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মনোবিজ্ঞান এবং অ্যাডভারটাইযিং এর কৌশল কাজে লাগিয়ে কীভাবে সমকামিতার ব্যাপারে সমাজের মনোভাব বদলে দেওয়া সম্ভব, তা নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছিল তারা।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আমূল পালটে ফেলতে হবে সমকামী আন্দোলনের চেহারা, বার্তা আর কর্মপদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে কার্ক-ম্যাডসেনের বাতলে দেওয়া নানা কৌশল। ভার্জিনিয়ার যুদ্ধবৈঠকের বছরখানেক পর, ১৯৮৯ সালে আগেকার প্রবন্ধকে ৩৯৮ পৃষ্ঠার বইয়ে পরিণত করে কার্ক-ম্যাডসেন। *After the Ball* নামের এ বইতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে সমকামিতার পক্ষে সমর্থন তৈরির নানান কৌশল আর সেগুলো বাস্তবায়নের উপায়।

পরের তিন দশকে কার্ক ও ম্যাডসেনের প্রস্তাবিত পদ্ধতি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে রাজনীতি, মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতে। শুরু করবে পশ্চিমা সমকামী আন্দোলনের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল পর্যায়। আশির দশকের

শেষ নাগাদ নতুন চেহারায় নিজেকে গড়ে তুলবে সমকামী আন্দোলন। নতুন কৌশল কাজে লাগিয়ে তিন দশকেরও কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে চূড়ান্ত সাফল্যে।

আফটার দা বল

কার্ক-ম্যাডসেনের প্রস্তাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হলো।

রূপ বদল : ষাট ও সত্তরের দশকে সমকামী আন্দোলনের চরিত্র ছিল বিদ্রোহী। সমাজের সাথে তাল মেলানোর বদলে সমাজকে বদলে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল তারা। এ সময়কার সমকামী অ্যাকটিভিস্টরা নিজেদের 'বৈচিত্র্য'-কে জাহির করত, উদ্‌যাপন করত। তারা অন্যদের মতো না, তারা আলাদা, সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তারা—এমন পরিচয়কে গর্ব ভরে গ্রহণ করে নিতো অ্যাক্টিভিস্টরা। এ অবস্থানকে ১৮০ ডিগ্রি বদলে দিলো কার্ক-ম্যাডসেন। তারা বললো, এইডস মহামারির কারণে পরিস্থিতি বদলে গেছে। মানুষের সহানুভূতি পেতে হলে নিজেদের আর আলাদা করে দেখানো যাবে না। এতে বিরোধিতা বাড়বে। বাড়বে অসন্তোষ। সমকামীদের এখন থেকে নিজেদের দেখাতে হবে নিরীহ, শান্তশিষ্ট, আদর্শ নাগরিক হিসেবে। তাদের ভাষায়,

> সমকামীদের পরিস্থিতির শিকার এবং শোষিত হিসেবে দেখাতে হবে, আগ্রাসী চ্যালেঞ্জার হিসেবে দেখানো যাবে না।[১৩৫]

> মিডিয়াক্যাম্পেইনেসমকামীদেরযথাসম্ভবইতিবাচকভাবেতুলেধরতেহবে।[১৩৬]

> সমকামীদের উপস্থাপন করতে হবে সমাজের স্তম্ভ হিসেবে, যারা বাকি সবার চাইতে সমাজে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[১৩৭]

কার্ক-ম্যাডসেনের প্রেসক্রিপশন ছিল, সমকামীরা আলাদা না, তাদের জীবনযাত্রা অস্বাভাবিক না, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহ নেই তাদের—বারবার বলে মানুষের মাথায় গেঁথে দিতে হবে ধারণাগুলো। আর এ কাজটা করতে হবে মিডিয়া দিয়ে।

ভিকটিম-সংখ্যালঘু-অধিকার : আন্দোলনের রূপ বদলের অংশ হিসেবে আসলো কার্ক-ম্যাডসেনের স্ট্র্যাটিজির আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে দেখাতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে সমকামীরা বঞ্চিত, হুমকির সম্মুখীন, তাদের সুরক্ষা প্রয়োজন। সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের দিকে আগাতে হবে মানুষের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে। কার্ক-ম্যাডসেন বললো,

---

[১৩৫] Kirk, Marshall, and H. Madsen. "After the Ball: How America Will Conquer It's Fear and Hatred of Gays in the 90's." Harvard: Plume books (1989). p. 183

[১৩৬] Ibid, p. 179

[১৩৭] Ibid, p. 9

> সমকামীদের সমাজের ভিকটিম হিসেবে দেখাতে হবে। যাতে করে অসমকামীদের মধ্যে অবচেতনভাবেই তাদের রক্ষকের ভূমিকা নেওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়।[১৩৮]

এইডস মহামারির প্রসারের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল সমকামীদের, কিন্তু সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে দেখাতে এইডসকেও কাজে লাগানোর দু:সাহসী প্রস্তাব দিলো কার্ক-ম্যাডসেন। বললো, এইডস মহামারিকে ব্যবহার করে সমকামীদের তুলে ধরতে হবে 'আক্রান্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী' হিসেবে, যাতে তাদের প্রতি মানুষের 'মনোযোগ আর সহানুভূতি বাড়ে'।[১৩৯]

কার্ক-ম্যাডসেনের এ প্রস্তাবও গৃহীত হলো। তাদের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী সমকামীরা বলতে শুরু করলো—এইডসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে সমকামীরা, কিন্তু তারা সংখ্যালঘু হবার কারণে এইডস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না সরকার। সমকামীদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। আশির দশকের শেষ থেকে শুরু করে পুরো নব্বইয়ের দশক জুড়ে এভাবে প্রোপাগ্যান্ডা চালিয়ে গেল সমকামীরা। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এরাই আবার এইডসের বিস্তারের পেছনে সমকামীদের ভূমিকার কথা জোর গলায় অস্বীকার করত। পরস্পরবিরোধিতা বরাবরই সমকামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

প্রোপাগ্যান্ডা : কার্ক-ম্যাডসেন জুটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবনা ছিল, সমকামী আন্দোলনকে রাজপথ থেকে স্টুডিওতে নিয়ে আসা। তারা বললো, সমাজের মনোভাব বদলানোর কাজটা রাস্তায় নেমে আর করা যাবে না। রাজপথ থেকে যা যা পাবার ছিল তা এসে গেছে, এখন মনোযোগ দিতে হবে মিডিয়াতে। অ্যাডভার্টাইযিং আর সাইকোলজি থেকে শেখা বিভিন্ন কৌশল কাজে লাগিয়ে একের-পর-এক হিসেবী পদক্ষেপে মার্কিন সমাজের মনোভাব বদলে দিতে হবে ধাপে ধাপে। কোনো রাখঢাক ছাড়াই কার্ক-ম্যাডসেন ঘোষণা করলো, তাদের মূল ফোকাস হবে প্রোপাগ্যান্ডা। প্রোপাগ্যান্ডার পদ্ধতি হিসেবে তিন ধাপের এক কৌশল প্রস্তাব করলো তারা। ডিসেনসেটাইয, জ্যামিং এবং কনভারশন।

ডিসেনসেটাইযেইশান অর্থ অবশ করে দেওয়া। সমকামিতা যে একটি জঘন্য বিকৃতি, চরম সীমালঙ্ঘন ও ঘৃণ্য পাপাচার, এ নিয়ে মানুষের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দিতে হবে। তাদের ভাষায়,

> প্রথম কাজ হলো সমকামী এবং সমকামীদের অধিকারের ব্যাপারে অ্যামেরিকার জনগণের চিন্তাকে অবশ করে দেওয়া, তাদের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে

---

[১৩৮] Ibid, p. 8
[১৩৯] Ibid, p. xxv

> দেওয়া (desensitization)। মানুষের চিন্তাকে অবশ করে দেওয়ার অর্থ হলো, সমকামিতার ব্যাপারে তাদের মধ্যে উদাসীনতা তৈরি করা... একজন স্ট্রবেরি ফ্লেভারের আইসক্রিম পছন্দ করে, আরেকজন ভ্যানিলা ফ্লেভারের। একজন বেইসবল দেখে, আরেকজন ফুটবল। এ আর এমন কী![১৯০]

কার্ক-ম্যাডসেনের মতে প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য এই একটিই। একবার এই উদ্দেশ্য অর্জিত হলে, সহজ হয়ে যাবে পরের ধাপগুলো,

> সমকামিতা ভালো জিনিস—একেবারে শুরুতেই সাধারণ মানুষকে এটা বিশ্বাস করানো যাবে না। এমন আশা বাদ দাও। তবে তুমি যদি তাদের মনে করাতে পারো যে, সমকামিতা হলো কেবল আরেকটা জিনিস (ভালো না, খারাপ না—জাস্ট আরেকটা ব্যাপার), তাহলে ধরে নাও আইনি ও সামাজিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তুমি জিতে গেছ।[১৯১]

কার্ক-ম্যাডসেন বুঝতে পেরেছিল মানুষের সংবেদনশীলতা নষ্ট করার মূল চাবিকাঠি মিডিয়া। তাই টিভি সিনেমা, গান, নাটক, বই ইত্যাদির মাধ্যমে বারবার সমকামিতাকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছিল তারা,

> সোজা ভাষায়, ভিযুয়াল মিডিয়া-টিভি ও সিনেমা হলো ভাবমূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ...যত বেশি ও যত উচ্চৈঃস্বরে সম্ভব, সমকাম, সমকামিতা এবং সমকামীদের কথা বলুন। বারবার দেখতে থাকলে প্রায় যেকোনো কাজ-ই মানুষের কাছে একসময় 'স্বাভাবিক' মনে হতে শুরু করে...।[১৯২]

অবশ করার পরের ধাপ জ্যামিং। বিরোধিতাকারীদের মুখ বন্ধ করা। ক্রমাগত ব্যক্তি আক্রমণ আর অপপ্রচার করে সমকামিতা-বিরোধীদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে দিতে হবে। একদিকে সমকামীদের দেখানো হবে নিরীহ, দুর্বল, ভিকটিম হিসেবে। অন্যদিকে বিরোধীতাকারীদের দেখানো হবে আগ্রাসী, অত্যাচারী, হিংস্র কিংবা উন্মাদ হিসেবে। অধিকাংশ অ্যামেরিকান নাৎসি আর কেকেকে নামক শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী দলকে অপছন্দ করে। সমকামিতার বিরোধীদের নামের সাথে এসব ট্যাগ জুড়ে দিতে হবে। সমকামীরা আদর্শ নাগরিক, বিরোধিতাকারীরা বর্ণবাদী! সমকামীরা বাকি দশ জনের মতো নির্বিবাদী মানুষ, বিরোধীতাকারীরা নাৎসি, হিটলারের সাক্ষাৎ অনুসারী! মুখস্থ বুলির মতো নিরন্তর বলে যেতে হবে এসব কথা। যাতে এক সময় সাধারণ মানুষের মনে তা গেঁথে যায়।

---

[১৯০] Kirk & Madsen (১৯৮৭), The Overhauling of Straight America
[১৯১] Ibid
[১৯২] Ibid

> সমকাম বিরোধীদের আমরা এতটা বাজে ভাবে দেখাতে চাই, যাতে করে সাধারণ অ্যামেরিকানরা এদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে।[১৪৩]

এভাবে এক সময় নীরবতার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। কেউই যেহেতু নাৎসি কিংবা বর্ণবাদী হিসেবে পরিচিত হতে চায় না, তাই মানুষ একসময় সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করে দেবে।

তৃতীয় পর্যায় হলো কনভারশান বা রূপান্তর। ধাপে ধাপে সমাজের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ পালটে দেওয়া, যাতে সমাজ বিকৃত যৌনাচারকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেয়। কার্ক-ম্যাডসেনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, পুরো সমাজকে যৌন বিপ্লবের আদর্শের ওপর নিয়ে আসা।

এই লক্ষ্য নতুন কিছু না। একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিল অ্যালেন গিন্সবার্গ থেকে শুরু করে হ্যারি হেই এবং ফ্র্যাঙ্ক ক্যামিনিরাও। তবে ষাটের দশকের অ্যাক্টিভিস্টদের মতো রাজপথে নেমে হুট করে সব বদলে ফেলার পদ্ধতিতে আস্থা ছিল না কার্ক-ম্যাডসেনের। তারা মনে করতো সমাজের এই রূপান্তর আনতে হবে ধাপে ধাপে, মিডিয়ার মাধ্যমে।

> সমকামী এজেন্ডা সফল হতে পারে সাধারণ অ্যামেরিকানদের আবেগ, চিন্তা এবং ইচ্ছার রূপান্তরের মাধ্যমে। আর এ রূপান্তর আসবে প্রোপাগ্যান্ডারূপে জাতির ওপর **এক পরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের** মাধ্যমে, যা তাদের কাছে পৌঁছে দেবে মিডিয়া।[১৪৪]

পরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ

সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তনের প্রোপাগ্যান্ডার ব্যাপারে কার্ক-ম্যাডসেনের আরও কিছু প্রস্তাবনা আর মন্তব্য দেখা যাক,

- প্রোপাগ্যান্ডা যতটা যুক্তির ওপর নির্ভর করে, তারচেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে আবেগের ম্যানিপুলেশন বা আবেগ বশে আনার ওপর।[১৪৫]
- মিডিয়া ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের আবেগকে নাড়া দেওয়া।[১৪৬]
- বড় এবং বিখ্যাত গণমাধ্যমের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ ধরনের টিভি চ্যানেল বা ম্যাগাজিনে কোনো বিষয় আলোচিত হওয়া মানেই এক ধরনের সামাজিক বৈধতা ও গুরুত্ব পেয়ে যাওয়া।[১৪৭]

---

[১৪৩] Kirk & Madsen. After the Ball. p. ১০
[১৪৪] Ibid, p. 153
[১৪৫] Ibid, p. 162
[১৪৬] Ibid, p. 187
[১৪৭] Ibid, p. 173

- বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের শিরোনামে কিংবা ট্যাগলাইনে কোনো-না-কোনো ভাবে সমকামী শব্দটা নিয়ে আসতে হবে।[১৪৮]
- যেসব কাজকে সমাজে ইতিবাচক এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে মনে করা হয়, মিডিয়াতে বারবার সেগুলোর সাথে সমকামীদের যুক্ত করতে হবে।[১৪৯]
- সমকামীদের যত বেশি মিডিয়াতে নিয়ে আসা হবে, তত সমকামিতাকে মানুষের কাছে স্বাভাবিক এবং সহজাত মনে হবে। একে আপত্তিকর এবং অস্বাভাবিক মনে করার প্রবণতা কমবে, দিন দিন একে আরও বৈধ মনে হবে।[১৫০]
- বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সমকামী হিসেবে দেখাতে হবে। দুটো কারণে: এক, তারা বহু আগেই মরে গেছে, তাই প্রতিবাদ করতে পারবে না। দুই, শৈশব থেকে মানুষ এসব ব্যক্তির জীবন ও অর্জনকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। তাদেরকে সমকামী বলা হলে সমকামিতার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা ধীরে ধীরে কমবে।[১৫১]
- সমকামীদের সাথে বিভিন্ন ‘অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার’ মঞ্চস্থ করতে হবে, যেখানে তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে আপাতত তাদের সমকামী সঙ্গীদের আনা যাবে না।[১৫২]
- মানুষের সামনে আগেই সমকামী (যৌন) আচরণ উপস্থাপন করা যাবে না। মানুষের কাছে তা জঘন্য মনে হবে এবং মানুষ সমকামিতার বিরুদ্ধে চলে যাবে।...’[১৫৩]
- বিরোধীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিন্দা ও অপপ্রচার চালিয়ে যেতে হবে।[১৫৪]
- সমকামী আচরণের সব ধরনের বিরোধিতাকে সমকামবিদ্বেষ, সমকামীদের প্রতি ঘৃণা এবং কুসংস্কারের ফসল হিসেবে দেখাতে হবে।[১৫৫]
- কেউ সমকামীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত অথবা আচরণের সাথে পুরোপুরি একমত না হলে অবস্থা বুঝে তাদের ওপর ‘সমকামবিদ্বেষী’ কিংবা ঘৃণাজীবী ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে।[১৫৬]
- সমকামীদের নেতিবাচক হিসেবে তুলে ধরে এমন সব নিউস এবং মিডিয়া

---

[১৪৮] Ibid. p. 207

[১৪৯] Ibid. p. 219

[১৫০] Ibid. p. 217

[১৫১] Ibid. p. 189.

[১৫২] Ibid. p. 247

[১৫৩] Kirk & Madsen (1987), The Overhauling of Straight America

[১৫৪] Ibid. p. 14

[১৫৫] Ibid. p. 112

[১৫৬] Ibid. p. xxiii, 112

কাভারেজ পক্ষপাতদুষ্ট এবং বাতিল বলে উড়িয়ে দিতে হবে।[১৫৭]

- সমকামিতার বিরুদ্ধে যেকোনো বক্তব্যকে জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হিসেবে প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।[১৫৮]
- সমকামী আর তাদের বিরোধীদের এক সাথে দেখানোর সময় একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। ধরুন, সমকাম বিরোধী কোনো পাদ্রীর উত্তেজিত বক্তব্যের ফুটেজ দেখানো হচ্ছে। এসময় ফোকাস করতে হবে তার মুখ আর বড় বড় চোখের ওপর। তারপর তার বক্তব্য চলতে থাকবে, কিন্তু এবার স্ক্রিনে দেখানো হবে কিছু নিরীহ, দুর্বল, ভদ্র চেহারার সমকামীকে। তারপর আবার ফোকাস চলে যাবে সেই পাদ্রীর উত্তেজিত মুখের ওপর। এই ধরনের কনট্রাস্ট বা পার্থক্য দর্শকের মনে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। প্রোপাগ্যান্ডাতে একে বলা হয় ব্র্যাকেট টেকনিক।[১৫৯]
- ধর্মীয় নৈতিকতার জায়গায় অস্পষ্টতা তৈরি করতে হবে। এজন্য মডারেট গির্জাগুলোর সমর্থনে প্রচারণা চালাতে হবে। ধর্মীয় আপত্তি তুলতে হবে রক্ষণশীলদের সমকামিতা-বিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে। সমকামিতার বিরুদ্ধে বাইবেলে যেসব কথাবার্তা আছে, সেগুলোর আধুনিক ব্যাখ্যা আনতে হবে।[১৬০]
- সমকাম-বিরোধী চার্চ এবং ধর্মীয় নেতাদের সেকেলে এবং পশ্চাৎপদ হিসেবে দেখাতে হবে, যারা আধুনিক পৃথিবী আর মনোবিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছুই জানে না। ধর্মের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে বিজ্ঞান আর জনমতকে।[১৬১]
- এভাবে কাজ চালিয়ে গেলে, বেশ কয়েক বছর পর মূলধারার মিডিয়ার বড় এক অংশে সমকামীরা প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে।[১৬২]

গোয়েবলস ও অন্যান্য

কার্ক-ম্যাডসেনের ভবিষ্যৎবাণী ভুল ছিল না। *অ্যাফটার দা বল* প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। দশ বছরের মাথায় অ্যামেরিকার মূলধারার মিডিয়ার ওপর মজবুত প্রভাব বিস্তার করে ফেলে সমকামী আন্দোলন। এই প্রভাবের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো ম্যাথিও শেফার্ড এবং জেসি ডারকাইযিং-এর খুনের ব্যাপারে মিডিয়া কাভারেজের পার্থক্য।

একটু পেছন থেকে শুরু করি। ১৯৩০ সালে জার্মানিতে তুমুল দ্বন্দ্ব চলছিল কমিউনিস্ট আর নাৎসিদের মধ্যে। নাৎসি পার্টি দিন দিন বড় হচ্ছিল, শক্তিশালী

[১৫৭] Ibid, p. 54
[১৫৮] Ibid, p. 101
[১৫৯] Ibid, pp. 13-14
[১৬০] Ibid, p. 179
[১৬১] Ibid, p. 179, 12
[১৬২] Ibid, p. 213

হচ্ছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক থেকে এগিয়ে ছিল কমিউনিস্টরা। নাৎসি পার্টির হয়ে জনগণের মন জয় করার দায়িত্ব পড়ে জৌসেফ গোয়েবলসের ওপর। গোয়েবলস ছিল প্রোপাগ্যান্ডার উস্তাদ। আগ্রাসী মনোভাবের কারণে সাধারণ মানুষের অনেকেই নাৎসিদের অপছন্দ করত। কিন্তু চতুর এক চালে খেলার দান উলটে দেয় গোয়েবলস। সে কমিউনিস্টদের আগ্রাসী আর নাৎসিদের আক্রান্ত হিসেবে তুলে ধরে। আর এ সব কিছুর চাবিকাঠি ছিল হোর্স্ট ভেসেল-এর খুন।

হোর্স্ট ভেসেল ছিল নাৎসি বাহিনীর গুন্ডা। বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঝামেলার জের ধরে ভেসেলকে শায়েস্তা করার জন্য কমিউনিস্টদের কাছে সাহায্য যায়, তার বাড়িওয়ালী। কমিউনিস্টদের গুন্ডা দলের লোকজন শায়েস্তা করতে গিয়ে একেবারে মেরেই ফেলে ভেসেলকে। আর এ সুযোগটাই কাজে লাগায় গোয়েবলস।

ভেসেলকে সে তুলে ধরে জাতীয়তাবাদী বীর হিসেবে, শয়তান কমিউনিস্টদের আক্রমণে যে 'শহীদ' হয়েছে। এ ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে নাৎসিদের ভিকটিম হিসেবে চিত্রিত করে গোয়েবলস। ভেসেল পরিণত হয় নাৎসি আন্দোলনের প্রতীকে। নাৎসি বাহিনীর আনুষ্ঠানিক সংগীতের নামকরণ হয় ভেসেলের নামে। আর তারপরের কাহিনি তো সবার জানা।

অনেকটা একই ধরনের প্রোপাগ্যান্ডা দেখা যায় ১৯৯৮-এর ঘটনাকে ঘিরে। এ সময়টাতে সমকামী আন্দোলন আর রক্ষণশীল খ্রিষ্টানদের মধ্যে তীব্র সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছিল। সমাজের মূল্যবোধ অনেকাংশে পালটে গেলেও খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ তখনো মার্কিনীদের মনে একটা প্রভাব ধরে রেখেছিল। জনগণের মন জয় করার দরকার ছিল সমকামী আন্দোলনের। কিন্তু কীভাবে?

হোর্স্ট ভেসেলের জায়গায় আসলো ম্যাথিও শেফার্ড। ৯৮-এর অক্টোবরে ছিনতাইয়ের সময়ের বেড়ধক পিটিয়ে ২২ বছর বয়সী ম্যাথিউ শেফার্ডকে রাস্তার পাশে ফেলে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। কয়েকদিন পর হাসপাতালে মারা যায় শেফার্ড। দেখতে নিরীহ আর দুর্বল শেফার্ডের মৃত্যু খাপেখাপে মিলে যায় কার্ক-ম্যাডসেনের প্রেসক্রিপশানের সাথে। নিরীহ সমকামী ভিকটিম, সহিংস আক্রমণ, প্রচুর আবেগ ও সহানুভূতি, আর বিরোধীদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার মোক্ষম সুযোগ। সমকামী আন্দোলন এ খুনকে উপস্থাপন করে রক্ষণশীল খ্রিষ্টানদের ঘৃণার ফসল হিসেবে। রাতারাতি সমকামী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয় শেফার্ড। সমকামীরা বলতে শুরু করে, সমকামিতা-বিরোধী প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে প্রাণ হারাবে আরও অনেক ম্যাথিও শেফার্ড। মোটাদাগে এ বক্তব্য গ্রহণ করে নেয় মিডিয়া। চলে ব্যাপক কাভারেজ। আস্তে আস্তে জনমত চলে যায় সমকামী আন্দোলনের পক্ষে।

ঠিক পরের বছর ১৩ বছর বয়সী জেসি ডারকাইবিংকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, বিছানার ম্যাট্রেসের সাথে বেঁধে, দুই দিন ধরে ক্রমাগত নির্যাতন আর ধর্ষণের পর খুন করে দুই সমকামী। কিন্তু এ ঘটনা অ্যামেরিকার মিডিয়াতে তেমন গুরুত্ব পায় না। ম্যাথিউ শেফার্ডের ঘটনায় সমকামিতার তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না, অন্যদিকে জেসি উইলিয়ামসের বর্বর হত্যাকাণ্ড আর ধর্ষণের পেছনে মূল কারণ ছিল সমকামী বিকৃত যৌনতা। অথচ দুটোর কাভারেজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

কারণ, জেসি উইলিয়ামসের পক্ষে মিডিয়া ক্যাম্পেইন চালানোর মতো কোনো আন্দোলন ছিল না। অন্যদিকে শেফার্ডের মৃত্যুকে কাজে লাগাতে কার্ক-ম্যাডসেনের নীলনকশা নিয়ে প্রস্তুত ছিল সমকামী আন্দোলন। এ দুই মৃত্যু নিয়ে ব্যাপারে মিডিয়া কাভারেজের পার্থক্যকে কার্ক-ম্যাডসেনের প্রস্তাবিত পলিসি ও পদ্ধতির সাফল্যের কেইস স্টাডি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

রূপান্তর

আশির দশকের শেষ থেকে আরও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে, যার মাধ্যমে আন্দোলন তার বর্তমানের চেহারা গ্রহণ করে।

মহামারির অপ্রত্যাশিত প্রভাব : এইডস মহামারি সমকামী আন্দোলনকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছিল, বাধ্য করেছিল রূপ বদলাতে। বিচিত্রভাবে এই মহামারিই রূপান্তরের এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় সাফল্যগুলোর পেছনে প্রভাব রাখে। নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এইডস মহামারিকে বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখতে শুরু করে। এইডস মোকাবিলায় সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক খাত থেকে আসে প্রচুর ফান্ডিং। এই অর্থের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ যায় এইডস সচেতনতা ও এইডস রোগীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর কাছে। আর এইডস নিয়ে কাজ করা অধিকাংশ সংগঠন কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত ছিল সমকামী আন্দোলনের সাথে। অনেক ক্ষেত্রে একই লোক একাধিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করত।[১৬৩]

ফলে এইডস মোকাবিলায় আসা ফান্ডিংয়ের বড় একটা অংশ পৌঁছে গেল সমকামী অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের কাছে। ফান্ডিং পাবার সাথে সাথে বাড়লো তাদের প্রভাব। এমনকি সবচেয়ে বেশি এইডস ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) উপদেষ্টা পদও পেয়ে গেল কিছু কিছু সমকামী সংগঠন। এবার তারা বিকৃতির অধিকারের আলাপ তুলতে শুরু করলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। গড়ে ওঠলো এলজিবিটি আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রভাব ও বিস্তৃতি।

---

[১৬৩] Bernstein, 'Identities and Politics', 560

এইডস মহামারির আরেকটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ছিল। সেই উলরিখসের সময় থেকে সমকামীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া। শেষ পর্যন্ত এইডসের উসিলায় এ লক্ষ্য অর্জিত হয়। মহামারির কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমকামীদের একটি আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে সরকারগুলো। কারণ, এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সমকামীদের দিকেই তাদের বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছিল।

এ ব্যাপারটা আজও চলমান। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে সমকামিতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। কিন্তু সমকামিতাকে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করা সমাজেও এইডস সংক্রান্ত উদ্যোগে সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ও সরাসরি সাহায্য থাকে।[১৬৪] আর এর মাধ্যমে সমকামী সংগঠনগুলোর প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এসব দেশে। পরে আমরা দেখবো এইডস প্রতিরোধের আড়ালে ঠিক এ সময়টাতেই কীভাবে বাংলাদেশেও শুরু হয়েছিল সমকামী আন্দোলন।

কর্পোরেট-এনজিও কাঠামো : ষাট ও সত্তরের দশকের সমকামী আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল হ্যারি হেইয়ের মতো কমিউনিস্টদের হাত ধরে। আন্দোলনের কাঠামো গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক সংগঠনের আদলে। এসব সংঠনের কর্মসূচিতে ছিল মিছিল, পিকেটিং, বিক্ষোভ আর রোডমার্চের মতো ব্যাপারগুলো। কিন্তু আশির দশকের শেষ দিকে রাজনৈতিক সংগঠনের বদলে সমকামী আন্দোলন গ্রহণ করে এনজিও এবং কর্পোরেট কাঠামো। তৃণমূল পর্যায়ের অ্যাকটিভিসমও ধীরে ধীরে এনজিও কাঠামোর ভেতরে চলে আসে। সেই সাথে চলে কর্পোরেট রীতিতে ফান্ডিং এবং নানা ধরনের রাজনৈতিক লবিয়িং। পরবর্তীতে এ কৌশল অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয় এবং বাকি পৃথিবীতেও ছড়িয়ে পড়ে।

কৌশল পরিবর্তনের এ ব্যাপারটা থেকে সমকামী আন্দোলনের ধূর্ততা এবং সুযোগসন্ধানী চরিত্রের প্রমাণ মেলে। ষাট ও সত্তরের দশকে তুমুল জনপ্রিয় ছিল নাগরিক অধিকার ও নারীবাদী আন্দোলন। তারা ব্যাপক সফলতা পাচ্ছিল। সমকামীরা তখন এই আন্দোলনগুলোর বুলি, কাঠামো এবং ধাঁচ অনুকরণ করেছিল। আশির দশকের শেষ দিকে যখন এনজিও-কর্পোরেট কাঠামো শক্তিশালী হয়ে উঠলো, তখন আবার সুযোগ বুঝে তারা চলে গেল নতুন কাঠামোতে। দুই ক্ষেত্রেই উদ্ভাবনী ভূমিকায় না থাকলেও সময়ের প্রবণতা বুঝে সেটা কাজে লাগিয়েছিল সমকামী আন্দোলন।

পর্যায়ক্রমিক আইনি সংস্কার : আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল রাজপথের আন্দোলনের বদলে আইনি লড়াই এবং পর্যাক্রমিক সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়া। যেসব রাজ্যে পায়ুসঙ্গম আইনি অপরাধ বলে স্বীকৃত ছিল, সেখানে আইন

[১৬৪] Ibid, p. 558

বাতিলের চেষ্টা শুরু হলো। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো সমকামিতাকে জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচার করার যুক্তি।

অপ্রত্যাশিতভাবে, আইনি লড়াইয়ের বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হলো এইডস মহামারির কারণেও। এইডসের কারণে হাজার সমকামী মারা যাচ্ছিল। মৃত এই সমকামীদের 'পার্টনার'দের মধ্যে কেউ কেউ সম্পত্তির অধিকারসহ নানা বিষয়ে মামলা করতে শুরু করলো। আইনি লড়াইয়ের এই পদ্ধতি বেশ ভালোভাবে মিলে গেল কর্পোরেট-এনজিও কাঠামোর সাথে। সমকামী আন্দোলনকে সুযোগ করে দিলো রাজনৈতিক লবিয়িং-এরও। এভাবে 'অধিকার' আদায়ের দিকে এগিয়ে গেল সমকামীরা।[১৬৫]

প্রগতিশীল রাজনীতি : এ সময়টাতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটলো। অ্যাক্টিভিস্টরা খুব সচেতনভাবে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ বা তাদের ভাষায় 'সমকামীদের অধিকার'-কে প্রগতিশীল রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত করলো। ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের অনুকরণে মার্কিন সমকামীরাও লবিয়িং শুরু করলো প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। সেই সাথে চললো মিডিয়া, এনজিও আর বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটাকে 'সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের লড়াই' হিসেবে দেখানো।

এলজিবিটি : ইমেজ বদলের জন্য আরেকটা কাজ করলো সমকামী আন্দোলন। শুধু পুরুষ বা নারী সমকামীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের বদলে তারা এবার জোট গঠন করলো। এমন এক জোট যেখানে সমকামী, উভকামীদের পাশাপাশি অন্যান্য বিকৃতিতে আসক্ত লোকেরাও থাকবে এক ছাতার নিচে। প্রত্যেক বিকৃতির অনুসারীদের আলাদা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর সবাইকে নিয়ে তৈরি জোটের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সবার জন্য 'যৌন স্বাধীনতা' ও 'যৌন অধিকার' অর্জন। অর্থাৎ সব ধরনের বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ।

জোট গঠন হলো, সেই সাথে বদলে গেল আন্দোলনের নাম। সমকামী আন্দোলন আগে পরিচিত ছিল গে লিবারেশন মুভমেন্ট বা সমকামী মুক্তি আন্দোলন নামে। নতুন জোট আর আন্দোলনের নাম দেওয়া হলো LGBT Rights Movement বা এলজিবিটি অধিকার আন্দোলন। এলজিবিটি মূলত লেসবিয়ান (নারী সমকামী), গে (পুরুষ সমকামী), বাইসেক্সুয়াল (উভকামী) ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে গঠিত। সারা বিশ্বজুড়ে আজ এ নামেই সমকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনতার প্রসারের আন্দোলন চলছে।

***

আন্দোলনের রূপ বদলের প্রক্রিয়ার পেছনে পুরো পরিকল্পনা কার্ক-ম্যাডসেনের,

---

[১৬৫] Ibid, p. 559

এমন বলা অতি সরলীকরণ হবে। এ ধরনের প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন এবং চলকের প্রভাব থাকে। প্রভাব থাকে পারিপার্শ্বিকতার এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির। তবে সমকামী আন্দোলনের রূপান্তরের পেছনে কার্ক-ম্যাডসেনের নীলনকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছিল, তাদের প্রস্তাবিত বেশিরভাগ কৌশল গৃহীত হয়েছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কার্ক-ম্যাডসেন সমকামী আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্যে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনেনি। তারা যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছে, সেগুলোর সাথে ষাট ও সত্তরের দশকের দাবিগুলোর তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তারা পার্থক্য এনেছিল পদ্ধতি, পলিসি আর উপস্থাপনায়। সমকামী আন্দোলনের এ রূপান্তরকে হ্যারি হেইদের র‍্যাডিকাল পদ্ধতি বাদ দিয়ে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন হিসেবে দেখা যায়। তবে সমকামী আচরণ এবং জীবনযাত্রা নিয়ে কার্ক-ম্যাডসেনের মধ্যে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি ছিল না। এ জীবনের বাস্তবতা খুব ভালোভাবেই জানতো তারা। এ স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে তাদের লেখাতে,

> সমকামী জীবনযাত্রা চরম নৈরাজ্যপূর্ণ। এ ধরনের নৈরাজ্যকে যদি আদৌ কোনো জীবনযাত্রা বলা যায়, তাহলে বলতে হবে এই জীবনযাত্রা আসলে কাজ করে না। সব সামাজিক কাঠামো দুটি উদ্দেশ্যে বিকশিত হয় : খারাপ আচরণ করার প্রাকৃতিক তাড়নাকে সীমাবদ্ধ করা, এবং মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানো। সমকামী জীবনযাত্রা এ দুটির কোনোটি করতে পারে না।[১৬৬]

তারা জানতো সমকামী জীবনযাত্রা স্বাভাবিক না। এ ধরনের আচরণ পরিবার এবং সমাজের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ঘৃণিত। জেনেবুঝেই তারা পরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণে সমাজের চিন্তাকে বদলে দেওয়ার নীলনকশা এঁকেছিল। দিনশেষে, ভালোমন্দ, সাদাকালোর পার্থক্য তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ কেবল নিজেদের তাড়না, নিজেদের স্বার্থ।

সাফল্য

নতুন কৌশল অভাবনীয় ফলাফল নিয়ে আসে। সমকামী আন্দোলনের হাতে ধরা দিতে শুরু করে একের পর এক সাফল্য। ১৯৮৭ সালে ডেমোক্রেট রাজনীতিবিদ এবং কংগ্রেস সদস্য বার্নি ফ্র্যাঙ্ক নিজের সমকামিতার কথা ঘোষণা করে। এর আগে কোনো কংগ্রেস সদস্য স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যে সমকামিতার কথা স্বীকার করেনি। ১৯৯০ সালে স্যান ফ্রানসিসকো-তে সমকামীদের 'পারিবারিক সম্পর্ক' (ডোমেস্টিক পার্টনারশিপ)-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরের দু বছরে একই ধরনের স্বীকৃতি আসে, প্রথমে বার্কলি আর তারপর ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়াতে।

---

[১৬৬] After the Ball: (Doubleday, 1st edition, May 1989) p. 363.

১৯৯১ সালে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে। মিনেসোটা রাজ্যের আদালত সমকামী 'পার্টনার'-দের পরস্পরের আইনি অভিভাবক বা লিগ্যাল গার্ডিয়ান হবার বৈধতা দেয়। এসব স্বীকৃতির ফলে সমকামীরা কার্যত বিবাহিত দম্পতির কিছু অধিকার পেয়ে যায়। একই রকম একটি আইন পাশ হয় ১৯৯৯ সালে, ক্যালিফোর্নিয়াতে।

১৯৯৪ সালে সামরিক বাহিনীতে সমকামীদের যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নতুন এক পলিসি গ্রহণ করে বিল ক্লিনটনের সরকার। 'ডোন্ট আস্ক, ডোন্ট টেল' নামের পলিসিতে বলা হয়, যে নিজেকে প্রকাশ্যে সমকামী বা উভকামী দাবি করে, তাকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হবে না। তবে ঘোষণা না দিয়ে কেউ যদি সমকামী হিসেবে জীবনযাপন করে, তাহলে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবে। ব্যক্তিগত জীবনের কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। আপাতভাবে এ নীতিকে অনেকে সমকামীদের বিরুদ্ধে মনে করলেও, আদতে এটা ছিল সেনাবাহিনীতে সমকামীদের গ্রহণ করে নেওয়ার প্রথম ধাপ।

১৯৯৬ সালে প্রায় দেড় যুগ ধরে চলা এক মামলার প্রভাবে এবং রক্ষণশীল রিপাবলিকান সেনেটরদের চাপে ডিফেন্স অফ দা ম্যারেজ (DOMA) আইন পাশ করতে বাধ্য হয় ক্লিনটন সরকার। এই আইনে বিয়েকে নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। বলা হয়, আইন অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী যেসব অধিকার পেয়ে থাকে, সমকামী দম্পতিরা সেগুলো পাবে না। ডোমা আইনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। এ আইনে বলা হয়, কোনো রাজ্য সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি দিলেও অন্য রাজ্যগুলো এ ধরনের 'ম্যারেজ সার্টিফিকেট' প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ আইন যখন পাশ হয় তখনো পর্যন্ত অ্যামেরিকার কোনো রাজ্য সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়ের স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতি আসতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই এ আইন করেছিল রক্ষণশীল রাজনীতিবিদরা। তবে এতে শেষ রক্ষা হয়নি।

২০০৩ সালে লরেন্স বনাম টেক্সাস মামলায়, টেক্সাস রাজ্যের পায়ুকাম-বিরোধী (অ্যান্টি-সডোমি) আইন বাতিল করে দেয় মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। এ রায়ের ফলে কার্যত অ্যামেরিকা জুড়ে আইনি বৈধতা পেয়ে যায় সমকামী যৌন আচরণ। দু বছর পর ডোমা'র কিছু অংশ বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৪ সালে প্রথম অ্যামেরিকান রাজ্য হিসেবে সমকামী বিয়ের বৈধতা দেয় ম্যাসাচুসেটস। এ বছর মে'র ১৭ তারিখ ম্যাসচুসেটসে ৭১ সমকামী দম্পতির 'বিয়ে' অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর আর ফিরে তাকাতে হয় না সমকামী আন্দোলনকে। মিডিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে 'পরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ'। ফিলাডেলফিয়া, বয়েস ডোন্ট ক্রাই, ব্রোকব্যাক মাউন্টেনসহ বিভিন্ন সিনেমায় সমকামিতাকে ইতিবাচক হিসেবে আর সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। উইল অ্যান্ড গ্রেইস এর মতো টিভি শো-তে সমকামীদের দেখানো হয় আর দশজনের মতো সাধারণ, নিরীহ

সুনাগরিক হিসেবে। বুদ্ধিজীবী আর অ্যাকাডেমিকরা ক্রমাগত লিখে যান সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে। বিরোধীদের দেখানো হয় নাৎসি, উন্মত্ত বর্ণবাদী কিংবা ধর্মান্ধ বর্বর হিসেবে। সমকামী এনজিও আর তাদের কর্পোরেট লবি সুপারিশ চালাতে থাকে রাজনীতিবিদদের কাছে। মিডিয়াতে সমকামীদের যেন নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা না হয়, তা নিশ্চিত করতে গড়ে উঠে বিভিন্ন সংগঠন।

পরের দশ বছর ধরে একের পর এক রাজ্যে বৈধতা পায় 'সমকামী বিয়ে'। ধীরে ধীরে প্রগতিশীল ডেমোক্রেটদের পাশাপাশি এলজিবিটি আন্দোলনের সমর্থকে পরিণত হয় রক্ষণশীল রিপাবলিকান পার্টিও। আন্দোলনের মৌলিক দাবিগুলো মেনে নেয় দু দলই। সময়ের সাথে সাথে সমাজের অনুভূতি অবশ হয়ে আসে, বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে অনেকটা এক ঘরে করে ফেলা হয়, আর বদলে যায় সমাজের মূল্যবোধ। ২০১৫ সালে পুরো অ্যামেরিকা জুড়ে সমকামী বিয়েকে বৈধতা দেওয়া হয়। পূর্ণতা পায় সত্তরের দশকের অসমাপ্ত বিপ্লব।

এর পরের ঘটনা এ বইয়ের পাঠকদের মোটামুটি জানা থাকার কথা।

পরিশিষ্ট

পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতা আজ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সমকামীদের বিকৃত যৌনাচারের শিক্ষা ঢুকে পড়েছে প্রাইমারি স্কুলগুলোর পাঠ্যবইয়ে। ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে পাকিস্তান, সবকিছুকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে শিশুদের সামনে। শেখানো হচ্ছে পরিবারের নতুন নতুন সংজ্ঞা। বিশ্বব্যাপী সমকামিতাকে বৈধতার দেওয়ার জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালছে পশ্চিমা সরকারগুলো।

এলজিবিটি আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার অ্যামেরিকার ফরেন পলিসির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউএসএইড থেকে শুরু করে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স, বিশ্বে এলজিবিটি আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে মার্কিন সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এলজিবিটি আন্দোলনকে বিশ্ব জুড়ে রপ্তানি করছে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্য। বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষা, মিডিয়া, আইন, সব জায়গাতে ঢুকে পড়েছে সমকামী আন্দোলনের কালো ছায়া।

সমকামী অ্যাক্টিভিস্টদের মনোযোগ এখন বিয়ে এবং পরিবারের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর দিকে। অধিকারের আলাপের বদলে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে এখন তাদের আগ্রহ। সংবাদ, বিনোদন, শিক্ষা, উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক পলিসির মধ্য দিয়ে আজ সমকামী আন্দোলনের বিকৃত মতবাদে দীক্ষিত হচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। মানুষের অজান্তেই তাদের মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করছে কার্ক-ম্যাডসেন আর তাদের অনুশিষ্যরা। সমকামিতার সমর্থন পরিণত হয়েছে প্রগতিশীলতা এবং আধুনিকতা মাপার অন্যতম মাপকাঠিতে।

***

১৮৬৭ সালে মিউনিখে কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের প্রকাশ্য বক্তৃতার দেড়শো বছরের মাথায় চূড়ান্ত সফলতা পেয়ে যায় সমকামী আন্দোলন। উর্নিং, হোমোসেক্সুয়াল, গে, এলজিবিটি—নাম বদলেছে, কৌশল বদলেছে। কখনো বিদ্রোহীরূপে, কখনো আবার ভিকটিম সেজে সামনে এসেছে ওরা। তবে মোড়ক বদলালেও আন্দোলনের মূল কেন্দ্র থেকে গেছে অপরিবর্তিত, বিকৃত যৌনতার বৈধতা। কুৎসিত নোংরা অনাচারকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা। ধাপে ধাপে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ বদলে ফেলেছে ওরা। অর্জন করে নিয়েছে আইনি ও সামাজিক বৈধতা। বাস্তবায়িত হয়েছে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের প্রচেষ্টা, আলফ্রেড কিনসির শ্রম, এবং হ্যারি হেই-দের স্বপ্ন। কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের রোপা বীজ বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তারপর তা পরিণত হয়েছে এক অন্ধকার অরণ্যে।

অধ্যায় ৭

কারিকুরি

গত দুই দশকে সমকামী আন্দোলনের বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর 'সমকামী' বলে আলাদা কোনো গোষ্ঠী, আলাদা কোনো সামষ্টিক পরিচয় অ্যামেরিকাতে ছিল না। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত অধিকাংশ মানুষ যেকোনো মূল্যে বিষয়টা গোপন রাখার চেষ্টা করত। অ্যামেরিকা জুড়ে পায়ুসঙ্গমের বিরুদ্ধে আইন ছিল। সত্তরের দশক পর্যন্ত সমকামিতা মানসিক রোগ হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিল।[১৬৭] কিন্তু আজ পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতা উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

সমকামী আন্দোলনের এই সাফল্যের পেছনে বড় একটা কারণ হলো পুরো আলোচনাটাকে তারা নিজেদের পছন্দের ছক বা ফ্রেমে নিয়ে যেতে পেরেছে। যারা সমকামিতার বিরোধিতা করেছেন, তাদের বড় একটা অংশ তা করেছেন এমন এক ছকের মধ্যে থেকে, যার সীমানা আর নিয়ম ঠিক করে দিয়েছে সমকামী আন্দোলন। আর এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে ভাষা আর শব্দের ব্যবহার।

ফ্রেমিং দা ডিবেইট

ধরুন, অসুস্থ হয়ে আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার আপনার হাতে ওষুধ ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা খেলে আপনার সুস্থ হবার সম্ভাবনা ৯০%। আপনি খুশি মনে ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু ডাক্তার যদি বলত, ১০% সম্ভাবনা আছে, ওষুধ খেলেও আপনার অবস্থার উন্নতি হবে না, তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া হতো উলটো। অথচ দুটো কথাই কিন্তু এক। প্রথমটা আপনার কাছে ইতিবাচক মনে হচ্ছে আর পরেরটা নেতিবাচক। এটাই ফ্রেমিংয়ের ক্ষমতা। একই তথ্যকে নানা ভাবে, নানা ছকে ফেলে উপস্থাপন করা যায়। আপনি কোন ছকে ফেলবেন সেটাই আপনার ফ্রেমিং।

ফ্রেমিং-এর আরেকটা উদাহরণ দিই। নির্বাচনের আগে দুই প্রার্থীর একজন বলল, নির্বাচিত হলে আমি ১০% ট্যাক্স কমিয়ে দেবো। আরেকজন বলল, নির্বাচিত হলে

---

[১৬৭] Bernstein, Mary. "Identities and politics: Toward a historical understanding of the lesbian and gay movement." Social Science History 26, no. 3 (2002), 540

আমি জনকল্যাণমূলক খরচ ১০% কমিয়ে দেবো। এখানেও মূল বক্তব্য এক। জনকল্যাণমূলক খরচের টাকা আসে জনগনের দেওয়া ট্যাক্স থেকে। কাজেই ট্যাক্স ১০% কমানো হলে জনকল্যাণমূলক খরচও কমবে। কিন্তু প্রথম কথাটা শুনতে ভালো লাগে। মানুষ প্রথম জনকে ভোট দেবে, পরের জনকে দেবে না। বেচারা নির্বাচনে জামানতও হারাতে পারে।

তথ্য বা প্রশ্নকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা আমাদের প্রতিক্রিয়া ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। কোনো বিষয়কে একপেশেভাবেও তুলে ধরা যায়। একে বলা হয় বায়াসড বা পক্ষপাতমূলক ফ্রেমিং—কোনো তর্ককে এমনভাবে উপস্থাপন করা, আপাতভাবে নিরপেক্ষ মনে হলেও যা আসলে নির্দিষ্ট পক্ষকে সুবিধা দেয়। এই কৌশলে কিছু অবস্থানকে বাদবাকি অবস্থানের চেয়ে বেশি যৌক্তিক, নৈতিক বা কাঙ্ক্ষিত হিসেবে দেখানো যায়। কাজটা করা হয় কোনো ইস্যুর কিছু দিকের ওপর জোর দিয়ে, কিছু বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে, আর আবেগী ভাষার চতুর ব্যবহারের মাধ্যমে।

ইসরাইলি দখলদারিত্ব নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়াতে যেভাবে আলোচনা হয়, সেটাকে বায়াসড ফ্রেমিং-এর আদর্শ উদাহরণ বলা যায়। ফিলিস্তিন ইস্যুটা আসলে কী? যায়োনিস্ট ইহুদিরা মুসলিমদের একটা ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে, সেখানকার মানুষদের ওপর জাতিগত নিধন চালিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের তাদের ভিটেবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে সেখানে ঘোষণা করেছে 'ইসরাইল রাষ্ট্র'। পবিত্র আল-আকসা মাসজিদ দখল করে রেখেছে। হত্যা আর যুলুম চালাচ্ছে প্রায় আশি বছর ধরে। তাই তো?

কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া ব্যাপারটা কীভাবে উপস্থাপন করে লক্ষ্য করুন। পশ্চিমা মিডিয়াতে বলা হয়, 'ইসরাইল বনাম হামাস সংঘাত' অথবা 'ইসরাইল বনাম পিএলও সংঘাত'। অথচ এটা ইসরাইলের সাথে কোনো একটা দলের 'সংঘাত' না। এটা যায়োনিস্ট ইহুদিদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মুসলিম ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষা ও মুক্তির লড়াই।

মিডিয়াতে বলা হয়, 'ইসরাইলের অধিকার আছে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার'। আপাতভাবে কথাটা খুব নিরীহ এবং নির্দোষ। কিন্তু এই কথার আসল অর্থ হলো, ইসরাইলের অধিকার আছে দখলদারিত্ব, জাতিগত নিধন আর গণহত্যা চালাবার। পশ্চিমা মিডিয়া ইসরাইলিদের আগ্রাসনে খুন হওয়া ফিলিস্তিনি নারী-শিশু-বৃদ্ধদের স্রেফ কিছু সংখ্যা হিসেবে তুলে ধরে। অন্যদিকে যায়োনিস্ট প্রাণহানি ঘটলে তাদের জীবনকাহিনি নিয়ে আবেগঘন গল্প ফাঁদে।

সবগুলো বায়াসড ফ্রেমিং-এর উদাহরণ। তথ্যগুলো এমন ছকে ফেলে উপস্থাপন

করা হচ্ছে, যা তৈরিই হয়েছে ইসরাইলকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। এই ছকের ভেতরে ঢুকে তর্ক করতে গেলে শুরু করার আগেই আপনি হেরে যাবেন। প্রতিপক্ষকে কাবু করতে হলে আলোচনাটাকে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে ওদের ঠিক করা ছকের বাইরে।

বায়াসড ফ্রেমিং-এর এই ব্যাপারটা সমকামী তথা এলজিবিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়। এ বিষয়ে মিডিয়াতে যত আলোচনা আছে, সব হয় কার্ক-ম্যাডসেনের মতো লোকদের ঠিক করা ছকের মধ্যে। এই ছকটা তারা তৈরি করেছে ভাষা, শব্দ আর পরিভাষার চতুর ব্যবহারের মাধ্যমে। যৌন বিকৃতির পক্ষে কীভাবে বায়াসড ফ্রেমিং কাজে লাগানো হয়, তার উদাহরণ হিসেবে তিনটি পরিভাষার দিকে তাকানো যাক।

'সমকামিতা'

'হোমোসেক্সুয়ালিটি' বা 'সমকামিতা' শব্দটাই শব্দের খেলার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। 'সমকামিতা' যে একটা বানোয়াট পরিচয় এ নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পাঠকের সুবিধার জন্য মূল কথাগুলো আবার মনে করিয়ে দিই।

'সমকামিতা' শব্দটা দিয়ে আচরণের বদলে যখন পরিচিতি বোঝানো হয়, তখন এর ভেতরে একটা বিশ্বাস মিশে থাকে। সে বিশ্বাসটা হলো সমকামিতা একটা স্বতন্ত্র পরিচয়। এই বিশ্বাস মেনে নিলে মেনে নিতে হয় আরও কিছু বিষয়। সমকামিতাকে অপরিবর্তনীয় এবং ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিষয় হিসেবে মেনে নিতে হয়। সমকামীদের একটি আলাদা গোষ্ঠী স্বীকৃতি দিতে হয়। আর একবার এ দুটো অবস্থান মেনে নিলে তাদের 'অধিকারের দাবি' অস্বীকার করার তেমন কোনো উপায় আসলে থাকে না।

একটা কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায়। কিন্তু একটা পরিচয়ের বিরুদ্ধে আপনি কী করবেন? কৃষ্ণাঙ্গ একটা পরিচয়, স্প্যানিয়ার্ড একটা পরিচয়, জ্যাপানিজ একটা পরিচয়। এ পরিচয়গুলোর জন্য কি কারও বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া যায়? কাউকে শাস্তি দেওয়া যায়? না, বরং পরিচয়কে গ্রহণ করে নিতে হয়।

সমকামিতার পক্ষে যত যুক্তিতর্ক আছে, তার সবগুলোর ভিত্তি হলো আচরণকে পরিচয় বানিয়ে ফেলা। যে মুহূর্তে কাজ বা আচরণ থেকে মনোযোগ সরিয়ে আলোচনাটা পরিচয়ের জায়গাতে যাবে, সেই মুহূর্তেই আসলে কাজটার বৈধতার ভিত্তি তৈরি হয়ে যাবে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এভাবে প্রায় যেকোনো জঘন্য অপরাধ এবং অনৈতিকতাকে স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

'সমকামিতার অধিকার' এর আলাপের ভিত্তি তৈরি হয় 'সমকামিতা'-কে একটা

পরিচয় হিসেবে ফ্রেম করার মাধ্যমে।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের শাব্দিক অর্থ 'যৌন অভিমুখ'। সহজভাবে বলা যায়, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন মানে যৌন রুচি বা আকর্ষণ। এই ধারণা আবিষ্কারের কৃতিত্বও কার্ল হাইরিখ উলরিখসের। তবে একে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলে অ্যালফ্রেড কিনসি। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন তত্ত্ব বলে, যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যারা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো—তারা সমকামী। যারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তারা অসমকামী। যারা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারা উভকামী।

এভাবে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, সুস্থতা ও বিকার সব ধরনের যৌন আচরণকে এই তত্ত্ব এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়। মুছে দেয় স্বাভাবিক যৌনতা আর বিকৃত যৌনতার পার্থক্য। এই পার্থক্য মুছে দেওয়া 'সমান অধিকারের' আলাপ তোলার জন্য খুবই জরুরি।

যৌন আকর্ষণ যদি অনেক রকমের হয়, আর সবই যদি সমান হয়, তাহলে কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণবোধ করলে, তাকে অপরাধী কেন বলা হবে? কেন তার সাথে বৈষম্য করা হবে? ভালোবাসা তো ভালোবাসাই, তাই না?

এভাবে একদিকে নৈতিকতার প্রশ্নটা সরিয়ে ফেলা হয়। অন্যদিকে তৈরি হয় অধিকারের আলাপ তোলার জায়গা। কিন্তু সমস্যা আছে এ ধারণাটার মধ্যেই। প্রথম সমস্যার দিকে তাকানো যাক।

আচ্ছা, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কি শুধু সমকামী, অসমকামী আর উভকামীর মধ্যে সীমিত? না কি এর আরও সংস্করণ থাকতে পারে? খোদ অ্যালফ্রেড কিনসির মত ছিল, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বহু ধরনের হতে পারে। এমন বহু লোক আছে, যাদের আকর্ষণ আরও অনেক 'বৈচিত্র্যময়'। কেউ পশুর প্রতি আকর্ষণবোধ করে (পশুকাম), কেউ শিশুর প্রতি (শিশুকাম), কেউ মৃতদেহের সাথে যৌনতার প্রতি আকৃষ্ট (নেক্রোফিলিয়া), আবার কেউ আকৃষ্ট হতে পারে নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে যৌনকর্মে (ইনসেস্ট)। এসব আকর্ষণের প্রতিটার জন্য রীতিমতো আলাদা আলাদা নাম ঠিক করা আছে।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের ধারণা মেনে নিলে এই আকর্ষণগুলোর পক্ষেও অধিকারের দাবি তোলা যায়। সমকামীরা হয়তো বলতে পারে, পেডোফিলিয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতি থাকে না, তাই এটা খারাপ। কিন্তু এই আপত্তি নেক্রোফিলিয়া, অজাচার

কিংবা পশুকামের ক্ষেত্রে খাটবে না।[১৬৮] এছাড়া ১৮ বছরের আগে মানুষ সম্মতি দিতে পারে না, এ কথাটা নিয়েও আপত্তি আছে প্রচুর। অনেকেই—এদের মধ্যে বিভিন্ন সমকামী অ্যাকটিভিস্ট এবং অ্যাকাডেমিকও আছে—দাবি করে, শিশুরা যৌনকাজে সম্মতি দিতে পারে। কাজেই শিশুকাম, পশুকাম, অজাচারেরও অধিকার থাকা উচিত, তাই না? ভালোবাসা তো ভালোবাসাই!

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের ধারণা মেনে নিলে কার্যত যেকোনো ধরনের বিকৃত যৌনতাকে অধিকার-সংখ্যালঘু-বৈষম্যের ছকে ফেলে বৈধতা দেওয়া সম্ভব।

এই ধারণার আরেকটা মৌলিক সমস্যা হলো, আকর্ষণ আর আচরণ এক না। মাথার ভেতরের চিন্তা, মনের ভেতরের আবেগ, আর বাস্তব পৃথিবীতে করা কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা মানুষের কাজের বিচার করি। তার মন আর মস্তিষ্কে কী আছে, সেটা জানা এবং বিচার করা সমাজের দায়িত্ব না। কেউ সারাদিন মনে মনে কাউকে খুন কিংবা রেইপ করা নিয়ে ফ্যান্টাসি করতে পারে। আমরা তার চিন্তাভাবনাকে অসুস্থ বলতে পারি, কিন্তু স্রেফ চিন্তা করার কারণে কেউ তাকে শাস্তি দেবে না। একইসাথে কারও কিছু করতে ইচ্ছা করলেই তাকে সেটা করতে দিতে হবে, সেটাকে অধিকার বানিয়ে ফেলতে হবে—এটাও একেবারে অযৌক্তিক কথা। এই তত্ত্ব আকাঙ্ক্ষা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য মুছে দিয়ে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দিতে চায়।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন একটি বানোয়াট ধারণা, যা তৈরি করা হয়েছে যৌন বিকৃতির বৈধতা দেওয়ার জন্য। এই ধারণাগুলো শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। দিনশেষে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা ছাড়া অন্য সব ধরনের যৌনতা, তা সমলিঙ্গের মধ্যে হোক, পশু, মৃতদেহ বা অন্য কিছুর সাথে হোক, বিকৃতি।

সমকামবিদ্বেষ

বায়াসড ফ্রেমিং আর শব্দের খেলার আরেকটা উদাহরণ হলো 'সমকামবিদ্বেষ' বা 'হোমোফোবিয়া' শব্দটা। ফোবিয়া (phobia) শব্দের অর্থ কোনোকিছুর প্রতি অযৌক্তিক ভীতি। ফোবিয়াকে বাতিক হিসেবে দেখা হয়। আর 'হোমো' (homo) শব্দের অর্থ যদিও 'সম' বা এক (same), তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো সমকামিতা। তাহলে হোমোফোবিয়া'র শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় সমকামী বা সমকামিতার প্রতি অযৌক্তিক ভয়ের বাতিক। এই শব্দের মাধ্যমে সমকামিতার বিরোধিতাকে মানসিক বিকার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বিকৃতির বিরোধিতাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে অযৌক্তিক ঘৃণা হিসেবে। যারা কালোদের অধিকারের বিরোধিতা করে, তারা বর্ণবাদী। যারা সমকামীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তারা সমকামবিদ্বেষী, হোমোফোবিক।[১৬৯]

---

[১৬৮] নতুন মাদকযুদ্ধ আর রংধনুর রাজনীতি।

[১৬৯] বাংলা ভাষায় এমন লেখালেখির নমুনা হিসেবে দেখতে পারেন বিবিসি বাংলা'র এই প্রতিবেদনটি, 'সমকামিতা কি কোনো রোগ? চিকিৎসা করিয়ে কি একে সারিয়ে তোলা যায়?', বিবিসি বাংলা, ২২

ঘৃণার এই অভিযোগ বেশ কার্যকর। এভাবে প্রতিপক্ষকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। যখন বলা হবে আপনি ঘৃণাজীবী, আপনি বিদ্বেষ দ্বারা চালিত, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি এই অভিযোগের খণ্ডন করতে ব্যস্ত হয়ে যাবেন। আপনি আসলে ঘৃণা করেন না, কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখেন না—এসব প্রমাণে তখন আপনাকে কথা বলতে হবে। এ সুযোগে আলোচনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে সমকামীরা।

পাশাপাশি বিদ্বেষ-এর সংজ্ঞা যেহেতু তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে, তাই কোন কাজগুলো 'ঘৃণা' আর 'বিদ্বেষ' বলে গণ্য হবে সেটাও তারাই ঠিক করবে। আর যেমনটা আমরা কার্ক-ম্যাডসেনের আলোচনা থেকে দেখেছি, যতক্ষণ আপনি তাদের মৌলিক অবস্থানের সাথে একমত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তাদের চোখে আপনার অবস্থান হলো ঘৃণা আর বিদ্বেষের। কাজেই যত চেষ্টাই করুন না কেন, ঘৃণা আর বিদ্বেষের ট্যাগ থেকে মুক্তি পাবেন না। একমাত্র উপায় হলো, তাদের অবস্থান পুরোপুরি মেনে নেওয়া।

এখানে করণীয় হলো, 'সমকামবিদ্বেষ' বা 'হোমোফোবিয়া' শব্দগুলো এবং এর পেছনের চিন্তার কাঠামো প্রত্যাখ্যান করা। দখলদার ইসরাইল রাষ্ট্রের সমর্থকরা যেমন যায়নবাদের যৌক্তিক বিরোধিতাকে ইহুদিবিদ্বেষ (অ্যান্টি-সেমিটিসম) হিসেবে দেখায়, তেমনি সমকামীরা বিকৃত যৌনতার বিরোধিতাকে 'বিদ্বেষ' ও 'ঘৃণা' হিসেবে দেখাতে চায়। এই শব্দ ও সংজ্ঞাকেই তাই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

সমকামী আন্দোলন শব্দের কারসাজিতে আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। খেলার ছকটা এমনভাবে সাজায়, যাতে ফলাফল সবসময় তাদের পক্ষে যায়। কার্ক-ম্যাডসেন তাদের কুখ্যাত বইয়ে বলেছিল, প্রোপাগ্যান্ডার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শব্দের অর্থ আর সংজ্ঞা নিয়ে খেলা। তাদের ভাষায়,

> শব্দকে ভেঙে, আলাদা করে, হেরফের করে নতুন অর্থ তৈরি করা যায়। আর শব্দ নিয়ে খেলার এই ক্ষমতা আমাদের প্রস্তাবিত ক্যাম্পেইনের সমস্ত অন্তর্নিহিত নীতির ভিত্তি।[১৭০]

কথাটা ওরা বুঝেছে, আমাদেরও বোঝা দরকার।

সমকামিতার পক্ষে যুক্তি

এবার আসুন, সমকামিতার পক্ষে বহুল ব্যবহৃত দুটি যুক্তির দিকে তাকানো যাক। সমকামীদের নানা কলাকৌশলের বাস্তবতা আগেকার অধ্যায়গুলোর আলোচনার সুবাদে স্পষ্ট হয়ে যাবার কথা। তবু গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা তাদের প্রধান দুটি যুক্তির দিকে এখন তাকাবো। এই যুক্তি দুটি হলো,

---

সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[১৭০] After the Ball (Doubleday, 1st edition, May 1989) p. 149.

- সমকামিতা জন্মগত
- প্রকৃতিতে সমকামিতা আছে

সমকামিতা জন্মগত

বিকৃত যৌনতার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৌশল হলো, সেটাকে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বলা। সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতাকে জন্মগত বলে চালানোর চেষ্টা চলছে সেই উনবিংশের সময় থেকেই। উনবিংশের প্রধান দাবি ছিল, কিছু মানুষ জন্ম থেকেই যেহেতু এমন, তাই সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় বাধা দেওয়া অমানবিক। তাদেরকে এভাবেই মেনে নিতে হবে। হুবহু এ যুক্তিটাই সংবিধানের ব্যাখ্যা আর আইনি সংস্কারের অংশ হিসেবে মার্কিন সমকামী আন্দোলন কাজে লাগিয়েছে আশির দশকে। আসুন, এর পেছনের কাহিনিটা জেনে নেওয়া যাক।

মার্কিন সংবিধানে নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসির অধিকার দেওয়া হয়েছে। অধিকারের এই যুক্তি দিয়ে আশির দশকের প্রথম দিকে বিকৃত যৌনতার বৈধতা আনার চেষ্টা করেছিল সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা। ১৯৮২ সালে শুরু হওয়া বাওয়ারস বনাম হার্ডউইক মামলায় তারা দাবি করেছিল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেমন ব্যক্তিগত বিষয়, তেমনি সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতাও ব্যক্তিগত বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর বেডরুমে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। একইভাবে সমকামীরা ঘরের ভেতর যাই করুক না কেন, সেখানেও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এমন করা করা হলে সেটা হবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসির অধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু অ্যাক্টিভিস্টদের এ যুক্তি মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দেয়।[illegible]

সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা হাল ছাড়ে না। তারা নতুন কৌশল খুঁজতে শুরু করে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও যায় এক মোক্ষম কৌশল। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, কোনো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যদি তাদের অপরিবর্তনীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়, তাহলে 'সাসপেক্ট ক্লাস' হিসেবে তারা বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষা পাবে।

'সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য'—এই শর্তের মধ্যে তুরুপের তাস পেয়ে গেল সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা। 'সমকামিতা'কে যদি জন্মগত/অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা যায়, তাহলে তারা সাংবিধানিক সুরক্ষা পাবে। আর এই সুরক্ষার ছাতার নিচে আশ্রয় পাবে তাদের বিকৃত যৌনতা। যুক্তিটা আসলেই চমৎকার। ব্যাপারটা নিয়ে ধাপে ধাপে চিন্তা করুন।

সমকামিতাকে জন্মগত বলার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া আচরণকে পরিচয় বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

[illegible] [illegible] Bowers v. Hardwick 478 U.S. 186 (1986)

> কিছু মানুষ সাদা চামড়া নিয়ে জন্মায়, কিছু মানুষ জন্মায় কালো চামড়া নিয়ে। কিছু মানুষ জন্মগতভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, কিছু মানুষ সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কৃষ্ণাঙ্গরা যেমন আলাদা একটা জনগোষ্ঠী, তেমনি সমকামীরা আলাদা জনগোষ্ঠী।

এই 'পরিচয়ের' ভিত্তিতে নিজেদের তারা বৈষম্যের শিকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বলে দাবি করতে পারছে,

> শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত সমাজে কৃষ্ণাঙ্গরা ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার। অসমকামী নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় সমকামীরা বৈষম্যের শিকার।

তারপর কৃষ্ণাঙ্গদের মতো প্রকৃত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য গড়ে ওঠা আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো ব্যবহার করতে পারছে বিকৃত যৌনতার বৈধতার পক্ষে।

> একজন কালো মানুষকে যেমন তার চামড়ার রঙ বদলাতে বলা যায় না, তেমনিভাবে একজন 'সমকামী'কে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা বন্ধ করতে বলা যায় না। স্রেফ কালো হবার কারণে কাউকে বাসা ভাড়া না দেওয়া যদি বেআইনি বৈষম্য হয়, তাহলে বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত কোনো লোককে বাড়িওয়ালা বাসা ভাড়া দিতে না দিতে চাইলে, সেটাও বেআইনি।

সমকামিতাকে জন্মগত বলা আইনি ও রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়। মার্কিন আদালতগুলো এ যুক্তি মেনে নেয়। বিকৃত যৌনতার বৈধতা, সমকামীদের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখা, তাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া—এই সবকিছুর কেন্দ্রে আছে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতাকে জন্মগত অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখানো। এ কারণেই এই দাবি বা যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা জরুরি।

ফাঁকফোকর

কিন্তু সমস্যা হলো, 'সমকামিতা' জন্মগত হবার কোনো প্রমাণ নেই। কেউ 'সমকামী' কি না, তা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির দাবির ওপর। এমন কোনো টেস্ট নেই, যা দিয়ে তার কথার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। তাছাড়া নিজেদের যারা সমকামী বলে পরিচয় দেয়, তাদেরই বড় একটা অংশ আবার জোর দিয়ে বলে—তারা জন্মগতভাবে না, বরং স্বেচ্ছায় সমকামী হয়েছে। নিজেকে লেসবিয়ান বলে পরিচয় দেওয়া ক্যামিল পা'গিয়া, তার বই *ভ্যাম্পস অ্যান্ড ট্র্যাম্পস*-এ লিখেছেন,

> সমকামিতা 'স্বাভাবিক' না। বরং সমকামিতা হলো স্বাভাবিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা... আমরা পছন্দ করি বা না করি, বাস্তবতা হলো প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে। আর প্রকৃতিতে একমাত্র নিরন্তর নিয়ম হলো প্রজনন, বংশবৃদ্ধি। এটাই

> স্বাভাবিক, এটাই নিয়ম। আমাদের যৌন শরীরগুলো তৈরি হয়েছে প্রজননের উদ্দেশ্যে... চটকদার শব্দের খেলা দিয়ে এই বায়োলজিকাল বাস্তবতাকে বদলানো যাবে না।[১৭২]

জার্নাল অফ হোমোসেক্সুয়ালিটির সম্পাদক এবং স্যান ফ্রানসিসকো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জন ডিসেক্কো তার বইতে খোলাখুলি লিখেছেন, সমকামিতা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয় হবার এই পুরো ধারণটা আসলে 'সমকামী রাজনীতি', যে রাজনীতির উদ্দেশ্য 'সমকামী অধিকার' অর্জন।[১৭৩] আর সমকামী অধিকার অর্থ তাদের যৌন আচরণের বৈধতা। সমকামী রাজনৈতিক লেখক ড্যাভিড বেনকফ লিখেছে,

> নৃতত্ত্ববিদরা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে কোথাও কোনো সমকামী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সন্ধান পাননি। বিশেষজ্ঞদের মতে... 'সমকামী হওয়া' সাম্প্রতিক সময়ের নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা একটা ধারণা।[১৭৪]

সমকামিতা যে অপরিবর্তনীয় না, বরং যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে এ আসক্তি থেকে মুক্তি সম্ভব, এ নিয়ে কথা বলেছেন অ্যামেরিকান সাইকায়েট্রিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস কামিংস-ও। ইউএসএ টুডে-তে লেখা এক কলাম থেকে তার বক্তব্য দেখা যাক,

> ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সময়টাতে স্যান ফ্রানসিসকোতে সমকামীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি দু হাজারের বেশি এমন রোগী দেখেছি, যারা সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আমার স্ট্যাফ এমন আরও কয়েক হাজার রোগীকে নিয়ে কাজ করেছে... আমার দেখা রোগীদের অনেকেই নিজেদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বদলাতে ইচ্ছুক ছিল। তাদের মধ্যে শত শত জন সফলও হয়েছেন। কিন্তু তখন থেকেই এ ব্যাপারে সাইকোথেরাপির ভূমিকার রাজনীতিকরণ হয়েছে।
>
> আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সমকামী অধিকার অ্যাক্টিভিস্টরা জনগণকে বোঝাতে চাচ্ছে, সমকামিতা একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য। সমলিঙ্গের প্রতি সব আকর্ষণকে অপরিবর্তনীয় দাবি করা আসলে বাস্তবতার বিকৃতি। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বদলানোর সব থেরাপিকে অনৈতিক বলার ফলে মূলত রোগীদের সিদ্ধান্তকে

---

[১৭২] Paglia, Camille. "Vamps & Tramps. New Essays (1994)." New York: Vintage.

[১৭৩] De Cecco, John P., and John P. Elia. If You Seduce a Straight Person, Can You Make Them Gay?: Issues in Biological Essentialism Versus Social Constructionism in Gay and Lesbian Identities. Vol. 24, no. 3-4. Psychology Press, 1993. p. 17-18.

[১৭৪] Nobody is 'born that way,' gay historians say in The Daily Caller (19th March 2014).

> অগ্রাহ্য করা হয় এবং বহিরাগত একটা পক্ষকে রোগীদের সিদ্ধান্তের ওপর আপত্তি তোলার ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়।[১৭৫]

খোদ অ্যালফ্রেড কিনসির অবস্থানও সমকামিতা জন্মগত হবার দাবির সাথে মেলে না। কিনসির স্পষ্ট অবস্থান ছিল যৌনতা বর্ণালীর মতো, মানুষ যখন ইচ্ছে যেকোনো 'রঙ' বেছে নিতে পারে।

সমকামিতা জন্মগত প্রমাণের বহু ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে অনেক সমকামী বিজ্ঞানী নানা তত্ত্ব হাজির করে সমকামিতাকে প্রাকৃতিক এবং অপরিবর্তনীয় প্রমাণের চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ 'সমকামী জিন' (gay gene) আবিষ্কারের দাবি করেছে। অর্থাৎ এমন কোনো বিশেষ জিন, যার কারণে কিছু মানুষ সমকামী হয়ে জন্মায়। কিন্তু এ সবগুলো গবেষণার ফলাফল অন্য পরীক্ষায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে, অথবা গবেষণা পদ্ধতিতে বড় ধরনের ত্রুটি পাওয়া গেছে, অথবা দেখা গেছে গবেষণায় যা প্রমাণিত হয়নি, গবেষক সেটাই দাবি করে বসে আছে। ২০১৯ সালে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের ওপর চালানো এক মেগা স্টাডিতে ফল এসেছে, সমকামী জিন বলে কিছু নেই।[১৭৬]

সমকামিতাকে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বলার পেছনে তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, এ কথা স্বীকার করেন ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়ের সমকামী প্রফেসর জন ডি এমিলিও। প্রমাণ না থাকলে কেন বারবার এ কথা বলা হয়? ডিএমিলিও-এর মতে এর পেছনে কারণ হলো, এই ধারণাটা সমকামী আন্দোলনের কাজে লাগে। ডিএমিলিও-এর ভাষায়,

> আমার কাছে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক লাগে তা হলো, 'জন্মগত সমকামী' ব্যাপারটার পেছনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খড়ের মতো পাতলা (নেই বললেই চলে)। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এই ধারণার সামাজিক উপযোগিতা এতই বেশি যে, এটাকে আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে খুব বেশি প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।[১৭৭]

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা জন্মগত পরিচয় না, স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া আচরণ। একে 'পরিচয়' বানানো হয়েছে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে। 'সমকামী' অ্যাক্টিভিসমের জন্য রীতিমতো পুরস্কার জেতা ড. লিলিয়ান ফেইডারম্যানের উদ্বৃতি দিয়ে শেষ করি,

---

[১৭৫] 'Southern Poverty Law Center wrongly fighting against patients' right to choose' in USA Today 30th July 2013.

[১৭৬] Lambert, Jonathan. "No 'gay gene': study looks at genetic basis of sexuality." (2019): 14-15.

[১৭৭] Wolf, Sherry. "LGBT Liberation: Build a Broad Movement: Interview with John D'Emilio." International Socialist Review 65 (2009).

> যদিও সমকামী পরিচয়ের ধারণা একটি সামাজিক নির্মাণ (সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট) ছাড়া আর কিছুই না, কিন্তু এই পরিচয়ই আমাদেরকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হবার এবং সংখ্যালঘু হিসেবে প্রাপ্য অধিকার দাবি করার সক্ষমতা দিয়েছে... আজ যদি আমরা স্বীকার করি 'গে' আর 'লেসবিয়ান' আসলে কোনো পরিচয় না, বরং মাঝে মাঝে করার ইচ্ছা জাগে এমন আচরণ (a 'sometime behavior'), তাহলে আমাদের আন্দোলনের কী হবে?[১৭৮]

প্রকৃতিতে পাওয়া যায়

সমকামিতার পক্ষে দেওয়া আরেকটা যুক্তি হলো, প্রকৃতিতে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার উদাহরণ আছে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে এমন আচরণ দেখা যায়। অতএব, মানব সমাজেও সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক।

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে এ যুক্তিটাও খুব সহজে ভেঙ্গে পড়ে।

প্রথমত, এই দাবিটা নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়। যেসব আচরণকে কিছু গবেষক সমকামী আচরণ বলছেন, তার সবগুলোকে কি সত্যিকার অর্থে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা বলা যায়? কুকুর, বানরের মতো বিভিন্ন প্রাণীকে 'উত্তেজিত' অবস্থায় চেয়ার কিংবা গাছের গুড়ির মতো অনেক জড় বস্তুর ওপরও 'চড়াও' হতে দেখা যায়। এগুলোকে কি প্রাণীজগতে 'বস্তুকাম' জাতীয় কিছুর উদাহরণ বলা হবে?

আরেক দিক থেকে চিন্তা করুন। পৃথিবীতে সব মিলিয়ে কমসেকম ৮৭ লাখ প্রজাতির প্রাণী আছে।[১৭৯] অনেকে মনে করেন সংখ্যাটা কোটিরও বেশি। এত প্রজাতির মোট কত শতাংশের মধ্যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার ব্যাপারটা ঘটে? যদি আদৌ এগুলোকে 'সমকামী আচরণ' বলা যায়?

ধরা যাক, এমন আচরণ দেখা যায় দুই হাজার প্রজাতির মধ্যে (প্রকৃত সংখ্যাটা আরও অনেক কম)।[১৮০] এর অর্থ, প্রকৃতিতে এমন আচরণ পাওয়া যায় মাত্র ০.০২% ক্ষেত্রে। পুরো প্রাণীজগতের মধ্যে ০.০২% পরিসংখ্যানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ না। এর দ্বারা সমকামিতা 'প্রাকৃতিক' বা 'স্বাভাবিক' বলে প্রমাণ হয় না, উলটোটা প্রমাণ হয়।

---

[১৭৮] The Advocate, 9th May 1995, p.43

[১৭৯] How many species on Earth? About 8.7 million, new estimate says, ScienceDaily, 2011, https://tinyurl.com/yc2m6jr4

[১৮০] এব্যাপারে এ তত্ত্বের সমর্থকদের মধ্যেই বিভিন্ন মত আছে, কেউ বলেছে সংখ্যাটা ৫০০ এর বেশি, কেউ বলেছে, কেউ বলেছে ১৫০০ এর বেশি। Bagemihl, Bruce. Biological exuberance: Animal homosexuality and natural diversity. Macmillan, 1999. Monk, Julia D., Erin Giglio, Ambika Kamath, Max R. Lambert, and Caitlin E. McDonough. "An alternative hypothesis for the evolution of same-sex sexual behaviour in animals." Nature ecology & evolution 3, no. 12 (2019): 1622-1631.

দ্বিতীয়ত, আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, প্রকৃতিতে এমন আচরণ আসলেই ঘটে এবং এমন আচরণের হার পরিসংখ্যানগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, তাতেও কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হয় না। প্রকৃতিতে কোনো আচরণ থাকার অর্থ কি সেটা সঠিক হওয়া?

প্রাণীজগতে 'ক' আচরণ দেখা যায়,

অতএব মানুষের জন্যও 'ক' আচরণ স্বাভাবিক, সঠিক এবং প্রাকৃতিক

এটা কি খুব শক্ত অবস্থান? এই অবস্থান কি আসলে ধরে রাখা সম্ভব?

প্রকৃতিতে সেক্সুয়াল ক্যানিবালিসম দেখা যায়। ব্ল্যাক উইডো নামে এক জাতের মাকড়শা আছে। যৌনসঙ্গমের পর মেয়ে মাকড়শা পুরুষ সঙ্গীকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে। প্রেয়িং ম্যানটিস নামের পতঙ্গের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটা দেখা যায়। সঙ্গমরত অবস্থাতেই পুরুষ সঙ্গীকে খেতে শুরু করে নারী। যৌনসঙ্গমের আগে আগে সম্ভাব্য সঙ্গীণির ওপর তীব্র গতিতে প্রস্রাব ছিটিয়ে দেয় পুরুষ সজারু। প্রজাপতি, হনুমান, সিংহ, ইদুরসহ বিভিন্ন প্রাণী নিজ প্রজাতির শিশুদের হত্যা করে। কখনো নিজের কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য, কখনো নিহত শিশুর মায়ের সাথে সঙ্গমের লোভে। শিশু সীলদের ধর্ষণ এবং হত্যা করে সমুদ্রের ভোঁদড় (সী-অটার)। পেঙ্গুইনের একটা জাত আছে, যারা নিজ প্রজাতির নারীদের গণধর্ষণ করে। অনেক সময় সঙ্গম করে মৃতদেহের সাথে। কোনো কারণ ছাড়া পরপইস নামের প্রাণীকে টর্চার এবং হত্যা করার মতো আচরণ দেখা যায় ডলফিনদের মধ্যে। নিজ প্রজাতির নারীদের দলবেঁধে ধর্ষণও করে পুরুষ ডলফিনরা।

'প্রকৃতিতে আছে তাই স্বাভাবিক, মেনে নেওয়া উচিত'—এই যুক্তি অনুযায়ী বলতে হবে ওপরের প্রত্যেকটা কাজ প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে এমন আচরণ দেখা গেলে আমাদের এগুলো স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া উচিৎ। কারণ, এগুলো ন্যাচারাল।

কিন্তু কোনো সুস্থ মানুষ এমন কথা বলে না। যারা সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ চায়, তারাও (সম্ভবত) এমন বলবে না। অর্থাৎ এই যুক্তি আসলে কাজ করে না। প্রাণীজগতের মাঝে কোনো আচরণ থাকা সেটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক, সঠিক এবং অনুকরণীয় গণ্য হবার জন্য যথেষ্ট না। যদি যথেষ্ট হতো তাহলে এসব আচরণের পক্ষেও প্রাণীজগত থেকে দলিল দেখানো যেত।

তৃতীয়ত, একটা পাল্টা যুক্তি চিন্তা করুন। প্রাণীজগতে প্রত্যেক প্রজাতির প্রধান লক্ষ্য বংশবৃদ্ধি করা। প্রজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে প্রজননের ওপর। যেহেতু সব প্রজাতি বংশবৃদ্ধি করে এবং সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি সম্ভব না, তাহলে উপসংহার টানা যায়, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা অস্বাভাবিক, প্রকৃতি

বিরুদ্ধ। প্রজাতির স্বার্থবিরুদ্ধ। বিবর্তনের দিক থেকে চিন্তা করলে সমকামিতা আসলে যেকোনো প্রজাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা। সুন্দর বাগান বানাতে হলে যেভাবে আগাছা উপড়ে ফেলা প্রয়োজন, তেমনিভাবে কোনো প্রজাতিকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার স্বার্থে সমকামিতাকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার—যুক্তি দেওয়া যায় এমনও। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত লোকেদের সন্তান দত্তক নিতে দেওয়াও উচিত না। কারণ, বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সন্তান পালনের অনুপযুক্ত।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, পশুর মতো হওয়া কখনোই মানবজাতির লক্ষ্য ছিল না। মনুষ্যত্বের অন্তত একটা শর্ত হলো, পশুত্ব থেকে যথাসম্ভব বের হয়ে আসা। কিন্তু আধুনিক মানুষ করছে উলটোটা। তারা পশুর কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করছে, পশুকে দিয়ে নিজের অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে, আর তারপরও দিন দিন তার আচরণ হচ্ছে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

***

এ অধ্যায়ে আমরা যা আলোচনা করলাম, সেগুলোর বাইরেও অনেক ধারণা আর 'যুক্তি' সমকামিতার পক্ষে ব্যবহার হয়। তবে ঘুরেফিরে তাদের সব যুক্তিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু একটাই। কিছু ঐচ্ছিক আচরণকে (সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা) একটা পরিচয়ে পরিণত করা। তারপর এই পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে অধিকার দাবি করা। অথচ এখানে মূল তর্কটা আসলে বিকৃত যৌনতার নৈতিকতা নিয়ে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার ওপর এর প্রভাব নিয়ে। সমকামীদের সব যুক্তিতর্ক আর বুলির মূল উদ্দেশ্য হলো আলোচনাটা নৈতিকতার জায়গা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া।

সমকামী আন্দোলন এমন কিছু শব্দ, কাঠামো এবং পরিভাষা ব্যবহার করে, যেগুলোর ভেতরে নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস ও ধারণা মিশে আছে। এগুলো গ্রহণ করে তর্ক করতে যাওয়া মানেই তাদের মূল বক্তব্য মেনে নেওয়া। আপনি যত ভালো বিতার্কিক-ই হন না কেন, একবার এগুলো মেনে নিলে দিনশেষে আপনি তাদের কাছে হেরে যাচ্ছেন।

সমকামী আন্দোলনের কৌশলগুলো বুঝতে এবং মোকাবিলা করতে হলে শব্দের এ খেলাগুলোর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তর্কটা বের করে নিয়ে যেতে হবে তাদের পছন্দের ছক থেকে। প্রশ্ন করতে হবে তাদের যুক্তিতর্কের পেছনে থাকা বিশ্বাস ও পূর্বধারণাগুলোকে।

অধ্যায় ৮

বিকৃতির ধ্রুবক

সমকামী আন্দোলনের ১৬০ বছরের লম্বা ইতিহাসে অনেক কিছু বদলালেও কিছু বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থেকে গেছে। অন্য অনেক তর্ক-বিতর্কের কারণে এই ব্যাপারগুলো অনেক সময় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু এ আন্দোলন কীভাবে কাজ করে, কীভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়, তা বুঝতে হলে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মূল্যবোধ বদল

সমকামী আন্দোলন শুরু থেকেই চেয়েছে সমাজের মূল্যবোধকে বদলে দিতে। মূল্যবোধের কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়া ছিল তাদের স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত। এই আন্দোলন তাই সবসময় অবাধ যৌনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। উসকে দিয়েছে অনৈতিকতা।

যে সমাজে যৌনতা কেবল বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে বিকৃত যৌনতার স্বীকৃতি আসা সম্ভব না। সমাজ যখন অবাধ যৌনতা মেনে নেয়, তখন অবধারিতভাবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে এবং পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজে যিনা বাড়ে। ক্ষয় হতে থাকে সমাজের কাঠামো। এই দুর্বলতাই প্রস্তুত করে বিকৃতির বৈধতার মঞ্চ। যে সমাজ অবাধ যিনা মেনে নিয়েছে, তা কখনোই সমকামিতার বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে শক্ত অবস্থান নিতে পারে না। তার নৈতিক ভিত্তি যে এরই মধ্যে ফাঁপা হয়ে গেছে।

তাই কোনো সমাজে সমকামিতাকে স্বাভাবিক করতে হলে, আগে সেখানে যিনা এবং অবাধ যৌনতার প্রচলন ঘটাতে হবে। বদলে দিতে হবে পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা। প্রচলিত ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গায় এমন এক মূল্যবোধ আনতে হবে, যেখানে মানুষের ইচ্ছা, সুখ আর নাফসই সব। আর এজন্যেই পশ্চিমে সমকামিতার বৈধতা এসেছে যৌন বিপ্লবের পরে, আগে না।

সমকামীরা যে অনৈতিকতা উসকে দিতে চায়, তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো গর্ভপাতের প্রতি তাদের সমর্থন। ১৯৭৩ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দেবার পর গত ৪৭ বছরে শুধু অ্যামেরিকাতেই ৫ কোটির বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন

করা হয়েছে।[১৮১] শুরু থেকে সমকামীরা ইচ্ছেমতো গর্ভপাতের 'স্বাধীনতার' পক্ষে কথা বলে আসছে। কেন? তাদের তো গর্ভধারণের 'সমস্যা' নেই!

কারণ, তারা জানে গর্ভপাত অবৈধ হলে বাধ্য হয়েই সমাজে যিনাকে সীমিত করার চেষ্টা করতে হবে। যদি নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনতা টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে গর্ভপাতের বৈধতা দিতে হবে। এজন্যই সমকামীরা গর্ভপাতের 'অধিকার' চায়।

পরিবারের বিরুদ্ধে সমকামী আন্দোলনের অবস্থানও গোপন কিছু না। ১৯৭১ সালে ব্রিটেনে গে লিবারেশন ফ্রন্ট নামের সমকামী সংগঠন তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিল। এতে তারা স্পষ্টভাবে বলে,

> 'আমাদের অবশ্যই পরিবারকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্য রাখতে হবে।'[১৮২]

সমকামীরা শুধু সমকামিতার বৈধতা চায় না, তারা বৈধতা চায় সব ধরনের অবাধ ও যৌন বিকৃতির।

হাইড্রা

গ্রিক পুরানের এক দানব হাইড্রা। তার নাকি ছিল নয় মাথা। একটা মাথা কাটলে তার জায়গায় দুটো গজিয়ে যেত। সমকামী আন্দোলনের মধ্যে হাইড্রার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই আন্দোলন একেক সময় একেক ধরনের যুক্তিতর্ক ব্যবহার করে। একটা খণ্ডন করা হলে আরও দুটো নিয়ে আসে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সমকামিতা নিয়ে তারা অ্যাকাডেমিকভাবে আলোচনা করেছে মানুষের সহানুভূতির অর্জনের জন্য, যৌন বিপ্লবের সময় স্রোতের টানে প্রকাশ্যে সমাজকে চ্যালেঞ্জ করেছে, আবার হাওয়া বদলে যাবার সাথে সাথে সমাজকে মেনে নেওয়ার অভিনয় করে গেছে। যখন যে অবস্থান সুবিধাজনক মনে হয় সেটাই গ্রহণ করেছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী স্লোগান বানিয়েছে, তারপর আবার পালটে ফেলেছে। একসাথে কাজ করে গেছে কয়েক ফ্রন্টে।

এসব কারণে সমকামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থান পরস্পরবিরোধী। একদিকে পরিচয় আর অধিকারের বুলি আওড়ায়, অন্যদিকে নিজেদের সব আন্দোলনের কেন্দ্র বানায় পায়ুসঙ্গমের বৈধতার প্রশ্নকে।[১৮৩] এইডসকে সমকামীদের রোগ বললে ক্ষেপে যায়, আবার সবচেয়ে বেশি এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠী হবার পরও সমকামীদের যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয় না বলে হাহুতাশ করে।

---

[১৮১] Abortion in numbers, thelifeinstitute.net- tinyurl.com/mus42brk

[১৮২] *Manifesto*. Gay Liberation Front (UK), written in 1971 in London and revised in 1978 https://tinyurl.com/yuz9z45u

[১৮৩] *Bernstein*, 'Identities and Politics', 553

এই পরস্পরবিরোধিতা নিয়ে সমকামীরা মাথা ঘামায় না। সত্য তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না, সমাজের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ না। তাদের কাছে গুরুত্ব পায় কেবল তাদের স্বার্থ, তাদের ক্ষুধা, তাদের তৃপ্তি। যেকোনো মূল্যে এগুলো নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য।

বেপরোয়া

যৌনতাই যেহেতু সমকামী অ্যাক্টিভিস্টদের জীবন ও পরিচয়ের মূল কেন্দ্র, তাই অ্যাক্টিভিসমকে তারা বেশ গুরুত্বের সাথে নেয়। স্বাভাবিক মানুষের মতো সন্তান ও পরিবার নিয়ে মাথা ঘামাতে না হওয়ায় আন্দোলনের পেছনে অর্থ ও সময় খরচেও এগিয়ে থাকে তারা। সমকামীরা বেপরোয়া। এজেন্ডার প্রতি তাগিদ, নিজেদের 'ভিকটিম' মনে করা এবং সমাজকে শত্রু ও শোষক হিসেবে দেখার কারণে যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণে সমকামীরা পিছপা হয় না। তাদের আন্দোলনের সফলতার পেছনে এ বিষয়গুলোও নিঃসন্দেহে ভূমিকা রেখেছে।

ত্বরণ

সময়ের সাথে সাথে মাত্রাবৃদ্ধি সমকামী আন্দোলনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য। দিন দিন তাদের দাবি বেড়েছে। প্রথমে তারা আসে সহানুভূতি চাইতে। তারপর অধিকারের কথা বলে। তারপর বিশেষ সুবিধা চায়। একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে রাষ্ট্রের শক্তি ব্যবহার করে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে।[১৮৪] সবশেষে আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করে সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর। অ্যামেরিকার গত সাত দশকের ইতিহাস এ কথাগুলোর অকাট্য প্রমাণ।

তারা মিডিয়া, প্রশাসনিক এবং রাষ্ট্রীয় পলিসিকে প্রভাবিত করেছে। 'সমকামী বিয়ে'র বৈধতার হাস্যকর দাবির মাধ্যমে আক্রমণ করেছে বিয়ে এবং পরিবারের ধারণাকে। শেষমেশ যখন বৈধতা পেয়ে গেছে, তখন মনোযোগ দিয়েছে শিক্ষার দিকে, শিশুদের দিকে। সমকামিতার কথা এনেছে পাঠ্যবইয়ে। আজ বিকৃত যৌনতার সবক দেওয়া হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলে।[১৮৫]

ধাপে ধাপে তাদের চাহিদা বেড়েছে। ক্ষুধা বেড়েছে। বেড়েছে প্রভাববলয়।

---

[১৮৪] ২০১৫ সালে ব্রিটেনের এক এমপি যেমন বলেছে, যেসব খ্রিষ্টান শিক্ষক 'সমকামী বিয়ে'কে ভুল বলেন, তাদের সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করা উচিৎ। MP: use anti-terror powers on Christian teachers who say gay marriage is 'wrong'. The Telegraph, August 03, 2015.

[১৮৫] Castleton Primary School in Glasgow fully embeds LGBT inclusive education in Scottish first. Sky News, 23 August 2023.

LA elementary schools begin week of LGBTQ+ lessons. Fox 11. October 9, 2023.

Twelve-year-olds are being taught about anal sex in school while nine-year-olds are told to 'masturbate' for homework: The shocking lesson plans used by teachers in UK classrooms. Daily Mail Online, 18 June 2023.

সমকামী মনস্তত্ত্ব

একজন সমকামী বিকৃতিকে নিজের পরিচয় বানায়। বিকৃতির মাধ্যমে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে, জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে। তার মনের ওপর রাজত্ব করে যৌন কামনা আর লালসা। সে সংযমী না, সংযমী হতেও চায় না। সে বাতিকগ্রস্থ, যৌনউন্মাদ। আর এটাকেই সে তার পরিচয় বানায়। আর নিজের নোংরা ছাঁচে বদলে নিতে চায় সমাজকে।

বিকৃত কামনা ভেতর থেকে অবিরাম তাকে ঠেলতে থাকে। কখনো সাধারণ, কখনো বিপ্লবী, কখনো গবেষক, কখনোবা ভিকটিম সেজে সে ছুটে চলে নতুন নতুন উত্তেজনা আর নিষিদ্ধতার খোঁজে। আগুনের দিকে ছুটে চলা পোকা হয়ে বিকৃতির সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে ব্যাধিগ্রস্থ পথে। সে ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ক্রমশ আসক্তি বাড়ে। বাড়ে মানুষ, মাদক, উত্তেজনা আর শরীরের পাইকারি লেনদেন। সে ছুটে চলে মোহাবিষ্ট, নেশাগ্রস্থ হয়ে। পাপের চিহ্ন শরীরে বয়ে বেড়ায় নিজের অজান্তে।

যৌন কামনা থেকে আলাদা নিজের আর কোনো অস্তিত্ব, আর কোনো পরিচয়, জীবনের আর কোনো অর্থ খুঁজে পায় না সে। তার কামনাই তাকে চালিত করে। তার মনোজগৎকে ঢেকে ফেলে অশান্তি, অস্থিরতা। সমাজের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তার। সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তার মধ্যে কাজ করে বৈপরীত্য। তাকে মেনে নিতে চায় না বলে সমাজকে সে ঘৃণা করে। অন্যদিকে সমাজের স্বীকৃতির খোঁজে মরিয়া হয়ে পড়ে। বিকৃতি সে ছাড়তে নারাজ, কিন্তু স্বীকৃতি চায় পুরোদমে। সমাজের নিয়ম মানবে না সে, কিন্তু সমাজের মেনে নিতে হবে তাকে। সমাজের কাছে বারবার সে দাবি নিয়ে আসে। কিন্তু সমাজের স্বার্থ নিয়ে ভাবে না এক মুহূর্তও। সবার দায়িত্ব আছে তার প্রতি, তার কোনো দায়িত্ব নেই। সবার ভুল আছে, সে নির্দোষ। তার কামুকতা, তার উচ্ছৃঙ্খলতা, তার বিকৃত কামনার মূল্য দিতে হয় সমাজকে, সভ্যতাকে। তখনো সে নিজেকে ভিকটিম দাবি করে যায়। জানিয়ে যায় অভিযোগ।

অতৃপ্ত কামনা তাকে ঠেলে নিয়ে যায় বার্লিনের নিষিদ্ধ পল্লীতে, বাথহাউসের নিয়ন প্রেতপুরীতে, অথবা এক বিধ্বংসী মহামারির কেন্দ্রে। ঠেলতে ঠেলতে তাকে পৌঁছে দেয় বিকৃতির এমন এক প্রান্তে, যেখানে সে আবিষ্কার করে তার কেবল মানুষের খোলসটুকু টিকে আছে বাইরে, কিন্তু ভেতরে রাজত্ব করছে ঘুটঘুটে অন্ধকারের পিচ্ছিল কোনো সরীসৃপ। মনুষ্যত্বের শেষ রেখাগুলো ক্রমেই মুছে যেতে থাকে। কিন্তু ফিরতে চায় না সে। আলোতে এসে দাঁড়াবার বদলে পুরো সমাজকে সে টেনে নিয়ে যেতে চায় অন্ধকারে। নিজের কামনাকে জায়েজ করতে পালটে দিয়ে চায় পুরো সমাজের মূল্যবোধকে। সেই কামনাই তাকে হাজির করে চক্রান্তের গোপন বৈঠকে, রংধনুর আন্দোলনে কিংবা রাজনীতিবিদদের ছিমছাম অফিসে। এই সব ক্লেদাক্ত

পথ ঘুরে দিনের আলোয় সে আবির্ভূত হয় মিথ্যার মুখোশ পরে।

বিকৃতির এমনই মনস্তত্ত্ব নানা আঙ্গিকে দেখা দেয় উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসি, হ্যারি হেই, গ্যাইটেন ডুগাস কিংবা কার্ক আর ম্যাডসেনের মধ্যে। একই ব্যাধির বিভিন্ন সংস্করণ।

***

পশ্চিমে সমকামী আন্দোলন সফল হয়েছে। তবে এই সাফল্যের কৃতিত্ব এককভাবে তাদের না। এ আন্দোলন আবির্ভূত হয়েছিল পশ্চিমা সভ্যতার এমন এক পর্যায়ে, যখন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমকামী আন্দোলন সাফল্য পেয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার ভেতরে চলা গভীর রূপান্তরের অংশ হিসেবে।

তবে সফল হবার পরও তাদের তৃষ্ণা মেটেনি। ১৬০ বছরের দীর্ঘ পথচলার পর গন্তব্য পৌঁছানো গেছে। এখন সুখে শান্তিতে সবাই নিজ নিজ জীবন কাটিয়ে দেবে—এমন রূপকথার গল্পের সমাপ্তি আসেনি। যা চেয়েছে সবকিছু পাবার পরও তৃপ্তি আসেনি। 'সমান অধিকার' পেয়েও সন্তুষ্ট হয়নি বিকৃতচারীরা। ওরা এখনো চায়। আরও চায়।

বিকৃতির ধর্মই এমন। পঁচনের মতো বিকৃতির সীমানাও স্থির থাকে না। সময়ের সাথে সাথে তা আরও তীব্র হয়। সীমানা গলে যায়। নষ্ট কোষ থেকে ব্যাধি ছড়াতে থাকে চারদিকে। একসময় উপচে বের হয় পুতিগন্ধময় পুঁজ। গড়িয়ে গড়িয়ে এগোয় নতুন কোনো সংক্রমণ নিয়ে। পশ্চিমে সমকামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাই ঘটে।

পঙ্কিল ছায়ার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে নতুন এক বিকৃতি।

পঙ্কিল রূপান্তর

...আমি অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করবো, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত কর

৪:১

অধ্যায় ৯

বিভীষিকা

সেইজ লিলি ব্লেয়ার। বয়স দুই হবার আগেই ছয় ছয়টা পালক পরিবারে হাতবদল হতে হয় অনাথ মেয়েটাকে। শেষমেশ ঠাঁই মেলে দাদা-দাদির ঘরে। অ্যামেরিকার দক্ষিণে, পাহাড়ঘেরা ভার্জিনিয়ার সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো ছোট্ট এক শহরে। বুড়ো-বুড়ির কাছে ভালোই বেড়ে উঠছিল সেইজ। ভালো ছাত্রী ছিল, অবসরে কবিতা লিখত, ভালোবাসতো পিয়ানো বাজাতে। তবে জীবনের আরেকটা দিক ছিল ওর। ডিপ্রেশন, সেলফ হার্ম, ইটিং ডিসঅর্ডার, অনেক সময় হ্যালুসিনেশন—ছোটবেলা থেকেই নানা মানসিক সমস্যা ওকে তাড়া করে বেড়াতো। জ্ঞান হবার আগেই দেখে ফেলা পৃথিবীর নিষ্ঠুর চেহারাটা হয়তো গভীর ক্ষত একে দিয়েছিল ওর মনে। সেইজ বুদ্ধিমান, কিন্তু ভঙ্গুর। ঐ যে কাঁচের জিনিসপত্রের প্যাকেটে লেখা থাকে না, 'হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার'? কথাটা ওর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

সেইজ তখন ক্লাস এইটে পড়ে। একদিন বাড়ি ফিরে দাদিকে অদ্ভুত সব কথাবার্তা শোনালো—সব মেয়ে নাকি আসলে সমকামী, উভকামী অথবা 'নারীদেহের ভেতরে আটকা পড়া পুরুষ'। স্কুলে টিচার আর বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছে ও। কথাগুলো কতটুকু বুঝলো কে জানে, তবে ও পালটে গেল। পরের বছর থেকে স্কুলে নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেওয়া শুরু করলো। বললো, ওর নাম এখন থেকে 'ড্র্যাইকো'। নামটা সম্ভবত হ্যারি পটারের বই বা কোনো কমিক বুক থেকে বাছাই করা। ব্যাপারটা বাড়িতে জানালো না সেইজ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ বিনা প্রশ্নে মেনে নিলো ওর কথা। ক্লাসের খাতাপত্রে ওর নাম পালটে 'ড্র্যাইকো' লেখা হলো। এ নামেই ওকে ডাকতে শুরু করলো টিচাররা। স্কুলের কাউন্সেলর[১৮৬] বুদ্ধি দিল, এখন থেকে ওর ছেলেদের টয়লেট ব্যবহার করা উচিৎ। সেইজের দাদা-দাদি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানলো না। সেইজ তো জানায়নি, স্কুল থেকেও ওর দাদা-দাদিকে কিছুই বলা হলো না।

---

[১৮৬] মনোবিদ।

অ্যামেরিকার হাই-স্কুলগুলোতে অনেকেই প্রচণ্ড বুলিয়িং[১৮৭] এর শিকার হয়। যারা একটু লাজুক, একটু অমিশুক, তাদের সাথে ব্যাপারটা বেশি ঘটে। সেইজ তীব্র বুলিয়িং এর শিকার হলো স্কুলে। বুলিয়িং ওর জীবনটা নরক বানিয়ে ফেললো। ছেলেদের বাথরুমে ভয়ংকর গালিগালাজ শুনলো ও, অনেকে গায়ে হাত দিল। একদিন দেয়ালের সাথে চেপে ধরে কয়েকজন ওকে শাসালো, 'আবার তোকে ছেলেদের টয়লেটে দেখলে এখানেই রেইপ করবো'।

পরে সেইজ ওর দাদিকে জানাবে, ছেলেদের টয়লেটে যাবার কোনো ইচ্ছাই ওর ছিল না। ব্যাপারটা নিয়ে তীব্র ভয় কাজ করতো ওর মধ্যে। কিন্তু স্কুলের কাউন্সেলর বারবার জোর দিয়ে বলছিল—'ড্র্যাইকো', তুমি যেহেতু নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দিচ্ছ, তাই তোমার উচিৎ ছেলেদের টয়লেট ব্যবহার করা।

গালিগালাজ, হুমকি, আর তীব্র আতঙ্ক খুব বেশিদিন নিতে পারলো না সেইজ। বাড়ি থেকে পালালো ও। এক বন্ধুর সাথে মিলে পরিকল্পনা করলো। ছেলেটার বয়স ষোলো, অনলাইনে পরিচয়। সেইজের মতো সে-ও নাকি স্কেইটবোর্ডিং ভালোবাসে। পালাবার বুদ্ধিটা প্রথম তার মাথাতেই এসেছিল। অদেখা বন্ধুর ওপর ভরসা করে ২০২১ এর অগাস্টের ২৫ তারিখ রাতে ঘর ছাড়লো সেইজ। জীবনের কেবল ১৪ টা বসন্ত পার করা সেইজ একবারের জন্যেও টের পেল না পরবর্তী ছয়মাস (না কি বাকি জীবন?) ওকে কীসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

সেইজের বন্ধু মিথ্যা বলেছিল। তার বয়স ষোলো নয়। স্কেইটবোর্ডিং নিয়েও আগ্রহ ছিল না তার। যৌন নির্যাতনের দায়ে জেল খাটা দাগী আসামী সে। কারাগারের নথিতে ওর ব্যাপারে লেখা- নাম, কেনেথ ফিশার। বয়স, ছত্রিশ। অনলাইনে অল্প বয়সী মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর থেকে বের করে আনতে ওস্তাদ এই লোক।

সেইজকে কিডন্যাপ করে ভার্জিনিয়া থেকে প্রথমে ওয়াশিংটন, তারপর বাল্টিমোরের মেরিল্যান্ডে নিয়ে যায় ফিশার। জায়গাটা ভার্জিনিয়া থেকে দুশো দশ মাইল দূরে। একটা বদ্ধ ঘরে আটকে রেখে সেইজকে ধর্ষণ করে ফিশার, তারপর টাকার বিনিময়ে ওকে তুলে দেয় আরও অনেকের কাছে। উপুর্যপরি ধর্ষণ আর গণধর্ষণের শিকার হয় সেইজ। অপহরণের এক সপ্তাহ পর কেনেথ ফিশারের বাড়ির তালাবদ্ধ রুম থেকে এফবিআই ওকে উদ্ধার করে।

দুঃস্বপ্ন এখানেই শেষ হবার কথা ছিল। উচিৎ ছিল। কিন্তু হলো না। ওকে পাওয়া গেছে জানার পর সারা রাত গাড়ি চালিয়ে মেরিল্যান্ড এসে পৌঁছলো দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে বসা দাদা-দাদি। কিন্তু সেইজকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো না। উলটো

[১৮৭] বুলিয়িং : কাউকে ধারাবাহিকভাবে শারীরিক বা মানসিকভাবে হেনস্থা করা। অপমান করা, অপদস্থ করা, [illegible], মারা—সবই বুলিয়িং এর অন্তর্ভুক্ত।

বুড়োবুড়িকে তলব করা হলো কোর্টে! সেখানে তারা জানতে পারলো মেরিল্যান্ড নগর কর্তৃপক্ষ শিশু নির্যাতনের মামলা করেছে তাদের বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষের ধারণা—দাদা-দাদির 'নির্যাতনের' হাত থেকে বাঁচতেই বাড়ি থেকে পালিয়েছে সেইজ। ওকে তাদের কাস্টডিতে দেওয়া হবে না। আপাতত রাখা হবে একটা কিশোর সংশোধনাগারে!

কোর্টরুমে বসে বিস্ফোরিত চোখে সেইজের দাদি শুনলেন, তার পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, ৪৫ কেজি ওজনের, ধর্ষকের কবল থেকে সবেমাত্র ছাড়া পাওয়া নাতনিকে কিশোর অপরাধীদের সাথে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিচারক!

কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হলো সেইজকে। চারপাশে বেপরোয়া উঠতি বয়সের ছেলের মাঝখানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে। আবারও ধর্ষিত হলো ও। পরিচিত হলো ড্রাগসের সাথেও। দু মাস কাটাবার পর নভেম্বরের ১২ তারিখ আবারও পালালো ভীতসন্ত্রস্ত এবং বিধ্বস্ত সেইজ। এবং আবারও কিডন্যাপড হলো। এইবার অপহরণের পর মেরিল্যান্ড থেকে অপহরণকারী ওকে নিয়ে গেল টেক্সাসের ডালাসে। একটা বদ্ধরুমে না খাইয়ে রাখলো দিনের পর দিন। পেটালো। নেশাগ্রস্থ করে পর্নোগ্রাফি বানালো। ওর শরীর বিক্রি করলো।

এমন অবস্থা থেকে অনেকেই আর ফিরে আসে না। খোঁজ পাওয়া যায় না তাদের। সমাজের অন্ধকার ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যায় তারা। তবে সেইজকে খুঁজে পাওয়া গেল। দ্বিতীয়বার অপহৃত হবার আড়াই মাস পর ওকে উদ্ধার করা হলো ডালাস থেকে।

তারপর?

সেইজ এখন রোগী হিসেবে ভর্তি একটা মানসিক হাসপাতালে। এখানেই কাটাতে হবে কমসেকম আগামী এক থেকে দুই বছর। তীব্র ট্রমা আর পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসর্ডারে[১৮৮] ভুগছে ও। এই হাসপাতালেও কাউন্সেলররা ওকে 'ড্র্যাইকো' নামে ডেকে যাচ্ছে। জোরাজুরি করছে অপারেশন করে ওর শরীরের ওপরের অংশটা ছেলেদের মতো করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেইজ তা চায় না। দাদিকে ও লুকিয়ে লুকিয়ে বলে, ও আসলে ছেলে না, ও মেয়ে। ওর নাম সেইজ।[১৮৯]

---

[১৮৮] **ট্রমা (Trauma):** শরীরে বা মনে সৃষ্ট আঘাত। মানসিক ট্রমা এক ধরনের মনোদৈহিক আঘাত বা চাপ-জনিত ঘটনা। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়াবহ ঘটনার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির মনে ট্রমা তৈরি করতে পারে।
পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD): ট্রমার শিকার অনেক মানুষের মধ্যে বারবার সেই ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অনুভূতি কাজ করে, আবার ঘটতে যাচ্ছে এরকম আতঙ্ক বোধ করেন তারা। নেতিবাচক আবেগ ও ভাবনা সৃষ্টি হয়। সাময়িক স্মৃতিভ্রম তৈরি হয়। অনেকে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেন। ওই ঘটনা মনে করিয়ে দিতে পারে এমন যেকোনো কিছু শুনলে বা দেখলে তীব্র প্রতিক্রিয়া, আতঙ্ক, উদ্বেগ বোধ করেন, চমকে ওঠেন।।

[১৮৯] Saga Of Sage, Please Read My Story. Missing Person's Center, June 1, 2023.
https://tinyurl.com/4958j9zj
সেইজের দাদির বক্তব্য - https://www.youtube.com/watch?v=S88XIaPwj7c

***

সেইজ ব্লেয়ারের ঘটনায় সবচেয়ে দুঃখজনক দিক কোনটা জানেন? এ ঘটনাগুলো ঘটারই কথা ছিল না। সবকিছু খুব সহজে এড়ানো যেত। পুরো ঘটনাপ্রবাহে এমন অনেকগুলো জায়গা ছিল, যেখানে থামিয়ে দেওয়া যেত এই ভয়াবহ ব্যাপারটা।

কেন স্কুলের ক্লাসরুমে শেখানো হলো সব মেয়ে সমকামী, উভকামী অথবা ট্র্যান্স? কিশোরী মেয়েদের মনে কেন এ ধারণা বদ্ধমূল হলো? মানসিক সমস্যায় ভোগা একটা কিশোরী মেয়ে নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেওয়া মাত্র কেন তা মেনে নিলো স্কুল কর্তৃপক্ষ? কেন তার পরিবারকে জানানো হলো না? কোন বিবেচনায় স্কুল কাউন্সেলর একটা মেয়েকে ছেলেদের টয়লেট ব্যবহার করতে বললো? গণধর্ষণের শিকার কিশোরীকে কেন কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হলো?

শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, আইন, আদালত—সেইজ ব্লেয়ারের জীবনে ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারিগর হিসেবে কাজ করেছে প্রত্যেকে। এদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ছিল সেইজকে রক্ষা করা। কিন্তু তারা করেছে উল্টোটা। যেকোনো সুস্থ, বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল, প্রতি পদে পদে বিপরীতটা করেছে তারা।

লুইস ক্যারলের বিখ্যাত বই *অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে* কোনো কিছুই স্বাভাবিক নিয়মমতো হয় না। নুড়ি পাথর কেক হয়ে যায়, শুঁয়োপোকা হুক্কা খায়, কচ্ছপ করে দুঃখবিলাস, ছোট্ট শিশু হয়ে যায় শূকরছানা আর আজব দেশের রানী বিচারের সময় বলে দেয়—শাস্তি আগে, রায় পরে! অদ্ভুতুড়ে এক জগত। সেইজের গল্পটা শুনলে মনে হয়, আমরা যেন পথ ভুলে অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো কোনো এক জগতে ঢুকে পড়েছি। যেখানে কোনো কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে হয় না। তবে এই জগৎ মজার না, ভয়ঙ্কর বিভীষিকার।

বিভীষিকার এ জগৎ তৈরি হয়েছে একটা মৌলিক ভ্রান্তির ওপর। একজন মানুষের যখন মনে হচ্ছে সে বিপরীত লিঙ্গের, সে 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে'—সেই বিকারকে তখন সত্য বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আইনি ও প্রশাসনিকভাবে। অনেক লম্বা সরল অংকের একটা লাইনে যদি যোগের বদলে বিয়োগ চিহ্ন বসে, অ্যালজেব্রার একটা লাইনে যদি চলে আসে ভুল চলক, তাহলে পাতার পর পাতার হিসেব নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি এই বিধ্বংসী বিকারকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার কারণে এলোমেলো হয়ে গেছে শিক্ষা, স্কুল, আইন, আদালত, প্রশাসন, মিডিয়া—সব কাঠামো। নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বদলে এই কাঠামোগুলো তখন উলটো বিপর্যয় ডেকে এনেছে। কিন্তু 'ভুল দেহে আটকা পড়ার' এই ধারণা এলো কোথা থেকে? আর কীভাবেই-বা শিকড় গেড়ে বসলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সব স্তরে?

ওয়ান্ডারল্যান্ডে অ্যালিসের যাত্রা শুরু হয়েছিল এক সাদা খরগোশের পিছু নিতে গিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে তার গর্তে ঢুকে পড়েছিল অ্যালিস। সেই গর্ত তাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল আজব এক দুনিয়াতে। প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে আমাদেরও নামতে হবে খরগোশের গর্তে। দেখতে হবে এ গর্ত আসলে কত গভীর।

সংক্রমণ

অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর রাজত্ব কায়েম করেছে অদ্ভুত এক মতবাদ। এ মতবাদের নাম 'ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ' (Transgenderism)। অনেকে একে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা লিঙ্গ পরিচয় মতবাদও বলে থাকেন।

এই মতবাদ বলে—কোনো পুরুষের যদি 'নিজেকে নারী বলে মনে হয়', তাহলে সে একজন নারী। সমাজ ও আইন নারী হিসেবেই তাকে বিবেচনা করবে। সেই পুরুষ শারীরিকভাবে স্বাভাবিক হোক, তিন বাচ্চার বাপ হোক, কিচ্ছু আসে যায় না তাতে। কোনো নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে হয় ১০০% সুস্থ। নিজেকে পুরুষ মনে করা নারী যদি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেটা এই মতবাদের ভ্রান্তির প্রমাণ না। বরং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাই প্রমাণ করে যে, 'পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে পারে'!

এই মতবাদ অনুযায়ী কোনো বালকের যদি 'মনে হয়' সে বালিকা অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট আর বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকুটি করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' তাকে দিতে হবে। এই 'মনে হওয়া'র চিকিৎসা করা যাবে না; বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে। সেইজের ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটেছে।

'ট্র্যান্সজেন্ডার' শব্দটার প্রথম ব্যবহার ১৯৬৫ সালে।[১১০] কেতাবিভাবে ট্র্যান্সজেন্ডার বলতে এমন কোনো মানুষকে বোঝানো হয়, যার 'আত্মপরিচয়ের উপলব্ধি তার শরীরের সাথে মেলে না'। কথাটা একটু খটমটে শোনায়, সহজে বলি। ট্র্যান্সজেন্ডার হলো এমন কেউ, যার দেহ পুরুষের কিন্তু সে নিজেকে নারী বলে দাবি করে, অথবা যার দেহ নারীর কিন্তু সে নিজেকে পুরুষ দাবি করে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রধান দাবি হলো,

> জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, কেউ নিজেকে নারী দাবি করলে তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে। নিজেকে যে পুরুষ দাবি করবে তাকে মেনে নিতে হবে পুরুষ বলে। আইনি ও সামাজিকভাবে।
>
> মানুষ ইচ্ছেমতো পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওষুধ আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে

[১১০] John F. Oliven, Sexual Hygiene and Pathology: A Manual for the Physician and the Professions (London: Pitman Medical Publishing Co., 1965).

> নিজের দেহকে বদলাবে। কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও মেনে নিতে হবে মুখ বুজে। রাষ্ট্র ও সমাজ বাধা দিতে পারবে না; বরং 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে বিশেষ সুবিধা।
>
> সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।

প্রবল আগ্রহে এই মতবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী, সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই মতবাদ প্রচার করে চলছে উগ্রভাবে। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে আইন এবং এই মতবাদ আজ শেখানো হচ্ছে পশ্চিমের স্কুলগুলোতে। এই মতবাদের খপ্পরে পড়েই নিজেকে 'ড্র্যাইকো' ভাবতে শুরু করেছিল সেইজ।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্য এতটাই বিদঘুটে যে, প্রথম শোনার পর অনেকে বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, আদৌ এমন কোনো মতবাদ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন—

- হয়তো কোনো কারণে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- হয়তো এটা তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন।
- হয়তো এটা মানবিক বিবেচনা আর অধিকারের বিষয়।
- হয়তো যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়, নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদের শারীরিক কোনো সমস্যা আছে।

না, বাস্তবতা হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সত্যিকার অর্থেই এতটা বিদঘুটে, বিচিত্র, বিকৃত। লম্বা চওড়া তাত্ত্বিক আলোচনা পরে হবে, আগে কিছু বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি, পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রিচার্ড লাভিন : জন্ম ১৯৫৭ সালে, ধনী ইহুদি পরিবারে। পড়াশোনা করেছে ম্যাসাচুসেটসের এক অভিজাত বয়েজ স্কুলে। তারপর উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছে হার্ভার্ড আর টুলেইন ইউনিভার্সিটিতে থেকে। ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা রিচার্ড এখন অ্যামেরিকার পেন স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু রোগ ও মানসিক রোগের প্রফেসর। রিচার্ডের আছে দুই সন্তান।

কিন্তু ২০১১ সালে দুই বাচ্চার বাপ, ৫৪ বছর বয়সী রিচার্ড ঘোষণা করে, সে আসলে একজন নারী। নতুন নাম নেয় 'র‍্যাইচেল'। ২০২১ সালে রিচার্ড; না সরি, 'র‍্যাইচেল', অ্যামেরিকার অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অফ হেলথ মনোনীত হয়। সরকারি সব ঘোষণায় বলা হয়—লাভিন হলো অ্যামেরিকার জনস্বাস্থ্য বাহিনীতে

কাজ করা প্রথম ফোর-স্টার 'নারী অফিসার'।

জেইমস প্রিটযকার : অ্যামেরিকার সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর একটা হলো প্রিটযকার পরিবার। বিখ্যাত হায়াত হোটেলের মালিক এই প্রিটযকাররা। আছে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র বানানোসহ আরও নানা ব্যবসা। মোট কত টাকা ওদের, নিজেরাও ঠিকঠাক জানে কি না সন্দেহ। এই বিলিয়নেয়ার ইহুদি পরিবারের সন্তান জেইমস প্রিটযকার মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেয় ২০০১ সালে। দুইবার বিয়ে করা প্রিটযকার এক মেয়ে আর দুই ছেলের বাবা।

২০১৩ সালে, ৬৩ বছর বয়সে ভদ্রলোক নিজেকে নারী ঘোষণা করে এবং আইনিভাবে নিজের নাম বদলে নেয়। তার নতুন নাম 'জেনিফার'। 'জেনিফার' প্রিটযকারকে প্রথম ট্র্যান্সজেন্ডার বিলিয়নেয়ার বলা হয়। যদিও পরিচয় বদলানোর আগেই পারিবারিক সম্পত্তির সুবাদে বিলিয়েনেয়ার ছিল সে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অর্থায়নের পেছনে সবচে' বেশি টাকা ঢালা প্রতিষ্ঠানের লিস্ট করা হলে প্রথম তিনের মধ্যে থাকবে প্রিটযকারের গড়ে তোলা টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের নাম।

ব্রুস জেনার : ১৯৪৯ সালে জন্ম নেওয়া অ্যামেরিকান ক্রীড়াবিদ এবং বিশ্বরেকর্ড করা অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট। খেলাধুলা থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্যবসা আর বিনোদন জগতেও সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলে ব্রুস জেনার। নাম করেছিল কার রেসিংয়েও। তিন বিয়ে থেকে মোট ছয় সন্তানের বাবা সে। ২০১৫ সালে এই লোক নিজেকে নারী ঘোষণা করে। বলে—এখন থেকে তার নাম 'ক্যাইটলিন'। সেই সময়টাতে 'ক্যাইটলিন' ছিল সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল ট্র্যান্সজেন্ডার। তার রূপান্তরের ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় মিডিয়াতে।

এই হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। লাভিন, প্রিটযকার এবং জেনারের মতো মানুষের নিজেদের পরিচয় দেয় ট্র্যান্সজেন্ডার বলে। তাদের শরীর পুরুষের ছিল কিন্তু মনে মনে তারা ছিল নারী—এই হলো তাদের বক্তব্য। ট্র্যান্সজেন্ডার মানেই অপারেশন করে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করা মানুষ, তাও না।[১৯১] ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মূল বক্তব্য হলো শরীর গুরুত্বপূর্ণ না, মনের অনুভূতিই আসল। তাই কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী মনে করে তাহলে অপারেশন করুক বা না করুক, তাকে নারী বলেই গণ্য করতে হবে। সেইজ ব্লেয়ার অপারেশন জাতীয় কিছুই করেনি, কিন্তু তবু আইনিভাবে তাকে একজন পুরুষ গণ্য করা হচ্ছিল। এজন্যই তাকে কিশোর সংশোধনাগারে ছেলেদের সাথে রাখা হয়েছিল। এমন ঘটনা আরও ঘটেছে। দুটো উদাহরণ দেখা যাক।

---

[১৯১] ২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা মানুষদের মধ্যে ৫০ শতাংশ 'হরমোন ট্রিটমেন্ট' নেয়, সার্জারি করায় মাত্র ২৫%। James, S. E., J. L. Herman, S. Rankin, M. Keisling, L. Mottet, and M. Anafi. "National center for transgender equality." National Center for Transgender Equality: Washington, DC, USA (2016).

মহিলা কারাগারে গর্ভবতী দুই কয়েদি : বিচিত্র এ ঘটনা ঘটেছে অ্যামেরিকাতে। ২০১১ সালে হত্যার দায়ে ত্রিশ বছরের জেল হয় ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামে এক যুবকের। নয় বছর জেলে খাটার পর হঠাৎ করে নিজেকে সে নারী দাবি করতে শুরু করে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বিষে আচ্ছন্ন অ্যামেরিকান বিচারব্যবস্থা দাবি মেনে নিয়ে তাকে পাঠায় মহিলা কারাগারে। কারাগারে নারীদের সাথেই রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিট্রিয়াসকে। ফলে যা হবার তাই হয়, ডেমিট্রিয়াসের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদি। এ ঘটনার পর ডেমিট্রিয়াসকে আবারও পুরুষদের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১১২]

মহিলা ওয়ার্ডে ধর্ষিত রোগী : হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের ভেতর নিজেকে নারী দাবি করা পুরুষের হাতে ধর্ষিত হয়েছেন একজন নারী রোগী। ধর্ষিত নারী যখন বিচার চাইতে গেছেন তখন তাকে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে নারী বলে দাবি করেছে, তাই সে নারী। আইনের দৃষ্টিতে ধর্ষণ সংঘটিত হয় পুরুষের মাধ্যমে। একজন নারী কখনো ধর্ষক হতে পারে না। কাজেই এখানে কোনো ধর্ষণ হয়নি। পুরো একটা বছর এই নারী বিচার পাননি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য এবং হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর পর পুলিশ এই মামলা নিতে রাজি হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে যুক্তরাজ্যে।[১১৩]

আশা করি ওপরের উদাহরণগুলো থেকে বুঝতে পারছেন, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক ত্রুটি বা এ জাতীয় কিছুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ নারী বা পুরুষ, যারা একসময় স্বাভাবিকভাবে বাবা কিংবা মা হয়েছে—এক পর্যায়ে নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে ঘোষণা দিচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরতে শুরু করছে, নাম বদলাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সার্জারির মাধ্যমে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করছে। দাবি করছে—সমাজ তাদের এভাবেই মেনে নিক। অনেকে আবার কোনো অপারেশন ছাড়াই দিব্যি বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে।

ট্র্যান্সজেন্ডার মানে কি হিজড়া?

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। আমাদের সমাজে 'হিজড়া' বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ধারণা আছে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের কথা শুনলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এটা হয়তো হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। কিন্তু দুটো জিনিস একেবারেই আলাদা। আসুন, পুরো ব্যাপারটা ভেঙে ভেঙে দেখা যাক, ঠিক কোন কোন জায়গাতে ভুলগুলো হচ্ছে।

---

[১১২] Incarcerated transgender woman Demi Minor impregnates two inmates at NJ prison. New York Post, July 16, 2022. https://tinyurl.com/38shc3cw

[১১৩] Hospital says patient could not have been raped because alleged attacker was transgender. Scottish Daily Express. March 19, 2022.- https://tinyurl.com/3pp7p678

মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। এ দুইয়ের বাইরে তৃতীয় কিছু নেই। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা পুরুষ, যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা নারী। এটা শুধু বাহ্যিক 'অঙ্গ'-এর বিষয় না; বরং পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়।[১৯৪]

মানবজাতির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছেন, যাদের প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায়। ব্যাপারটা জন্মগত। এ ধরনের মানুষকে বোঝাতে যে শব্দটা ব্যবহৃত হয়, তা হলো ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ 'হিজড়া' বলতে মূলত এই ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষদের বুঝিয়ে থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী পুরো পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স হন। বাকি ৯৯.৯৮২% মানুষ জন্ম নেন স্বাভাবিক শরীর নিয়ে।[১৯৫]

তবে, ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষরা কিন্তু আসলে তৃতীয় কোনো লিঙ্গ না, বা দুটোর মাঝামাঝি কিছুও না। তারাও নারী অথবা পুরুষই, তবে তাদের যৌনাঙ্গ, গঠন বা জিনগত কিছু ত্রুটি থাকে। যে কারণে এ ধরনের সমস্যাকে ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট (ডিএসডি) বা যৌন বিকাশগত ত্রুটি-ও বলা হয়।[১৯৬]

ধরা যাক, একটি শিশুকে জন্মের সময় বাহ্যিকভাবে মেয়ে মনে হয়েছে, সেভাবেই সে বড় হয়েছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় দেখা গেল তার মাসিক হচ্ছে না। ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে জানা গেল তার জরায়ু নেই, ফ্যালোপিয়ান টিউব[১৯৭] নেই; বরং শরীরের ভেতরে অণ্ডকোষ আছে। তার শরীর পুরুষের হরমোন তৈরি করছে, শরীরের প্রজনন ব্যবস্থা শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি। ইনি একজন ইন্টারসেক্স পুরুষ, যার শরীরে বাহ্যিকভাবে নারীসুলভ কিছু চিহ্ন আছে।

ইন্টারসেক্স মানুষের অন্য সবার মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার আছে। তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, সমাজ থেকে বের করে দেওয়া, অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করা, তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করা ইসলামের শিক্ষা না। আমাদের মাপকাঠি ইসলাম এবং ইসলাম আমাদের বলে যে, ইন্টারসেক্স মানুষরা তাদের অবস্থা অনুযায়ী নারী বা পুরুষ হিসেবে শরীয়াহ অনুযায়ী অধিকার পাবেন।

অন্যদিকে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তলিঙ্গ

[১৯৪] বিস্তারিত রেফারেন্সের জন্য দেখুন, Why Sex is Binary – https://www.youtube.com/watch?v=XN2-YEgUMg0

[১৯৫] Sax, Leonard. "How common is Intersex? A response to Anne Fausto-Sterling." Journal of sex research 39, no. 3 (2002): 174-178.

[১৯৬] বিস্তারিত, Is Intersex a Third Sex?, https://www.theparadoxinstitute.com/watch/is-intersex-a-third-sex?

[১৯৭] জরায়ুনালী। দুটি পেশীবহুল পাতলা নালী, যা ডিম্বাশয়কে জরায়ুর সাথে সংযুক্ত করে।

বা ইন্টারসেক্স না। তাদের জন্ম হয়েছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক যৌনাঙ্গ নিয়ে। ট্র্যান্সজেন্ডার জন্মগত কোনো বিষয় না। তাদের সমস্যা মনে। এরা হলো এমন কিছু মানুষ যারা মনে করছে তারা 'ভুল দেহে' জন্মেছে, তাই বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্জারি করে কেটে ফেলে দিচ্ছে নিজের শরীরের কিছু অংশ। জন্মগত হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার এক জিনিস না। ব্রিটেনের ইন্টারসেক্স নারী এবং অ্যাকটিভিস্ট ক্ল্যায়ার গ্র্যাহ্যাম তার ব্লগে লিখছেন, 'ইন্টারসেক্স আর ট্র্যান্সজেন্ডার এক না, এ দুটোকে মিলিয়ে ফেলা ক্ষতিকর এবং মূর্খতা'।[১১৮]

ট্র্যান্সজেন্ডার আসলে কী?

সোজা বাংলায় ট্র্যান্সজেন্ডার মানে বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ।

ট্র্যান্সজেন্ডার নারী বা ট্র্যান্সনারী মানে এমন একজন পুরুষ, যে নিজেকে নারী দাবি করছে, নারীর পোশাক পরছে, নারীসুলভ নাম রাখছে। তার জন্ম হয়েছে অণ্ডকোষ আর পুরুষাঙ্গ নিয়ে। তার শরীরে আছে XY ক্রোমোসোম।

ট্র্যান্সজেন্ডার পুরুষ বা ট্র্যান্সপুরুষ মানে এমন নারী, যে নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করছে। তার জন্ম জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনী এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব নিয়ে। তার দেহে আছে XX ক্রোমোসোম। সেইজ ব্রেয়ার নিজেকে ট্র্যান্স পুরুষ দাবি করছিল, যদিও সে আসলে নারী।

একদম সহজভাবে বললে, 'ট্র্যান্সজেন্ডার নারী' মানে হলো নারী সাজা পুরুষ। 'ট্র্যান্সজেন্ডার পুরুষ' মানে পুরুষ সাজা নারী। বর্তমানে পাশ্চাত্যে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা অধিকাংশ লোক অস্ত্রোপচার বা হরমোন সার্জারি করে না। মুখে বলা, নাম বদলানো, পোশাকে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আনাই যথেষ্ট।

বিশ্বাস হচ্ছে না? অ্যামেরিকার পাবলিক স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের কী পড়ানো হচ্ছে, দেখুন। আই অ্যাম জ্যায (I Am Jazz) নামের বইতে বলা হচ্ছে—

> আমার মস্তিষ্ক মেয়েদের, কিন্তু শরীর ছেলেদের
>
> এটাকে বলে ট্র্যান্সজেন্ডার
>
> আমি জন্ম থেকেই এমন।

মনে রাখবেন, এ জিনিস শেখানো হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, একজন শিশু জন্মানোর পর তাকে যে ছেলে বা মেয়ে বলা

---

[১১৮] Claire Graham. Do Intersex Women Have Penises?. (2019)। https://tinyurl.com/ u8ten423, আরও দেখুন, What's the difference between being transgender or transsexual and having an intersex condition?, Intersex Society of North America. https://isna.org/faq/ transgender/

হয়, তা পুরোটাই হয় 'অনুমানের ভিত্তিতে'। ডাক্তাররা আন্দাজ করে নবজাতক শিশুর জন্য ছেলে বা মেয়ে পরিচয় 'বরাদ্দ' করে দেয়। একজন মানুষ চাইলে 'জন্মকালে নির্ধারিত' এই পরিচয়ের বদলে বেছে নিতে পারে অন্য কোনো পরিচয়। কারণ, কিছু মানুষ 'ভুল দেহে জন্ম নেয়'।

প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আরেক বই *It Feels Good to Be Yourself*-এ বলা হচ্ছে,

> দেখো, যখন তোমার জন্ম হয়েছিল, তখন তুমি নিজের অনুভূতি মানুষকে জানাতে পারতে না। তোমার আশেপাশের মানুষরা তোমাকে দেখে একটা অনুমান করে নিয়েছিল। সেটা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে।
>
> যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তাদের জানাতে কোনো সমস্যা নেই।
>
> রুথির বয়স যখন ৫, তখন সে তার বাবামা-কে বলেছিল,
>
> 'আমি জানি তোমরা আমাকে ছেলে মনে করো, কিন্তু আসলে আমার মনে হয় আমি একটা মেয়ে।'[১৯৯]

এই হলো ট্রান্সজেন্ডারবাদ। এই মতবাদের আলোকে আজ ঠিক হচ্ছে অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের এক্সিকিউটিভ নির্দেশ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পলিসি। মানবাধিকারের নামে সারা বিশ্বজুড়ে এই মতবাদ ফেরি করে বেড়াচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব এবং জাতিসংঘ। বিলিয়ে বেড়াচ্ছে বিপুল অর্থ। কেউ রুখে দাঁড়ালে ভয় দেখাচ্ছে স্যাংশান আর ভিসা রেস্ট্রিকশানের। ফলে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে পাকিস্তানের আদালতের রায়েও ঢুকে পড়েছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ।[২০০]

***

কিন্তু বিচিত্র এই মতবাদ তৈরি হলো কীভাবে? আর সমকামী আন্দোলনের সাথেই-বা এর সম্পর্ক কী? তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কীভাবে এত শক্তিশালী হয়ে উঠলো এ মতবাদ?

প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে বেশ কিছুদূর। ফিরে যেতে হবে পাপের নগরী বার্লিনে, সেই পুরনো পাপী ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের কাছে।

---

[১৯৯] Thorn, Theresa. It feels good to be yourself: A book about gender identity. Henry Holt and Company (BYR), 2019.

[২০০] CNN, Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump. January 12, 2024, https://tinyurl.com/yc2s3x6u
USAID: 5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World. 2021. https://tinyurl.com/2h26unhd

অধ্যায় ১০

'তৃতীয় লিঙ্গ'

ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা মোটামুটি নতুন। আজকাল যেটাকে ট্র্যান্সজেন্ডার বলা হচ্ছে আগে সেটার নাম ছিল ট্র্যান্সসেক্সুয়াল (Transsexual)। নানান ঘটনা প্রবাহ আর তত্ত্বের মিশেলে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল ট্র্যান্সজেন্ডার হয়ে উঠতে শুরু করে সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বংশগতি বুঝতে হলে তাই আমাদের শুরু করতে হবে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ইতিহাস দিয়ে। সেই ইতিহাসের শুরু বার্লিনে।

বিকৃতির সওদাগর

বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্য নিয়ে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বার্লিনে আস্তানা গেড়েছিল ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। শুরু করেছিল বিকৃতির সামাজিকীকরণের নানা উদ্যোগ। সমকামী আন্দোলনের জনক বলে পরিচিত ইতিহাসের এই বিচিত্র চরিত্রকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের গল্পেও এক কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখতে পাই আমরা।

সমকামী আন্দোলন নিয়ে কাজ করার সুবাদে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্তদের মধ্যে বিশেষ এক শ্রেণিকে চিহ্নিত করে ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। এ ধরনের মানুষ বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজতে পছন্দ করে, এর মধ্যে যৌন আনন্দ খুঁজে পায়। এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে উভকামিতা, অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে যৌন সম্পর্কের প্রবণতা দেখা যায়। এ জাতের লোকেদের বর্ননা দিতে গিয়ে ১৯১০ সালে নতুন একটা শব্দ উদ্ভাবন করে হার্শফেল্ড- ট্র্যান্সভেস্টাইট (Transvestite)।[২০১] বেশ কয়েক দশক পর অ্যামেরিকাতে যখন এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা হবে, তখন জনপ্রিয়তা হয়ে উঠবে 'ক্রসড্রেসিং' আর 'ড্র্যাগ'—এর মতো কিছু শব্দ। শব্দগুলো আলাদা হলেও মূল অর্থ এক। এমন কেউ, যে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। নারী সাজা পুরুষ অথবা পুরুষ সাজা নারী।

১৯২৩ সালে আরেকটা শব্দ উদ্ভাবন করে হার্শফেল্ড, ট্র্যান্সসেক্সুয়াল

---

[২০১] মূল জার্মান, Transvestiten। Magnus Hirschfeld and Max Tilke, Die Transvestiten: Eine Untersuchung uber den erotischen Verkleidungstrieb (Berlin: Pulvermacher, 1910).

(Transsexual)।[২০২] এমন মানুষ, যারা চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের শরীরকে বিপরীত লিঙ্গের মতো করতে চায় স্থায়ীভাবে। সোজা বাংলায়, ট্রান্সসেক্সুয়াল হলো ট্রান্সভেস্টাইটদের মধ্যে বিশেষ একটা শ্রেণি, যারা 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করতে চায়।[২০৩]

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি, কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডও মনে করত, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত মানুষরা নারী ও পুরুষের বাইরে তৃতীয় একটা শ্রেণি।[২০৪] পুরুষের দেহে 'আটকা পড়া নারী'। এ তত্ত্বে হার্শফেল্ড কিছু পরিবর্তন আনলেও, মোটাদাগে সেটা উলরিখসের তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্বেরই একটা সংস্করণ হিসেবে থেকে যায়। এই তত্ত্ব ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থানে বড় একটা ভূমিকা রাখে। তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্বের আলোকেই তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করে হার্শফেল্ড। উলরিখস ও হার্শফেল্ডের চিন্তা থেকে আসা যুক্তির সিঁড়িটা অনেকটা এরকম—

- সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত পুরুষরা আসলে পুরুষ দেহে আটকা পড়া নারী সত্তা।
- সমকামী পুরুষদের অনেকে নিজেদের নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। নারীর পোশাক পরে, তাদের আচরণ অনুকরণ করে।
- এই চাওয়া যদি যথেষ্ট তীব্র হয়, তাহলে 'চিকিৎসা হিসেবে' অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এসব পুরুষের দেহকে নারীদেহের মতো করে দেওয়া যেতে পারে।
- এতে করে তাদের ভেতরের নারী সত্তার সাথে বাইরের দেহটা মিলবে।

এসব তত্ত্ব ও ধারণার আলোকে ১৯২০-এর দশক থেকে তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করে হার্শফেল্ড।[২০৫] এক্ষেত্রে কাজে লাগায় তার গড়ে তোলা 'যৌন গবেষণা ইনস্টিটিউট'-কে। হার্শফেল্ডের তত্ত্বাবধানেই ১৯২২ সালে পৃথিবীর প্রথম 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি হয়। রোগী, রুডলফ রিকটার নামে একজন পুরুষ।[২০৬] সার্জারির পাশাপাশি রিকটারকে হরমোন 'চিকিৎসা' দেওয়া হয়।

---

[২০২] মূল জার্মান, Transsexualismus। Hirschfeld, Magnus. "Die intersexuelle konstitution." Jahrbuch für Sexuelle Zwishenstufen 23 (1923): 3-27.

[২০৩] Hofmann, Franziska. Transsexualität: Wenn Körper und Seele nicht zusammenpassen. GRIN Verlag, 2009.

[২০৪] Ramien, Theodor. Sappho und Sokrates oder wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?. Spohr, 1896. Theodor Ramien হার্শফেল্ডের ছদ্মনাম।

[২০৫] F. Naz Khan, 'A History of Transgender Health Care', Scientific American (16 November 2016), https://tinyurl.com/4dsdr9j6

[২০৬] Haire, Norman. "Encyclopaedia of Sexual Knowledge". 1934

পরের বছরগুলোতে আরও কয়েকজন রোগীকে লিঙ্গ পরিবর্তনের পরামর্শ দেবে হার্শফেল্ড ও তার দলবল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠবে ডেনমার্কের আইনার ওয়েগেনার, যে পর 'লিলি এলবা' নামে পরিচিত হবে। আপাদমস্তক পুরুষ হলেও ওয়েগেনার নারী সাজতে পছন্দ করত। সে উভকামী ছিল। এক নারীর সাথে বিয়েও হয়েছিল তার। ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে হার্শফেল্ডের পরামর্শে মোট ৪টি অপারেশন করে সে। সর্বশেষ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েগেনারের দেহে জরায়ু প্রতিস্থাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ অপারেশন ব্যর্থ হয়। তিন মাস প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভোগার পর মারা যায় ওয়েগেনার। তার স্ত্রী বিখ্যাত একজন শিল্পী হওয়াতে এ অপারেশন এবং ওয়েগেনারের 'রূপান্তর'-এর খবর আলোড়ন তোলে ইউরোপের মিডিয়াতে। ব্যাপারটা অ্যামেরিকাতেও অনেকের নজরে আসে।

ওয়েগেনার যখন মরণ যন্ত্রণায় ভুগছে, হার্শফেল্ড তখন ব্যস্ত তার অ্যামেরিকা ট্যুর নিয়ে। এই ট্যুরে আয়োজকরা হার্শফেল্ডকে পরিচয় করিয়ে দেয় ইউরোপের 'প্রধানতম যৌন বিশেষজ্ঞ' এবং 'যৌনতার আইনস্টাইন' নামে।[২০৭] অ্যামেরিকাতে ঘুরে ঘুরে নিজের বিকৃত ধ্যানধারণার ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় হার্শফেল্ড। এ ট্যুরের আয়োজকদের একজন ছিল হ্যারি বেঞ্জামিন। দুই দশক পর এই হ্যারি বেঞ্জামিনই হবে অ্যামেরিকায় ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থানের পেছনে প্রধান কুশীলব।

১৯৩১ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইউরোপে; বিশেষ করে সুইটযারল্যান্ড এবং ডেনমার্কে, আরও কিছু 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি হয়। অ্যামেরিকাতে তখন এ ধরনের সার্জারি হতো না। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা প্রয়োগ ছিল না অ্যাটল্যান্টিকের ওপারে। এ অবস্থা বদলাতে শুরু করবে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে।

ক্যানভাসার

হ্যারি বেঞ্জামিনের জন্ম বার্লিনে, ১৮৮৫ সালে। এখানেই তার বেড়ে ওঠা আর পড়াশোনা। এক পর্যায়ে সে স্থায়ীভাবে অ্যামেরিকা চলে যায়। মেডিসিনের ওপর পিএইচডি করলেও, যৌনতা সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে ভালোই আগ্রহ ছিল হ্যারি বেঞ্জামিনের। জার্মানিতে থাকা অবস্থায় সে হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিল। ছিল হার্শফেল্ডের অ্যামেরিকা ট্যুরের প্রধান আয়োজকও। অর্থাৎ, হার্শফেল্ডের তত্ত্ব, কাজ আর গবেষণার সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিল হ্যারি বেঞ্জামিন।

আমাদের এ গল্পের অন্যান্য চরিত্রদের সাথে বেঞ্জামিনের একটা পার্থক্য আছে। উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসির মতো চরিত্রগুলোর জীবনে নির্দিষ্ট একটা ছক দেখা যায়। তারা নিজেরা বিকৃতিতে আসক্ত ছিল, তাই বিকৃতিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য

[২০৭] Magnus Hirschfeld at the Hotel New Yorker. NYC LGBT Historic Sites Project. https://tinyurl.com/4wr9t93p

করে তোলার জন্য কাজ করেছিল। কিন্তু যতদূর জানা যায়, হ্যারি বেঞ্জামিনের এ ধরনের কোনো সমস্যা ছিল না। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখী ও স্বাভাবিক ব্যক্তিগত জীবন ছিল তার। তবে একটা দুর্বলতা ছিল হ্যারি বেঞ্জামিনের। যেকোনো মূল্যে টাকা কামানোর দিকে তার ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে কাজ শুরুর আগে বেঞ্জামিনের প্রধান দুটো ব্যবসায়িক উদ্যোগের বর্ণনা দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে।

বেঞ্জামিনের প্রথম প্রকল্প ছিল 'যৌবন ধরে রাখা'র টোটকা হিসেবে টেস্টোস্টেরন বিক্রি করা। দ্বিতীয় প্রকল্প ছিল আরও এক কাঠি সরেস। এক পার্টনারের সাথে মিলে যক্ষার ওষুধ হিসেবে 'কচ্ছপের রস' বিক্রি করতে চেয়েছিল সে।[২০৮] ভালো কথা, বেঞ্জামিনের পিএইচডি গবেষণার বিষয়বস্তু কিন্তু ছিল যক্ষা। কচ্ছপের রস দিয়ে যে যক্ষা রোগ সারে না, এটা সে ভালোভাবেই জানতো। কিন্তু নীতিনৈতিকতা বাদ দিয়ে দ্রুত টাকা বানানোর দিকেই ছিল তার আগ্রহ। সম্ভবত এই লোভ ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে তার কাজকেও প্রভাবিত করেছিল প্রচ্ছন্ন, কিন্তু গভীরভাবে।

যেমনটা আমরা এরই মধ্যে জেনেছি, হার্শফেল্ডের তত্ত্ব এবং কথিত লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে আগে থেকেই ধারণা ছিল বেঞ্জামিনের। তবে কথিত লিঙ্গ পরিবর্তন বা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে সে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে, এক অধ্যাপক বন্ধুর পরামর্শে। বেঞ্জামিনকে উৎসাহ দেওয়া সেই বন্ধুর নাম পাঠকের চেনা, অ্যালফ্রেড কিনসি। কিনসির উৎসাহে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে জোরেশোরে কাজ শুরু করে বেঞ্জামিন।

ইংরেজি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যায় ট্র্যান্সসেক্সুয়াল শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৪৯ সালে। যৌনতা সংক্রান্ত মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে।[২০৯] তবে শব্দটাকে জনপ্রিয় করে তোলে হ্যারি বেঞ্জামিন। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে লেখা আর বক্তব্যের মাধ্যমে সে ক্রমাগত ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ধারণা প্রচার করতে থাকে। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে বলে,

> "ট্র্যান্সভেস্টিসিসম (বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ) অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রবল হতে পারে। এর ফলে এমনও হতে পারে, বিপরীত লিঙ্গের মতো হবার জন্য (রোগীর মধ্যে তার) দেহের ব্যাপারে 'প্রকৃতির ভুল' সংশোধনের ইচ্ছা কাজ করে। এ ধরনের (রোগীর) ক্ষেত্রে 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালিসম' শব্দটি যথাযথ

---

[২০৮] Joyce, Helen. Trans: when ideology meets reality. Simon and Schuster, 2021. Green, Richard. "The three kings: Harry Benjamin, John Money, Robert Stoller." Archives of sexual behavior 38, no. 4 (2009): 610-613. N. Matte, 'Putting Patients First: Harry Benjamin and the Development of Transgender Medicine in the Twentieth Century', Masters Thesis (2004), p.34, p.35.

[২০৯] D. O. Cauldwell, "Psychopathia Transsexualis, " Sexology, XVI (1949): 274-80.

বলে মনে হয়।"[২০]

ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের ধারণাগুলোকেই নিজের মতো করে উপস্থাপন করে বেঞ্জামিন। সেও বলে—ট্র্যান্সসেক্সুয়াল হলো এমন মানুষ, যে বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজতে চায়। এ চাওয়া অনেকের ক্ষেত্রে এতটাই তীব্র আকার ধারণা করে যে, তারা নিজেদের দেহকেও বদলে ফেলতে চায়। তারা নাকি 'তাদের পুরুষ দেহের ভেতর নারীসত্তা ধারণ করে'। এই প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে বেশি। বেঞ্জামিনের ভাষায়, 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালরা হলো পুরুষ ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মধ্যে সবচেয়ে অসুস্থ দল'। এ ধরনের লোকেদের ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসায় কাজ হয় না। এসব রোগীদের একমাত্র চিকিৎসা হলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন'।[২১] বেঞ্জামিন এবং তার সহকর্মী চার্লস ইহলেনফেল্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করে,

> 'পুরুষের শরীরে আটকা পড়া নারীর মন' বা 'নারীর শরীরে আটকা পড়া পুরুষের মন' থেকে যে দ্বন্দ জন্ম নেয়, সার্জারি এবং হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তা সমাধান করা সম্ভব।[২২]

উলরিখস এবং হার্শফেল্ডের তৃতীয় লিঙ্গ আর ভুল দেহে আটকা পড়া-র তত্ত্বই প্রচার করে হ্যারি বেঞ্জামিন। তবে মজার ব্যাপার হলো, বেঞ্জামিন তার গবেষণার পেছনে অ্যালফ্রেড কিনসির পরামর্শের ভূমিকার কথা স্বীকার করলেও, হার্শফেল্ডের কথা বেমালুম চেপে যায়।

লেখালেখির পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকে রোগীও দেখে বেঞ্জামিন, এবং তাদের 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' পরামর্শ দেয়।। অ্যামেরিকাতে সার্জারির সুযোগ না থাকায় অপারেশনের জন্য সে তার রোগীদের পাঠায় ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা, ইস্তাম্বুল, ডেনমার্ক কিংবা সুইটযারল্যান্ডের মতো জায়গায়। এমনই এক রোগী জর্জ জর্গেনসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা জর্জ ১৯৫২ সালে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করায় ডেনমার্কে। নতুন নাম নেয় ক্রিস্টিন জর্গেনসেন। নিজের 'রূপান্তর' এর খবর গোপন রাখার চেষ্টা করলেও, কীভাবে কীভাবে যেন পত্রিকাওয়ালাদের কাছে তা পৌঁছে যায়। রসিয়ে রসিয়ে জর্গেনসেনের অপারেশনের খবর প্রচার করে পত্রিকাগুলো। 'লিঙ্গ পরিবর্তন'-এর ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানতে শুরু করে। মেডিক্যাল ফিল্ডেও বেড়ে যায় ট্র্যানসেক্সুয়ালিসম নিয়ে লেখালেখি। গতিশীল হয় হ্যারি বেঞ্জামিনের গবেষণা এবং প্রচারণা।

---

[২০] Harry Benjamin, "Transvestism and Transsexualism," International Journal of Sexology 7 (1953): 12, 13.

[২১] Ibid., p. 13.

[২২] H. Benjamin & C. L. Ihlenfeld, 'Transsexualism', The American Journal of Nursing. Vol. 73, No. 3 (Mar., 1973), p. 457.

এবার বেঞ্জামিন মনোযোগী হয় অ্যামেরিকাতে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি চালু করার দিকে। ১৯৬৪ সালে নিজের নামে ফাউন্ডেশন খোলে সে। দু বছর পর, ৬৬ তে প্রকাশিত হয় তার লেখা বই, 'দা ট্রান্সসেক্সুয়াল ফেনোমেনন'। মজার ব্যাপার হলো, সে বছরেই তার উদ্যোগে চালু হয় অ্যামেরিকার প্রথম জেন্ডার ক্লিনিক। যে রোগকে বেঞ্জামিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তার কথিত সমাধান নিয়ে হাজির হয় সে নিজেই। ব্যাপারটাকে কেউ হয়তো কাকতালীয় বলবেন, আবার কেউ হয়তো বলবেন তুখোড় ব্যবসায়িক বুদ্ধি।

নিজের ফাউন্ডেশনের জন্য একটা গবেষণা দল তৈরি করে বেঞ্জামিন। এ দলের সদস্য ছিল হার্ভার্ড থেকে পাশ করা এক তরুণ সাইকোলজিস্ট, নাম জন মানি। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ইতিহাসের আরেক মহারথী। জন মানি অদ্ভুত এক তত্ত্ব হাজির করে। বলে মানুষের দেহ জন্মগত, কিন্তু তার আত্মপরিচয়ের অনুভূতি সামাজিকভাবে নির্মিত। মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মায় না। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে 'নারী' অথবা 'পুরুষ' হয়ে উঠতে শিখে। মানুষের পরিচয় ও যৌনতা দুটোই পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট নির্ভর। অপরিবর্তনীয় কিছু না। মানুষ কী ধরনের শরীর নিয়ে জন্মাচ্ছে, তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানসিকভাবে সে কোন লৈঙ্গিক ভূমিকা বা Gender Role গ্রহণ করছে।

এই তত্ত্ব দিয়ে দেহ আর পরিচয়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে মানি। তার প্রচার করা ধারণা লুফে নিয়ে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা 'লিঙ্গ পরিচয়' নামে আরেক ধারণা প্রস্তাব করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ড. রবার্ট স্টৌলার। এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার হয় লিঙ্গ পরিবর্তনের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা তৈরিতে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'দা ট্র্যান্সসেক্সুয়াল ফেনোমেনন' বইতে হ্যারি বেঞ্জামিন লেখে,

> 'সেক্সের অবস্থান নাভির নিচে, জেন্ডারের অবস্থান নাভির ওপরে।[২৩]

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় জরগেনসেনের আত্মজীবনী। আবারও ব্যাপক হাইপ উঠে মিডিয়াতে। ট্যান্সসেক্সুয়ালবাদ তথা 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' ধারণা ব্যাপকভাবে পৌঁছে যায় জনমানুষের কাছে। একই বছর বিখ্যাত জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা ক্লিনিক চালু হয় 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে। জনস হপকিন্সকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল স্কুলগুলোর একটা মনে করা হয়। এখানে এই ক্লিনিক চালু হওয়ার পর চিকিৎসাবিদ্যা ও গবেষণার জগতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায় ট্র্যান্সসেক্সুয়ালিসম। খুব দ্রুত এ ধরনের সার্জারির চল শুরু হয় আরও অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে।

এক জরিপ অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' রোগীদের গুরুত্বের সাথে

---

[২৩] Benjamin, The Transsexual Phenomenon (New York, 1966), p.6.

নিতো মার্কিন সার্জনদের মাত্র ৩%। কিন্তু ১৯৭৫ নাগাদ এ ধরনের সার্জারি হচ্ছিল বিশটি বড় বড় মেডিক্যাল সেন্টারে।[২১৪] এরই মধ্যে সার্জারি করিয়ে ফেলেছিল অ্যামেরিকার কয়েক হাজার মানুষ।[২১৫] মাত্র বিশ বছরের মধ্যে প্রায় অজ্ঞাত এক তত্ত্ব থেকে মেডিক্যাল গবেষণার বৈধ ফিল্ডে পরিণত হয় ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ।

ভালো কথা, ২০০৬ সালে হ্যারি বেঞ্জামিনের ফাউন্ডেশনের নাম বদলে ফেলা হয়। নতুন নাম রাখা হয় World Professional Association for Transgender Health সংক্ষেপে WPATH। বর্তমানে WPATH-কে ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রধান প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। নিজেদের যারা বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাদের 'চিকিৎসা' কীভাবে হবে তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে এই WPATH। হ্যারি বেঞ্জামিনের তৈরি ফাউন্ডেশন।

হ্যারি বেঞ্জামিন ধুরন্ধর উদ্যোক্তা ছিল, স্বীকার করতেই হয়। অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাষায় বললে, বেঞ্জামিন প্রথমে একটা জিনিসের চাহিদা তৈরি করে। তারপর নিজেই সেটার যোগান নিয়ে হাজির হয়। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে বেঞ্জামিন যখন ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ বা 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' মতবাদ প্রচার শুরু করেছিল, তখন এ শব্দটাও ছিল ইংরেজি ভাষাতে আনকোরা নতুন। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, চিকিৎসক এবং গবেষকদের কাছেও অপরিচিত ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ নাগাদ বই, অ্যাকাডেমিক জার্নাল আর বিশ্বব্যাপী লেকচার ট্যুরের মাধ্যমে এ তত্ত্ব পৌঁছে যায় চিকিৎসক ও গবেষকদের কাছে।

এরিকসন ফাউন্ডেশন

ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের ঝড়োগতির প্রসারের পেছনে ছিল আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি, যে শক্তির ভূমিকা সুপ্রমাণিত হলেও অ্যাকাডেমিক আলোচনাতে খুব কমই তা উঠে আসে।

সালটা ১৯৬৩। 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি জন্যে বেঞ্জামিনের কাছে হাজির হয় রিটা অ্যালমা এরিকসন নামে ৪৬ বছর বয়সী এক নারী। বাংলা সিনেমাগুলোতে ধনী বাবার একমাত্র মেয়েদের যেমন দেখানো হয়, রিটার অবস্থা অনেকটা তেমনই। বিংশ শতাব্দীর শুরুর বছরগুলোতে কয়লার ব্যবসা করে প্রচুর টাকা বানিয়ে নিয়েছিল তার বাবা। রিটা সেই বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সিনেমার নায়িকাদের মতো পড়াশোনায়ও ভালো ছিল রিটা। তবে নায়িকাদের সাথে রিটার মিল এখানেই

---

[২১৪] Green, Richard, Robert J. Stoller and Craig MacAndrew 1966 "Attitudes toward sex transformation procedures." Archives of General Psychiatry 15:178-182. Greenberg, N.H., A. Rosenwald, and P. Nielson

[২১৫] B. Reay, 'The Transsexual Phenomenon: A Counter-History', Journal of Social History, vol. 47, no. 4 (May 2014), p.1054.

শেষ। তার জীবনের বাকি অংশের গল্প ক্রমশ সুপারভিলেনের মতো হয়ে উঠবে।

আমাদের এই গল্পের প্রায় অন্য সব চরিত্রের মতো রিটাও আসক্ত ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায়। বিশাল বড়লোকের মেয়ে হবার কারণে তাকে কেন্দ্র করে সমকামী নারীদের একটা বলয় গড়ে উঠেছিল অ্যামেরিকার লুইসিয়্যানাতে। নিজের সমকামিতা নিয়ে খুব একটা রাখঢাক করতো না রিটা। বাবার প্রাচুর্য ও প্রভাবের কল্যাণে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হতো না তাকে। পঞ্চাশের দশকে হ্যারি বেঞ্জামিনদের কল্যাণে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ধারণা যখন পরিচিত হতে শুরু করলো, জর্গেনসেনের 'রূপান্তর' নিয়ে মিডিয়া যখন পুরো দেশে শোরগোল বাধিয়ে দিল, তখন রিটার মাথায় নতুন এক ভূত চাপলো। তার মনে হলো, সে এখন পুরুষ হতে চায়। ১৯৬২ সালে রিটার বাবা মারা গেল। সাম্রাজ্য এসে গেল রিটার হাতে। পরের বছর সে হাজির হলো হ্যারি বেঞ্জামিনের চেম্বারে।

বেঞ্জামিনের সহায়তায় ১৯৬৫ সালে অপারেশন করে 'পুরুষ হলো' রিটা এরিকসন।[২১৬] নতুন নাম, রীড এরিকসন। এরিকসন তারপর এমন একটা কাজ করলো, যা পরে সদূরপ্রসারী প্রভাব রাখবে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্ব এবং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থান ও প্রসারে। হ্যারি বেঞ্জামিনের সাথে পরিচয়ের এক বছরের মাথায় ১৯৬৪ সালে নিজ নামে একটা ফাউন্ডেশন খুললো সে—এরিকসন এডুকেশন ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ ডলারের অনুদান দিলো বেঞ্জামিনকে। এরিকসনের টাকা দিয়েই চালু হলো হ্যারি বেঞ্জামিনের ফাউন্ডেশন। তারপর এরিকসন মনোযোগ দিলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ষাট ও সত্তরের দশকে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে যত কাজ হয়েছে, তার প্রায় সবকিছুর পেছনে রিটা এরিকসনের চেকবই আর এরিকসন ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের তত্ত্বকে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এরিকসন ফাউন্ডেশনের ভূমিকাকে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। সামাজিকীকরণ : ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রতি মেডিক্যাল ফিল্ড এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বেশ কিছু কাজ করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। যেমন,

- 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে প্রতি বছর মেডিক্যাল সিম্পোসিয়ামের আয়োজন করা ও খরচ যোগানো। ফাউন্ডেশনের খরচে বাছাই করা ডাক্তার ও মনোবিদদের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। সেখানে গিয়ে তারা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে লেকচার দিতো। 'বাছাই করা' ডাক্তার ও মনোবিদদের মধ্যে ছিল জন মানির মতো লোকজন। মানি এই ফাউন্ডেশনের বোর্ডের সদস্যও ছিল।

---

[২১৬] Devor, Aaron H. "Reed Erickson and The Erickson Educational Foundation". Sociology Department, University of Victoria, Canada. Retrieved September 13, 2013.

- মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাদার সংস্থার মিটিংয়ে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- শর্টফিল্ম, পুস্তিকা আর লিফলেটের মাধ্যমে ডাক্তার, মনোবিদ, উকিল, পুলিশ, পাদ্রী এবং সামাজিক কর্মীদের মধ্যে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে সচেতনতা তৈরি।

২। **অনুদান :** ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে গবেষণা এবং 'লিঙ্গ পরিবর্তন' ক্লিনিক স্থাপনের জন্য উদার হস্তে টাকা ঢেলেছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন। একটু আগে জনস হপকিন্সের যে ক্লিনিকের কথা বললাম, সেটার পেছনেও ছিল এরিকসনের টাকা। অনুদানের সব টাকা যেত বেঞ্জামিন ফাউন্ডেশনের হাত ঘুরে।

৩। **'রোগী' সেবা :** লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয় এরিকসন ফাউন্ডেশন। যেমন:

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তারা একটা নিউসলেটার প্রকাশ করে, যার গ্রাহক সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের বেশি। লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে সামসময়িক গবেষণার সারমর্ম এই নিউসলেটারে তুলে ধরা হতো। অ্যামেরিকা জুড়ে আগ্রহী মানুষদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই প্রকাশনা।

সহজে অপারেশন করতে রাজি হয় এমন ২৫০ জনের বেশি ডাক্তারের লিস্ট তৈরি করেছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন। নিউসলেটারের সুবাদে তৈরি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তালিকার নামগুলো পৌঁছে যায় লিঙ্গ পরিবর্তনে ইচ্ছুক লোকেদের কাছে।

ইন্সুরেন্স কোম্পানি, নগর ও প্রাদেশিক কল্যাণ সংস্থা, এমনকি কারিগরি শিক্ষা ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করা নানা প্রতিষ্ঠানকেও লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের অর্থায়ন করতে রাজি করায় এরিকসন ফাউন্ডেশন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগানো খরচে অনেক লোকের অপারেশন হয়।

স্যান ফ্রানসিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে মিলে 'জাতীয় ট্র্যান্সসেক্সুয়াল কাউন্সেলিং ইউনিট' তৈরি করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। এ ইউনিটের কাজ ছিল সার্জারি করা লোকেদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা। সার্জারি করেনি এমন পুরুষদের নারী সেজে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতিপত্র দিতেও পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগকে রাজি করায় এই ফাউন্ডেশন।

সার্জারি করা লোকেদের নতুন জন্ম সনদ দেওয়ার জন্য অ্যামেরিকা জুড়ে রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের লোকদের পেছনে লবিয়িং করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। সফলও হয়। এতে করে অপারেশনের পর নতুন জন্ম সনদ পাওয়ার পথ খুলে যায়।[২৮৭]

---

[২৮৭] D. B. Billings & T. Urban, 'The Socio-Medical Construction of Transsexualism: An Interpretation and Critique', Social Problems, Vol. 29, No. 3 (Feb., 1982), p. 266.

এভাবে লিঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারে মেডিক্যাল ফিল্ড ও প্রশাসনের মনোভাব ও চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। তৈরি করে আইনি বৈধতার ভিত্তি, গড়ে তোলে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক।

***

এরিকসন ফাউন্ডেশনের কর্মপদ্ধতির সাথে অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের সায়েন্টিফিক হিউম্যানিটেরিয়ান কমিটির কার্যক্রমের। যেমন মিল পাওয়া যায় হ্যারি বেঞ্জামিনের প্রচারিত 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের' সাথে হার্শফেল্ডের দেওয়া তত্ত্বের। বেঞ্জামিনের একদিকে হার্শফেল্ডের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল, অন্যদিকে এরিকসন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাথেও সে যুক্ত ছিল অন্তরঙ্গভাবে। তাই হার্শফেল্ডের তৈরি ছকটাই সামান্য বদলে নিয়ে বেঞ্জামিন বাস্তবায়ন করছিল, এমন বলাটা ভুল হবে না। তবে হার্শফেল্ডকে সে যথাযথ কৃতিত্ব দেয়নি। লোভীর মতো সব প্রশংসা, স্তুতি আর কৃতিত্ব শুষে নেবার চেষ্টা করেছে একাই।

হার্শফেল্ডের মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরে মুন্সিয়ানার সাথে তার কৌশলগুলো কাজে লাগায় এরিকসন ফাউন্ডেশন। আবার আশির দশকের শেষ দিকে এই একই কৌশলগুলো গ্রহণ করে সমকামী অধিকার আন্দোলন। পায় ব্যাপক সাফল্য। আর এই কৌশলগুলোরই মাধ্যমে, ডাক্তার-তাত্ত্বিক-দাতা এবং রোগীর যোগসাজসকে কাজে লাগিয়ে, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দুই দশকে সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে যায় ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ।

অধ্যায় ১১

জোড়াতালি

সার্কাসের মজার কসরত কিংবা জাদুকরের হাতসাফাই দেখার সময় আমরা ব্যাখ্যা খুঁজি না। জাদুকর কীভাবে হাতসাফাই করছে, ঠিক কীভাবে কসরত করা হচ্ছে—দর্শক তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। কারণ, এসব নিয়ে ভাবতে গেলে সামনের দৃশ্য উপভোগ করা যাবে না। আমরা বিনোদনের দিকে মনোযোগ দিই। আমাদের মস্তিষ্ক তখন সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের প্রশ্নগুলোকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখে। সে তখন গ্রহণ করে, কিন্তু পরীক্ষা করে না। অনুভব করে, কিন্তু বিশ্লেষণ করে না।।

লিঙ্গ পরিবর্তন বা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের আলোচনার ক্ষেত্রেও এরকম একটা ব্যাপার ঘটে। এ ধরনের তথ্যগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরনের বিস্ময় আর অস্বস্তিমেশানো কৌতূহল কাজ করে। তার সাথে থাকে খেই হারিয়ে ফেলার অনুভূতি। হঠাৎ করে এমন সব তথ্য আমাদের সামনে হাজির হয়, যা আগে অকল্পনীয় ছিল। অদ্ভুত এই তথ্যগুলো আমাদের অপ্রস্তুত, দিশেহারা করে ফেলে। আমরা বুঝে উঠতে পারি না কোন ছকে ফেলে এগুলোর অর্থ বের করে আনা দরকার। সামনে থাকা গাছের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ যেমন পুরো বনটাকে দেখতে পায় না, তেমনিভাবে বিচিত্র খুঁটিনাটিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে ঠান্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা হয় না।

এমন অবস্থায় মানুষ খুব সহজে কোনো একটা ব্যাখ্যা গ্রহণ করে ফেলে। কারণ দিশেহারা হবার চেয়ে একটা ব্যাখ্যা আঁকড়ে ধরা সহজ, তাতে যতই ভুল থাকুক না কেন। মানবমনের এই প্রবণতা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ তথা 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' তত্ত্ব গড়ে উঠেছে ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর। এই তত্ত্বের পুরো শরীর জুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে অগণিত কাটাছেঁড়া আর জোড়াতালির দাগ। মানসিক সমস্যার সমাধানে দেহকে বদলানো, সার্জারির ফলাফলকে ভুলভাবে উপস্থাপন কিংবা পুরো ব্যাপারটার তাত্ত্বিক সমীকরণ—তালগোল প্যাকিয়ে আছে অনেক জায়গাতেই। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলাকে আমরা

সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। খুলতে পারি না চিন্তার জট। তাই আসুন বিদঘুটে, চাঞ্চল্যকর খুঁটিনাটিগুলো সরিয়ে রেখে, দূর থেকে, একটু সময় নিয়ে খতিয়ে দেখা যাক অসঙ্গতিগুলো। তবে সেই আলোচনাতে যাবার আগে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারিতে ঠিক কী হয়, আগে তা জেনে নেওয়া যাক।

গোড়ায় গলদ

সব তত্ত্বকথার আড়ালে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের মূল কেন্দ্র হলো স্বেচ্ছায় 'লিঙ্গ পরিবর্তন' বা 'সেক্স চেইঞ্জ'। গোড়াতেই গলদ। আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে, 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির মাধ্যমে নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারী হওয়া যায়। এটি ভুল ধারণা। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির মাধ্যমে কেউ আসলে পুরুষ থেকে নারী কিংবা নারী থেকে পুরুষ হয় না। এগুলো এক ধরনের কসমেটিক সার্জারি। এখানে বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন হয় কেবল। পুরো প্রজননব্যবস্থা বদলায় না। যার জন্ম নারী হিসেবে, শত অস্ত্রোপচার করা হলেও তার শরীর বীর্য উৎপাদন করতে পারবে না। তার ঔরসে সন্তানের জন্ম হবে না। যার জন্ম হয়েছে পুরুষ হিসেবে, শত অস্ত্রোপচার করা হলেও সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না।

তাহলে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' বলে আসলে কী বোঝানো হয়? আসলে কী করা হয় এ ধরনের সার্জারিতে?

একদম সোজাসাপ্টাভাবে বললে, একজন পুরুষের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির মানে হলো অপারেশন করে তার বুকে কৃত্রিম 'স্তন' বসানো, তার অণ্ডকোষ ফেলে দেওয়া আর পুরুষাঙ্গ কেটে উল্টে (invert) দিয়ে দু' পায়ের মাঝখানে একটা ছিদ্র তৈরি করা। নারীদের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' এর অর্থ হলো, তার স্তন কেটে বাদ দেওয়া, শরীর থেকে জরায়ু এবং গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অংশ কেটে ফেলে দেওয়া, তারপর হাতের কবজি কিংবা পা থেকে কিছু পেশী নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি 'পুরুষাঙ্গ' তৈরি করা।

এই কৃত্রিম যোনী এবং কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ কোনোটাই সত্যিকারের অঙ্গের মতো কাজ করে না। প্রজননের ক্ষেত্রে তো না-ই, যৌনতার ক্ষেত্রেও না। কথাটা সহজে, একটু স্থূলভাবে বলি—পাঠাকে খাসি করলে সেটা মাদী ছাগী হয়ে যায় না। সে তখন বাচ্চা দিতে পারে না, দুধ দিতে পারে না। জায়গামতো 'ছিদ্র' করে দিলেও পারে না।

তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক আছে, আর তা হলো হরমোন ট্রিটমেন্ট। পুরুষত্বের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন টেস্টোস্টেরন। এই হরমোনের প্রভাবেই বয়ঃসন্ধির সময় পুরুষের কণ্ঠ ভারী হয়, দাড়ি গজায়, শরীরে লোম গজায়, মাংসপেশী ও হাড়ের ঘনত্ব বাড়ে। এ হরমোন পুরুষদেহে তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবে। পুরুষদের রাগ, আগ্রাসী মনোভাব এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার পেছনেও জোরালো

ভূমিকা রাখে এই হরমোন। তাই দেখবেন, অনেক ক্রীড়াবিদ এবং বডিবিল্ডার পারফরমেন্স বাড়াতে এবং শরীরকে আরও পেশীবহুল করতে টেস্টোস্টেরন ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে নারীত্বের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন ইস্ট্রোজেন। বয়ঃসন্ধির সময়ে নারীদেহে আসা পরিবর্তনগুলোর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই হরমোন। ইস্ট্রোজেনের কারণে নারীদেহে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়, শরীরের কাঠামো হয় কমনীয় এবং নারীসুলভ।

তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন'–এর সময় পুরুষদের ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন[২৮] এবং নারীদের টেস্টোস্টেরন হরমোন দেওয়া হয় উচ্চ পরিমাণে। অর্থাৎ তাদের দেহে বিপরীত লিঙ্গের হরমোন ঢোকানো হয়। টেস্টোস্টেরনের প্রভাবে নারীদের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে, চুল পড়তে শুরু করে, দাড়ি গজায় এবং শরীরের কমনীয়তা কমে। পেশী কিছুটা বাড়ে। অন্যদিকে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে পুরুষের কণ্ঠ চিকন হয়, শরীরে চর্বি বাড়ে (বিশেষ করে বুকে ও কোমরে) এবং সার্বিকভাবে তার অবয়ব পুরুষের তুলনায় গোলগাল হতে শুরু করে।[২৯]

তবে যত হরমোনই দেওয়া হোক না কেন, এতে করে একজন পুরুষ নারী হয়ে যায় না। একজন নারী পুরুষে পরিণত হয় না। স্রেফ বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন আসে। তাছাড়া কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অঙ্গ যৌনতা বা প্রজনন, কোনো ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক অঙ্গের মতো কাজ করতে পারে না। 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করা প্রতিটি মানুষ প্রজননে অক্ষম। এক অর্থে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সবচেয়ে চরম ধরনের বন্ধ্যাকরণ।

কৃত্রিমভাবে তৈরি পুরুষাঙ্গ 'নান্দনিকতার' বাইরে অন্য কোনো কাজে আসে না। আর কৃত্রিমভাবে তৈরি করা 'যোনী'র ব্যাপারটা একজন ভুক্তভোগীর নিচের মন্তব্য থেকেই বুঝে নেওয়া যায়,

> কোনো অপারেশন করেই নারীর যোনীর কাছাকাছি কিছু বানানো সম্ভব না। এই অপারেশন একটা ডাকাতি। এটা (অপারেশন করে যা বানানো হয় সেটা) একটা খোলা ক্ষত ছাড়া আর কিছু না। এটাকে যারা কৃত্রিম যোনী বলে, তারা ডাকাত। এরা শুধু অজ্ঞ, সাধাসিধে, বোকা মানুষদের টাকা হাতিয়ে নিতে চায়।[৩০]

---

[২৮] প্রোজেস্টেরন: এক ধরনের সেক্স হরমোন; যা মাসিক, গর্ভধারণ ও ভ্রূণীয় বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

[২৯] Christian Hamburger, "Endocrine Treatment of Male and Female Transsexualism," in Green and Money, Transsexualism, p. 291.

[৩০] Socarides, Charles W. Beyond sexual freedom. Quadrangle/The New York Times Book Company, 1975, p 130

খুব অল্পসংখ্যক রোগীই সার্জারির পর নতুন 'যৌনাঙ্গ' নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। অনেকেই 'সংশোধনমূলক' আরও বিভিন্ন সার্জারি করায়।[২২১] সার্জারির পর থাকে নানা ধরনের জটিলতা, অনেক ক্ষেত্রে তীব্র শারীরিক কষ্ট। হরমোন ট্রিটমেন্টের কারণে অনেকে আক্রান্ত হয় ক্যান্সারে।[২২২] পশ্চিমা বিশ্বে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার বলে দাবি করা লোকদের বড় একটা অংশই হরমোন ট্রিটমেন্ট এবং সার্জারি করে না। ট্র্যান্সজেন্ডার দাবিদারদের মধ্যে হরমোন ট্রিটমেন্ট নেয় অর্ধেকের মতো। আর 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করে টেনেটুনে মাত্র ২৫%।[২২৩] অন্যদিকে অপারেশন করে 'রূপান্তরিত' হওয়া মানুষদের মধ্যে অনেকে ভুল বুঝতে পেরে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে তারা নিজেরাই। তাই তাদের মধ্যে তৈরি হয় হতাশা, আত্মহত্যার প্রবণতা।[২২৪]

মোদ্দাকথা হলো, ডাক্তাররা কসমেটিক সার্জারি করে সেটাকে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' বলছেন। অথচ তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন, এসব অপারেশনের ফলে একজন পুরুষ নারীতে বা নারী পুরুষে পরিণত হয় না। একই কারণে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল শব্দটাও বিভ্রান্তিকর। কারও সেক্স আসলে রূপান্তর করা যায় না। নিজের দেহের পরিচয়কে মুছে ফেলা যায় না। দেহকে অতিক্রম করা যায় না।

লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির জগতে জর্জেস ব্যুরো নামটা কিংবদন্তির মতো। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে মরক্কোর ক্যাসাব্ল্যাংকাতে ঘাটি গেড়ে বসা এই ফরাসি সার্জন ১৯৭৩ নাগাদ করে ফেলেছিল তিন হাজারের বেশি লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি।[২২৫] নিজের কাজের ব্যাপারে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল ড. ব্যুরোর। সব ভণিতা আর বায়বীয়

---

[২২১] Bellinger, Creighton G., and Dicran Goulian. "Secondary surgery in transsexuals." Plastic and Reconstructive Surgery 51, no. 6 (1973): 628-631.

[২২২] Doctors Admit Link Between Transgender Hormone Therapy And Cancer In Leaked Emails. The Telegraph. March 5, 2024. https://tinyurl.com/yc3tmthe

[২২৩] James, Sandy, Jody Herman, Susan Rankin, Mara Keisling, Lisa Mottet, and Ma'ayan Anafi. "The report of the 2015 US transgender survey." (2016). 99,100.cNolan, Ian T., Christopher J. Kuhner, and Geolani W. Dy. "Demographic and temporal trends in transgender identities and gender confirming surgery." Translational andrology and urology 8, no. 3 (2019): 184.

[২২৪] সার্জারি করার পর আবার আগের অবস্থায় ফিরতে চাওয়া বা 'রূপান্তরের প্রক্রিয়া' বন্ধ করে দেওয়াকে বলা হয় ডিট্র্যানযিশান। Cohn, J. "The Detransition Rate Is Unknown." Archives of Sexual Behavior (2023): 1-16. Transgender detransition is a taboo topic, but data shows it's on the rise, Big Think - https://bigthink.com/health/transgender-detransition/
সার্জারি করার পর আবার আগের অবস্থায় ফিরতে চাওয়া কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে ডকুমেন্টারি, Detransition: I Want My Sex Back: https://www.youtube.com/watch?v=m3D8OyCT7ac
নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার বলে দাবি করা লোকেদের মধ্যে ৪০% এর বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, More than 40% of transgender adults in the US have attempted suicide, https://williamsinstitute.law.ucla.edu/press/transpop-suicide-press-release/

[২২৫] "The Three Kings: Harry Benjamin, John Money, Robert Stoller," Archives of Sexual Behavior 38:4 (August 2009), 610-613.

তত্ত্বের কচকচি বাদ দিয়ে ব্যুরো সরাসরি বলেছিল,

> আমি পুরুষকে নারী বানাই না। আমি পুরুষাঙ্গকে এমনভাবে রূপান্তর করি, যাতে সেটাতে নারীসুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য আসে। ব্যস, এটুকুই। বাদবাকি সব রোগীর মনের ব্যাপার।[২২৬]

কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের বাস্তবতার পুরোটা বোঝার জন্য এই চারটা বাক্যই যথেষ্ট।

শরীর বনাম মন

বার্লিনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করতে চাওয়ার ব্যাপারটাকে জন্মগত প্রমাণের বহু চেষ্টা হয়েছে। ম্যাগনাস হার্শফেল্ড বিভিন্ন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিল, যদিও তার সবই ভুল প্রমাণিত হয় পরে। প্রমাণ করে দেখাতে পারেনি হ্যারি বেঞ্জামিনও। তবে তারও আশা ছিল কোনো-না-কোনো সময়ে হয়তো ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ জন্মগত হবার প্রমাণ মিলবে। হয়তো এটা জেনেটিক, হয়তো গর্ভে থাকা অবস্থায় হরমোনজনিত কোনো ভারসাম্যহীনতার কারণে এমন হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ আশা বয়ে বেড়িয়েছে বেঞ্জামিনের অনুসারীরাও। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[২২৭] স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়ার পুরো ব্যাপারটা মানসিক। ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের ইতিহাস হলো 'মনের চাওয়া'কে মেডিক্যাল সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করার আখ্যান।

প্রশ্ন হলো, মানসিক সমস্যার সমাধান কি শরীর বদলানো, না কি মনের চিকিৎসা?

সম্পূর্ণ সুস্থ দেহের একজন মানুষ মনে করছে তার শরীরে গুরুতর কোনো সমস্যা আছে, যেকোনো মূল্যে নিজের দেহকে সে বদলে ফেলতে চাচ্ছে, মনে করছে সে 'ভুল দেহে আটকা পড়ে আছে'—এটা নিসন্দেহে গুরুতর মানসিক সমস্যা। এ ধরনের বদ্ধমূল ধারণাকে ডিলিউশান বলা হয়। ডিলিউশানের তীব্রতার কারণে অনেক সময় মানুষ নিজের এবং অন্যের ক্ষতি করে। অনেকে আত্মহত্যার হুমকি দিতে পারে। নিজের ক্ষতি করা কিংবা আত্মঘাতী হবার প্রবণতাও মানসিক বিকারের উপসর্গ। এখানে সমস্যার কেন্দ্র ব্যক্তির মন, তার দেহ না। মানসিক সমস্যার কারণে শরীরের ওপর অস্ত্রোপচার করার অর্থ সমস্যার সমাধান করার বদলে, সমস্যার সামনে আত্মসমর্পণ করা।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের পক্ষে ব্যবহার করা যুক্তি এমন

---

[২২৬] "The Sexes: Prisoners of Sex," Time, January 21, 1974, 64.

[২২৭] J Michael Bailey, Michael P. Dunne, and Nicholas G. Martin, "Genetic and Environmental Influences on Sexual Orientation and Its Correlates in an Australian Twins Sample," Journal of Personality and Social Psychology 78.3 (March 2000): 524-536, John de Cecco and David Parker, eds., Sex, Cells, and Same-Sex Desire: The Biology of Sexual Preference (New York: Harrington Park Press, 1995).

এক পথ খুলে দেয়, যে পথে এসে হাজির হয় অনেক বিচিত্র আগন্তুক। নিজের দেহ ও পরিচয় নিয়ে মানুষের মধ্যে হরেকরকমের অতৃপ্তি কাজ করে। মনের সমস্যারও অনেক ধরন থাকে। তাহলে মনের সমস্যার কারণে দেহ বদলানোর ব্যাপারটা শুধু লিঙ্গ পরিবর্তনের মধ্যে সীমিত কেন থাকবে বলুন তো?

কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি যদি তার গায়ের রঙ সাদা করতে চায়, যদি তার কাছে মনে হয় সে কালো দেহে আটকা পড়া সাদা মানুষ, তাহলে কি তাকে তা করতে দেওয়া উচিত? বডি আইডেন্টিটি ইন্টেগ্রিটি ডিসঅর্ডার নামে একটা মানসিক রোগ আছে। এই অসুখের রোগী মনে করে তার শরীরের কোনো একটা অংশ আসলে 'তার না'।[২২৮] হয়তো নিজের ডান পা-কে তার কাছে অপরিচিত লাগতে শুরু করে, তখন সে ঐ পা কেটে বাদ দিতে চায়। যদিও শারীরিকভাবে তার কোনো সমস্যা নেই।

এমন রোগীদের কি অপারেশন করে নিজেদের হাত-পা কেটে ফেলতে দেওয়া উচিত? না কি তাদের মনের চিকিৎসা করা দরকার?

এক্ষেত্রে সবাই বলবে, শরীর সুস্থ, রোগটা মনে। অসুস্থ মনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শরীরের ক্ষতি না করে, মনের চিকিৎসা করা জরুরি।[২২৯] কিন্তু ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে একেবারে উল্টো কথা। কেন?

এ ধরনের অপারেশনের বিরোধিতা করতে গিয়ে এক ডাক্তার মন্তব্য করেছেন,

> কেউ যদি ছাতা হতে চায়, আপনি কি তাকে একটা ছাতায় পরিণত করার চেষ্টা করবেন?[২৩০]

উপস্থাপনা তির্যক হলেও প্রশ্নের পেছনের জিজ্ঞাসাটা কিন্তু যৌক্তিক।

প্রণোদিত চাহিদা

ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ডাক্তাররা। মেডিক্যাল ফিল্ডের ভূমিকা ছাড়া কোনোভাবেই ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ আজকের এই অবস্থানে পৌঁছায় না। এক অর্থে এটা ডাক্তারদের আবিষ্কৃত একটা বিষয়। ডাক্তাররা আমার ওপর ক্ষেপে যাবার আগেই জানিয়ে রাখি কথাটা আমার না। এ কথা বলেছেন বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং খোদ ডাক্তারদের অনেকেও। তাদের কথাগুলো দেখার আগে, ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদকে চিকিৎসাবিদ্যার 'আবিষ্কার'

---

[২২৮] Müller, Sabine. «Body integrity identity disorder (BIID)—Is the amputation of healthy limbs ethically justified?." The American Journal of Bioethics 9, no. 1 (2009): 36-43.

[২২৯] S. Müller, "Body Integrity Identity Disorder (BIID)—Is the Amputation of Healthy Limbs Ethically Justified?," American Journal of Bioethics 9:1 (January 2009), 36–43.

[২৩০] Bogdan (ed.), Being Different, 105.

বলার পেছনের যুক্তিগুলো বলি।

পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, ট্র্যান্সসেক্সুয়াল-এর সংজ্ঞাটা গড়েই উঠেছে 'অপারেশন করে শরীর বদলাতে চাওয়া'-কে কেন্দ্র করে। অপারেশন করার ইচ্ছাকে বলা হচ্ছে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল হবার প্রধান উপসর্গ। হ্যারি বেঞ্জামিনের দেওয়া ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের সংজ্ঞাতে আমরা দেখেছি সে বলছে,

> ...এমনও হতে পারে যে, বিপরীত লিঙ্গের মতো হবার জন্য (রোগীর মধ্যে নিজের) দেহের ব্যাপারে 'প্রকৃতির ভুল' সংশোধনের ইচ্ছা কাজ করে। এ ধরনের (রোগীর) ক্ষেত্রে 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালিসম' শব্দটি যথাযথ বলে মনে হয়।[২৩১]

এখানে *'প্রকৃতির ভুল সংশোধন'*-এর অর্থ অপারেশনের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে শরীর বদলে নেওয়া। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় জনস হপকিন্সের ডাক্তারদের দেওয়া সংজ্ঞা থেকেও। তারা বলছেন ট্র্যান্সসেক্সুয়ালিসম হলো,

> ...মানসিক সিন্ড্রোম[২৩২]। এর বৈশিষ্ট্য হলো, বিপরীত লিঙ্গের মতো হবার জন্য, এবং তা স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য ব্যক্তি নিজের দেহকে অস্বীকার করে এবং বদলানোর চেষ্টা করে।[২৩৩]

অস্ত্রোপচার করে পুরুষের দেহকে বাহ্যিকভাবে নারীসুলভ বা নারীর দেহকে পুরুষসুলভ করার প্রযুক্তি ও সক্ষমতা এসেছে ১৯২০-এর দশকের দিকে। আর ঠিক তখনই তৈরি হয়েছে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল নামে আলাদা একটা শ্রেণি। এই ব্যাপারটা কাকতালীয় না। অপারেশনের সুযোগ যদি না থাকত, তাহলে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালকে সংজ্ঞায়িত করা হতো কীভাবে? সুযোগ না থাকলে অপারেশনের 'তাড়না' তৈরি হতো কী করে? একজন সমকামীর সাথে, কিংবা নারী সাজতে পছন্দ করা পুরুষের (ট্র্যান্সভেস্টাইট) সাথে একজন 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল'-এর মৌলিক পার্থক্য তখন কী হতো?

প্রতি বছর কসমেটিক সার্জারির পেছনে পৃথিবীতে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। 'সৌন্দর্য বৃদ্ধি'র জন্য স্বেচ্ছায় অস্ত্রোপচার করাকে বলে কসমেটিক সার্জারি। আমরা অনেকে এটাকে প্লাস্টিক সার্জারি নামেও চিনি। এ ধরনের অপারেশন করাতে চাওয়া লোকের সংখ্যা প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপনের ইচ্ছা মানুষের মধ্যে অনেক পুরোনো। কিন্তু তার জন্য শরীরে

---

[২৩১] Harry Benjamin, "Transvestism and Transsexualism," International Journal of Sexology 7 (1953): 12, 13.

[২৩২] শরীর বা মনের (সাধারণত) অস্বাভাবিক অবস্থা নির্দেশক লক্ষণসমষ্টি।

[২৩৩] Milton T. Edgerton, Norman J. Knorr, and James R. Callison, "The Surgical Treatment of Transsexual Patients," Plastic and Reconstructive Surgery, 45 (January 1970): 38

ছুরিকাঁচি চালানোর মতো চরম পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারটা নতুন।

এ প্রবণতা তখনই তৈরি হয়েছে যখন এ ধরনের অপারেশনের প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে, যখন তা সহজলভ্য হয়েছে, যখন মিডিয়া এ প্রযুক্তির মার্কেটিং করেছে, যখন বিনোদন জগৎ সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছে এই প্রযুক্তির আদলে, যখন ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এর দিকে উসকে দিয়েছে মানুষকে। প্রযুক্তি, প্রচারণা আর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের যোগসাজস, প্লাস্টিক সার্জারি করার প্রবণতা উসকে দিয়েছে সমাজে। তৈরি করেছে কৃত্রিম চাহিদা। আজ বিনা প্রয়োজনে মানুষ হাজারো কোটি টাকা খরচ করছে কৃত্রিম চেহারা আর দেহের জন্যে। পরিবর্তন করছে মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে।

ঠিক একই ব্যাপারটা ঘটেছে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ তথা 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' ক্ষেত্রে। এ ধরনের সার্জারির পক্ষে মিডিয়াতে যত বেশি মাতামাতি হয়েছে, তত বেশি সার্জারির চাহিদা তৈরি হয়েছে। জর্জ ওরফে ক্রিস্টিন জর্গেনসেনের ঘটনা নিয়ে মিডিয়া শোরগোলের কয়েকমাসের মধ্যে তার সার্জনের কাছে চিঠি লিখে লিঙ্গ পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ৪৬৫ জন মানুষ।[২৩৪] সার্জারি নিয়ে প্রচারণা সার্জারির চাহিদা তৈরি করেছে, এই সম্পর্কটা বোঝা জটিল কিছু না। বিজ্ঞাপনের পুরো ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে চাহিদা আর প্রচারণার এই সম্পর্কের ওপর।

কথিত লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ডাক্তাররাও। স্বপ্ন ফেরি করে বেড়িয়েছিল তারা উদারভাবে। বিস্ময়কর মাত্রার সাফল্যের গল্প শুনিয়েছিল হ্যারি বেঞ্জামিন।[২৩৫] এরিকসন ফাউন্ডেশনের পত্রিকাতে উঠে এসেছিল সার্জারির পর আশা আর আনন্দ উপচে ওঠা নতুন জীবনের কথা।[২৩৬] জন মানি লোভ দেখিয়েছিল, কৃত্রিম যোনীর মালিক হবার পর একজন পুরুষও কামোত্তেজনার 'উষ্ণ আভা' অনুভব করবে, স্বাদ পাবে চরম আনন্দের।[২৩৭]

আজ আমরা জানি, এ প্রতিশ্রুতিগুলো ভুল ছিল। সার্জারির ফলাফল আসলে কতটা 'আনন্দদায়ক' এবং 'আসলের মতো' তা নিয়ে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য এখন আমাদের সামনে আছে। কিন্তু অনেকেই এ প্রতিশ্রুতিগুলো বিশ্বাস করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে যুক্ত কিছু মানুষের ক্যানভাসিং এ ধরনের সার্জারির চাহিদা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, এ কথা স্বীকার করেন খোদ ডাক্তাররাও। লিঙ্গ পরিবর্তনকে এতটাই আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, ডাক্তারদের

---

[২৩৪] Hamburger, Christian. "The desire for change of sex as shown by personal letters from 465 men and women." European Journal of Endocrinology 14, no. 4 (1953): 361-375.

[২৩৫] Benjamin. "The transsexual phenomenon."

[২৩৬] Erikson Educational Foundation Newsletter. "Life Begins Again" Spring: □, 1969

[২৩৭] Money, John. "Sex reassignment therapy in gender identity disorders." International psychiatry clinics 8, no. 4 (1971): 197-210

চেম্বারে এসে মানুষ বলত, 'আমি ট্র্যান্সসেক্সুয়াল হতে চাই'।[২২৮] লক্ষ্য করুন, তারা কিন্তু 'আমি চিকিৎসা চাই' বলেনি, বলেছে আমি 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল' হতে চাই। অসুস্থতা কীভাবে কামনার বস্তু হয়ে ওঠে?

এ ধরনের সার্জারিকে 'ছোঁয়াচে রোগ' বলে আখ্যায়িত করেছিল নারী সাজা পুরুষ ভার্জিনিয়া প্রিন্স। যে 'রোগ' পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল নারী সাজতে চাওয়া পুরুষদের, অর্থাৎ ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মধ্যে।[২২৯] সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. ডোয়াইট বিলিংস এবং থমাস আরবানের মূল্যায়ন হলো,

> 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ একটা সামাজিকভাবে নির্মিত বাস্তবতা, যা শুধুমাত্র চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যে, এবং চিকিৎসাবিদ্যার মাধ্যমে অস্তিত্বমান হয়েছে। আমরা মনে করি, ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ এমন একটি সামাজিক নির্মাণ, যা টিকে থাকে মেডিক্যাল প্র্যাকটিসের মধ্যে এবং এর প্রচারণা হয় জনসম্মুখে দেওয়া (বিশেষজ্ঞ কিংবা সার্জারি করা ব্যক্তিদের) সাক্ষ্যের মাধ্যমে...লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের বৈধকরণ, বাজারজাতকরণ এবং যৌক্তিক অজুহাত তৈরির ফলে 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল' নামে একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে...[২৩০]

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ মেডিক্যাল শাস্ত্রের তৈরি করা একটা 'রোগ'। লিঙ্গ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বা 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল' সহজাত কোনো পরিচয় না। এই পরিচয় কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত। এই 'রোগ', 'রোগী' এবং 'চিকিৎসা'র চাহিদা, সবই চিকিৎসাশাস্ত্রের তৈরি করা। মিডিয়া আর 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' যথাক্রমে এর প্রচারক ও পরিবেশক। ব্যাপারটার সাথে অবিশ্বাস্য মাত্রার ট্র্যাজিডি এবং সীমালঙ্ঘন যুক্ত না থাকলে হয়তো এই ব্যবসায়িক কৃতিত্বের তারিফ করতে পারতাম আমরা।

হাতুড়ে

কেউ বলতে পারেন, যখন অপারেশন সম্ভব ছিল না তখনও চাহিদা ছিল। আর চাহিদার থাকার কারণেই প্রযুক্তি ও দক্ষতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। চাহিদা ছিল সত্য, তবে সেটা ছিল ইন্টারসেক্স তথা জন্মগত যৌনত্রুটি থাকা মানুষদের। কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার হয় সেগুলো আসলে তৈরি হয়েছিল ইন্টারসেক্স মানুষদের চিকিৎসার জন্য। সেই ১৯২০ থেকে ইন্টারসেক্স মানুষদের চিকিৎসার অগ্রগতি আর ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রসারের গ্রাফটা এগিয়েছে প্রায় সমান্তরালভাবে। লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা রথীমহারথীদের

---

[২২৮] Person, Ethel, and Lionel Ovesey. "The transsexual syndrome in males I and II." American Journal of Psychotherapy (1974), 28:4-20, 174-193.

[২২৯] Virginia Prince, "Transsexuals and Pseudotranssexuals," Archives of Sexual Behavior, 7, 4 (1978): 263-72, 271.

[২৩০] Billings & Urban, 'The Socio-Medical Construction

মধ্যে জন মানি এবং রবার্ট স্টোলারসহ অনেকেরই প্রাথমিক গবেষণা ছিল ইন্টারসেক্স মানুষদের নিয়ে।[২৪১] যে প্রযুক্তি তৈরি হয়েছিল ইন্টারসেক্স মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য, এক শ্রেণির ডাক্তার সেগুলোকে ব্যবহার করেছে বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করতে চাওয়া যৌন পথভ্রষ্টদের ফ্যান্টাসি বাস্তবায়নে।

এখানে আবারও লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির সাথে কসমেটিক সার্জারির মিলটা সামনে আসে। কসমেটিক সার্জারিতে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলো তৈরি হয়েছিল জন্মগত ত্রুটি কিংবা দুর্ঘটনার কবলে পড়া রোগীদের সংশোধনমূলক অপারেশনের জন্য। কিন্তু কিছু ডাক্তার ও ব্যবসায়ীরা এই প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াগুলো প্রয়োগ করতে শুরু করলো কসমেটিক সার্জারির ক্ষেত্রে। যেখানে উদ্দেশ্য কেবলই 'সৌন্দর্য বর্ধন'। ঠিক একইভাবে আন্তঃলিঙ্গ মানুষের চিকিৎসার জন্য তৈরি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হলো সুস্থ শরীর কাটাকুটির জন্য।

এক ধরনের রোগীর চিকিৎসার জন্য আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অন্য ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এবং সেটা অহরহ ঘটে। কিন্তু তা করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ মেডিক্যাল এবং নৈতিক ভিত্তি। জন্মগত সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারসেক্স মানুষদের ওপর অস্ত্রোপচার করা, আর কারও নারী সাজতে ভালো লাগে তাই কসমেটিক সার্জারি করে তার দেহ নারীর মতো করে দেওয়া, একেবারেই আলাদা ব্যাপার। যেমন, অস্ত্রোপচারের সময় চেতনানাশক হিসেবে মরফিন ব্যবহার করা আর প্রেমে ছ্যাঁকা খাওয়ার দুঃখ ভুলতে হেরোইনের নেশা করা আলাদা ব্যাপার।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে যার মূলভাবটা অনেকটা এরকম—হাতে হাতুড়ি থাকলে দুনিয়ার সব সমস্যাকে পেরেক মনে হয়। যেই কারিগরের কাছে যন্ত্রপাতি বলতে কেবল হাতুড়িই আছে, সে সবকিছুকে পেরেকের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে ঠিক করতে চায়। এ ধরনের একটা প্রবণতা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ইতিহাসে চোখে পড়ে। মানসিক বিকৃতি নিয়ে আসা রোগীদের ওপর জন্মগত শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা চালিয়ে দেওয়াকে 'হাতুড়ে নীতি' ছাড়া আর কিছু বলা মুশকিল।

অধরা-অতৃপ্তি

এতকিছুর পরও কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কোনো অপারেশন করেই একজন পুরুষকে নারী বানানো যায় না, একজন নারীকে বানানো যায় না পুরুষ। এটা ডাক্তারও জানে, রোগীও জানে। অর্থাৎ অপারেশনের পরও নারী সাজা পুরুষ জানছে, সে সত্যিকার অর্থে একজন নারী না। ব্রিটিশ সাংবাদিক জেমস মরিস ১৯৭২ সালে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' অপারেশন করায়। নতুন নাম নেয় জ্যান মরিস। 'লিঙ্গ

[২৪১] Katrina Karkazis, Fixing Sex: Intersex, Medical Authority, and Lived Experience (Durham, NC, 2008). Robert J. Stoller, Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity (New York, 1968), chs. 5–7.

পরিবর্তনের' পক্ষে নিজের আত্মজীবনীতে অনেক ইতিবাচক কথা বলা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে সে লেখে, 'আমি একজন নারীর শরীর পরিধান করি।' ব্যাপারটা আসলেই তাই। একজন নারী হওয়া আর 'নারীর শরীর পরা' কখনোই এক না।[২৪২]

জনস হপকিন্সে লিঙ্গ পরিবর্তন ক্লিনিক গড়ে তোলার পেছনে জন মানির পাশাপাশি অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন সার্জন ড. জন হপস। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালে এই ক্লিনিকের প্রধান নিয়োজিত হয়েছিলেন মনোবিদ ড. জন মেয়ার। এই ক্লিনিকের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৭৯ সালে তারা দুজন মিলে একটা বই লেখেন। অপারেশন করে নারী হতে চাওয়া পুরুষদের ব্যাপারে এ বইতে তারা বলেন,

> হাজারো সূক্ষ্ম উপায়ে রোগী (লিঙ্গ পরিবর্তনকারী) তিক্তভাবে অনুভব করে যে, সে একজন সত্যিকার নারী না, এবং কখনো হতে পারবে না। সে সর্বোচ্চ একজন বিশ্বাসযোগ্য কৃত্রিম নারী হতে পারবে। পুরুষ হবার সব সুযোগ হারিয়ে ফেলা এবং শেষ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে নারীও হতে না পারার যে ট্র্যাজিডি, এটুকু (বিশ্বাসযোগ্য কৃত্রিম নারী হতে পারা) দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ হয় না।[২৪৩]

অপারেশন করা রোগীদের ফলোআপ করার পর ড. জন মেয়ার মন্তব্য করেন, এই ধরনের অপারেশনের ফলে দিনশেষে মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সার্জারির আগে যারা সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে হিমশিম খেতো, সার্জারির পরও এক্ষেত্রে বলার মতো কোনো উন্নতি হচ্ছে না তাদের। কারণ,

> 'এটি মূলত একটি মানসিক সমস্যা, যা সার্জারি নিরাময় করতে পারে না'।[২৪৪]

সার্জারি করে নারী সাজতে চাওয়া পুরুষদের ব্যাপারে জনস হপকিন্সের সেই সময়কার সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ড. জন ম্যাকহিউ লিখেছেন,

> ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্র এবং আবেগ নিয়ে তাদের মধ্যে (সার্জারির) আগের মতোই সমস্যা ছিল। (সার্জারির পর) মানসিক অসুবিধাগুলো থেকে তারা বের হয়ে আসবে, তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে, এই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের দৃষ্টিতে এই ফলাফলগুলো প্রমাণ করে যে, এই পুরুষেরা সার্জারির আগে নারীর পোশাক পরা উপভোগ করত। সার্জারির পর এখন তারা নারী সেজে জীবন কাটানো উপভোগ করছে। কিন্তু তাদের মানসিক ইন্ট্রেগেশনের (সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার) ক্ষেত্রে কোনো

---

[২৪২] Jan Morris, Conundrum (New York: New American Library, 1974), p. 177.

[২৪৩] Jon K. Meyer and John E. Hoopes, "The Gender Dysphoria Syndromes: A Position Statement on So-Called Transsexualism," Plastic and Reconstructive Surgery, 54 (October 1974), p. 450.

[২৪৪] The Johns Hopkins Medical Institutions News, Press Release, August 13, 1979, p. 2.

উন্নতি হয়নি, তাদের সাথে বসবাস করাও আগের তুলনায় সহজ হয়নি।[২৪৫]

পল ম্যাকহিউ এবং তার সহকর্মীরা শেষ পর্যন্ত উপসংহার টানতে বাধ্য হন, লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন চিকিৎসা হিসেবে কার্যকর না। ম্যাকহিউয়ের ভাষায়,

> আমার উপসংহার হলো, জনস হপকিন্সে আমরা মূলত মানসিক রোগের সাথে সহযোগিতা করেছি। আমার মনে হয়েছে, আমরা সাইকিয়াট্রিস্টরা (এমন লোকেদের) যৌনাঙ্গের বদলে মন ঠিক করার দিকে মনোযোগ দিলেই ভালো করব।[২৪৬]

লিঙ্গ পরিবর্তন যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা পূরণ করতে অক্ষম। এর ফলে একজন পুরুষ নারী হয় না, একজন নারী পুরুষ হয় না। সমাধান হয় না মানসিক সমস্যারও।

অনৈতিক

লিঙ্গ পরিবর্তনের পুরো ব্যাপারটাই চিকিৎসাশাস্ত্রের এথিকস বা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। এর পরতে পরতে আছে সমস্যা।

লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া একটা ইচ্ছা, কোনো ডায়াগনসিস না। সমকামী এবং বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করতে চাওয়া মানুষের কারও কারও মধ্যে শরীর বদলানোর আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। এই ইচ্ছা একটা উপসর্গ, মূল রোগ না। রোগের চিকিৎসা ফেলে কেবল উপসর্গ উপশমের চেষ্টা করা চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতি না।[২৪৭] এই সমস্যা শরীরের না, মনের। সার্জারি করে শরীরকে স্থায়ীভাবে পালটে ফেলার মাধ্যমে মনের সমস্যা সমাধানের দরজাটা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারিতে সুস্থ দেহের অঙ্গহানি করা হয়। এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতিমালার সাথে বেমানান, নৈতিকভাবে অসমর্থনযোগ্য। এ ধরনের সার্জারি স্থায়ী, অপরিবর্তনযোগ্য। এক অর্থে এটি সবচেয়ে চরম ধরনের বন্ধ্যাকরণ। তাছাড়া বিপরীত লিঙ্গের হরমোনের কারণে ক্যান্সার হবার একাধিক নজির আছে। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া ইমেইলে দেখা গেছে, হ্যারি বেঞ্জামিনের গড়ে তোলা WPATH এর ডাক্তাররাই স্বীকার করছে, হরমোন নেওয়া আর সার্জারির দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলগুলো রোগীরা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারে না। একথা জেনেও ডাক্তাররা দেদারসে এসব 'ট্রিটমেন্ট' দিয়ে যাচ্ছে। দিব্যি এসবের প্রচারণা চালাচ্ছে, যা একেবারেই অনৈতিক।[২৪৮]

---

[২৪৫] Paul R. McHugh, "Surgical Sex," First Things 147 (November 2004): 35.

[২৪৬] Ibid, 35.

[২৪৭] Socarides, Charles W. "A psychoanalytic study of the desire for sexual transformation ('transsexualism'): the plaster-of-Paris man." The International Journal of Psycho-Analysis 51 (1970): 341.

[২৪৮] Hughes, Mia. The WPATH Files: Pseudoscientific Surgical And Hormonal Experiments

এ ধরনের সার্জারি করা মানুষেরা সমাজের সামনে নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। সার্জারির মাধ্যমে একজন পুরুষ বিশ্বাসযোগ্যভাবে নারী সাজতে চায়। একজন নারী বিশ্বাসযোগ্যভাবে সাজতে চায় পুরুষ। এদের অনেকে প্রেমের সম্পর্ক করে, নিজের অতীতের ব্যাপারে সঙ্গীকে সত্যটা না জানিয়েই বিয়ে করে। যে প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য অন্যকে ধোঁকা দেওয়া, তাতে অংশগ্রহণ করা কি নৈতিক হতে পারে? সার্জনদের কি এমন অপারেশন করা উচিত, যার লক্ষ্য তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকানো?

১৯৬৮ সালে জার্নাল অফ নারভাস অ্যান্ড মেন্টাল ডিযিস-এর একটা পুরো সংখ্যা জুড়ে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তথা ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। এতে বলা হয়, ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উপসর্গ, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং চিকিৎসা, সবই অস্পষ্ট। খোদ ট্র্যান্সেক্সুয়ালবাদ শব্দটা নিয়েও আছে সমস্যা। যথাযথ যাচাইবাছাই ছাড়া উপযুক্ত সময়ের আগেই এটি গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এ সংখ্যার উপসংহারে বলা হয়, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা (সমকামী) অথবা বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণের (ট্র্যান্সভেস্টাইট) বাইরে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ বলতে আলাদা কী বোঝানো হয়, তা স্পষ্ট না।[২৪৯]

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ-এর তত্ত্ব ও প্রয়োগের এই জোড়াতালি আর অসঙ্গতি নিয়ে ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, এই 'অসুখ'-নির্ণয়ের 'নিরপেক্ষ কোনো মাপকাঠি না থাকায়' পুরো ব্যাপারটা 'তাত্ত্বিকদের স্বর্গে' পরিণত হয়েছে। যে যেভাবে পারছে তত্ত্ব দিয়ে যাচ্ছে, ব্যাখ্যা তৈরি করছে ইচ্ছেমতো। একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া চলছে। ডাক্তার কিংবা মনোবিদরা পছন্দমতো একটা তত্ত্ব বেছে নিচ্ছেন বা বানিয়ে নিচ্ছেন। সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আবার অপারেশনের ফলাফলকেও ব্যাখ্যা করছেন সেই তত্ত্বের ছাঁচে ফেলে। যা মিলছে না বাদ দিচ্ছেন, যা মিলছে তা রাখছেন। তারপর সেটাকেই আবার উপস্থাপন করছেন ঐ তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে। প্রস্তুত হয়েছে থেরাপিস্ট আর রোগী, দু'জনের ফ্যান্টাসির যোগসাজসের মঞ্চ।[২৫০]

ড. পল ম্যাকহিউ লিখেছেন,

> কিছু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আমাদের কাছে এসে দাবি করেছিলেন, তারা

On Children, Adolescents, And Vulnerable Adults. 2024. https://tinyurl.com/7t74evce Doctors Admit Link Between Transgender Hormone Therapy And Cancer In Leaked Emails. The Telegraph. March 5, 2024. https://tinyurl.com/yc3tmthe

[২৪৯] Kubie, Lawrence S., and James B. Mackie. "Critical issues raised by operations for gender transmutation." The Journal of Nervous and Mental Disease 147, no. 5 (1968): 431-443.

[২৫০] MacKenzie, K. Roy. "Gender dysphoria syndrome: towards standardized diagnostic criteria." Archives of Sexual Behavior (1978).

> নিজেদের 'প্রকৃত' যৌন পরিচয় আবিষ্কার করেছেন। বলেছিলেন লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন সম্পর্কে জানার পর তারা আমাদের কাছে এসেছেন। এসব মানুষের মানসিক দিকভ্রান্তির ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার বদলে আমরা মনোযোগী হয়েছিলাম অস্ত্রোপচার আর বিপরীত লিঙ্গের সদস্য হিসেবে জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করার দিকে। আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সম্পদ নষ্ট করেছি। পাগলামির অধ্যায়ন, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের বদলে আমরা বরং পাগলামির সাথে সহায়তা করেছি। ক্ষতিগ্রস্থ করেছি আমাদের পেশাগত গ্রহণযোগ্যতাকে।[২৫১]

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ তথা লিঙ্গ পরিবর্তন তত্ত্বের ব্যাপারে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী লরেন্স কুবি এবং তার সহলেখক ড. জেইমস ম্যাকির মন্তব্য পুরো পরিস্থিতির চূড়ান্ত বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে, তারা বলেছিলেন,

> ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ হলো আবেগতাড়িত, নাটকীয় মেডিক্যাল হস্তক্ষেপের সাথে ভুল ডায়াগনসিস আর ধারণাগত অস্পষ্টতার অনন্য মিশ্রণ।[২৫২]

এই অস্পষ্টতা ডাক্তার, রোগী এবং চিকিৎসাকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। জন্ম দিয়েছে অসংখ্য ট্র্যাজেডি।

[২৫১] McHugh, "Surgical Sex," 35.
[২৫২] Kubie and Mackie. Critical issues, 436

অধ্যায় ১:

মুখ ও মুখোশ

এতক্ষণ আমরা সমীকরণের এক দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। ডাক্তার, মনোবিদ আর প্রতিষ্ঠানদের কথা জানলাম। এবার সমীকরণের অন্য দিকটার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাক। ঐসব 'রোগী'দের দিকে তাকানো যাক, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যারা নিজেদের দেহকে বদলে ফেলতে চায়।

কোন ধরনের মানুষ লিঙ্গ পরিবর্তন করতে আগ্রহী হয়? তাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের জীবন কেমন? কী তাদেরকে চালিত করে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরে যাবার আগে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ বা 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্বের মূল বক্তব্য আবার একটু মনে করিয়ে দেওয়া যাক। ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ বলে,

> এমন কিছু পুরুষ আছে যারা নারী সাজতে চায়, কিছু নারী আছে যারা পুরুষ সাজতে চায়। কারও কারও মধ্যে এই চাওয়া এতটাই তীব্র যে, তারা মনে করে তারা 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে'। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তারা নিজেদের শরীরকে স্থায়ীভাবে বদলাতে চায়। এ ধরনের মানুষকে ট্রান্সসেক্সুয়াল বলা হয়। আর ট্রান্সসেক্সুয়ালদের একমাত্র চিকিৎসা হলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি।[১৮৫]

প্রশ্ন হলো, বিপরীত লিঙ্গের মতো হবার ইচ্ছার তীব্রতা যাচাই করার উপায় কী? এটা হেলাফেলার বিষয় না। মেডিক্যাল ডায়াগনসিসের ব্যাপার। কেউ 'জ্বর জ্বর লাগছে' বললেই আমরা তাকে জ্বরের ওষুধ দিই না। আগে থার্মোমিটার দিয়ে যাচাই করে দেখি তার জ্বর এসেছে কি না, আসলে কতটুকু এসেছে। কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের মতো হতে চাওয়ার 'তীব্রতা' যাচাই করা হবে কীভাবে?

এক্ষেত্রে উত্তর হলো, অপারেশন করতে চাওয়াটাই তীব্রতার প্রমাণ। কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায়, রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারটা এখানে কার্যত 'রোগীর' ওপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। রোগী কেবল নিজের ডায়াগনসিস করছে না, বরং চিকিৎসাও বেছে নিচ্ছে নিজেই। অথচ রোগীর সিদ্ধান্তকে নির্মোহ এবং যৌক্তিক বলে মেনে নেওয়ার কোনো

---

[১৮৫] Baker, Howard J., and Richard Green. "Treatment of transsexualism." Current Psychiatric Therapies 10 (1970): 88-99.

কারণ নেই। বরং প্রচুর কারণ আছে উল্টোটা ধরে নেওয়ার। বিশেষ করে ঐ রোগীর যদি মানসিক বিকার থাকে, এবং ঐ বিকারের সম্পর্ক থাকে যৌনতার সাথে। যৌনতা প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি প্রাকৃতিক তাড়না, যা নিয়মিত মানুষের যৌক্তিক বিচারবিবেচনাকে ছাপিয়ে ওঠে।

কোনো মানসিক রোগী এসে বললো তার ব্রেইনে সমস্যা। সার্জারি করে সে তার মস্তিষ্কের কিছু অংশ ফেলে দিতে চায়। আপনি বললেন, সমস্যা যথেষ্ট তীব্র হলে অপারেশন করা যেতে পারে। তারপর ঠিক করলেন সমস্যার তীব্রতা যাচাইয়ের উপায় হলো সার্জারি করানোর ব্যাপারে রোগীর আগ্রহ মাপা—এটা কি যৌক্তিক অবস্থান? এমন রোগীর কথা মেনে অপারেশন করে ফেলাকে কি সমর্থন করা যায়?

তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটাই কিন্তু ঘটছে। যেহেতু লিঙ্গ রূপান্তরের ক্ষেত্রে রোগের কোনো 'অরগানিক ইন্ডিকেশন'[২৫৪] নেই, যাচাইবাছাইয়েরও পদ্ধতি নেই, তাই এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের প্রায় পুরোপুরিভাবে নির্ভর করতে হয় রোগীর কথার ওপর। ফলে চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চলে যায় রোগীর হাতে। যে ক্ষমতা রোগী ব্যবহার করতে পারে তার ইচ্ছেমতো।

প্রতারণা

অ্যামেরিকাতে যখন এ ধরনের সার্জারি চালু হয়, তখন সার্জারির জন্য উপযুক্ত রোগী বাছাই করতে ডাক্তাররা কিছু বৈশিষ্ট্য ঠিক করেছিলেন। যেমন, কোনো পুরুষ রোগীর মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তাকে সার্জারির জন্য আদর্শ প্রার্থী মনে করা হতো,

- শৈশব থেকে নিজেকে সে নারী বলে মনে করে
- ছেলেবেলা থেকে সে মেয়ে সাজে
- নারী সেজে সে কোনো ধরনের যৌন আনন্দ পায় না, অর্থাৎ যৌন কামনার কারণে সে নারী সাজে না
- তার মধ্যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার প্রতি ঘৃণা কাজ করে
- সে তীব্রভাবে সার্জারি করে দেহ বদলাতে চায়[২৫৫]

সমস্যা হলো, এই সবগুলো বৈশিষ্ট্য রোগীর অতীত এবং ব্যক্তিজীবনের সাথে সম্পর্কিত। এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা খুব সহজ, আর মিথ্যা চেনা খুব কঠিন। প্রাসঙ্গিক

---

[২৫৪] বাইরের হস্তক্ষেপ বা কৃত্রিম প্রভাবক মুক্ত প্রাকৃতিক, স্বতঃস্ফূর্ত কোনো লক্ষণ বা চিহ্ন যা দেখে বোঝা যাবে আসলেই রোগ হয়েছে কি না।

[২৫৫] Fisk, Normanl "Gender dysphoria syndrome (The how, what, and why of a disease)," Pp. 7-14 in Donald Laub and Patrick Gandy (eds.), Second Interdisciplinary Symposium of Gender Dyphoria Syndrome. Palo Alto: Stanford University (□□□□)

মেডিক্যাল লিটারেচার[২৫৬] পড়ে অথবা আগে সার্জারি করিয়েছে এমন কারও কাছ থেকে জেনে নিয়ে, ডাক্তারকে এসব প্রশ্নের মুখস্থ উত্তর দেওয়া যায় অনায়াসে। ব্যাপারটা ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেওয়ার চেয়েও সহজ।

আর ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটে। সার্জারি চালু হবার একদম শুরুর বছরগুলোতেই মনোবিদ ড. লরেন্স কুবি এবং ড. জেইমস ম্যাকি ডাক্তারদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, সার্জারি করাতে চাওয়া রোগীরা মেডিক্যাল ফিল্ডের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। ডাক্তারদের মধ্যে যখন যে তত্ত্ব বা মনোভাব গ্রহণযোগ্যতা পায়, তার আলোকে নিজেদের জীবনকাহিনি সাজিয়ে নেয় তারা।[২৫৭] রোগীরা বেছে বেছে ডাক্তারদের ঠিক ঐ কথাগুলোই বলে, যেগুলো শুনলে তারা সার্জারির পক্ষে রায় দেবেন।

এই সর্তকতাবানীকে খুব একটা পাত্তা দেওয়া হয় না। প্রথম ক'বছর রোগীদের কথা বিশ্বাস করে সরল মনে সার্জারি করার পর এক সময় ডাক্তাররা আবিষ্কার করেন—রোগীদের অনেকেই রুটিন করে, রীতিমতো রিহার্সাল করে এসে মিথ্যা বলছে।[২৫৮] এ ধরনের মিথ্যা ও প্রতারণা এতটাই ব্যাপক ছিল যে, 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' ধারণার প্রবর্তক এবং ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখা ড. রবার্ট স্টৌলার ১৯৭৩ সালে আক্ষেপ করে বলেন,

> আমাদের মধ্যে যাদের ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নির্ণয় করার কাজটি করতে হয়, আজকাল তাদের একটা অতিরিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। লিঙ্গ পরিবর্তনের অনুরোধ নিয়ে আসা অধিকাংশ রোগী (এ সংক্রান্ত মেডিকাল) লিটারেচারের ওপর পূর্ণ দখল রাখে। প্রশ্ন করার আগেই তারা সব প্রশ্নের উত্তর জানে।[২৫৯]

ডাক্তারদের অপারেশন করতে রাজি করানোর জন্য রোগীরা কীভাবে বানোয়াট জীবনকাহিনি (পেশেন্ট হিস্ট্রি) তৈরি করত, তা নিয়ে 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' আরেক মহারথী ড.নরম্যান ফিস্ক বলেছেন,

> খুব দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, অনেক বেশি রোগী পুরোপুরিভাবে (সার্জারির জন্য) মানানসই, রীতিমতো মুখস্থ করা (রিহার্সড) জীবনকাহিনি শোনাচ্ছেন। কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত না, এ ব্যাপারে আপাতদৃষ্টিতে তারা অত্যন্ত পারদর্শী। পরে আমরা জানতে পারলাম যে, এই (অপারেশন করাতে চাওয়া)

---

[২৫৬] বই, গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

[২৫৭] Kubie & Mackie. Critical issues. p, 431-443.

[২৫৮] Billings & Urban. The Socio-Medical Construction

[২৫৯] Stoller, Robert J. "Male transsexualism: uneasiness." American Journal of Psychiatry 130, no. 5 (1973): 536-539.

রোগীরা বেশ কার্যকরীভাবে একে অপরের সাথে তথ্য আদানপ্রদান করে।[২৬০]

ফিস্ক আরও লিখেছেন, এ সংক্রান্ত মেডিক্যাল লিটারেচরের ব্যাপারে অনেক রোগীর জানাশোনা ছিল ডাক্তারদের সমান। ডাক্তার ও গবেষকদের লেখালেখিতে যেসব বিষয় 'আদর্শ ট্রান্সসেক্সুয়াল' এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে আসতো, সার্জারি করাতে আসা রোগীদের সেগুলো মুখস্থ ছিল। সেগুলোর সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে নিজেদের জীবনকাহিনি সাজিয়ে নিতো তারা।[২৬১] সার্জারি হয়ে যাবার পর ফলোআপের সময় নিজেদের এসব মিথ্যাচার ও প্রতারণার কথা স্বীকারও করতো অনেক রোগী। একজন রোগী সরাসরি তার ডাক্তারকে বলেছিল,

> আমি নারীসুলভ ভূমিকা নেওয়ার পর এ নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি আর পড়াশোনা করেছিলাম। আমি আসলে আপনাকে ঠকিয়ে এবং মুগ্ধ করে আমার কথা বিশ্বাস করিয়েছি।[২৬২]

লিঙ্গ পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার ওপর রোগীদের দখল এবং ডাক্তারদের ব্যাপারে তাদের মনোভাব কেমন ছিল, তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় নারী হতে চাওয়া এক পুরুষের আত্মজীবনীতে। জেইন ফ্রাই (ছদ্মনাম) নামের এই রোগী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছে,

> ...ততদিনে আমি ডাক্তারদের নিয়ে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছি। এখনো আমি তাদের নিয়ে বিরক্ত। সবচেয়ে শিক্ষিত পেশাগুলোর একটা হওয়ার পরও আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় ****-দের বেশিরভাগই হলো ডাক্তার।
>
> আমি ড. মুরের কাছে গেলাম। বসে আমার কাহিনি শোনালাম। ততদিনে আমি একটা সেইলস পিচের[২৬৩] মতো তৈরি করে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি তাহলে একজন ট্রান্সসেক্সুয়াল? বেশ, বেশ। আমি মাত্রই এ নিয়ে কিছু প্রবন্ধ পড়ছিলাম'।
>
> ড. মুর জানালেন, তিনি কেবলই ড. (হ্যারি) বেঞ্জামিনের বই পড়েছেন... তাও ভালো। অন্তত কিছু-না-কিছু তো পড়েছেন...আসলে হরমোন আর

---

[২৬০] Norman Fisk, "Gender Dysphoria Syndrome

[২৬১] প্রাগুক্ত।

[২৬২] Roth, Helen N. "Three years of ongoing psychotherapy of a transsexual patient." In Proceedings of the Second Interdisciplinary Symposium on Gender Dysphoria Syndrome, Stanford University Medical Center, pp. 99-102. 1973.

[২৬৩] সেইলস পিচ (sales pitch): মার্কেটিং জগতের পরিভাষা। সম্ভাব্য ক্রেতাকে পণ্য কিনতে রাজি করানোর জন্য বিক্রেতারা যেভাবে পণ্যকে উপস্থাপন করে, সেটাকে সেইলস পিচ বলা যেতে পারে। এখানে বোঝানো হচ্ছে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি করতে ডাক্তারদের রাজি করানোর জন্য 'জেইন ফ্রাই' একটা কার্যকরী স্ক্রিপ্টের মতো রেডি করে ফেলেছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়ে কী বলবে, কীভাবে বলবে, সবকিছু আগে থেকে রেডি ও প্র্যাকটিস করা ছিল।

সেগুলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি (মুর) খুব বেশি জানতেন না। হরমোন চিকিৎসার ব্যাপারে তার চেয়ে আমার জানাশোনা ছিল বেশি। উনি যেন আমাকে খুব বেশি বা খুব কম হরমোন দিয়ে না বসেন, আমার তা খেয়াল রাখতে হচ্ছিল... [২৬৪]

মনোবিদদের নিয়ে ফ্রাইয়ের ধারণা ছিল আরও খারাপ,

'প্রত্যেক ডাক্তার আপনাকে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দেবে এবং এটা চলতেই থাকবে। এক পর্যায়ে আপনি বুঝতে পারবেন, যে বিষয়ে কথা বলছে সেটা যে আসলে কী, এরা নিজেরাই তা জানে না।[২৬৫]

ডাক্তারদের বোকা বানাতে অভিনব সব কৌশল কাজে লাগাতো রোগীরা। কেউ কেউ ভাড়াটে অভিনেতাদের বাবা-মা সাজিয়ে নিয়ে আসতো। এমনও ঘটনা আছে যেখানে রোগী মা সাজিয়ে এমন একজনকে নিয়ে এসেছে, যে নিজেই সার্জারি করে 'নারী হয়েছে'। লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে আয়োজিত ডাক্তারদের আন্তর্জাতিক সিম্পোসিয়াম এবং বিভিন্ন মিটিংয়ে এসব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন ভুক্তভোগী ডাক্তাররাই।[২৬৬] এতকিছুর পরও কোনো ডাক্তার বা ক্লিনিক অপারেশন করতে রাজি না হলে অন্য ডাক্তারের কাছে গিয়ে ঐ একই প্রক্রিয়া আবার শুরু করতো 'রোগী'। এভাবে চলত যতক্ষণ কেউ না কেউ সার্জারি করার জন্য রাজি হচ্ছে।[২৬৭] হ্যারি বেঞ্জামিনের সহলেখক এবং লিঙ্গ পরিবর্তন সংক্রান্ত চিকিৎসা নিয়ে গভীরভাবে কাজ করা ড. চার্লস ইলেনফেল্ড এসব রোগীদের নিয়ে হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে লিখেছিলেন,

ছয় বছর ধরে কয়েকশো রোগী দেখার পর... এখন আমার মনে হয় আমি কারসাজি এবং ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়েছি, এবং এভাবে আদৌ (এমন) রোগী দেখা উচিত কি না, তা নিয়ে এখন আমি গভীরভাবে সন্দিহান।[২৬৮]

ব্যাধি ও বিকার

শুধু নিজেদের জীবনকাহিনি নিয়ে মিথ্যাচার না, এসব রোগীদের মন ও জীবনযাত্রার সমস্যা ছিল আরও গভীরে প্রোথিত। মিডিয়ার প্রচারণা এবং লিঙ্গ পরিবর্তন করা

---

[২৬৪] Robert Bogdan (ed.), Being Different: The Autobiography of Jane Fry (New York, 1974), 135–6.

[২৬৫] Ibid.20

[২৬৬] Billings & Urban. The Socio-Medical Construction (1982), and Blending genders: Social aspects of cross-dressing and sex-changing (1996): 99.
Maxine E. Petersen and Robert Dickey, "Surgical Sex Reassignment: A Comparative Survey of International Centers," Archives of Sexual Behavior, 24, 2 (1995): 135–56. The 1981 allegation is cited at 149

[২৬৭] Reay, Barry. "The transsexual phenomenon: A counter-history." Journal of Social History 47, no. 4 (2014): 1042-1070.

[২৬৮] "Open Forum," Archives of Sexual Behavior, 7, 4 (1978): 393.

লোকেদের আত্মজীবনী পড়ে অনেকেরই মনে হতে পারে 'ভুল দেহে আটকা পড়া'-র ব্যাপারটা ছাড়া অন্যান্য সব দিক থেকে এসব মানুষের জীবন বুঝি বাকি দশজনের মতোই। সার্জারির আগে তারা তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে আর সার্জারি পর সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। কিন্তু এটা আসলে সতর্কতার সাথে তৈরি করা মিথ্যা। 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করা মানুষদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সার্জারির আগে ও পরে নানা ধরনের বিকৃত যৌনতায় আসক্ত থাকে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল, নৈরাজ্যপূর্ণ। সার্জারি করে নারী সাজা একজন পুরুষ তার অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে,

> একসময় আমি মনে করতাম আমি একজন সমকামী। তারপর আমার বিয়ে হলো, বাচ্চা হলো। তখন আমি ভাবলাম আমি অসমকামী। তারপর নারী সাজার (ক্রসড্রেসিং) ব্যাপারটার কারণে আমি মনে করলাম, আমি ট্র্যান্সভেস্টাইট। এখন (সার্জারির পর) আমি নিজেকে একজন উভকামী হিসেবে দেখি।[২৬৯]

লিঙ্গ পরিবর্তন করা ব্যক্তিরা হয় সমকামিতা অথবা উভকামিতায় আসক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরিচয়ের মতোই তাদের 'যৌন রুচি' বদলে যেতে থাকে।[২৭০]

এ ধরনের জীবনযাত্রাকে আর যাই হোক, সুস্থ এবং স্বাভাবিক বলা যায় না। যৌন বিকৃতির পাশাপাশি এসব মানুষের মধ্যে থাকে বিভিন্ন মানসিক বিকারও। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির ব্যাপারটা যখন থেকে চালু হয়, মনোবিদদের একটা অংশ তখন থেকেই এ ধরনের মানুষদের মানসিক বিকারগ্রস্থ হিসেবে শনাক্ত করে আসছেন। কেউ কেউ এ ধরনের পুরুষদের বর্ডারলাইন সাইকোটিক[২৭১] বলেছেন, কেউ এদের আখ্যায়িত করেছেন প্যারানয়েড-স্ক্রিৎযোফ্রেনিক সাইকোসিসের[২৭২] শিকার হিসেবে।[২৭৩] তাদের মতে, শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষ বারবার নিজের

---

[২৬৯] Billings & Urban. "The socio-medical construction.

[২৭০] Stoller, Robert J., and Lawrence E. Newman. "The bisexual identity of transsexuals: Two case examples." Archives of Sexual Behavior 1, no. 1 (1971): 17-28.

[২৭১] **সাইকোসিস (Psychosis):** গুরুতর মানসিক অসুস্থতা; আক্রান্ত ব্যক্তি হ্যালুসিনেশন (দৃষ্টিভ্রম) বা ডিলিউশনে (বিভ্রম) ভোগে। বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেন।
বর্ডারলাইন সাইকোসিস (Borderline Psychosis): যে অবস্থায় ব্যক্তি এমন আচরণ প্রদর্শন করে যা দেখে মনে হয় সে সাকসোসিসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে।

[২৭২] **প্যারানয়া (Paranoia):** মানসিক রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তি সবকিছুতেই নেতিবাচক কোনো কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পায়। সবাইকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে, মনে করে সবাই তার ক্ষতি করবে।
স্ক্রিৎযোফ্রেনিয়া (Schizophrenia): গুরুতর মানসিক রোগ। রোগী চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, আচরণ সবক্ষেত্রে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এর লক্ষণ হলো উদ্ভট চিন্তা, বিভ্রান্তিকর বা অলীক কিছু দেখা, অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা এবং অন্যরা যা শুনতে পায় না এমন কিছু শোনা।

[২৭৩] Meerloo, Joost AM. "Change of sex and collaboration with the psychosis." American Journal of Psychiatry 124, no. 2 (1967): 263-264.
Socarides, Charles W. "A psychoanalytic study of the desire for sexual transformation ('transsexualism'): the plaster-of-Paris man." The International Journal of Psycho-Analysis 51 (1970): 341.

লিঙ্গচ্ছেদ করতে চাচ্ছে, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, সে একজন মানসিক রোগী।

চিকিৎসা হিসেবে 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' যৌক্তিকতা নিয়েও হয়েছে তীব্র সমালোচনা। মনোবিদদের অনেকে বলেছেন, অপারেশন করার ইচ্ছা যদি রোগীর সাইকোসিস বা উন্মাদনার প্রকাশ হয়, তাহলে সেই চাওয়া পূরণ করার মাধ্যমে সার্জনরা আসলে উন্মাদনায় সহযোগিতা করছেন।[২৭৪] এই সার্জনরা পাগলের পাগলামিতে সহায়তা করছেন। অ্যামেরিকান জার্নাল অফ সায়কিয়াট্রিতে লেখা চিঠিতে একজন মনোবিদ বলেছিলেন,

> যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া যেসব রোগীকে আমি দেখেছি তারা সবাই বর্ডারলাইন সাইকোটিক। এরা নিজেদের শরীরের অন্যান্য অংশও বদলাতে চায়।[২৭৫]

এই মনোবিদদের মতে, এসব রোগীদের কথা মেনে নিয়ে অস্ত্রোপচার করার মাধ্যমে অসুখের চিকিৎসার বদলে ডাক্তাররা আসলে অসুস্থ ফ্যান্টাসি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছেন। এসব রোগীদের বিভ্রমে ভোগা মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে মনোবিজ্ঞানী ড. চার্লস সকারিডিস বলেছিলেন,

> ...বাস্তবতার ব্যাপারে ট্রান্সসেক্সুয়াল ব্যক্তির যে অস্বাভাবিক (প্যাথোলজিকাল) দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, অস্ত্রোপচারের দ্বারা সেটার অনুমোদন দেওয়া হয়। এটি (অস্ত্রোপচার) অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে না।[২৭৬]

আমরা ডাক্তারদের ব্যাপারে নারী সাজা পুরুষ জেইন ফ্রাইয়ের মূল্যায়ন দেখেছি। এবার তার ব্যাপারে ডাক্তারদের বক্তব্য কী ছিল, তা দেখা যাক। ফ্রাইয়ের আত্মজীবনীর সম্পাদক তার মেডিক্যাল ফাইল থেকে তাকে নিয়ে ডাক্তারদের মন্তব্যগুলো খুঁজে বের করেছিলেন। ডাক্তাররা তাকে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ মনে করতেন। তাদের মন্তব্য,

> নিজের যৌন পরিচয় নিয়ে জেইনের মধ্যে সমস্যা আছে, এটা স্পষ্ট। অনেক স্টাফের মতে, মূল দ্বন্দ্বের অন্যতম হলো অন্যের ওপর তার মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল হবার চাহিদা। সে নিজে নিজে যেসব সংকট পরিস্থিতি (ক্রাইসিস সিচুয়েশন) তৈরি করে; যেমন ইচ্ছা করে ওষুধের ওভারডোস করা, সেগুলো আসলে অন্যদেরকে দিয়ে তার প্রতি ভালোবাসা ও উদ্বেগ প্রকাশ করানোর চেষ্টা। এটা জেইন বুঝতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে 'পুরুষের দেহে আটকা পড়া বেচারি জেইন'-এর ভূমিকাটাও তার এই (ভালোবাসা ও উদ্বেগ

---

[২৭৪] Volkan, Vamik D., and Th Bhatti. "Dreams of transsexuals awaiting surgery." In Psychosomatic Medicine, vol. 34, no. 5, pp. 475-475. 1972.

[২৭৫] Meerloo, Change of Sex

[২৭৬] Socarides, The Desire for Sexual Transformation.

> পাওয়ার) কলাকৌশলের অংশ। পাশাপাশি, কেউ হয়তো আরও বলতে পারেন, নারী হবার অর্থ প্যাসিভ হওয়া, নিজের প্রয়োজন পূরণে সক্রিয় না হয়ে বরং পরোক্ষভাবে সেই প্রয়োজন পূরণ করানো, নারী হলো এমন কেউ, যার যত্ন নেওয়া হয় (এই বিষয়গুলো জেইনের নারী হবার ইচ্ছার পেছনে আছে)।[২৭৭]

এ ধরনের রোগীদের চরিত্রের ব্যাপারে লিঙ্গ পরিবর্তন ট্রিটমেন্টের আরেক দিকপাল ড. এলমার বেল্ট লিখেছেন,

> আমি দেখেছি, সাধারণত এই রোগীরা জীবনের সমস্যাগুলি মোকাবিলায় এতটাই অযোগ্য ছিল যে, সমাজের সাথে (মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে) তাদের যেসব সমস্যা, যৌনাঙ্গ পরিবর্তন সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান না...একজন ট্রান্সসেক্সুয়ালের ক্ষেত্রে;ভঁযে প্রতারণার জীবনে অভ্যস্ত, পেশেন্ট হিস্ট্রিকে (নিজের ব্যাপারে রোগীর দেওয়া তথ্য) মিথ্যা কল্পকাহিনি বলাই উপযুক্ত। কার্যত প্রত্যেক ট্রান্সসেক্সুয়াল ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে অসত্য বলে।[২৭৮]

লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষেরা বেশিরভাগ সময় অপারেশনের ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না। সার্জারির পর তাদের অনেকে উদগ্রীবভাবে প্রচারণা খোঁজে, এবং এদের অনেকেই আচার-আচরণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সামাজিকতা বজায় রাখতে পারে না। ড. বেল্ট তো এমনও বলেছেন যে, লিঙ্গ পরিবর্তন করতে আসা লোকেদের উদ্ভট আচার-আচরণের কারণে তার অন্যান্য পেশেন্টরা তীব্র অস্বস্তি বোধ করত। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের রোগীদের জন্য তাকে আলাদা চেম্বার খুলতে হয়েছিল।

অপারেশন করে নারী সাজতে চাওয়া পুরুষদের মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে রবার্ট স্টোলারের লেখা একটা প্রবন্ধের নাম 'পুরুষ ট্রান্সসেক্সুয়ালদের মধ্যে সাইকোপ্যাথ বৈশিষ্ট্য'। নাম থেকেই অনেক কিছু আঁচ করে ফেলা যায়। এ ধরনের লোকের মিথ্যাচার, অন্যদের সাথে অন্তঃসারহীন ফাঁপা ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং অনির্ভরযোগ্যতা নিয়ে স্টোলার আলোচনা করেছেন বেশ ধারালো ভাষায়। তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, কোনো রোগী যদি প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করত, তাহলে তার টিম ধরে নিতো এই ব্যক্তি নির্ঘাত অপারেশন করানোর কথা বলবে।[২৭৯] মনোবিদ লেসলি লথস্টাইন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

---

[২৭৭] Bogdan (ed.), Being Different, 214

[২৭৮] The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, University of Indiana, Bloomington, The Harry Benjamin Collection, Box 5, Series 2c, Correspondence, Folder: Belt, Dr Elmer, 1965–1971, Letter: March 24, 1969.

[২৭৯] Stoller, Transsexual Experiment, ch. 7.

সতর্ক, নিজেকে গোপন করা ব্যক্তি...অগভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নার্সিসিস্টিক। নিজের সমর্থনে বিভিন্ন আদিম ও অসুস্থ মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ব্যবহার করে, এবং নিজেকে উপস্থাপন করে উদ্ভটভাবে।[২৮০]

জন মানির বক্তব্য তো আরও কঠোর। মানি এবং তার এক সহলেখক মন্তব্য করেছেন, লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া পুরুষরা কেবল 'প্রতারক, ডিমান্ডিং এবং ধান্দাবাজ'-ই না, বরং সম্ভবত তারা ভালোবাসতেও অক্ষম।[২৮১] মানির একসময়কার সহকর্মী জনস হপকিন্সের লিঙ্গ পরিবর্তন ক্লিনিকে পরিচালক জন মেয়ার অভিযোগ করে লিখেছেন, লিঙ্গ পরিবর্তন করতে আসা বেশিরভাগ লোকেরা হলো স্যাডিস্ট[২৮২], সমকামী, স্কিযয়েড[২৮৩], ম্যাসোকিস্ট[২৮৪], সমকামী পতিতা এবং সাইকোটিক ডিপ্রেসেসিভস[২৮৫]।[২৮৬] নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মেয়ার বলেছিলেন তার মতে,

'একটা সাইকিয়াট্রিক ডিসর্ডারের সঠিক চিকিৎসা সার্জারি না। এবং এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, এসব রোগীর গুরুতর মানসিক সমস্যা আছে যেগুলো সার্জারির পরও দূর হয় না।[২৮৭]

এ তো গেল পুরুষ থেকে নারী সাজতে চাওয়া লোকেদের ব্যাপারে ডাক্তারদের মূল্যায়ন। নারী থেকে পুরুষ হতে চাওয়া মানুষদের কী অবস্থা? এ ব্যাপার ড. লেসলি লথস্টাইনের বক্তব্য দেখা যাক। ইয়েইল ইউনিভার্সিটির এই মনোবিদ নারী থেকে পুরুষ সাজতে চাওয়া রোগীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন একদম শুরু থেকে। এ ধরনের প্রবণতাকে 'গভীর মানসিক ব্যাধি' হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন,

অধিকাংশ নারী ট্র্যান্সসেক্সুয়ালদের গুরুতর পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার

---

[২৮০] L. M. Lothstein, "Countertransference Reactions to Gender Dysphoric Patients: Implications for Psychotherapy," Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 14. 1 (1977): 29.

[২৮১] John Money and John G. Brennan, "Heterosexual Vs. Homosexual Attitudes: Male Partners' Perception of the Feminine Image of Male Transsexuals," The Journal of Sex Research, 6, 3 (1970): 193–209, 201, 202

[২৮২] স্যাডিস্ট (Sadist): ধর্ষকামী। যে অন্যকে কষ্ট দিয়ে, অপমানিত করে যৌন আনন্দ লাভ করে।

[২৮৩] স্কিযয়েড (Schizoid): মানসিক সমস্যা। এ ধরনের লোকেদের স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা হয়। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, কোনো কাজে জড়িত না হওয়ার প্রবণতা এবং অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব দেখা যায়। কল্পনার জগতে আশ্রয় নেওয়ার ঝোঁক থাকে।

[২৮৪] ম্যাসোকিস্ট (Masochist): মর্ষকামী। এমন ব্যক্তি যে নিজেকে কষ্ট বা অপমানের মুখোমুখি করে যৌন আনন্দ লাভ করে।

[২৮৫] ডিপ্রেশনের একটি তীব্র ধরন।

[২৮৬] Meyer, Jon K. "Clinical variants among applicants for sex reassignment." Archives of Sexual Behavior 3, no. 6 (1974): 527-558.

[২৮৭] Jane E. Brody, "Benefits of Transsexual Surgery Disputed As Leading Hospital Halts the Procedure," New York Times, October 2, 1979.

> (ব্যক্তিত্বের সমস্যা) আছে। যদিও তারা পুরোপুরি সাইকোটিক (উম্মাদ) নন, তবে তাদের নানা সূক্ষ্ম চিন্তাবৈকল্য আছে, যা বাস্তবতার ব্যাপারে তাদের ধারণা এবং অন্যের সাথে তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে...পাশাপাশি অনেক নারী ট্রান্সসেক্সুয়ালের মধ্যে বিস্তর মানসিক সমস্যার উপসর্গ দেখা যায়। যেমন- তীব্র হতাশা, উদ্বেগ, প্যানিক অ্যাটাক, এবং গুরুতর সাইকোসমেটিক অভিযোগ।[২৮৮]

নারী থেকে পুরুষ হতে চাওয়া রোগীদের ব্যাপারে ফরাসি মনোবিদ ক্যাথেরিন মিলোর মূল্যায়ন হলো, এদের অবস্থান হিস্টিরিয়া এবং ডিলিউশনের মাঝামাঝি কোথাও।[২৮৯] তিনি মন্তব্য করেছেন,

> তাদের কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে একদিন মৃত পুরুষের শরীর থেকে (তাদের দেহে) পুরুষাঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। তারা পাগলের মতো আশা করে...একদিন তারা পুরুষ হিসেবে প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে (বাবা হবে)। তাদের কাছে বিজ্ঞানের ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। তারা মনে করে এটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।[২৯০]

অ্যাগনেস

'লিঙ্গ পরিবর্তনে' আগ্রহী রোগীদের চরিত্র এবং আচরণের ব্যাপারে ডাক্তারদের যেসব মূল্যায়ন আমরা দেখলাম, তার ভালো একটা উদাহরণ হলো 'অ্যাগনেস'-এর কেইস। ওপরের আলোচনাতে আসা প্রায় সব বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ এ কেইসের মধ্যে পাওয়া যায়।

১৯৫৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের অনুরোধ নিয়ে আসে উনিশ বছর বয়সী অ্যাগনেস। তার কেইস ডাক্তারদের অবাক করে। অ্যাগনেসের বেশভূষা নারীদের মতো, শরীরের কাঠামোতে নারীত্বের আভাস আছে, স্তন আছে। আবার একই সাথে আছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সুস্থ পুরুষাঙ্গ। অ্যাগনেস 'সার্জারি করে নারী হতে চায়'।

ডাক্তাররা ভাবলেন হয়তো অ্যাগনেস ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায়, তার শরীরের ভেতরের প্রজনন ব্যবস্থাও সুস্থ পুরুষের মতো। তার মুখ থেকে জানা যায়, জন্মের পর থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত শারীরিকভাবে আর দশটা স্বাভাবিক ছেলের মতোই ছিল সে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় তার দেহে দুধরনের

---

[২৮৮] Leslie Martin Lothstein, Female-to-Male Transsexualism: Historical, Clinical and Theoretical Issues (Boston, MA, 1983), 9.

[২৮৯] Catherine Millot, Horsexe: Essays on Transsexuality, translated Kenneth Hylton (New York, 1990), 117.

[২৯০] Ibid., 107–8.

পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এক দিকে স্বাভাবিক কিশোরের মতো তার গলার স্বর ভারী হয়, যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে তার স্তন দেখা দিতে শুরু করে, শরীরের অবয়বে ফুটে উঠে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য।

অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর কেবল একটা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পান ডাক্তাররা। অ্যাগনেসের শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা অনেক বেশি। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, বয়ঃসন্ধির সময়ে নারীদেহে আসা পরিবর্তনগুলোর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই হরমোনটি। ইস্ট্রোজেনের কারণেই নারীদেহে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়, শরীরের কাঠামো হয় কমনীয় এবং নারীসুলভ।

অ্যাগনেসের কেইসের কোনো কূলকিনারা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত ডাক্তাররা তার অনুরোধ মেনে নেন। ১৯৫৯ সালে তার সার্জারি করা হয়। ডাক্তাররা সন্তুষ্টমনে এই কেইসের ওপর গবেষণাপত্র লিখে প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্তু সার্জারির ৭ বছর পর অ্যাগনেস একটা বোমা ফাটায়। ফলোআপের সময় খুব সহজ ভঙ্গিতে জানায়, সে আসলে বারো বছর বয়স থেকে চুরি করে তার মায়ের এস্ট্রোজেন ট্যাবলেট খাচ্ছিল। এ কারণেই তার দেহে বাহ্যিকভাবে কিছু পরিবর্তন এসেছে।

মজার ব্যাপার হলো, ইস্ট্রোজেন নেওয়ার কারণে যে এমন হতে পারে তা ডাক্তাররাও জানতেন। আর জানতেন বলেই পরীক্ষানিরীক্ষার সময় অ্যাগনেসকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তারা। অ্যাগনেস মিথ্যা বলেছিল।[২৯১] কোন ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে অপারেশনের অনুমোদন দেওয়া হয় তা জানা থাকার কারণে সেভাবেই নিজের জীবনকাহিনি ফেঁদেছিল সে। ডাক্তারদের বোকা বানাতে অ্যাগনেসের কাজে লাগানো কৌশলগুলোর তালিকা করেছিলেন তার 'ট্রিটমেন্টে' অংশ নেওয়া ডাক্তার হ্যারল্ড গারফিঙ্কল। তার করা তালিকার মধ্যে আছে – 'ধূর্ততা, পরিকল্পনা, শেখা, মহড়া দেওয়া, দক্ষতা...'।[২৯২] অ্যাগনেসের স্বীকারোক্তির পর তার ডাক্তার রবার্ট স্টৌলার মন্তব্য করেছিলেন,

> ধোঁকা দেওয়াতে অ্যাগনেস কতই না পাকা ছিল...সে ছিল একজন অত্যন্ত দক্ষ মিথ্যাবাদী।[২৯৩]

'রূপান্তরকামী'

এতক্ষণের আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমিক লিটারেচর থেকে লিঙ্গ পরিবর্তন

---

[২৯১] Harold Garfinkel, "Passing and the Managed Achievement of Sex Status in an 'Intersexed' Person Part 1," in his Studies in Ethnomethodology (Englewood Cliffs, NJ, 1967), ch. 5. See also, "Appendix to Chapter 5" in the same volume, 285–8. 119, 126, 120, 285, 119, n. 1. 288, 174, 165.

[২৯২] Ibid 165

[২৯৩] Ibid, 174

করতে চাওয়া মানুষের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'পুরুষতান্ত্রিক'

লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষের অধিকাংশ পুরুষ। হ্যারি বেঞ্জামিনের ১৯৬৬ সালের হিসেব অনুযায়ী 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করতে চাওয়া নারী ও পুরুষদের অনুপাত ১:৮। আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল লিটারেচর অনুযায়ী অনুপাত হলো ১:৩। ২০২৩ এর এক গবেষণা বলছে অ্যামেরিকাতে লিঙ্গ পরিবর্তন করা রোগীদের প্রায় ৬০% পুরুষ। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে বেশি।[২৯৪]

বিকারগ্রস্ত

এ ধরনের মানুষের মধ্যে বাতিকগ্রস্থতা, আত্মহত্যার প্রবণতাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যা স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বেশি। যেমন, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা স্বাভাবিক মানুষের প্রায় তিন গুণ। মাদক ব্যবহারসহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের প্রবনতাও আশংকাজনক মাত্রার।[২৯৫] হার্শফেল্ডের সময় থেকে অনেকেই বলে আসছেন, সার্জারি এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখনো বলা হচ্ছে এসব কথা। যদি সার্জারি সহজলভ্য হয়, যদি সমাজ তাদের মেনে নেয়, তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মিডিয়া এ ধরনের বার্তা মাথায় গেঁথে দেবার চেষ্টা করছে ক্রমাগত।

কিন্তু বাস্তবতা তাদের এসব দাবিকে ভুল প্রমাণ করেছে। গত অধ্যায়েই আমরা দেখেছি, এ ধরনের মানুষদের নিয়ে গভীরভাবে কাজ করা ডাক্তাররাই বলছেন, সার্জারি তাদের মানসিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে না। এই উপসংহারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে একের পর এক গবেষণা ও পরীক্ষায়। সার্জারির পরও এ ধরনের মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাসহ অন্যান্য মানসিক সমস্যার হার স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। তবে মতাদর্শিক কারণে এই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে নানাভাবে।[২৯৬]

---

[২৯৪] Pauly, Ira B. "Male psychosexual inversion: Transsexualism: A review of 100 cases." Archives of General Psychiatry 13, no. 2 (1965): 172-181. Wright, Jason D., Ling Chen, Yukio Suzuki, Koji Matsuo, and Dawn L. Hershman. "National estimates of gender-affirming surgery in the US." JAMA Network Open 6, no. 8 (2023)

[২৯৫] Barber, Nigel. "The Gender Reassignment Controversy." Psychol. Today (Mar. 16, 2018).

[২৯৬] Regnerus, Mark. "New Data Show 'Gender-Affirming'Surgery Doesn't Really Improve Mental Health. So Why Are the Study's Authors Saying It Does?." Public Discourse 13 (2019). Sex changes are not effective, say researchers, The Guardian quoting University of Birmingham's aggressive research intelligence facility (Arif), 2004. https://tinyurl.com/yc4m2km8

Dhejne, Cecilia, Paul Lichtenstein, Marcus Boman, Anna LV Johansson, Niklas Långström, and Mikael Landén. "Long-term follow-up of transsexual persons undergoing

নারীত্বের ক্যারিক্যাচার

অপারেশন করে নারী সাজতে চাওয়া পুরুষরা নারীত্বের একটা কাল্পনিক, অতিরঞ্জিত ছবি আঁকে। মনোবিদ ও ডাক্তারদের কাছে দেওয়া তাদের সাক্ষাৎকার থেকে একটা বাস্তবতা বারবার ফুটে ওঠে, নারী হবার অর্থ, নারীর দায়িত্ব, কর্তব্য, ভূমিকা—কোনোকিছু নিয়েই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এ ধরনের পুরুষদের। আগ্রহও নেই তাদের। তারা নারী হওয়া বলতে বোঝায় দামি, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, চকচকে অলঙ্কার, বিনুনী করা লম্বা চুল, কড়া মেইকআপের মতো ব্যহিক কিছু বিষয়ক। নারীত্বের একটা ক্যারিক্যাচার তৈরি করে তারা।[২৯৭] ড. পল ম্যাকহিউয়ের এ ব্যাপারটা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> সার্জারি করা রোগীদের আমার কাছে নারীর ক্যারিক্যাচার মনে হয়েছে। তারা হাই হিলের জুতো, কড়া মেইকআপ আর চটকদার পোশাকে নিজেদের সাজাতো। তারা বলত, সার্জারি করার পর শান্তি, স্বস্তি, কমনীয়তা আর ঘরোয়া পরিবেশের প্রতি তারা তাদের সহজাত প্রবণতা প্রকাশ করতে পারছে। কিন্তু তাদের বড় বড় হাত, উঁচু অ্যাডামস অ্যাপেল, আর মুখের পুরু বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল (তাদের কথার সাথে) বেমানান। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলো (নারী পরিচয়ের সাথে) আরও বেমানান হয়ে উঠবে। এ ধরনের রোগীদের আমি যেসব নারী মনোবিদদের কাছে পাঠাতাম, তারা সহজাতভাবে বেশভূষা আর অতিরঞ্জিত অঙ্গভঙ্গির আড়ালের বাস্তবতা ধরে ফেলতেন। নারী মনোবিদদের একজন আমাকে বলেছিল, 'মেয়েরা মেয়েদের চেনে, আর ওটা একজন পুরুষ।'[২৯৮]

লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনি এমন কোনো পুরুষ পাবেন না যে মধ্যবয়সী, সাদামাটা পোশাক পরা, উগ্র মেকাপের ফর্মূলা এড়িয়ে চলা তিন বাচ্চার মায়ের মতো শরীর চায়। বরং তারা হাই হিল পরা, বিশাল বক্ষা, প্রকট মেইকআপ আর উগ্র পোশাকের এমন

---

sex reassignment surgery: cohort study in Sweden." PloS one 6, no. 2 (2011). Kaltiala, Riittakerttu, Laura Takala, Richard Byng, Anna Hutchinson, Anastassis Spiliadis, Angela Sämfjord, Sven Román et al. "Youth Gender Transition Is Pushed Without Evidence." The Wall Street Journal (2023). Ruuska, Sami-Matti, Katinka Tuisku, Timo Holttinen, and Riittakerttu Kaltiala. "All-cause and suicide mortalities among adolescents and young adults who contacted specialised gender identity services in Finland in 1996–2019: a register study." BMJ Ment Health 27, no. 1 (2024).

[২৯৭] Frederic G. Worden and James T. Marsh, "Psychological Factors in Men Seeking Sex Transformation: A Preliminary Report," Journal of the American Medical Association 157.15 (April 9, 1955): 1292–1298, quoted in Charles W. Socarides, "The Desire for Sexual Transformation," 1421. Socarides, Charles W. "The desire for sexual transformation: A psychiatric evaluation of transsexualism." American Journal of Psychiatry 125, no. 10 (1969): 1419-1425.

[২৯৮] McHugh, "Surgical Sex," 34.

এক নারীর মতো হতে চায়, যার সাথে দৈনন্দিন জীবনের নারীদের তেমন একটা মিল নেই। তাদের কাছে নারী মানেই কামার্ত, অতি আহ্লাদী, অতি যৌনায়িত। নারী দুর্বল, পরনির্ভরশীল এক জীব, যে সবসময় পরচর্চা, গালগল্প আর কেনাকাটা নিয়ে মগ্ন থাকে। কাল্পনিক এই নারীর অস্তিত্ব বাস্তব দুনিয়াতে নেই, আছে পর্নোগ্রাফির জগতে।

পুরুষের চোখ দিয়ে দেখে তারা নারীত্বের খণ্ডিত এক ছবি আঁকে, তারপর সেই ছবি অনুকরণের চেষ্টা করে। আর এর মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে চায় পুরুষকে। তাদের 'নারী হবার' ইচ্ছার সাথে নারীত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে আত্মতৃপ্তি, যৌনতা আর ফ্যান্টাসির।

বিকৃত যৌনতা ও ফ্যান্টাসি

লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতার পুরো ব্যাপারটাকে নিরেট আত্মপরিচয়ের সংকট হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের মানুষের 'আত্মপরিচয়ের সংকট' নিয়ে মাতামাতি হয়, প্রচুর মাতামাতি। এর মাধ্যমে সুচারুভাবে চাপা দেওয়া হয় এর পেছনে যৌনতা আর যৌন ফ্যান্টাসির ভূমিকা। বাস্তবতা হল, কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বিকৃত যৌনতা আর ফ্যান্টাসি। লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষের মধ্যে তীব্র ফ্যান্টাসি কাজ করে, যার অনেকগুলো যৌনতাকেন্দ্রিক। এদের মধ্যে সমকামিতা বা উভকামিতার প্রবণতা দেখা যায়।[২১১]

মোটাদাগে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়ার প্রবণতার পেছনে দুটি কারণ কাজ করে আছে,

- মানসিক অসুস্থতা
- যৌন বিকৃতি

মানসিক রোগ : কিছু মানুষ এক ধরনের মানসিক রোগে ভোগে, যার ফলে নিজের শরীর ও আচরণ নিয়ে তাদের মধ্যে অস্বস্তি কাজ করে। সাধারণত এটা শুরু হয় বয়ঃসন্ধির সময় থেকে। একসময় তারা মনে করতে শুরু করে, তাদের শরীর বিপরীত লিঙ্গের মতো হলে এ অস্বস্তি থেকে তারা মুক্তি পাবে। আগে এ রোগকে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (Gender Identity Disorder) বলা হতো। বর্তমানে বলা হচ্ছে জেন্ডার ডিসফোরিয়া (Gender Dysphoria)। এ ধরনের সমস্যা যাদের মধ্যে দেখা যায়, সাধারণত তাদের ডিপ্রেশনসহ অন্যান্য আরও অনেক মানসিক সমস্যা

---

[২১১] Fitzgibbons, Richard P. "The psychopathology of "sex reassignment" surgery: Assessing its medical, psychological, and ethical appropriateness." The National Catholic Bioethics Quarterly 9, no. 1 (2009): 97-125.
এ ধরনের মানুষের জীবনে যৌন ফ্যান্টাসি ঠিক কী ধরনের ভূমিকা রাখে, তা জানতে আগ্রহী পাঠক নারী সাজা পুরুষ মনিকা হেলমস ওরফে রবার্ট হগের আত্মজীবনী *More Than Just A Flag* দেখতে পারেন। হগ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হওয়া 'ট্র্যান্সজেন্ডার পতাকা'-র নকশাকার।

থাকে। এছাড়া এ ধরনের মানুষের অনেকে শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, যা নিজ শরীর ও যৌনতা নিয়ে তাদের চিন্তায় নানা ধরনের জটিলতা নিয়ে আসে।[৩০০]

যৌন বিকৃতি : বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করার পেছনে দ্বিতীয় কারণটা বিকৃত যৌনতা। বিশেষ করে নারী সাজা পুরুষদের ক্ষেত্রে। কিছু পুরুষ নিজেকে নারী হিসেবে চিন্তা করে, নারীর পোশাক পরে যৌন আনন্দ লাভ করে। এটা এক ধরনের যৌন বিকৃতি, যার একটা জবরজং নাম আছে, অটোগাইনেফিলিয়া (Autogynephillia)। শাব্দিকভাবে এর অর্থ 'নিজেকে নারী হিসেবে কামনা করা'।[৩০১] এ বিকৃতিকে নারীত্ব ও যৌনতা নিয়ে ফ্যান্টাসি এবং বিকৃত যৌনতার মিশেল হিসেবে দেখা যায়।

অটোগাইনেফিলিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কেউ হয়তো খোলামেলা পোশাকের নারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ দেহকাঠামো চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ আচরণ করতে চায়, আর বড় একটা অংশ যৌনকর্মে নিতে চায় নারীর ভূমিকা। তবে অটোগাইনেফিলিয়া থাকা পুরুষদের মধ্যে সবাই কেবল অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় আকৃষ্ট হয় না, এদের একটা অংশ উভকামীও হয়।[৩০২] অটোগাইনেফাইলদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে বয়ঃসন্ধির সময় যৌন ফ্যান্টাসি, হস্তমৈথুন এবং নারী সাজা—এই তিনটি উপাদানের মিশ্রণ দেখা যায়।[৩০৩]

অন্যদিকে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করতে চাওয়া মানুষের বড় একটা অংশ বিকৃত যৌনতায় আসক্ত। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের বিকৃত যৌনতাকে সমাজের চোখে বৈধ করে তোলার জন্য তারা সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'লিলি এলবা' থেকে 'ক্রিস্টিন জর্গেনসেন', রিটা এরিকসন থেকে হাল আমলের অনেক ট্রান্সজেন্ডার 'আইকন'-এর 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাদের বিকৃত

---

[৩০০] এ সংক্রান্ত অ্যাকাডেমিক লিটারেচরের রিভিউ-এর জন্য দেখুন,
Fitzgibbons, Richard P. "The psychopathology of "sex reassignment"
উল্লেখ্য, জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার এবং/অথবা জেন্ডার ডিসফোরিয়ার ধারণা নিয়েও নানা যৌক্তিক আপত্তি আছে, তবে এ বইতে সে আলোচনায় ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না।

[৩০১] Ray Blanchard, "Gender Identity Disorders in Adult Men," in Clinical Management of Gender Identity Disorders in Children and Adults, ed. Ray Blanchard and B.V. Steiner (Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, 1990): 49–75.
James Shupe, "I Was America's First 'Nonbinary' Person. It Was All a Sham," Daily Signal (March 10, 2019), https://tinyurl.com/m5lahe25

[৩০২] Bailey, J. Michael. The man who would be queen: The science of gender-bending and transsexualism. Joseph Henry Press, 2003. Blanchard, Ray. "Early history of the concept of autogynephilia." Archives of sexual behavior 34 (2005): 439-446.

[৩০৩] সার্জারি করে নারী সাজা পুরুষ 'স্যান্ডি স্টৌন' এর ভাষ্যমতে, "wringing the turkey's neck (the ritual of penile masturbation just before its surgical removal), is 'the most secret of secret traditions' practiced by transexuals. Stone, Sandy. "The empire strikes back: A posttranssexual manifesto." In The transgender studies reader, pp. 221-235. Routledge, 2013.

যৌনতার প্রবণতা।[৩০৪]

বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক সময়ে সার্জারি করে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে সেই একই বৈশিষ্ট্য। বারডেম হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ফিরোজ আমিন লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

> আমার এক রোগী যেমন আছে, সে না বুঝে মেয়ে হয়ে গেছে। এটা একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি...আমি তাকে বললাম, তুমি এটা কেন হয়েছো? সে বললো, আমার আসলে নরমাল (স্বাভাবিক) সেক্স ভালো লাগত না। সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির কারণে সে মেয়ে হয়েছে। সে ছেলে; কিন্তু সে আরেকটা ছেলের সাথে মেয়ে হিসেবে (মেয়ের ভূমিকায়) মেলামেশা করছে।[৩০৫]

শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর 'সেক্স চেইঞ্জ' অপারেশনের কথা দেশি মিডিয়াতে আলোচিত হয়েছে। এই নারী শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু অন্য 'নারীর প্রতি আকৃষ্ট' হবার কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছে। নাম নিয়েছে জিবরান সওদাগর। দেশি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তার বক্তব্য দেখা যাক,

> জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি...একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেত না।...
>
> ...জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন...[৩০৬]

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শারমিন আক্তার নামের এ নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিল। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল, যে কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সে নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন।

লিঙ্গ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বিকৃত যৌনতা ও ফ্যান্টাসি।

---

[৩০৪] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Bailey. The man who would be queen

[৩০৫] সে ভুল করে মেয়ে হয়ে গিয়েছে, যা বললেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, দৈনিক কালবেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০২৪। https://www.kalbela.com/video-gallery/news/1433
https://www.youtube.com/watch?v=cC2ZuhCFh1U

[৩০৬] নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে, দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৩। https://www.prothomalo.com/bangladesh/g1oz3nhb5b

কিন্তু বিষয়টি সাফসুতরো করে উপস্থাপন করার জন্যে এই সম্পর্ককে ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দেওয়া হয়।

***

ছোটবেলায় সুকুমার রায়ের একটা ছড়া পড়েছিলাম, নাম খিচুড়ি। সুকুমার রায় ভারতীয় সাহিত্যে ননসেন্স রাইম-এর প্রবর্তক। 'ননসেন্স রাইম' মানে অর্থহীন ছড়া। পড়তে মজা লাগে, কিন্তু শত খুঁজেও অর্থের আগামাথা পাওয়া যায় না। খিচুড়ি নামের এই ছড়াটাকে ননসেন্স রাইমের আদর্শ উদাহরণ বলা যায়। কয়েকটা লাইন দেখুন,

হাঁস ছিল, সজারুও, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কী ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ মূর্তি'।"
...জিরাফের সাধ নাই মাঠে–ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি সেও চায় উড়িতে...

লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষদের সাথে সুকুমার রায়ের এই হাসজারুর মিল আছে। বাস্তবতার ব্যাকরণকে উপেক্ষা করে তারা পড়ে থাকে কাল্পনিক ভালো লাগার পেছনে। নিজেদের বিকৃত যৌনতা আর অসুস্থ ফ্যান্টাসিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য অর্থহীন কিছু গালগল্প তৈরি করে। আবেগ, মুখস্থ করা মিথ্যা আর কুড়িয়ে কুড়িয়ে শেখা নানা তত্ত্বের একটা খিচুড়ি বানায়। বারবার সেটা নিজেকে শোনায়। একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করে। তারপর দাবি নিয়ে হাজির হয় সমাজের কাছে। দুনিয়ার কাছে নিজেদের বিকারগ্রস্ত কল্পজগতের স্বীকৃতি চেয়ে বসে। কিন্তু এত কাঠখড় পোড়ানোর পরও ধূলোর ওপর বানানো বালির প্রাসাদ অর্থহীনই থেকে যায়। ফড়িঙের ঢং ধরা জিরাফ উড়তে পারে না কখনো।

অধ্যায় ১৩

কলুষতার বংশগতি

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থান এবং বিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা মানুষগুলোর অন্যতম হলো ড. জন মানি। এরই মধ্যে তার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। হ্যারি বেঞ্জামিনের তৈরি করা গবেষণা টিমের অন্যতম এই সদস্য ছিল এরিকসন ফাউন্ডেশনের বোর্ড মেম্বারও। ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নানা দেশে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াতো সে। তার উদ্যোগেই চালু হয়েছিল জনস হপকিন্সের লিঙ্গ পরিবর্তন ক্লিনিক। চিকিৎসাক্ষেত্রে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের স্বাভাবিকীকরণে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের তালিকা করা হলে হ্যারি বেঞ্জামিনের ঠিক পরেই আসবে তার নাম।

তবে জন মানির সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী এবং বিধ্বংসী অবদান হলো তার 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকার' তত্ত্ব। এ তত্ত্ব থেকে জন্ম নেয় জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদ, যার প্রভাবে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ একসময় পরিণত হয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে। বিকৃতির তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে মানির ভূমিকার তুলনা চলে কেবল অ্যালফ্রেড কিনসির সাথে। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ কী করে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ হয়ে উঠলো, তা বুঝতে হলে ব্যক্তি জন মানির পাশাপাশি আমাদের পরিচিত হতে হবে তার চিন্তা ও কাজের সাথে।

জেন্ডার

হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করার পর জন মানি চাকরিজীবন শুরু করে জনস হপকিন্সে। শিক্ষক হিসেবে। তার পিএইচডি ছিল আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে, এবং এ নিয়েই জনস হপকিন্সে কাজ করছিল সে। গবেষণার অংশ হিসেবে ১৯৫৫ সালে 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকা' নামে একটি ধারণা প্রস্তাব করে মানি। সেই তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার আগে জেন্ডার শব্দের ইতিহাসটা এক নজর দেখে নেওয়া দরকার।

ইংরেজি ভাষায় জেন্ডার (gender) শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে, ব্যাকরণের আলোচনায়।[৩০৭] ঐ যে ছোটবেলাতে আমরা বাংলা ব্যাকরণে

---

[৩০৭] Lexico, "Gender," https://www.lexico.com/definition/gender.

'লিঙ্গ' পড়েছি না? পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ—এসব? বাংলা ব্যাকরণের এই 'লিঙ্গ' এসেছে ইংরেজি ব্যাকরণের 'জেন্ডার' থেকে। প্রথমদিকে জেন্ডার শব্দের ব্যবহার শুধু ব্যাকরণের মধ্যে সীমিত ছিল, শব্দের পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো বায়োলজিকাল সেক্স-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে, অর্থাৎ একজন মানুষ নারী নাকি পুরুষ তার শ্রেণিবিভাগে জেন্ডার শব্দটা ব্যবহার হয়। তবে বিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত এমন ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত।[৩০৮] নারী বা পুরুষ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বোঝাতে 'সেক্স' শব্দটাই বেশি ব্যবহার হতো। জেন্ডার ব্যবহৃত হতো ব্যাকরণগত অর্থে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জেন্ডার শব্দটার ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৪৫ সালে। ম্যাডিসন বেন্টলি নামে একজন মনোবিদ এই শব্দ ব্যবহার করে নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্যের সামাজিক দিককে বোঝাতে।[৩০৯] তবে শব্দটাকে সত্যিকার অর্থে পরিচিত করে তোলে জন মানি। ১৯৫৫ সালে এক অ্যাকাডেমিক পেপারে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে আলোচনাতে প্রথমবারের মতো 'জেন্ডার রোল' (Gender role) পরিভাষা প্রস্তাব করে সে। জেন্ডার শব্দটাকে সে প্রয়োগ করে নতুন এক পারিভাষিক অর্থে।

জন্মগতভাবে আন্তঃলিঙ্গ শিশুদের যৌনাঙ্গের বিকাশজনিত নানা ত্রুটি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে থাকে অপূর্ণাঙ্গতা। মানির মতে, এ ধরনের শিশুদের প্রধান চিকিৎসা অপারেশন। এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধলো যখন নিজের প্রস্তাবনার পক্ষে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলো সে। মানি বললো, জন্মের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুরা কাঁদামাটির মতো থাকে। এসময় যেকোনোভাবে তাদের গড়ে নেওয়া যায়। শরীর যাই হোক না কেন, সময়মতো অপারেশন করা হলে যেকোনো শিশুকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে বড় করা সম্ভব।

ধরুন, কোনো ছেলেশিশুর জন্ম হয়েছে অপূর্ণাঙ্গ পুরুষাঙ্গ নিয়ে। তার দেহের ভেতরের প্রজনন ব্যবস্থা পুরুষের। মানির তত্ত্ব অনুযায়ী, জন্মের আঠারো মাসের মধ্যে যদি অপারেশন করে পুরুষাঙ্গ ফেলে দেওয়া হয়, তারপর বাবা-মা যদি তাকে মেয়ে হিসেবে বড় করে, তাহলে এই শিশু একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারী হিসেবে বেড়ে উঠবে। হ্যাঁ, সে গর্ভধারণ করতে পারবে না। বয়ঃসন্ধির সময় তাকে হরমোন নিতে হবে, কিছু সার্জারি করাতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর। তবে এমন অল্প কিছু দৈহিক ব্যাপার ছাড়া বাকি সব দিক থেকে সে হবে একজন নারী। নিজেকে সে নারী হিসেবে চিনবে, জানবে, দেখবে। অন্যান্য নারীর সাথে তার চিন্তা, আচরণ, আবেগে তেমন

---

[৩০৮] Haig, David. "The inexorable rise of gender and the decline of sex: Social change in academic titles, 1945–2001." Archives of sexual behavior 33 (2004): 87-96.

[৩০৯] Bentley, Madison. "Sanity and hazard in childhood." The American Journal of Psychology 58, no. 2 (1945): 212-246.

কোনো পার্থক্য হবে না। নারীর মতোই সে কামনা করবে।

এখানেই জেন্ডার রোলের ধারণা নিয়ে আসলো মানি। বললো, শরীর আর জেন্ডার রোল, দুটো আলাদা জিনিস। শরীর হলো জন্মগত। আর জেন্ডার রোল হলো, 'নারী বা পুরুষ হবার সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য'।[৩১০] মানি আরও বললো, শিশু নিজেকে কোন পরিচয়ে চিহ্নিত করবে তা প্রায় পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর; দেহের ওপর না। যেহেতু জন্মের আঠারো মাসের মধ্যেই পারিবারিকভাবে তাকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলা হচ্ছে এবং তার শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে পুরুষত্বের চিহ্ন, তাই এই শিশু মানসিকভাবে একজন নারী হবে।

মানি তার জেন্ডার রোলের তত্ত্ব তৈরি করেছিল আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে গবেষণার আলোকে। তার নিজের ভাষ্যমতেই, 'জেন্ডারের এই নতুন অর্থের পেছনে অবদান রাখা অধিকাংশই ছিল হারমাফ্রোডাইট বা আন্তঃলিঙ্গ'।[৩১১] কিন্তু পুরো মানবজাতির ওপর সে এই তত্ত্ব চাপিয়ে দিলো। ঢালাওভাবে উপসংহার টেনে দিলো, মানুষের দেহ জন্মগত, কিন্তু তার জেন্ডার রোল সামাজিকভাবে নির্মিত। মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে উঠতে শিখে। আর এই শেখাটা নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর।

মানির এই তত্ত্ব দেহ আর পরিচয়কে পৃথক করে ফেললো। তার প্রচার করা জেন্ডার রোল-এর ধারণা লুফে নিয়ে জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয় নামে আরেকটি ধারণা প্রস্তাব করলো ক্যালিফোর্নিয়া মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ড. রবার্ট স্টৌলার। স্টৌলার বললো, জেন্ডার আইডেন্টিটি হলো নিজের পরিচয়ের ব্যাপারে একজন মানুষের অনুভূতি।[৩১২] এই অনুভূতি তার দেহের সাথে নাও মিলতে পারে। মানির মতো স্টৌলারেরও প্রাথমিক গবেষণা ছিল আন্তঃলিঙ্গের মানুষদের নিয়ে।[৩১৩]

আবারও মনে করিয়ে দিই, পুরো মানবজাতির ০.০১৮% হলো ইন্টারসেক্স। এই চরম সংখ্যালঘু মানুষদের নিয়ে বানানো অপ্রমাণিত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে চাপিয়ে দেওয়া হলো পুরো মানবজাতির ওপর।

---

[৩১০] J. Money, "An Examination of Some Basic Sexual Concepts: The Evidence of Human Hermaphroditism," Bulletin of Johns Hopkins Hospital 97:4 (October, 1955), 301–319.

[৩১১] John Money, preface, in John Money & A. A. Ehrhardt, Man and Woman, Boy and Girl. Gender Identity from Conception to Maturity (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1972).

[৩১২] Stoller, Robert J. "A contribution to the study of gender identity." The International Journal of Psychoanalysis (1964). Green, Richard (2010-08-12). "Robert Stoller's Sex and Gender: 40 Years On"

[৩১৩] Katrina Karkazis, Fixing Sex: Intersex, Medical Authority, and Lived Experience (Durham, NC, 2008). Robert J. Stoller, Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity (New York, 1968), chs. 5–7.

প্রমাণ

মানি আর স্টোলার তত্ত্ব দিলো। হ্যারি বেঞ্জামিন আর এরিকসন ফাউন্ডেশনের মতো কিছু প্রতিষ্ঠান এসব তত্ত্ব গ্রহণও করে নিল। কিন্তু বৃহত্তর মেডিক্যাল ফিল্ডে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য তত্ত্বের পাশাপাশি প্রয়োজন ছিল প্রমাণের। প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী মানি যখন নিজের তত্ত্বের জন্য উদগ্রীব হয়ে প্রমাণ খুঁজছে, ঠিক সেই সময় ১৯৬৭ সালের এক সকালে তার বাল্টিমোরের অফিসে এসে হাজির হলো রনাল্ড এবং জ্যানেট রাইমার।

রাইমার দম্পতি কানাডার উইনিপেগের বাসিন্দা। যমজ দুই ছেলে তাদের, ব্রুস আর ব্রায়ান। এক মেডিক্যাল দুর্ঘটনায় আট মাস বয়সে ব্রুসের লিঙ্গ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ছেলের স্বাভাবিক জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল রাইমাররা। তবে টিভিতে জন মানির সাক্ষাৎকার দেখার পর তাদের মনে হয়, হয়তো ব্রুসকে তিনি সাহায্য করতে পারবেন।

জন মানি যেন আকাশের চাঁদ পেল হাতে। রাইমার যমজরা মানির চোখে ধরা দিলো তার তত্ত্বকে প্রমাণ করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। তার তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, মানুষের পরিচয় যদি আসলেই দেহের বদলে পরিবেশ ও সমাজের ওপর নির্ভর করে, তাহলে ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করা সম্ভব। দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন বেড়ে উঠবে সুস্থ পুরুষ হিসেবে, আরেকজন সুস্থ নারী হিসেবে।

জন মানি রাইমারদের পরামর্শ দিলো ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করার। বললো, একজন অসম্পূর্ণ পুরুষ হবার বদলে একজন পরিপূর্ণ নারী হতে পারবে ও। তবে যত দ্রুত সম্ভব ব্রুসের শরীর থেকে পুরুষাঙ্গের অবশিষ্ট অংশ এবং অণ্ডকোষ কেটে বাদ দিতে হবে। কৈশোরের শুরুতে দিতে হবে হরমোন ট্রিটমেন্ট। আর ট্রিটমেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে সার্জারির মাধ্যমে কৃত্রিম যোনী স্থাপন করা হবে ওর শরীরে। আর হ্যাঁ, একটা নতুন নাম দিতে হবে ওর।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিদ ড. জন মানির কথা মেনে নিলো উইনিপেগের মধ্যবিত্ত দম্পতি। ব্রুসের অপারেশন হলো। ওর নতুন নাম দেওয়া হলো ব্রেন্ডা। বাবা-মা ওকে মেয়ে হিসেবেই বড় করতে লাগলো।

গভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে একের পর এক প্রবন্ধ, বক্তব্য আর বইতে ব্রুস রাইমারের কেইসকে অমিশ্র সাফল্য হিসেবে তুলে ধরলো জন মানি। ব্রুসের ব্রেন্ডাতে 'রূপান্তর' হওয়াকে উপস্থাপন করলো তার তত্ত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন ছেলে আর অন্যজন সুস্থ সবল মেয়ে হিসেবে বড় হচ্ছে, এটাই প্রমাণ করে পরিবেশই মানুষকে 'নারী' বা 'পুরুষ' বানায়। প্রকৃতি না। কে কোন ধরনের শরীরে নিয়ে জন্মাচ্ছে তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানসিকভাবে সে কোন

লৈঙ্গিক ভূমিকা বা জেন্ডার রোল গ্রহণ করছে।

ব্রুস রাইমারের কেইসের কথা যুক্ত করা হলো সাইকোলজি, সেক্সোলজি, জেন্ডার স্টাডিসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের পাঠ্যবইয়ে। প্রমাণিত সত্য হিসেবে গৃহীত হয়ে গেল মানির তত্ত্ব। মানির তত্ত্ব আর সাফল্যের গল্পকে অনেকে নারীবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার কবতে শুরু করলো। ১৯৭৩ টাইম ম্যাগাজিনের জানুয়ারি সংখ্যায় লেখা হলো,

'চাঞ্চল্যকর এই কেইস নারীবাদীদের বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেয়।'[৩১৪]

মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার গবেষণায় নব দিগন্তের সূচনাকারী হিসেবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান করে নিলো ড. জন মানি। জেন্ডারের ধারণা ঢুকে পড়লো সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত নানা শাস্ত্রে।

প্রত্যাবর্তন

মানির তত্ত্ব ভুল ছিল। একবারে শুরু থেকেই রাইমাররা বুঝতে পারছিল, হিসেবে মিলছে না। কোথাও বড় একটা ভুল হয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই হাঁটা, চলা, কথা সবকিছুতে ব্রুসকে দেখা যেত, 'ব্রেন্ডা'কে না। স্কুলে ও ছিল একা, রাগী, একগুঁয়ে। মেয়েদের সাথে খেলতে চাইতো না, ছেলেরা ওকে খেলায় নিতো না। একের পর এক মনোবিদ বললো, শৈশবের কোনো স্মৃতি না থাকা সত্ত্বেও কোনো এক কারণে নিজের এই রূপান্তরকে ব্রুস মেনে নিচ্ছে না। মানিকে জানানো হলে ব্যাপারটাকে 'টমবয়ের স্বাভাবিক দস্যিপনা' বলে স্রেফ উড়িয়ে দিলো সে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়লো সমস্যাগুলো। ব্রুস বুঝতে পারছিল ও অপরিচিত, অদ্ভুত। এক পর্যায়ে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিলো ওর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত জন মানির অমতেই ওকে ওর অতীত সম্পর্কে জানাবার সিদ্ধান্ত নিলো বাবা-মা।

১৯৮০-এর মার্চের এক পড়ন্ত দুপুরে সাইকলোজিস্টের সাথে সাপ্তাহিক সেশনের পর ব্রুসকে সব কিছু খুলে বললো ওর বাবা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানি আর হাতের গলতে থাকা আইসক্রিমের ফোটা এক এক করে জমতে থাকলো ওর কোলে। কিছুক্ষণ পর শান্ত গলায় নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো ব্রুস। ও ছেলে, আর ছেলে হিসেবেই বাকি জীবন কাটাবে। অতীতের সব চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টায় নিজের জন্য নতুন এক নাম বেছে নিলো ও। ডেইভিড, বাইবেলের সেই ছেলেটার মতো, বিশাল এক দানবকে যে যুদ্ধে হারিয়েছিল।

তারপর...

তারপর ডেইভিড সুখে-শান্তিতে বাকি জীবন কাঁটিয়ে দিল। ক্ষতবিক্ষত, ভ্রমণ ক্লান্ত,

---

[৩১৪] টাইম ম্যাগাজিন, জানুয়ারি ৮, ১৯৭৩ সংখ্যা।

কিন্তু সন্তুষ্ট একজন মানুষ হিসেবে—গল্পটা এখানে, এভাবে শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত সহজে শুকায় না। বাল্টিমোরে জন মানির সাথে নির্জন সেশনগুলোতে এমন কিছু হয়েছিল যার তাজা ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছিল ডেইভিড আর ব্রায়ান। এমন এক অন্ধকারে উঁকি দিতে বাধ্য হয়েছিল, শত চেষ্টার পরও যার দাগ মুছতে পারেনি ওরা।

দুঃসহ ক্ষতচিহ্ন

নিয়মিত চেকআপের অংশ হিসেবে বছরে একবার কানাডা থেকে অ্যামেরিকার বাল্টিমোরে যেত রাইমাররা। প্রথমে চারজন বসতো জন মানির অফিসে। রন আর জ্যানেটের সাথে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলার পর প্রাইভেট সেশনের জন্য ব্রুস আর ব্রায়ানকে আলাদা রুমে নিয়ে যেত মানি। নির্জন অফিস রুমে ওদের বিভিন্ন ছবি দেখাতো সে। নারী ও পুরুষের নগ্ন ছবি, যৌনাঙ্গের ছবি, সন্তান প্রসবের ছবি। কখনো কখনো পর্নোগ্রাফি। তারপর ব্রুস আর ব্রায়ানকে কাপড় খুলে নগ্ন হবার নির্দেশ দিতো। ৭ বছরের নগ্ন ব্রুসকে বাধ্য করতো মেঝেতে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে ভর দিতে। তারপর ব্রায়ানকে বলতো ব্রুসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে... কখনো কখনো ব্রুসকে নগ্ন হয়ে দু পা দু দিকে ছড়িয়ে চিত হয়ে শোয়াতো মানি। ব্রায়ানকে বাধ্য করতো ব্রুসের ওপরে উঠতে। তারপর ওদের ছবি তুলতো। ছোট্ট শিশু দুটিকে সেক্সুয়াল রোল-প্লে তে বাধ্য করতো মানি।[৩১৫]

জন মানির নির্জন অফিস রুমের 'থেরাপি' সেশনগুলো ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে দুই যমজের ওপর। কিশোর বয়সে এসে ব্রুস আর ব্রায়ান যখন বুঝতে পারলো মানি ওদেরকে দিয়ে যা করিয়েছিল তা অজাচার এবং সমকামের অনুকরণ, তখন ঠিক কী অনুভূতি হয়েছিল ওদের? কতটা দুঃসহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজের যমজ ভাইয়ের চোখের দিকে তাকানো? বিভীষিকাময় এই অভিজ্ঞতার স্মৃতির কেমন প্রভাব ফেলেছিল ওদের মনের ওপর?

প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করাটাও বেশ কঠিন। এ ধরনের স্মৃতি একজন মানুষের মনকে স্থায়ীভাবে ভেঙ্গে চুরমার দেয়। দুটো নিষ্পাপ শিশুকে কলুষিত করেছিল জন মানি। ওদের ভেতরে এঁকে দিয়েছিল চিরস্থায়ী ক্ষত।

অন্ধকার এ স্মৃতির অত্যাচার থেকে বাঁচতে অল্প বয়সেই নেশার জগতে ঢুকে পড়ে

[৩১৫] জ্যানেট এবং রনাল্ডকে মানি বলত, ওরা যেন বাসায় বাচ্চাদের সামনে, বিশেষ করে ব্রুসের সামনে সঙ্গম করে। এতে করে যৌনতা সম্পর্কে নাকি ওর স্পষ্ট ধারণা হবে। ওরা অস্বীকৃতি জানালে, মানি বলেন জ্যানেট যেন কমসেকম গৃহস্থালির কাজ করার সময় নগ্ন থাকে। এর ফলে নারী পুরুষের পার্থক্য এবং নিজের নারীত্ব সম্পর্কে ব্রুসের বিশ্বাস আরও গাঢ় হবে। মানির যুক্তি ছিল, স্বাভাবিক 'বিকাশের' জন্য ব্রুসকে নগ্নতা ও যৌনতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া জরুরি। বিশ্ববিখ্যাত ডক্টরের প্রেসক্রিপশান রাইমাররা মেনে চলার চেষ্টা করে। এসব 'চিকিৎসা' যখন চলছিল তখন ব্রুস আর ব্রায়ানের বয়স ছিল কেবল ৭ বছর। Colapinto, John. As nature made him: The boy who was raised as a girl. HarperCollins Publishers. 2000.

ব্রায়ান। দুনিয়ার ওপর রাগ নিয়ে বেপরোয়া হয়ে মদ খেতো। বুদ হয়ে থাকতো নানা ড্রাগসে। কিন্তু লাভ হলো না। অবশ হলো না স্মৃতির আঘাত, নাছোড়বান্দার মতো বারবার ওকে টেনে নিয়ে গেল বাল্টিমোরের সেই রুমে। ২০০২ এর বসন্তে ৩৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করলো ব্রায়ান। ভাইয়ের মৃত্যু প্রচণ্ড প্রভাব পড়লো ডেইভিডের ওপর।

দু' বছর পর, মে মাসের এক ভোরবেলায় নিজের শটগানের ব্যারেলের মাথাটা চেঁছে ফেললো ডেইভিড। তারপর বেড়িয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। কিছুক্ষণ পর বাসার কাছের এক সুপারস্টোরের পার্কিং লটে পাওয়া গেল ওর বিস্ফোরিত খুলির মৃতদেহ। রক্ত, মগজ আর করোটির ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরো ছড়ানো গাড়ির ভেতর পাক খেতে থাকলো এক অভাগার বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা গভীর দীর্ঘশ্বাস। মৃত্যুর সময় ডেইভিড রাইমারের বয়স ছিল ৩৮ বছর।[৩১৬]

নির্বিকার নিষ্ঠুরতা

ডেইভিড যখন পুরুষ হিসেবে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেটা জন মানিকে জানানো হয়। তারপর থেকে এই কেইস নিয়ে কথা বলা কমিয়ে দিলেও সাধের 'এক্সপেরিমেন্ট' যে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথাটা বেমালুম চেপে যায় সে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে ডেইভিডের কেইসের আসল খবর যখন মিডিয়াতে চলে আসে, তখন মানি তার এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে মিডিয়া হট্টগোলকে। কখনো রক্ষণশীল মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বলে, কখনো আবার প্রশ্ন তোলে রন আর জ্যানেটের অভিভাবকত্ব নিয়ে। যদিও এর আগে নিজের মেডিক্যাল নোটসে দু'জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল সে।

২০০৬ সালে, ৮৫ বছর বয়সে, পার্কিন্সন্সে ভুগে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ডেইভিড ও ব্রুস রাইমারের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনুতাপ দেখা যায়নি জন মানির মধ্যে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গভীর আত্মবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্য নিয়ে নিজের তত্ত্ব প্রচার করে যায় ড. মানি।

এই সব ক্লেদাক্ত পথ

একজন বিখ্যাত ও সম্মানিত সাইকলোজিস্ট কেন এমন করলেন? পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। জন মানি প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী এবং আত্মকেন্দ্রিক ছিল। নিজের তত্ত্বের ওপর তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। যেকোনো মূল্যে এ তত্ত্বকে সঠিক

---

[৩১৬] Diamond, Milton, and H. Keith Sigmundson. "Sex reassignment at birth: Long-term review and clinical implications." Archives of pediatrics & adolescent medicine 151, no. 3 (1997): 298-304.
Colapinto. As Nature Made Him Money, Dr. "the Boy with No Penis." BBC. https://tinyurl.com/2s3vvz7u

প্রমাণে উদগ্রীব ছিল সে। এ সবই সত্য। তবে এগুলো তার চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বেশ কিছু বিষয় অস্পষ্ট থেকে যায়। সেই অস্পষ্টতাগুলোর রহস্য ভেদ করতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ব্যক্তি জন মানির দিকে, আরেকটু গভীরভাবে।

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা বলেছিলাম বিকৃতির তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরিতে জন মানির ভূমিকার তুলনা চলে কেবল অ্যালফ্রেড কিনসির সাথে। তবে কিনসির সাথে মানির মিল কেবল এতটুকুতে সীমাবদ্ধ না। চিন্তা, কর্ম এবং জীবন—নানা দিক থেকে কিনসির সাথে অদ্ভুত মিল ছিল মানির।

কিনসির মতো মানিও সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণকে মিশন হিসেবে নিয়েছিল। সত্তরের দশকের শুরু থেকেই নিজের অবস্থান ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য শুরু করেছিল ওকালতি। একবার বিয়ে করলেও কিনসির মতো মানিরও ঝোঁক ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায়। অবাধ যৌনতা, প্রকাশ্য নগ্নতা, গ্রুপ সেক্স এবং পর্নোগ্রাফির সমর্থনে কট্টরভাবে প্রচারণা চালাতো মানি। নিয়মিত এ ধরনের বিকৃতিতে অংশ নিতো নিজেও।[৩১৭]

জন মানি তার ক্লাস এবং পাবলিক লেকচারগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে চরম মাত্রার অশ্লীলতা তুলে ধরত। 'গবেষণার অংশ হিসেবে' ভরা মজলিসে পর্নোগ্রাফি দেখানোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল তার। একবার অতিথি হয়ে উইনিপেগের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারে উপস্থিত দর্শক, সাংবাদিক, প্রফেসর আর ফার্স্ট ইয়ার মেডিক্যাল ছাত্রদের সামনে বড় পর্দায় পশুকাম, মানব মূত্র পান, মানব বর্জ্য খাওয়া, অ্যাম্পুটেইশান ফেটিশসহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির ছবি নিয়ে তৈরি করা স্লাইড শো দেখিয়েছিল মানি।[৩১৮] তার ভাষ্যমতে এই প্রেসেন্টেশনের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের ডিসেনসেটাইয করা, অর্থাৎ বিকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা নষ্ট করে করে দেওয়া। এ ঘটনার পরের দিন বড় পর্দায় গ্রুপ সেক্সের ভিডিও দেখায় মানি। ভিডিও শেষে ঘোষণা করে, বিয়ে হলো স্রেফ একটা অর্থনৈতিক বোঝাপড়া, যেখানে হৃদয় কেবল মানিব্যাগের অনুসরণ করে।[৩১৯]

কিনসির মতো মানিও মনে করত, শিশুরা জন্ম থেকেই যৌনতায় সক্ষম। শিশুকামের বৈধতার পক্ষে রীতিমতো ওকালতি করে সে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন মার্কিন

---

[৩১৭] Downing, Lisa, Iain Morland, and Nikki Sullivan. Fuckology: critical essays on John Money's diagnostic concepts. University of Chicago Press, 2019.

[৩১৮] শরীরের কোনো অঙ্গ বা অংশ কেটে ফেলা নিয়ে যৌন ফ্যান্টাসি বা যাদের শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে তাদের নিয়ে ফ্যান্টাসি করার মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করা।

[৩১৯] Colapinto. As Nature Made Him quoting, The Winnipeg Free-Press, Students, Mds Debating Worth Of Sex Exercise and Moral Values Of Lecturers Questioned.

অ্যাটর্নী জেনারেলের নেতৃত্ব পরিচালিত এক কমিশনের সামনে মানি দাবি করে বসে পর্নোগ্রাফি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর না। বরং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য 'যৌন খেলাধূলা' জরুরি।[৩২০] টাইম ম্যাগাজিনের এপ্রিল, ১৯৮০ সংখ্যায় মানি বলে,

> শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতা, যেমন তুলনামূলকভাবে বয়স্ক কোনো ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন শিশুর জন্য যে নেতিবাচকই হবে, এমন কোনো কথা নেই।[৩২১]

ডাচ পেডোফিলিয়া ম্যাগাজিন 'পাইডিকা'-তে দেওয়া ১৯৯১ সালের সাক্ষাৎকারে বলা জন মানির নিচের কথাগুলো লক্ষ্য করুন,

> 'ধরুন, আমি যদি দেখি দশ-এগারো বছর বয়সের একটি ছেলে বিশের বা ত্রিশের কোঠায় থাকা কোনো পুরুষের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে, তাদের সম্পর্ক যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়, তাদের বন্ধন যদি পারস্পরিক হয়, তাহলে আমার মতে এ ধরনের সম্পর্ককে কোনোভাবেই বিকারগ্রস্ত বা অসুস্থ (pathological) বলা যায় না।'[৩২২]

পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একই সাক্ষাৎকারে মানি বলে,

> 'সহজ ভাষায় স্নেহময় শিশুকাম (affectional pedophilia) হলো শিশুদের প্রতি স্নেহময় আকর্ষণ। যেখানে অভিভাবকসুলভ ভালোবাসা ও বন্ধন যৌন ভালোবাসা ও বন্ধনে পরিণত হয়। পুরুষ শিশুকামের ক্ষেত্রে এই স্নেহময় সম্পর্ক হলো পিতৃসুলভ ভালোবাসার মতো। পিতৃসুলভ ভালোবাসার সাথে এখানে যৌন বা প্রেমময় বন্ধন যুক্ত হয়েছে। স্নেহময় ভালোবাসার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেম ও কামনা।'[৩২৩]

অজাচারের সমর্থনে মানির বক্তব্য আরও জঘন্য। মানি এবং তার এক সহলেখকের মতে, যে সমাজে কেবল একটাই ধর্ম সেখানে অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস করা যে অর্থে অস্বাভাবিক, অজাচারে লিপ্ত পুরুষের আচরণও ঐ অর্থে অস্বাভাবিক।[৩২৪] মানির কথার প্রচ্ছন্ন অর্থ দাঁড়ায়, অজাচারের বিরোধিতা করা আসলে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো একটা ব্যাপার। অজাচারকে তাই অপরাধ গণ্য করা

---

[৩২০] Highleyman, Liz. Sex researcher John Money dies. The Bay Area reporter, 2006. https://www.ebar.com/story.php?ch=news&id=237195

[৩২১] "A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an older person, need not necessarily affect the child adversely." ATTACKING THE LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)]

[৩২২] Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.

[৩২৩] Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5

[৩২৪] Abuse and Neglect of Children at Home (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980), p. 412.

মানির মতে একেবারেই অযৌক্তিক। উইনিপেগের যে লেকচারের কথা একটু আগে বলা হলো, সেখানেই মানি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা বলেছিল, সৎ বাবা তার সৎ মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক করলে মেয়েদের মা অনেক ক্ষেত্রে 'খুশি' হয়, কারণ এতে স্বামীর কাছ থেকে কিছুটা ফুরসত মেলে তার।[৩২৫]

আগে বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্রে 'Perversion' বা 'বিকৃতি' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। জন মানি এর বদলে প্যারাফিলিয়া (Paraphilia) শব্দের প্রচলন ঘটায়। স্বাভাবিক যৌনাচারকে মানি সংজ্ঞায়িত করে নর্মোফিলিয়া (Normophilia) নামে। নর্মোফিলিয়া হলো এমন সব যৌনাচার, যা সমাজের বিদ্যমান মানদণ্ড অনুযায়ী—সেটা আইন, ধর্ম বা অন্য কোনো কিছু হতে পারে—স্বাভাবিক (Norm) মনে করা হয়। আর যা কিছু স্বাভাবিক গণ্য হয় না, সেগুলোই প্যারাফিলিয়া। অর্থাৎ যৌনতা কেবল প্রচলিত আর অপ্রচলিত। প্রথাগত আর প্রথাবিরোধী। প্রাকৃতিকভাবে যৌনতার মধ্যে কোনো ভালো-মন্দ নেই। আছে কেবল যৌনতার ব্যাপারে সমাজের ধারণা। পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। যৌনতাকে কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা কেবলই একটি সামাজিক প্রচলন। ভাষার চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের যৌনাচারকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে জন মানি। বিকৃত যৌনাচারকে নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত করে কেবল 'অপ্রচলিত' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে । তার কণ্ঠ আর কলমে পাওয়া যায় কিনসির প্রতিধ্বনি।

***

এই ছিল জেন্ডার ধারণার উদ্ভাবক, সম্মানিত মনোবিদ ড. জন মানি। জন মানি; যে ছোট্ট ব্রুস আর ব্রায়ানকে সমকাম ও অজাচারের অনুকরণে বাধ্য করেছিল, যে ছয় বছরের সন্তানের সামনে বাবা-মাকে যৌনমিলন করার পরামর্শ দিয়েছিল, যে শিশুকামের পক্ষে ওকালতি করত, অজাচারের সাফাই গাইতো, শিশুদের পর্নোগ্রাফি দেখাতো, যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা এবং গ্রুপ সেক্সে লিপ্ত হতো নিয়মিত, একটা পরিবারের জীবনকে যে নিজের সাফল্যের সিঁড়ি বানিয়েছিল।

কলুষতার কারিগর জন মানির তত্ত্বের ব্যাখ্যা তার জীবন। তার নিজের বিকৃত কামনাই তার বিকৃত চিন্তার উৎস। জন মানির জীবনেও এ বইতে বারবার দেখা সেই ছকের প্রতিফলন দেখি আমরা। কলুষতার অন্যান্য কারিগর- উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসিদের মতো, মানিরও চিন্তা ও তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের বিকৃতির অজুহাত তৈরি করা। সমাজে সেগুলোকে বৈধ এবং স্বাভাবিক করে তোলা। সফলও হয়েছিল সে।

---

[৩২৫] Colapinto. As Nature Made Him quoting, The Winnipeg Free-Press, Students, Mds Debating Worth Of Sex Exercise and Moral Values Of Lecturers Questioned.

মানির চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে মনোবিদ্যা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে। কিনসির মতোই মানির চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে আধুনিক 'যৌনশিক্ষা'র কাঠামোকে। মানির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় শিক্ষাক্রম, সরকারি পলিসি, আইন, এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতি।[৩২৬] কিনসির মতো জন মানিও এক অমোচনীয় কলংকের দাগ রেখে যায় আধুনিক মানসে।

সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলন দেহ থেকে আলাদা জেন্ডারের ধারণা গ্রহণ করে। জেন্ডার স্টাডিস নামে আলাদা শাস্ত্রই চালু করে ফেলে তারা। ১৯৮০ নাগাদ নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকার আলোচনাতে জেন্ডার শব্দটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে এই শব্দের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রচারকরাও। মানির 'জেন্ডার' তত্ত্ব পশ্চিমা জ্ঞানের জগৎ আর সংস্কৃতিকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, এক সময় একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

মানির তত্ত্বের মাধ্যমে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে রূপান্তরিত হবার যাত্রা শুরু হয়। তবে বাকি রয়ে গিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু উপাদান। সেই উপাদানগুলো আসবে অপ্রত্যাশিত এক উৎস থেকে।

---

[৩২৬] Goldie, Terry. The man who invented gender: engaging the ideas of John Money. UBC Press, 2014.

অধ্যায় ১৪

তত্ত্ব-তালাশ

ফেমিনিসম বা নারীবাদী আন্দোলনের শুরু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ১৮৪৮ সালে অ্যামেরিকার সেনেকো ফলস শহরে আয়োজিত এক কনভেনশনকে নারীবাদী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনাবিন্দু মনে করা হয়। সেই সময় পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনগুলোতে সোশ্যালিসম বা সমাজতন্ত্র ছিল খুব প্রভাবশালী। প্রগতিশীল চিন্তা ও রাজনীতি বলতে মোটাদাগে সমাজতন্ত্রকে বোঝানো হতো। শুরু থেকেই নারীবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সমাজতন্ত্রের। নারীবাদী আন্দোলনের অনেক নেত্রী যুক্ত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে। নারীবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বয়ানও গড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্র থেকে ধার করা শ্রেণি সংঘাতের ধারণার ওপর। শ্রেণি সংঘাতের ধারণাকে নারীবাদ প্রয়োগ করেছিল পরিবার এবং সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

মার্ক্স এবং বাকুনিনের মতো সোশালিস্ট দার্শনিকরা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতো নির্দিষ্ট এক তত্ত্বের মাধ্যমে। তাদের চোখে ইতিহাস এক শ্রেণির সাথে অন্য শ্রেণির সংঘাতের গল্প। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মৌলিকভাবে শ্রেণি দুটি, পুঁজিবাদী গোষ্ঠী বনাম শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণি। পুঁজিবাদী শোষক, শ্রমিক শোষিত। পুঁজিবাদীরা অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের শ্রমের ফসল ভোগ করে। তাদের শোষণ করে। শোষণের এই কাঠামোই দারিদ্র্য, বৈষম্য, যুদ্ধসহ সব সমস্যার প্রধান কারণ। এ সমস্যার সমাধান হলো, বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি করা। শ্রেণিবিভেদ মুছে দেওয়া। নারীবাদ শ্রেণিসংঘাতের কাঠামোকে গ্রহণ করে মূল চরিত্রগুলোকে বদলে দেয়। নারীবাদ বলে,

> পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ শোষক আর নারী শোষিত। পুরুষ নারীকে অধীনস্ত করেছে। নারীর সময়, শ্রম আর কষ্টের ফসল নিয়ন্ত্রণ করেছে। কেড়ে নিয়েছে নারীর অধিকার।

অর্থাৎ শোষকের ভূমিকায় আসে পুরুষ, আর শোষিতের ভূমিকায় আসে নারী। পুরুষ তার পুরুষ হবার কারণেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত। নারী তার নারীত্বের কারণে বৈষম্যের

শিকার, নিপীড়িত। শোষণের এই কাঠামোর নাম পিতৃতন্ত্র (Patriarchy)। নারীকে অধীনস্ত করে রাখার ব্যাপারটা ঘটে পরিবারের মাধ্যমে। পরিবার নামের প্রতিষ্ঠান শোষণের এ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নারীবাদ বনাম পরিবার

উনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদীদের দাবি ছিল 'অর্থনৈতিক মুক্তি'। যতদিন নারী আর্থিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, ততদিন সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। পিতৃতান্ত্রিক শেকলে সে বন্দি হয়ে থাকবে। নারীকে মুক্ত করতে হলে কর্মক্ষেত্র নারীর জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।[৩২৭] উন্মুক্ত বাজারে নারী ও পুরুষ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করবে একে অপরের সাথে।

কিন্তু কিছুদিন পর নারীবাদীরা বুঝতে পারলো, এ ধরনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নারীকে বড় ধরনের একটা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মাতৃত্ব। 'মাতৃত্বের বোঝা' কাঁধে নিয়ে সমানতালে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব, বিশেষ করে সর্বহারা শ্রেণির নারীদের জন্য। ধনী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন থাকে, সর্বহারা শ্রেণির নারীদের তা থাকে না। সন্তান জন্মদান আর লালনপালনের দায়িত্বের কারণে প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগেই নিশ্চিত হয়ে যায় নারীর হার।

কাজেই নারীকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করতে হলে তাকে ঐ সব সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা থেকে মুক্ত করতে হবে, যেগুলোকে ঐতিহাসিকভাবে নারীর দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। আর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে, তা হলো মাতৃত্ব। ১৯০৯ সালে মার্ক্সবাদী-নারীবাদী অ্যালেক্স্যান্ড্রা কোলোনটাই বললো,

> নারীকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে হলে বিদ্যমান পরিবার কাঠামোর শেকল ছুড়ে ফেলতে হবে। এই কাঠামো সেকেলে এবং শোষণমূলক।[৩২৮]

কোলোনটাইয়ের মতে, মাতৃত্বের শেকল থেকে নারীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্র যখন শিশুদের ভরণপোষণ আর দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে, তখনই কেবল স্বাধীনভাবে বাঁচার ও ভালোবাসার সুযোগ পাবে নারী।[৩২৯] সে তখন ভয় আর আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে, সুযোগ পাবে ভালোবাসার। মাতৃত্ব এবং নারীর পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধান দিতে পারবে কেবল কমিউনিস্ট রাষ্ট্র।

---

[৩২৭] এ ধারার আলোচনার উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে, Mill, Harriet Hardy Taylor, and Harriot Kesia Hunt. Enfranchisement of women. Lathrop's Print, 1852.

[৩২৮] Kollontai, Alexandra. "The social basis of the woman question." Consultado el 22 (1909).

[৩২৯] প্রাগুক্ত।

কোলনটাইয়ের ভাষায়,

> স্বামীর কাছে নয়, নারী তার সহায় খুঁজে পাবে নিজের কাজের সামর্থ্যের মধ্যে। সন্তান নিয়ে তাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সন্তানের সব দায়িত্ব নেবে শ্রমিকদের রাষ্ট্র। যে সমস্ত বৈষয়িক হিসেবনিকেশ পারিবারিক জীবনকে পঙ্গু করে ফেলে, তার সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে বিয়ে পরিণত হবে স্রেফ দুজন মানুষের মিলনে, যারা এক অপরকে ভালোবাসে এবং বিশ্বাস করে।[৩৩০]

কোলনটাইয়ের বার্তা স্পষ্ট। বিদ্যমান সমাজ আর পরিবার কাঠামো টিকিয়ে রেখে নারীকে মুক্ত করা যাবে না। বদলাতে হবে পরিবার, বিয়ে, অভিভাবকত্ব থেকে শুরু করে ভালোবাসার ধরনকেও। নারীকে মুক্ত করতে হলে পরিবর্তন আনতে হবে সমাজের শেকড় থেকে শুরু করে শাখা পর্যন্ত। অ্যালেক্স্যান্ড্রা কোলোনটাইয়ের এই বার্তা এক সময় পরিণত হবে নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল মন্ত্রে।

সিমন : অনুগত বিপ্লবী

নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু সিমন দ্য বোভয়াকে দিয়ে। প্যারিসের এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম নেওয়া সিমনের ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে নান হবার। কিন্তু কৈশোরের শুরুতে এক কাজিনের মাধ্যমে পরিচয় হয় মদ আর রাতের প্যারিসের উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের সাথে। শুরু হয় আজীবনের আসক্তি। কিছুদিন পর নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করে বেভোয়া।[৩৩১] বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী বেভোয়ার পরিচয় হয় জ্য পল সার্ত্রের সাথে। সার্ত্রেকে গত শতাব্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাস্তিক দার্শনিক মনে করা হয়। তার মতে,

> মানবপ্রকৃতি বলে কিছু নেই; কারণ মানবপ্রকৃতিকে তৈরি করার মতো কোনো ঈশ্বরই নেই। মানুষ কেবল তা না, যা সে নিজেকে মনে করে, বরং তা-ও যা সে হয়ে উঠতে চায়।[৩৩২]

সার্ত্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে বোভয়ার। দুই নাস্তিক বুদ্ধিজীবীর মধ্যেকার এ সম্পর্ক গতানুগতিক দম্পতির মতো ছিল না। অন্যান্য নারীপুরুষের সাথে অবাধে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতো দুজন। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সাথেও যৌন সম্পর্কের অভ্যাস ছিল বোভয়ার। নিজের ছাত্রীদের সাথে—যাদের বেশিরভাগের বয়স ছিল ২০ এর নিচে—বেশ কিছু যৌন কেলেঙ্কারির ইতিহাস আছে তার। তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগও এনেছিল কয়েকজন। সার্ত্রেরও শখ ছিল ছাত্রীদের সাথে প্রেম করার। বিশেষ আগ্রহ ছিল কিশোরীদের প্রতি। সার্ত্রের জন্য

---

[৩৩০] প্রাগুক্ত।

[৩৩১] De Beauvoir, Simone. "The second sex." In Social Theory Re-Wired, pp. 346-354. Routledge, 2023. p x

[৩৩২] Sartre, Jean-Paul. Existentialism is a Humanism. Yale University Press, 2007. p 22.

নিত্যনতুন কচি মেয়ে জোগাড় করার কাজটা করতে হতো বোভোয়াকে।[৩৩৩] নিজের ক্ষুধা মেটার পর কিশোরীদের সার্ত্রের হাতে তুলে দিতো সে। বিচিত্র এ সম্পর্ক টিকে ছিল সার্ত্রের মৃত্যু পর্যন্ত। ব্যক্তিজীবনের মতো সিমন দ্য বোভয়ার চিন্তা জগতেরও সার্ত্রের প্রভাব ছিল গভীর।

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় সিমন দ্য বোভয়ার বিখ্যাত বই, *দা সেকেন্ড সেক্স*। বইতে বোভয়া দাবি করে, পরিবার হলো নারীর জন্য অভিশাপস্বরূপ, সন্তান জন্মদান এক পাশবিক প্রক্রিয়া। নারীমুক্তির জন্য পরিবার বিলোপ করা আবশ্যক।[৩৩৪] তার কলমে পাওয়া যায় কোলোনটাইয়ের প্রতিধ্বনি। বোভয়া লেখে,

> যতক্ষণ পরিবার এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলো টিকে থাকবে, বিপ্লব অক্ষমই থেকে যাবে।[৩৩৫]

এ বইয়ে অ্যালেক্স্যান্ড্রা কোলোনটাইয়ের চিন্তার সাথে নতুন একটি দিক যুক্ত করে বোভয়া, যা ফুটে উঠেছে দা সেকেন্ড সেক্স-বইয়ের সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত নিচের এই বাক্য থেকে,

> কেউ নারী হিসেবে জন্ম নেয় না; বরং নারীতে পরিণত হয়।[৩৩৬]

বোভয়া বলে, নারী হিসেবে জন্মেছে বলেই নারী নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকায় জীবন কাটাতে বাধ্য না। নারী বা পুরুষের ভূমিকা, তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা, পরিবার ও সমাজে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য—এ সব কিছুই সমাজের তৈরি। কেউ মায়ের পেট থেকে এগুলো নিয়ে আসে না। সমাজ তাকে একটা নির্দিষ্ট ছাচে ফেলে দেয়, নির্দিষ্ট ভূমিকা চাপিয়ে দেয় তার ওপর। নির্দিষ্ট ধরনের শরীর থাকলেই নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে—এই ধারণা ভুল। এ ধারণার কবল থেকে মুক্ত করতে হবে নারীকে।

সিমন দ্য বোভয়া তার বইতে 'জেন্ডার' শব্দটা ব্যবহার করেনি। নতুন পারিভাষিক অর্থে জেন্ডার শব্দের প্রয়োগ শুরু হবে এই বই প্রকাশের আরও সাত বছর পর। দেহ থেকে পরিচয়কেও বোভয়া পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করেনি। তবে তার চিন্তার সাথে কিছু কিছু মিল পাওয়া যায় জন মানির জেন্ডার রোল এবং রবার্ট স্টোলারের জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের।

---

[৩৩৩] Menand, Louis. "Stand by your man: The strange liaison of Sartre and Beauvoir." The New Yorker 16 (2005).

[৩৩৪] Alice Schwarzer, After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir (New York: Pantheon, 1984), 40.

[৩৩৫] Simone de Beauvoir, The Second Sex, trans. Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier, with an introduction by Judith Thurman (New York: Vintage, 2011), p 47.

[৩৩৬] Ibid 283.

দা সেকেন্ড সেক্স অনুপ্রাণিত করে নারীবাদের নতুন এক প্রজন্মকে। বোভয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত নারীবাদীরা ষাটের দশকে অ্যামেরিকা জুড়ে শুরু করে জোরালো এক আন্দোলন। এ আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ বোভয়ার তত্ত্বকে নিয়ে যায় আরও চরম উপসংহারের দিকে।

ফায়ারস্টোন : ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী

শুলামিত ফায়ারস্টোনের জন্ম অর্থোডক্স ইহুদি পরিবারে। শৈশবটা ছিল রুক্ষ। বদমেজাজী বাবা ভীষণ মারধোর করতো ছেলেমেয়েদের। শুলামিথ নিজেও ছিল রগচটা আর একরোখা। মারপিট বরাবর তার ভাগেই বেশি জুটত। তাই প্রথম সুযোগেই শুলামিথ যখন ঘর ছেড়ে পালালো, তখন খুব একটা অবাক হলো না কেউ। অল্প সময়ের মধ্যেই বয়ফ্রেন্ড জুটে গেল। কিন্তু তারও ছিল মারধোরের অভ্যাস। এক বান্ধবীর ভাষ্যমতে, একবার চড় মেরে শুলামিতের দাত ফেলে দেয় তার বয়ফ্রেন্ড।[৩৩৭]

জীবন, পরিবার আর সমাজের প্রতি বুকভর্তি রাগ ছিল শুলামিথ ফায়ারস্টোনের। এই রাগ, ক্ষোভ আর কষ্টকে উগড়ে দিয়ে মাত্র ২৫ বছর বয়সে সাড়াজাগানো একটা বই লিখে ফেলে সে। 'দা ডায়ালেক্টিক অফ সেক্স' নামের এ বইতে কোলোনটাই এবং সিমন দ্য বোভয়ার সাথে সুর মিলিয়ে ফায়ারস্টোনও বলে, নারীর শোষণের শেকড় পরিবার। পরিবার যেহেতু সমাজের মৌলিকতম ইউনিট, তাই শোষণ বন্ধ করতে হলে বিলুপ্ত করতে হবে পরিবারকে। তার ভাষায়,

> বিপ্লব যদি পরিবার নামক মৌলিক সামাজিক সংগঠনের শেকড় উপড়ে না ফেলে...তাহলে শোষণের জোঁককে কখনোই ধ্বংস করা যাবে না।[৩৩৮]

নারীকে মুক্ত করতে হলে, 'সব ধরনের যৌন শ্রেণিবিভাগ থেকে মুক্ত হতে হবে' সমাজকে।[৩৩৯] শ্রেণি সংঘাতের সমাধান যেমন শ্রেণিহীন সমাজ, তেমনিভাবে নারীর শোষণের সমাধান হলো নারী-পুরুষের শ্রেণিবিভাগহীন সমাজ।

> '...সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য যেমন কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণিসুবিধা নির্মূল করা না, বরং শ্রেণিবিভেদকেই নির্মূল করা। ঠিক তেমনি নারীবাদী বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল প্রথমদিকের নারীবাদী আন্দোলনের মতো পুরুষের সুবিধাজনক অবস্থান (প্রিভিলেজ) নির্মূল করা না; বরং সেক্স বিভেদকেই নির্মূল করা...'[৩৪০]

---

[৩৩৭] Susan Faludi, "Death of a Revolutionary," New Yorker (April 15, 2013).

[৩৩৮] Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex (New York: Farrar, Straus and Giroux: 1970), 12.

[৩৩৯] Ibid, 30.

[৩৪০] Ibid, 11.

অর্থাৎ ফায়ারস্টোনের প্রস্তাব হলো, নারী ও পুরুষের মাঝে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক, সব বিভেদ মুছে ফেলা। নারীবাদীদের শুধু সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুললে হবে না, প্রশ্ন তুলতে হবে 'প্রাকৃতিক বিন্যাস নিয়েও'।'[৩৪১] শুলামিথ ফায়ারস্টোন এমন এক ভবিষ্যতের কথা বললো, যেখানে প্রযুক্তি নারীকে মাতৃত্বের বোঝা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করবে। যেখানে সন্তানধারণের কাজটা প্রযুক্তি করবে। চাইলে সন্তান ধারণ করতে পারবে পুরুষও। এ ধরনের সমাজে, 'মানবজাতি আবারও ফিরে যাবে বহুরূপী যৌনতায়, যা প্রাকৃতিক। সেখানে সব ধরনের যৌনতা অনুমোদিত হবে, উপভোগ করা হবে'।[৩৪২]

মজার ব্যাপার হলো, 'বহুরূপী যৌনতা'র সমর্থনে ফায়ারস্টোন বলে, এটা 'প্রাকৃতিক'। 'যেহেতু প্রাকৃতিক তাই ভালো', অনেকটা এ ধরনের ইঙ্গিত। অন্যদিকে তার বইয়ের মূল বক্তব্য হলো, নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ উৎখাত করা। নিজের তত্ত্বের সমর্থনে কখনো 'প্রাকৃতিক' হবার যুক্তিকে কাজে লাগানো, একটু পরই আবার প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দেওয়া—এ এক বিচিত্র পরস্পরবিরোধী অবস্থান। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের চিন্তার প্রায় পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এমন নানা সাংঘর্ষিকতা।

অল্প সময়ের মধ্যে নারীবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকদের একজন হয়ে উঠে ফায়ারস্টোন। নারীবাদী চিন্তার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে প্রশংসিত হয় *ডায়ালেকটিক অফ সেক্স*। সমাদৃত হয় রাজনীতির নারীবাদী তত্ত্ব হাজির করা প্রথম বই হিসেবে। নারীবাদী লেখিকা নাওমি উলফের মতে, এ আন্দোলনের বিবর্তন কীভাবে হয়েছে, এই বই না পড়লে তা বোঝা অসম্ভব। ফায়ারস্টোন এ বই যাকে উৎসর্গ করেছিল, সেই সিমন দ্য বোভয়া-ও ভূয়সী প্রশংসা করে বইটির। বোভয়া বলে, ফায়ারস্টোনের অবস্থান 'সঠিক, কারণ সন্তানদের হাত থেকে মুক্ত হবার আগ পর্যন্ত নারী মুক্তি পাবে না'...।[৩৪৩]

তবে শুলামিথ ফায়ারস্টোনের গল্পের শেষটা সুখকর হয় না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মধ্যে দেখা দেয় প্যারানয়েড স্কিৎযোফ্রেনিয়াসহ নানা মানসিক রোগ। পরিবারকে ত্যাজ্য ঘোষণা করা ফায়ারস্টোনের দিন কাটে নিজের ফ্ল্যাটের একাকী নীরবতায়। ঘুরপাক খেতে শুরু করে সে ডিলিউশানের জগতে। ফায়ারস্টোনের নিউইয়র্কের ছোট ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীরা প্রায়ই তার নামে অভিযোগ করে। সে পানির কল খুলে রাখে, পানিতে ভেসে নষ্ট হয়ে যায় মেঝের ফ্লোরবোর্ডগুলো। নির্জন ফ্ল্যাটে গভীর রাত পর্যন্ত তার চিৎকার শোনা যায়। হাতেগোনা অল্প ক'জন বন্ধুদের একজন

---

[৩৪১] Ibid, 4.

[৩৪২] Ibid, 187.

[৩৪৩] Alice Schwarzer, After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir (New York: Pantheon, 1984), 39.

নিউইয়র্কে গিয়ে দেখে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এক হাতে হাতুড়ি আরেক হাতে খাবারের ক্যান নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে ফায়ারস্টোন। অনাহারে ভেঙ্গে গেছে শরীর আর চেহারা।[৩৪৪] এক পর্যায়ে ফায়ারস্টোনের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মায়, তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র চলছে। অজানা কোনো শত্রু বিষ মেশাচ্ছে তার খাবারে। ধীরে ধীরে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে করে দেয় সে।

২০১২ সালের অগাস্টের এক সকালে ফায়ারস্টোনের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায় বাড়িওয়ালা। দরজার নিচ দিয়ে ভেসে আসে ভারী, থকথকে, বোটকা গন্ধ। এ গন্ধ নিয়েই বারবার নালিশ দিচ্ছিল বাদবাকি ভাড়াটিয়ারা। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় বাড়িওয়ালা। মেঝেতে দেখে ফুলেফেঁপে ওঠা গলিত, স্থবির লাশ। ঝাঁক ঝাঁক মাছি, পোকা আর লার্ভার চাদরে ঢাকা। থেকে থেকে কিলবিল করে উঠছে ওগুলো। পরে জানা যাবে, শুলামিথ ফায়ারস্টোন মারা গেছে প্রায় এক মাস আগে।[৩৪৫]

***

নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, মাতৃত্ব নারীর স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক। মুক্তি ও মাতৃত্বের এই দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে বিয়ে ও পরিবারকে উৎখাত করার কথা বলেছিল অ্যালেক্স্যান্ড্রা কোলোনটাই আর সিমন দ্য বোভয়ার মতো নারীবাদীরা। শুলামিথ ফায়ারস্টোন এতে যুক্ত করে প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী-পুরুষের শ্রেণিবিভাগ মুছে ফেলে এ দুয়ের মধ্যেকার প্রাকৃতিক পার্থক্যকে অতিক্রম করার প্রস্তাব। তার চিন্তা বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলে নারীবাদী আন্দোলনের ওপর।

অন্যদিকে প্রায় সমান্তরাল সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা জন মানির তত্ত্বগুলোর মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' খুঁজে পায় নারীবাদীরা। ব্রুস রাইমারের 'রূপান্তরের' ব্যাপারে মানির বানোয়াট গল্প উদগ্রীবভাবে আঁকড়ে ধরে তারা—এই যে দেখো! অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে! নারী ও পুরুষের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ছেলেরা যা পারে, মেয়েরাও তাই পারে। ছেলেরা যতটুকু পারে ততটুকুই পারে। নারী ও পুরুষের আলাদা ভূমিকার ধারণাগুলো পুরোপুরিভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। নির্দিষ্ট কিছু কাঠামোর ফসল। যেহেতু এগুলো মানুষ বানিয়েছে তাই এগুলো বদলানোও যাবে। জেন্ডার যেহেতু সামাজিকভাবে নির্মিত, তাই জেন্ডারকে ভেঙ্গে নতুন করে আবার গড়াও সম্ভব।

নারী ও পুরুষের শ্রেণিবিভাগ মুছে দেওয়ার, শরীরের বাস্তবতাকে চাপা দেওয়ার পথে বেশ অনেকদূর এগিয়ে যায় নারীবাদ। তারপর ধাঁধার সর্বশেষ টুকরোটা নিয়ে

[৩৪৪] Faludi, "Death of a Revolutionary.

[৩৪৫] Anderson, Lincoln (August 30, 2012). Shulamith Firestone, radical feminist, wrote best-seller, 67. https://www.amny.com/news/shulamith-firestone-radical-feminist-wrote-best-seller-67/

হাজির হয় নতুন এক তত্ত্ব।

কুইয়ার তত্ত্ব : যেমন খুশি তেমন সাজো

কুইয়ার (queer) শব্দের অর্থ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, অসুস্থ। এক সময় নেতিবাচক অর্থে কুইয়ার শব্দটা ব্যবহার হতো পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রে। আশির দশকের শেষ দিকে নারীবাদ, সমকামী আন্দোলন এবং উত্তর আধুনিক চিন্তার মিশেল থেকে এক বিচিত্র দর্শনের উদ্ভব ঘটে, প্রবক্তারা যার নাম দেয় কুইয়ার থিওরি বা কুইয়ার তত্ত্ব। এলজিবিটি আন্দোলনের নামের সাথে যে কিউ (Q) যুক্ত করা হয়, সেটা এসেছে কুইয়ার শব্দের আদ্যাক্ষর কিউ থেকে।

যৌন বিপ্লব এবং নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে আশির দশকের শুরুর দিকে কিছু কিছু পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার স্টাডিস নামে আলাদা একটা বিষয় পড়ানো শুরু হয়। বোভয়া আর ফায়ারস্টোনের মতো তাত্ত্বিকদের চিন্তার আলোকে যৌনতা এবং নারী-পুরুষের সামাজিক-পারিবারিক ভূমিকার ধারণাকে আক্রমণ করে জেন্ডার স্টাডিস। একে নারীবাদী দর্শনের অ্যাকাডেমিক প্রয়োগের চেষ্টা বলা যায়। 'চেষ্টা' বলছি, কারণ নারীবাদের মতো জেন্ডার স্টাডিসও নির্দিষ্ট মতাদর্শ দ্বারা চালিত। একে নির্মোহ বিশ্লেষণ বা গবেষণা বলা যায় না কোনো অর্থেই। নারীবাদের মতোই জেন্ডার স্টাডিসও প্রচণ্ড রকমের আবেগসর্বস্ব, পরস্পরবিরোধী, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন।[৩৪৬] জেন্ডার স্টাডিস মতাদর্শিক বুলি আর খেয়ালখুশির তাত্ত্বিকতার মিশেল।

কুইয়ার থিওরি নারীবাদের কাছ থেকে জেন্ডার স্টাডিসের অ্যাপ্রোচ বা পন্থা গ্রহণ করে। এর সাথে মেশায় পোস্ট-মডার্নিসম বা উত্তর আধুনিকতাবাদের দর্শন। উত্তর আধুনিকতাবাদ বলে পরিচয়, যৌনতা, সত্য, যুক্তি, মানবপ্রকৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের ধারণাগুলো চিরন্তন বা সর্বজনীন কিছু না। এগুলো সামাজিকভাবে নির্মিত, কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের ফসল। এগুলোকে চূড়ান্ত সত্য মনে করার কিছু নেই। সময়ের সাথে সাথে এসব সংজ্ঞা বদলায়। ভালো-মন্দেরও চূড়ান্ত কোনো সংজ্ঞা নেই। মানুষ ভালো-মন্দ তৈরি করে। প্রতিটি 'সত্য'ই কোনো-না-কোনো

---

[৩৪৬] ২০১৮ সালে কয়েকজন গবেষক ইচ্ছা করে বেশ কিছু বানোয়াট, হাস্যকর এবং অর্থহীন গবেষণাপত্র তৈরি করেন এবং জেন্ডার ও কুইয়ার স্টাডিসের সেরা জার্নালগুলোতে প্রকাশের জন্য জমা দেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই শাস্ত্র এবং জার্নালগুলোর অ্যাকাডেমিক মান ও অবস্থা যাচাই করা। বানোয়াট ও হাস্যকর এই গবেষণাপত্রগুলো প্রকাশ করে জার্নালগুলো, তাও আবার পিয়ার রিভিউয়ের পর। এর মধ্যে একটি গবেষণাপত্র বিশেষ রেকগনিশন পায়! প্রমাণ হয়, একেবারে অর্থহীন কথাও যদি নারীবাদ আর কুইয়ার তত্ত্বের নির্দিষ্ট মতাদর্শিক অবস্থান থেকে জটিল পরিভাষা আর জবরজং ভাষা ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হলে সেটা ঐ ডিসিপ্লিনের টপ জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হয়ে যায়। জেন্ডার স্টাডিস এবং কুইয়ার থিওরির জগতে ঠিক কোন মানের অ্যাকাডেমিক চর্চা হয় এ ঘটনা থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আরও জানার জন্য সার্চ করতে পারেন- Sokal Squared/Grievance Studies Hoax. আরও দেখতে পারেন, Pluckrose, Helen, and James A. Lindsay. Cynical theories: How activist scholarship made everything about race, gender, and identity—and why this harms everybody. Pitchstone Publishing (US&CA), 2020.

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শক্তির কাঠামোর সাপেক্ষে 'সত্য'।

জেন্ডার স্টাডিস আর পোস্টমডার্নিসমকে একসাথে করে সব ধরনের যৌন বিকৃতির তাত্ত্বিক বৈধতা দেওয়ার কাজটা করে কুইয়ার থিওরি। চ্যালেঞ্জ করে বসে জেন্ডার এবং যৌনতার ধারণাকেই। বলে, যৌনতা এবং জেন্ডার কোনোটাই স্থায়ী না। দুটোই সমাজের তৈরি, দুটোই পরিবর্তনশীল।

কুইয়ার থিওরির সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক জুডিথ বাটলার যেমন বলে, জেন্ডার হলো একটা পারফর্মেন্স। নাটকের অভিনেতারা যেমন বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে, তেমনি সমাজে মানুষ নারী বা পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজের প্রথা-প্রচলন আর প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু বেশভূষা, আচার-আচরণ, ভাবভঙ্গি গ্রহণ করে মানুষ। নির্দিষ্ট ধরনের শরীরের মানুষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ প্রত্যাশা করে সমাজ। জেন্ডার গড়ে উঠে এই পোশাক, আচরণ আর ভঙ্গির মতো বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি এবং প্রকাশের মাধ্যমে। জেন্ডার সহজাত না, সামাজিকভাবে নির্মিত। নারী বা পুরুষের ভূমিকায় মানুষ অভিনয় করে।

জুডিথ বাটলারের তত্ত্ব নারী ও পুরুষের মৌলিক ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। তার মতে, দেহ জন্মগতভাবে নির্ধারিত, কিন্তু মানুষের নারী বা পুরুষ পরিচয় সহজাত এবং স্থায়ী কোনো সত্য না। 'নারী' ও 'পুরুষ'-এর ধারণার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই, এটা আমাদেরই তৈরি। দেহ আর জেন্ডার আলাদা, তাই দেহ নারীর হলে তার লিঙ্গ পরিচয়বোধ বা জেন্ডার নারী হবে, দেহ পুরুষের হলে তার জেন্ডার পুরুষ হবে, এমন হওয়াটা জরুরি না। মানুষের জেন্ডার পরিচিতি (জেন্ডার আইডেন্টিটি) তার আচরণের মাধ্যমে তৈরি হয়। তাই আচরণ বদলানোর মাধ্যমে ভিন্ন পরিচয় তৈরি করা সম্ভব।

বাটলারের চিন্তা অনুযায়ী মানুষের পরিচয় অনেকটা 'যেমন খুশি তেমন সাজো' খেলার মতো, যেখানে মানুষ বিভিন্ন পোশাক এবং চরিত্র বেছে নিতে পারে ইচ্ছেমতো। একই অভিনেতা নানা ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, একই মানুষ গ্রহণ করতে পারে নানান জেন্ডারের ভূমিকা।

কুইয়ার থিওরির অন্যান্য তাত্ত্বিকরা এর সাথে যুক্ত করে বৈপ্লবিক আমেজ। তারা বলে, পুঁজিবাদী গোষ্ঠী যেভাবে সর্বহারাকে শোষণ করে, পুরুষ যেমন শোষণ করে নারীকে, ঠিক তেমনিভাবে 'স্বাভাবিক' যৌনতার কথা বলে 'অস্বাভাবিক' (বিকৃত) যৌনতায় লিপ্ত মানুষদের 'শোষণ' করে সমাজ। নারী ও পুরুষের 'গতানুগতিক ধারণা' ব্যবহার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষদের 'শোষণ' করা হয়। যৌনতাকে কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমে বৈষম্য করা হয় সমকামী, উভকামী, পশুকামী, শিশুকামীসহ বিকল্প যৌনতায় আগ্রহী মানুষদের

সাথে। যৌনতার ব্যাপারে ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ কিংবা নৈতিকতার ধারণাগুলো আসলে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক শোষণ ও নির্যাতনের ফসল।

শোষণের এই কাঠামো আর এই সব ধারণা ভেঙ্গে দিতে হবে। এই কাঠামো লঙ্ঘন একটা বৈপ্লবিক কাজ। সমকামিতা কেবল যৌন সুখের সন্ধান না, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বহুগামী নারী হলো আধুনিক বিপ্লবী। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় বিপ্লব হলো নারীপুরুষের বিভেদ মুছে দেওয়া—ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। কারণ, এ মতবাদ সব প্রথা, প্রচলন আর কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। পুরুষ যদি নারী হতে পারে, নারী যদি হতে পারে পুরুষ, তাহলে শোষণের এই পুরো কাঠামোই ধ্বসে পড়ে।

এভাবে কুইয়ার থিওরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে। এ ধারার গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকদের একজন সুসান স্ট্রাইকারের মতে ট্র্যান্সজেন্ডার হওয়া হলো পরিবার, সামাজিক মূল্যবোধ, যৌনতার স্বাভাবিক কাঠামো এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ক্রোধ আর প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ।[৩৪৭]

নারীবাদী তত্ত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতার দর্শন আর পোস্টমডার্নিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে বিভিন্ন যৌন বিকৃতির বৈধতা ও স্বাভাবিকীকরণের অজুহাত তৈরি করে কুইয়ার তত্ত্ব। আর এ তত্ত্বের হাত ধরেই দীর্ঘ চড়াইউতরাইয়ের পথচলা শেষ করে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ পরিণত হয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে।

***

মেরী শেলির বিখ্যাত ফ্র্যাংকেনস্টাইন গল্প এক উচ্চাভিলাষী বিজ্ঞানীকে নিয়ে। যিনি মানুষ আর বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ থেকে সংগ্রহ করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়াতালি দিয়ে এক দানব তৈরি করেছিলেন। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আমাদের সেই গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। যা শুরু হয়েছিল সমাজের প্রান্তসীমায় বসবাস করা নারী সাজতে চাওয়া বিকৃতমনা কিছু পুরুষের 'চিকিৎসা' হিসেবে, কালক্রমে তা পরিণত হয় নানা উৎস থেকে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি বিচিত্র এক দর্শনে। যে দর্শনের একেক অংশ কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো হয়েছে আধুনিক পশ্চিমা চিন্তার একেক ধারা থেকে। যে দর্শন নারী এবং পুরুষের মধ্যেকার সীমারেখা মুছে ফেলার চেষ্টা করে। সৃষ্টি ও সমাজের সব কাঠামো চ্যালেঞ্জ করে। নারী-পুরুষ, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের শ্রেণিবিভাগ গুড়িয়ে দিয়ে তৈরি করতে চায় লিঙ্গহীন, সীমানাবিহীন এবং যৌন শ্রেণিবিহীন সমাজ। যেখানে সব বৈধ, সব স্বাভাবিক। এবং ফ্র্যাংকেনস্টাইন গল্পের দানবের মতো এই দানবও এক সময় সহিংস হয়ে ওঠে।

---

[৩৪৭] Stryker, Susan. "My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix: Performing Transgender Rage." GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 1, no. 3 (1994): 237-254.

অধ্যায় ১৫

আকাশকুসুম তাত্ত্বিকতা

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ কীভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ হয়ে উঠলো, তার দীর্ঘ এবং চমকপ্রদ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটা ছবি আমরা দেখলাম। বিকৃতকামী পুরুষদের ফ্যান্টাসি আর বাতিক হিসেবে, সময়ের পরিক্রমায় হয়ে উঠলো ব্যক্তি এবং পরিচয়ের ব্যাপারে জটিল কিন্তু প্রভাবশালী তত্ত্বে। বিবর্তনের এ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করলো মনোবিদ্যার অপ্রমাণ্য তত্ত্ব, নারীবাদী চিন্তা, উত্তরআধুনিকতাবাদের দর্শন এবং সমকামী আন্দোলনের নিরেট বিকৃত যৌনতা। ধাপে ধাপে তৈরি হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বর্তমান এই চেহারা।

তত্ত্ব

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আজ তার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে চারটি ধারণার মাধ্যমে—

- বায়োলজিকাল সেক্স (Biological Sex) বা দেহ ('জন্মগত লিঙ্গ')
- সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ
- জেন্ডার
- জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ ('মনের লিঙ্গ')

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে এভাবে,

- বায়োলজিকাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গ হলো দেহের বর্ণনা। মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন শরীরের ভেতরের প্রজনন ব্যবস্থা, ক্রোমোসোম, যৌনাঙ্গ, হরমোন ইত্যাদি মিলে তার জন্মগত লিঙ্গ ঠিক হয়। কিছু মানুষের পুরুষাঙ্গ থাকে, কিছু মানুষের যোনী থাকে। কিন্তু কোনো মানুষ নারী নাকি পুরুষ, সেটা তার দেহ বা বায়োলজিকাল সেক্সের ভিত্তিতে ঠিক হয় না।
- সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো মানুষের যৌন রুচি বা আকর্ষণ। পুরুষ হলেই নারীর প্রতি বা নারী হলেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কেউ বিপরীত

লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ আকৃষ্ট হতে পারে উভয়ের প্রতি। আবার কারও মধ্যে হয়তো যৌনতার কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। সর্বপ্রথম কার্ল হাইনরিখ উলরিখস, তারপর কিনসি আর তারপর জন মানির মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের এই ধারণা সমকামিতাসহ যেকোনো বিকৃত [illegible] বৈধতা তৈরিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

- জেন্ডার হলো নারী বা পুরুষ হবার সাথে যুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা। নারী ও পুরুষের কেমন হওয়া উচিত, এ নিয়ে সমাজে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা থাকে। সমাজ ও সংস্কৃতি নারীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আচরণ আশা করে, পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে আলাদা ধরনের আচরণ। এই ধারণা, প্রত্যাশা আর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মানুষের বানানো। জেন্ডার সামাজিকভাবে নির্মিত, সর্বজনীন না। নারী বা পুরুষ হবার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। যে কেউ নিজেকে নারী, পুরুষ, দুটোই, কোনোটাই না, অথবা এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ। জেন্ডার একটি বর্ণালীর মতো।
- জেন্ডার আইডেন্টিটি বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ হলো নিজের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি। কারও দেহ পুরুষের হতে পারে কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে। সে নারীসুলভ নাম ব্যবহার করে, পোশাক পরে ইত্যাদি। নিজেকে নারী মনে হওয়াটা হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি। আর নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করাটা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।
- মানুষ ইচ্ছেমতো নারী, পুরুষ বা অন্য যেকোনো পরিচয় বেছে নিতে পারে। এর সাথে বায়োলজিকাল সেক্স (দেহ) কিংবা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কোনো সম্পর্ক নেই। একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সমাজ ও আইন তাকে সেটাই গণ্য করবে। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গের ওপর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ প্রাধান্য পাবে। তাই পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ 'নারী' হতে পারে, যোনী থাকলেও কেউ পুরুষ হতে পারে।

কথাগুলো শুনতে একটু জটিল মনে হতে পারে। তবে বিভিন্ন পরিভাষার আড়ালে মূল বক্তব্য সেই একই, মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার অনুভূতির ওপর। দেহ যাই হোক, নিজেকে সে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। একইভাবে মানুষ কার সাথে যৌন সম্পর্ক করবে, তাও নির্ভর করবে মনের ওপর। এখানে ভালো-মন্দের কিছু নেই।

প্রয়োগ

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ধারণাগুলো বাস্তবে কীভাবে ব্যবহার হয় তার উদাহরণ দেখা যাক। ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট জুলিয়া সেরানো একজন নারী সাজা পুরুষ। সেরানো নিজেকে একজন নারীবাদী দাবি করে এবং নারীবাদী মতাদর্শের আলোকে লেখালেখি করে।

২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় সেরানোর বই 'হুইপিং গার্ল'। অনেকে এ বইকে আখ্যায়িত করে উত্তর-আধুনিক 'নারীবাদী ক্ল্যাসিক' হিসেবে। কিন্তু আপত্তি করে বসে অন্য নারীবাদীরা। তারা বলে, একজন পুরুষ—যার দেহ পুরুষের, যৌনাঙ্গ পুরুষের—সে কীভাবে নারী হিসেবে লেখে? নারী হবার অর্থ সে কী বোঝে? নারীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও শোষণকেই-বা কীভাবে সে অনুভব করে? ধারণ করে? তারা বলে, সেরানো কেবল নারী সেজে বসেনি; বরং নারীর হয়ে কথা বলতেও শুরু করেছে। এটা নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণের আরেকটা উদাহরণ।

বিরোধীদের জবাবে সেরানো বলে, পুরুষাঙ্গ থাকলেও নারীত্বের দিক থেকে সে কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। তার ভাষায়,

> তারা (সমালোচকরা) নারীদেহে জন্ম নিয়েছে এবং সামাজিকভাবে নারী হিসেবে বেড়ে উঠেছে দেখে ট্রান্স নারীদের (পড়ুন, নারী সাজা পুরুষদের) চেয়ে 'নারীত্ব'-কে ভালোভাবে বোঝে—এই দাবি হাস্যকর ধরনের সরলতা এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ...আমার মন, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার শরীরের বাকি অংশের মাঝে নারীত্ব আছে। কিন্তু এ সবকিছু ছাপিয়ে স্রেফ আমার পুরুষাঙ্গ থাকাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে, এটাকে লিঙ্গকেন্দ্রিকতা (phallocentric) ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।[৩৪৮]

সোরানো আরও বলে, 'আমি নিজেকে পুরুষ থেকে নারী হওয়া ট্রান্সজেন্ডার বলে পরিচয় দিই না। নারী বলেই পরিচয় দিই'।[৩৪৯] তার কাছে 'ট্রান্স নারী' মানে নারীই। 'ট্রান্স' স্রেফ একটা বিশেষণ। আমরা যেমন বলি খ্রিষ্টান নারী, ইহুদি নারী, ভারতীয় নারী, এশীয় নারী, তেমনই আরেকটা পরিচয় 'ট্রান্স নারী'।[৩৫০]

সেরানোর কথাগুলো খেয়াল করুন, তার পুরুষাঙ্গ আছে তাও সে নারী। 'রূপান্তরিত' বা 'লিঙ্গ পরিবর্তিত' নারী না, বরং ১০০% খাটি নারী। কারণ নারীত্ব হলো মনের ব্যাপার, অনুভূতির ব্যাপারে নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ার ব্যাপার। এর সাথে দেহের সম্পর্ক নেই। জুলিয়া সেরানোর মতো নারী সাজা নারীবাদী পুরুষরা

---

[৩৪৮] Julia Serano, Whipping Girl (Berkeley, CA: Seal Press, 2007), 227, 239.
[৩৪৯] Ibid, 30.
[৩৫০] Ibid, 29.

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের তত্ত্বের বাস্তব উদাহরণ।

অনেক নারীবাদী সেরানোর কথার সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। কারণ, জেন্ডার ও জেন্ডার আইডেন্টিটির যেসব তত্ত্ব ব্যবহার করে সেরানো এই উপসংহারে এসেছে, এতদিন ওগুলোই জপ করে এসেছে নারীবাদীরা।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের নানা ফাঁকফোকর

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্যে যে ব্যাপক মাত্রা জোচ্চুরি আছে, এটা কমবেশি সবাই মোটামুটি বুঝতে পারেন। পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করলেই সেটা মেনে নিতে হবে, কমনসেন্সের জায়গা থেকেই মানুষ এটার বিরোধিতা করে। তবে ট্র্যান্সজেন্ডার সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব শোনার পর অনেকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। যারা এমন সমস্যায় পড়েন, এ তত্ত্বগুলোর কিছু ফাঁকফোঁকর সংক্ষেপে জেনে নেওয়া তাদের কাজে লাগতে পারে।

বিচ্ছিন্ন না কি সম্পৃক্ত?

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং বৃহত্তর এলজিবিটি আন্দোলন মূলত যে কাজটা করছে তা হলো, তারা দেহ থেকে যৌনতা এবং পরিচয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সমকামী আন্দোলন বলছে, দেহ যাই হোক মানুষ যে-কারও সাথে যৌন সম্পর্ক করতে পারবে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলছে, দেহ যাই হোক মানুষ নারী বা পুরুষ পরিচয় বেছে নেবে ইচ্ছেমতো। তাদের পুরো অবস্থান দাঁড়িয়ে আছে এই বিভাজনগুলোর ওপর।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই পুরো শ্রেণিবিভাগটাই বানোয়াট। দেহ, যৌনতা, পরিচয় এবং প্রকাশ—আলাদা আলাদা কিছু না। বরং পরস্পর সম্পৃক্ত। একটা আরেকটার ওপর নির্ভরশীল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পরিচয় হয় না। মানুষ এ দুনিয়াতে অস্তিত্বমান হয় তার দেহের মধ্য দিয়ে। পার্থিব জীবনের স্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করে মানুষের দেহ। মানুষের মন তার দেহের ওপরে বিচ্ছিন্ন কিংবা স্বাধীনভাবে ঘুরপাক খায় না।

মাদকের কথা চিন্তা করুন। মানুষ নেশা করে মনের আনন্দের জন্য। টিমোথি লিয়েরি আর অ্যালডাক্স হাক্সলির মতো মাদকপ্রেমীদের মতে এলএসডি'র মতো মাদক ব্যবহার করলে নাকি মনের দরজা খুলে যায়, মানুষ প্রবেশ করে উপলব্ধির নতুন জগতে। দেশী ভাষায় বলে, নেশা করলে 'পিনিক' লাগে। এসব বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা আপাতত সরিয়ে রেখে অন্য একটা প্রশ্ন করা যাক। এই মাদক ব্যবহার হয় কীভাবে? মাদক কি সরাসরি মনের মধ্যে নেওয়া হয়? না কি শরীরে নেওয়া হয়?

মাদক নেওয়া হয় শরীরে। দেহের ভেতরে মাদক ঢোকার পর নিরেট যান্ত্রিক একটা

প্রক্রিয়া শুরু হয়। রক্তের মধ্যে মিশে মাদক পৌঁছে যায় মস্তিকে। আমাদের মস্তিকের কোষগুলো প্রতিনিয়ত একে অপরের সাথে কথা বলে। মস্তিকের কোষগুলোর এই 'কথোপকথন'-এর ধরন বদলে দেয় মাদক। ডোপামিন, সেরাটনিন এবং এন্ডোরফিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারগুলোর প্রভাব বাড়ায়, কমায়, অথবা অনুকরণ করতে শুরু করে। ফলে আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয় চরম আনন্দ, উত্তেজনা, সুখ কিংবা দুঃখের অনুভূতি। একটা আগাগোড়া শারীরিক প্রক্রিয়া আমাদের আবেগ-অনুভূতি আর 'মনে হওয়া'কে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। 'পিনিক' তৈরি করে। হাক্সলির ভাষায় 'উপলব্ধির নতুন দরজা' খুলে দেয়।

মন দেহের ওপর নির্ভরশীল। মন দেহ দ্বারা প্রভাবিত।

মাদকদ্রব্য থেকে বের হয়ে অন্য এক মাদকতার দিকে তাকানো যাক। বলুন তো, দেহকে সমীকরণ থেকে বাদ দিলে জীবনানন্দরা কি বনলতা সেনদের নিয়ে কবিতা লিখত? ট্রয়ের হেলেনকে নিয়ে কি রচিত হতো মহাযুদ্ধ কিংবা মহাকাব্য? রোমিও কি জুলিয়েটের প্রেমে পড়ত? না কি খালি থেকে যেত পৃথিবীর সব কবিতার খাতা, শূন্য রয়ে যেত মানবজাতির বিশাল গল্পের ভান্ডার? উত্তরটা সবার জানা।

মানুষ তার দেহ থেকে আলাদা না। দেহ, মন, রূহ, নাফস নিয়েই মানুষ। ব্যাপারটা এমন না যে, দেহ একটা গাড়ি আর মন হলো সেই গাড়ির চালক। দেহ আর পরিচয়কে আলাদা করা যায় না। আলাদা করা যায় না দেহ আর যৌনতাকেও।

দেহ থেকে নারী-পুরুষের পরিচয় আলাদা করার এই হাস্যকর কসরত করা হয়েছে নারীবাদের মতাদর্শের প্রভাবে এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃত আচরণের বৈধতা দেওয়ার জন্য। নারীবাদ স্বাধীনতার নামে মাতৃত্ব, পরিবার এবং দেহকে অতিক্রম করতে চায়। ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং সমকামী আন্দোলন মুছে ফেলতে চায় দেহ ও যৌনতার সীমানা। নিরেট বাস্তবতাকে তারা বদলে দিতে চায়।

দেহ পুরুষের, মন নারীর—এসব বাস্তবতা বিবর্জিত কথা। নারীত্ব ও পুরুষত্ব নারী ও পুরুষের দেহ থেকে পৃথক কিছু না। নারীদেহের বাইরে নারীত্বের আলাদা, বিমূর্ত, স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। যেমন পুরুষদেহের বাইরে অস্তিত্ব নেই বিমূর্ত ও স্বতন্ত্র কোনো পুরুষত্বের। এই সত্যগুলো সব সমাজ ও সভ্যতায় স্পষ্ট। দিন ও রাতের আবর্তনের মতো চিরাচরিত ব্যাপার।

সামাজিকভাবে নির্মিত?

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রধান স্তম্ভ হলো 'জেন্ডার' এর ধারণা। দেহ সহজাত কিন্তু জেন্ডার সামাজিকভাবে নির্মিত, এই বুলি মন্ত্রের মতো জপ করে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সমর্থকরা। কালের পরিক্রমায় কীভাবে তারা এ উপসংহারে পৌঁছলো, তা নিয়ে আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা। সংক্ষেপে তাদের মূল বক্তব্য

হলো,

> নাটকের অভিনেতারা যেমন বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে, তেমনি সমাজে মানুষ নারী বা পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট ধরনের শরীরের মানুষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ প্রত্যাশা করে সমাজ। জেন্ডার গড়ে উঠে পোশাক, আচরণ, ভঙ্গির মতো বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি এবং প্রকাশের মাধ্যমে। জেন্ডার সহজাত না, সামাজিকভাবে নির্মিত। জেন্ডার হলো একটা পারফর্মেন্স।

এই বক্তব্যের মধ্যে অল্প কিছু সত্যতা আছে। সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে নারী ও পুরুষের কিছু কিছু ভূমিকা ভিন্ন হয়। পুরুষত্বের অ্যামেরিকান ধারণা কিছু দিক পুরুষত্বের আরবীয় কিংবা চাইনিজ ধারণার সাথে মিলবে না। যেমন, পুরুষ মানুষ সবার সামনে কাঁদলে পশ্চিমা সমাজে সেটাকে দুর্বলতার চিহ্ন মনে করা হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের কান্না স্বাভাবিক বিষয়। নবী ﷺ থেকে শুরু করে সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আখিরাতের কথা বলতে গিয়ে, কিংবা শহীদ হওয়া মুসলিমদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্না করেছেন। মিম্বারে খুতবা দেওয়ার সময় চোখের পানিতে তাঁদের কাপড় ভিজে গেছে, এমন অনেক উদাহরণ আছে। শুধু তাই না, পুরুষত্ব ও সাহসের সর্বোচ্চ যে পরীক্ষা, সেই জিহাদের ময়দানেও প্রতিপক্ষের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা মুসলিম কমান্ডার যুদ্ধের আগে সৈন্যদের সামনে নিয়ে দুআ করতে গিয়ে কাঁদছেন—এটা মুসলিম ইতিহাসে স্বাভাবিক ব্যাপার। আখিরাতের কথা চিন্তা করে কান্না করাকে ইসলামী সংস্কৃতিতে দুর্বলতার সাথে যুক্ত করা হয় না।

কাজেই পুরুষ বা নারীর প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে, তা নিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে কিছু কিছু পার্থক্য হয়। একথা সত্য। কিন্তু এখানে 'কিছু কিছু' শব্দ দুটো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এমন পার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম এবং সেগুলো গৌণ বিষয়ে। অন্যদিকে নারী-পুরুষের মৌলিক ভূমিকার ক্ষেত্রে মিলগুলো বেশি এবং সেগুলো মৌলিক বিষয়ে। নারী ও পুরুষের সংজ্ঞা বা ধারণাও মোটাদাগে এক।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা ছাড়া আর কেউই বলে না যে, একজন পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে পারে।[৩৫১] কোনো সমাজ বলে না, পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ নারী হতে পারে। সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব নারীর, এ কথা অস্বীকার করে না কেউ। ঘরে আগুন লাগলে, জাহাজ ডুবতে শুরু করলে আগে নারী ও শিশুদের বাঁচাতে হবে। গভীর অন্ধকার রাতে দরজায় হিংস্র আঘাতের শব্দ এলে পুরুষকেই এগিয়ে যেতে হবে—এ কথাগুলো অস্বীকার করে না কোনো সমাজ। এবং কোনো সমাজই দেহ থেকে

[৩৫১] কেউ এখানে কিছু কিছু লোককথা কিংবা পৌরানিক কাহিনিতে থাকা আন্তঃলিঙ্গ বা নারী পুরুষের মিশ্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত পুরুষের কথা বলতে পারেন। তবে এসব বর্ণনাতেও এমন ঘটনাকে ব্যতিক্রম বা অতিপ্রাকৃত কিছু হিসেবেই দেখানো হয়। মানবজাতি যে নারী ও পুরুষে বিভক্ত, প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতি এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে।

পরিচয় ও যৌনতাকে বিচ্ছিন্ন করে না, যেভাবে আধুনিক পশ্চিমা দর্শন করেছে। এই সর্বজনীন প্রত্যাশা ও ভূমিকাগুলো হাওয়ার ওপর তৈরি হয়নি। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক দেহ, সক্ষমতা এবং মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতেই যৌক্তিকভাবে এসেছে।

বাস্তবতার জ্ঞানও নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র দৈহিক পরিচয় ও পৃথক সামাজিক ভূমিকার প্রমাণ দেয়। নারীপুরুষের মস্তিক এবং হরমোনাল গঠন আলাদা, যা তাদের আচরণ এবং মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।[৩৫২] নারীপুরুষের আচরণের ওপর শারীরিক গঠনের প্রভাবকে অস্বীকার করার অর্থ সাইকোলজি এবং অ্যানাটমির ব্যাপারে আমরা যা কিছু জানি, তারা প্রায় সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা।

প্রাণিজগতেও আমরা দুটি লিঙ্গ দেখি, নারী ও পুরুষ। তাদের মধ্যেও ভূমিকার ফারাক দেখা যায়। নারী ও পুরুষের পরিচয় ও ভূমিকা যদি সামাজিকভাবেই নির্মিত হয়, তাহলে পশুদের মধ্যেও কেন আমরা নারী ও পুরুষের আলাদা ভূমিকা দেখি? পশুরাও কি 'সামাজিকভাবে' এসব 'জেন্ডার রোল' তৈরি করেছে?

সমাজভেদে নারী ও পুরুষের ব্যাপারে সামাজিক প্রত্যাশায় কিছু পার্থক্য হয়, এই অবস্থান থেকে তাই কোনোভাবেই এই উপসংহার টানা যায় না যে, 'নারী বা পুরুষের ধারণাগুলো সমাজের তৈরি, সহজাত কিছু না, তাই যে কেউ ইচ্ছেমতো যেকোনো ভূমিকা বেছে নিতে পারে।' এ ধরনের চিন্তাধারাকে তিলকে তাল বানানোর প্রবণতার ভালো উদাহরণ বলা যায়।

অসংলগ্নতা

আমরা যদি জুডিথ বাটলারদের মতো তাত্ত্বিকদের কথা মেনেও নিই, তাহলেও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের জন্য সমস্যা তৈরি হয়। বাটলাররা বলছে, জেন্ডার হলো পারফর্ম্যান্স, অভিনয়ের মতো। মানুষের জেন্ডার পরিচিতি (জেন্ডার আইডেন্টিটি) তার আচরণের মাধ্যমে তৈরি হয়। তাই আচরণ বদলানোর মাধ্যমে ভিন্ন পরিচয় তৈরি করা সম্ভব।

অর্থাৎ মানুষ স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে তার পরিচয় (নারী বা পুরুষ) বেছে নেয়। যদি তাই হয়, তাহলে সহজাত পরিচয়ের দাবিটা করা যায় না। যেই জিনিস মানুষ স্বেচ্ছায় বেছে নিচ্ছে, সেটা আবার জন্মগত হয় কীভাবে? কোনো বিষয় একইসাথে ঐচ্ছিক, আবার সহজাত হয় না। যেকোনো একটা হতে হবে।

পরিচয় যদি বেছে নেওয়ার বিষয় হয় তাহলে বলা যাবে না যে, 'আমি পুরুষ দেহে আটকা পড়া নারী'; বরং তখন বলতে হবে, 'আমার দেহ পুরুষের কিন্তু আমি নারী

---

[৩৫২] McEwen, Bruce S., and Teresa A. Milner. "Understanding the broad influence of sex hormones and sex differences in the brain." Journal of neuroscience research 95, no. 1-2 (2017): 24-39. NIH. Sex differences in brain anatomy. 2020. https://tinyurl.com/3j7v3u6r

হতে চাই'। আর সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে—শারীরিকভাবে সুস্থ কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারীর ভূমিকা বেছে নিতে চাচ্ছে; এই চাওয়া কি যথাযথ? এই চাওয়া কি সমাজের মেনে নেওয়া উচিৎ? সমাজ যদি মেনে নেয়-ও, সেক্ষেত্রে ব্যক্তির চাওয়ার জন্য সমাজ কি বাকি সবার জন্য বিধিবিধান বদলাবে?

বাস্তবতা হলো, দেহ আর জেন্ডারের এই বিভাজন—দেহ থেকে আলাদা জেন্ডারের যে ধারণা—সেটাই আসলে সামাজিকভাবে নির্মিত। এটা আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের দিকভ্রান্ত দর্শন আর লাগামছাড়া তাত্ত্বিকতার তৈরি এক অতিরঞ্জিত, অবাস্তব ধারণা।

নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যাশার ভিন্নতা থাকে। কিন্তু এই সামাজিক প্রত্যাশা থাকার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণকে ব্যক্তির পরিচয়ের ব্যাপারে তত্ত্ব বানিয়ে ফেলা, তারপর পরিচয়কে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনভাবে ভেসে বেড়ানো একটা বস্তুতে পরিণত করা যৌক্তিকভাবে অসংলগ্ন। তথ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন। শব্দ, কল্পনা আর তাত্ত্বিকতার জগাখিচুড়ি।

পরস্পরবিরোধিতা

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পরতে পরতে আছে পরস্পরবিরোধিতা। কেউ যখন নিজেকে ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করে, তখন তারা কী বলে লক্ষ্য করুন। বেশিরভাগ সময় দেখবেন, কোনো পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করার সময় বলছে,

> ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। আমার মেয়েদের পোশাক পরতে ইচ্ছে করত, মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে করত। পুতুল আর রান্নাবাটি খেলতে ভালো লাগত। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম আমি। একসময় বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলের হলেও মনে মনে আমি একজন মেয়ে...

অর্থাৎ মেয়েদের পোশাক পরা, মেয়েদের মতো সাজা, পুতুল খেলা, রান্নাবাটি—এগুলোকে নারীত্বের প্রমাণ ধরা হচ্ছে। কিন্তু নারী মানেই পুতুল খেলা, নারী মানেই সাজগোজ কিংবা রান্না করা—এগুলো না সমাজের গৎবাঁধা চাপিয়ে দেওয়া চিন্তাভাবনা? মানুষের বানানো প্রত্যাশা? জেন্ডার তত্ত্বই না বললো, নারী ও পুরুষের বাঁধাধরা কোনো সংজ্ঞা নেই, নির্দিষ্ট কোনো ভূমিকা নেই। সমাজ নিজের ইচ্ছেমতো নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়? তাহলে আবার এ বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েই নারীত্বকে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে?

ছেলেশিশুও তো রান্নাবাটি কিংবা পুতুল খেলতে পারে। এজন্য তাকে নারী ধরে নিতে হবে কেন? কোনো নারীর যদি রান্না করতে কিংবা সাজতে ভালো না লাগে, তাহলে তাকে আর নারী বলা যাবে না? ব্যাপারটা সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেকে নারী বা পুরুষ প্রমাণ করা হয়ে গেল না?

'মনে মনে' মনে হওয়া

কেউ হয়তো বলতে পারেন, ঠিক আছে পুতুল খেলা, সাজগোজ এসব বাদ দিলাম। কিন্তু এখানে তো আরেকটা ব্যাপার আছে। সে বলছে। 'মনে মনে সে একজন মেয়ে'। সে নিজেকে 'পুরুষের দেহে আটকা পড়া নারী' বলছে। এই অনুভূতির ভিত্তিতে সমাজ কি তাকে নারী হিসেবে মেনে নিতে পারে না?

না, পারে না। কারণ, এ অবস্থাও অসংলগ্ন। আপনি একবার বলবেন নারীত্বের ধারণা সামাজিকভাবে তৈরি, তারপর বলবেন সে ভেতরে ভেতরে নিজেকে 'নারী' মনে করে—এটা তো হয় না। সে ভেতরে ভেতরে তাহলে নিজেকে কী মনে করছে? নারীত্বের যে ধারণা সমাজ তৈরি করেছে, সেটাই সে নিজের ব্যাপারে ভাবছে? যদি তাই হয়, তাহলে সেটা সহজাত পরিচয় কীভাবে হলো?

কোনো কিছু যদি সমাজের বানানো হয়, তাহলে অবধারিতভাবেই সেটা মানুষের 'অভ্যন্তরীণ' কিংবা 'অন্তর্নিহিত' সহজাত আত্মপরিচয় হতে পারে না। দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক।

পরিচয়ের এই ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত না। এর সরাসরি প্রভাব আছে পুরো সমাজের ওপর। একজন মানুষ তার বাসার ভেতরে নারী, পুরুষ, কুকুর বিড়াল—নিজেকে যা ইচ্ছে তাই পরিচয় দিতে পারে। যেকোনো পোশাক পরতে পারে। যতক্ষণ সে ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে নিজে নিজে এসব করছে, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু সে যখন বাসার বাইরে এসে জনপরিসরে একটা দাবি তুলবে, তখন সেটা পরিণত হবে পুরো সমাজের স্বার্থের প্রশ্নে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবিগুলো লক্ষ্য করুন। তাদের দাবিগুলো সমাজ আর রাষ্ট্রের বিধিবিধান নিয়ে। তারা চায় নারী সাজা পুরুষকে সমাজ নারী হিসেবে মেনে নিক। আইন তাদেরকে নারী হিসেবে গণ্য করুক। মানুষ তাদের নারী হিসেবে সম্বোধন করুক। নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে ঢুকতে দেওয়া হোক তাদের।

অর্থাৎ তারা নিজেদের যেভাবে পরিচয় দিচ্ছে, সেভাবেই সবার মেনে নিতে হবে। আর তাদের পরিচয়ের ভিত্তি হলো 'মনে মনে' মনে হওয়া। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা 'মনে হওয়া'র ওপর ছেড়ে দেওয়া হলে যে কেউ যেকোনো পরিচয় দাবি করতে পারবে।

এমন লোক আছে যারা মনে করে তারা ভুল প্রজাতির দেহে আটকা পড়েছে। তারা আসলে মানুষ না, অন্য কোনো প্রাণী।[৩৫৩] ব্রিটেনের এক লোক, নাম টেড

---

[৩৫৩] Otherkin, Wikipedia Entry - https://en.wikipedia.org/wiki/Otherkin
Laycock, Joseph P. ""We Are Spirits of Another Sort" Ontological Rebellion and Religious Dimensions of the Otherkin Community." Nova Religio: The Journal of Alternative and

রিচার্ডসন, নিজেকে টিয়াপাখি মনে করে। নিজেকে টিয়াপাখির মতো করতে সে মুখে পালকের ট্যাটু করিয়েছে, কান কেটে ফেলেছে, নিজের ঘরকে বানিয়েছে পাখির খাচার মতো। নিয়মিত পাখির খাবার খাচ্ছে।[৩৫৪] টেডকে কি আমরা টিয়া পাখি হিসেবে মেনে নেবো?

২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে জার্মানির বার্লিনের এক অনুষ্ঠানে এক হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছিল, যারা নিজেদের কুকুর হিসেবে পরিচয় দেয়।[৩৫৫] আইনি ও সামাজিকভাবে কি তাদের কুকুর হিসেবে গণ্য করা উচিত?

ওলি লন্ডন নামে ব্রিটেনের এক লোক আছে, যে নিজেকে কোরিয়ান মনে করে। এই লোক কে-পপ ব্যান্ডগুলোর চরম ফ্যান। তার দাবি হলো, সে আসলে শ্বেতাঙ্গ দেহে আটকা পড়া একজন কোরিয়ান। নিজের এই মনে হওয়াকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য ওলি লন্ডন ১৮টা সার্জারি করেছে। চোখ, চোয়ালের গঠন, চুল, চামড়ার রঙ, সবকিছু বদলে নিয়েছে কে-পপ স্টারদের আদলে। বেশ অনেকগুলো অপারেশনের পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ওলি লন্ডন বলেছে–

> শেষ পর্যন্ত আমি খুশি। আমি অনেক খুশি। আট বছর ধরে আমি ভুল শরীরে আটকা পড়ে আছি। আপনি যখন নিজেকে বন্দি হিসেবে আবিষ্কার করবেন, যখন মনে হবে সত্যিকার অর্থে আপনি নিজের মতো হতে পারছেন না, পৃথিবীতে তখন এরচেয়ে খারাপ আর কোনো অনুভূতি হয় না।[৩৫৬]

কোরিয়ানদের কি বলা হবে, ওলি লন্ডনকে একজন কোরিয়ান হিসেবে মেনে নিতে? কোরিয়ার নাগরিকত্ব দিতে?

প্রত্যেক ক্ষেত্রে উত্তর হলো, না। টেড, ওলি লন্ডন এবং নিজেদের কুকুর মনে করা এই মানুষগুলো মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত। তাদের এই বিকারের সমাধান করা উচিত। কিন্তু তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পুরো সমাজকে বিভ্রান্তি মেনে নিতে বলা যায় না।

স্কিৎযোফ্রেনিয়া নামে একটা জটিল রোগ আছে। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ

Emergent Religions 15, no. 3 (2012): 65-90. Read, Max. "From Otherkin to Transethnicity: Your Field Guide to the Weird World of Tumblr Identity Politics." Gawker. September 6 (2012): 2012.

[৩৫৪] Parrot man' who chopped off his own ears to morph into a bird confesses he wants a BEAK, The Mirror. November, 2015. https://tinyurl.com/3eww2w6r

[৩৫৫] Hundreds of people who identify as dogs gather in city center: 'Call animal control'. New York Post, September 2023. https://tinyurl.com/ywdpytdu

[৩৫৬] 'I'm finally Korean': British influencer Oli London is blasted for saying they now identify as 'transracial' after having eye surgery following 18 surgeries to look like a K-pop star. The Daily Mail. June, 2021. https://tinyurl.com/37j3f6df

এমন কিছু দেখে বা শুনতে পায়, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এ ধরনের রোগীদের হ্যালুসিনেশন হয়। মনে করুন, এমন এক রোগী দেখছে রাস্তার মাঝখানে বিশাল একটা মানুষখেকো বাঘ বসে আছে। সে চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে বলছে রাস্তা থেকে সরে যেতে। এখন চিকিৎসার নামে আমরা কি পুরো সমাজকে বলবো এই কাল্পনিক বাঘের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার ভান করতে? রাস্তায় চলা গাড়িগুলোর চালকদের কি বলা হবে, রাস্তায় বাঘ আছে ধরে নিয়ে গাড়ি চালাতে? এটাই তখন আইন হবে? কারণ স্কিৎযোফ্রেনিয়া রোগীদের 'অধিকার দিতে হবে'?

এই অদ্ভুত আবদারটাই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ করছে। নারী সাজা পুরুষকে নারী বলে মেনে নিতে হবে। সে নারীদের হোস্টেলে থাকবে, নারীদের টয়লেট ব্যবহার করবে। তাদের নারী হিসেবে সম্বোধন করতে হবে, আইনিভাবে নারী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। নানা আবদার।

কেন? কারণ তাদের 'মনে হয়'!

অল্প কিছু মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত কিংবা মানসিক বিকারের জন্য পুরো সমাজকে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আইন পাল্টাতে বলার অর্থ বিভ্রান্তি ও বিকৃতির স্বীকৃতি দেওয়া। মনে মনে নিজেকে নারী বা পুরুষ ভাবাকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত বলুন অথবা মানসিক বিকার বলুন, উপসংহার একই দাঁড়ায়।

শব্দকল্পদ্রুম

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের তত্ত্ব নিয়ে পুরো আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হলো সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টশন, জেন্ডার এবং জেন্ডার আইডেন্টিটির মতো ধারণাগুলো নিছক কিছু তত্ত্ব আর মতাদর্শিক অবস্থানের মিশেল। এগুলো মানুষের বানানো কিছু ব্যাখ্যা, প্রশ্নাতীত কোনো বাস্তবতা না।

অনুমান, তত্ত্ব আর বাস্তবতার মধ্যে ফারাক আছে প্রচুর। কোনো তত্ত্ব হাজির করলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। নিরেট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া গৃহীত হয় না। কেবল প্রমাণ থাকলেও আসলে হয় না। অনেক সময় ভুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পক্ষেও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি মনে করতেন, পৃথিবী স্থির এবং সৌর জগতের কেন্দ্র। তার এই মডেলের পক্ষে প্রমাণ ছিল। এই মডেল ব্যবহার করে গ্রহগুলোর অবস্থানের ব্যাপারে মোটামুটি সঠিকভাবে পূর্বাভাস করা যেত। শত শত বছর ধরে এ মডেলকে সত্য ধরে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগও করেছিল মানুষ। সমুদ্রযাত্রার সময় এই মডেল অনুযায়ী গ্রহ এবং সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করতেন

নাবিকরা, অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণ করতেন ঠিকঠাকভাবে।[৩৫৭] কিন্তু আপাতভাবে প্রমাণ থাকার পরও, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও আজ একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, টলেমির তত্ত্ব ভুল ছিল।[৩৫৮]

আর সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত তত্ত্বগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্রেফ তাত্ত্বিকতাই, এগুলোর পক্ষে বলার মতো তেমন কোনো প্রমাণ থাকে না। ঘুরানোপ্যাঁচানো কিছু ব্যাখ্যা থাকে কেবল। সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণার ফলাফলের পুনরাবৃত্তি (replicate) করা যায় না। আর পুনরাবৃত্তি করা না গেলে সেই ফলাফল এবং তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হয় না। পুনরাবৃত্তির এই সংকট (Replication Crisis) নিয়ে খোদ পশ্চিমা অ্যাকাডেমিক জগতেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে দিন দিন। এ সংকট সাইকোলজি, মেডিসিন এবং একোনমিক্সের মতো শাস্ত্রগুলোতে বেশি হলেও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান, এমনকি হার্ড সাইন্স (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরবিদ্যা)-ও এ থেকে মুক্ত না।[৩৫৯]

তাছাড়া নারীবাদী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত জেন্ডার স্টাডিস, আর পোস্টমডার্ন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত কুইয়ার থিওরি থেকে আসা উপসংহারগুলো সত্যিকার অর্থে তত্ত্বের পর্যায়েও পৌঁছায় না। এগুলো স্রেফ কিছু মতাদর্শিক বিশ্বাস আর উপসংহার। যেগুলো প্রমাণ করা যায় না, যাচাই করা যায় না, বিচারও করা যায় না।

অল্প কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে বিশাল কোনো উপসংহার টেনে ফেলা, তারপর সেটাকে সর্বজনীন বলে দাবি করা, বাস্তবতার সাথে তত্ত্বকে মেলানোর বদলে তত্ত্বের আদলে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা—এগুলো পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের পুরোনো সমস্যা। আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানে চরম ধরনের কনফার্মেশন বায়াস কাজ করে। তারা বেছে বেছে ঐ তথ্য-উপাত্তগুলো গ্রহণ করে, যেগুলো তাদের অবস্থানকে সমর্থন করে। অন্য তথ্য-উপাত্ত অগ্রাহ্য করে। পশ্চিমা সমাজের একটা নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থেকে বেছে বেছে কিছু বিষয় নিয়ে তার আলোকে অতিরঞ্জিত সব উপসংহার টানে, তারপর সেটা চাপিয়ে দেয় পুরো মানবজাতির পুরো ইতিহাসের ওপর।

---

[৩৫৭] Britannica. Ptolemaic system. https://tinyurl.com/44zsbpyx

[৩৫৮] বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে অসাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন, Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions. University of Chicago press, 2012. আগ্রহীদের জন্য অবশ্য-পাঠ্য।

[৩৫৯] Wiggins, Bradford J., and Cody D. Christopherson. "The replication crisis in psychology: An overview for theoretical and philosophical psychology." Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 39, no. 4 (2019): 202. Dreber, Anna, and Magnus Johannesson. "Statistical significance and the replication crisis in the social sciences." In Oxford research encyclopedia of economics and finance. 2019. Bohannon, John. "About 40% of economics experiments fail replication survey." Science 3 (2016). Baker, Monya. "1,500 scientists lift the lid on reproducibility." Nature 533, no. 7604 (2016).

আর এ প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য পরিচয় ও যৌনতা সম্পর্কিত এই তত্ত্ব ও ধারণাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। মোদ্দাকথা হলো, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের তত্ত্বের জাল আপাতভাবে খুব জটিল এবং সূক্ষ্ম মনে হলেও, আদতে এগুলো বাস্তবতাবিবর্জিত আকাশকুসুম তাত্ত্বিকতা। পণ্ডিতির মোড়কে ছাইপাশ উপস্থাপন করা হলেও, তা ছাইপাশই থাকে।

***

নিরেট বাস্তবতা হলো, নারী বা পুরুষ পরিচয় মহাজাগতিকভাবে নির্ধারিত, আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ হলো সামাজিকভাবে নির্মিত। পশ্চিমা সভ্যতা তার অবক্ষয় ও অধঃপতনের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভিন্ন প্রভাবকের মিথস্ক্রিয়ার এই বিচিত্র মতবাদ তৈরি করেছে। পশ্চিমা 'চিন্তাবিদরা' নিজের তৈরি নানা তত্ত্বের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। বাস্তবতার আলোকে তত্ত্ব তৈরির বদলে তত্ত্বের আদলে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। আর বাস্তবতা যখন তত্ত্বের সাথে মিলছে না, তখন অস্বীকার করে বসছে বাস্তবতাকেই। আর বরাবরের মতোই পশ্চিমা বিশ্ব তার নিজস্ব বিদঘুটে চিন্তাভাবনাকে চিরন্তন, সর্বজনীন সত্য হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছে পুরো বিশ্বের ওপর।

গ্রিক পুরাণে নার্সিসাস নামে এক তরুণের গল্প আছে। নার্সিসাস তার নিজের প্রতিবিম্বের প্রেমে পড়ে। দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকে পানিতে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে। চোখ সরাতে পারে না। ছুঁতে পারে না। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই মিলিয়ে যায় পানিতে ভেসে ওঠা মুখ। নিজের সৌন্দর্যের প্রেমে পাগল হয়ে একসময় বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে নার্সিসাস। পানি, খাবার, বিশ্রাম সব ভুলে একদৃষ্টিতে সে কেবল তাকিয়ে থাকে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যুমুখে পৌঁছে যায়। এই নার্সিসাসের নাম থেকেই নার্সিসিসম (narcissism) শব্দটা এসেছে, যার অর্থ তীব্র ও গভীর আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মমুগ্ধতা এবং আত্মপ্রেম। ট্যান্সজেন্ডারবাদকে পশ্চিমা চিন্তার আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মমুগ্ধতা আর আত্মপ্রেমের আদর্শ উদাহরণ বলা যায়।

অধ্যায় ১৬

বিষচক্র

সমকামী আন্দোলন আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মধ্যে বেশ অনেকগুলো মিল দেখা যায়। দুটোরই শেকড় জার্মানিতে। দুটোরই উত্থান বার্লিনে, কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের চিন্তা আর ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের অ্যাকটিভিসম থেকে। দুটোই জার্মানি থেকে স্থানান্তরিত হয় অ্যামেরিকাতে, দৃশ্যপটে আসে পঞ্চাশের দশকে শুরুতে। তবে এই মিলগুলোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু অমিলও আছে। একই বিন্দু থেকে শুরু হলেও দুটোর গতিপথ ভিন্ন।

সমকামী আন্দোলনের ইতিহাসটাকে অনেকটা সরলরৈখিক বলা যায়। দশক থেকে দশকে এই আন্দোলনে এক ধরনের ধারাবাহিকতা আমাদের চোখে পড়ে। ধাপে ধাপে এ আন্দোলন তার গন্তব্যে পৌঁছে। অ্যামেরিকাসহ পুরো পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতা বৈধতা পায়। কিন্তু যেমনটা আমরা দেখলাম, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের গল্পটা ভিন্ন।

ভিন্ন গতিপথ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের শুরু মেডিক্যাল তত্ত্ব আর চিকিৎসার জগতে। তখন এর নাম ছিল ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ। শুরুর দিকে আন্দোলনের কোনো বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা যায় না। চোখে পড়ে না তেমন কোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা কিংবা সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো। প্রথম কয়েক দশক ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ চালিত হয় অল্প কিছু মানুষের বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আর মেডিক্যাল ফিল্ডের কিছু প্রবণতাকে পুঁজি করে। ষাটের দশকে এরিকসন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এর সাথে অ্যাক্টিভিসমের একটা দিক যুক্ত হয়। পরের কয়েক দশক জুড়ে নারীবাদ, জন মানি এবং কুইয়ার থিওরি সরবরাহ করে জোড়াতালি দেওয়া তাত্ত্বিক কাঠামো। কয়েক হাত ঘুরে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ একসময় ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদে পরিণত হয়। নানা চড়াইউৎরাই পেরিয়ে অবশেষে বৈশ্বিক এলজিবিটি আন্দোলনের ছাতার নিচে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আবারও সমকামী আন্দোলনের সাথে মিলিত হয় এক বিন্দুতে।

১৯৬৯ সালে নিউইয়র্কের স্টোনওয়াল দাঙ্গা শুরু করেছিল 'ড্র্যাগ কুইন' বা নারী সাজা পুরুষরা। প্রায় শুরু থেকেই নারী সাজা পুরুষরা মার্কিন সমকামী আন্দোলনের

অংশ ছিল। তাদেরকে তখন সমকামী আন্দোলনেরই একটা অংশ মনে করা হতো। ট্রান্সজেন্ডার পরিচয়ের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসেবে অ্যাকটিভিসম শুরু হয় অনেক পরে, নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে।

পার্থক্য পাওয়া যায় আন্দোলনের পদ্ধতিতেও। সমকামী আন্দোলন কখনো সমাজের মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কখনো সমাজের সাথে বোঝাপড়া করতে বেছে নিয়েছে আপসের পথ। কখনো রাজপথে বিক্ষোভ করেছে, কখনো বেছে নিয়েছে লবিয়িং আর প্রোপাগ্যান্ডার পদ্ধতি। এর বিপরীতে নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্টরা গ্রহণ করে নীরবে নিভৃতে কাজ করার নীতি।

শুরুতে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিসমের মনোযোগ ছিল আইনি সংস্কারের দিকে। ষাটের দশক থেকেই অ্যামেরিকায় লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি হচ্ছিল। সার্জারি নিয়ে আইনি বাঁধা ছিল না। আইনি জটিলতা দেখা দিতো সার্জারি পর। একজন পুরুষ যখন নিজেকে নারী দাবি করে, তখন পারিবারিক আইনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিলতা শুরু হয়ে যায়। পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে পাবলিক টয়লেট, নারী হোস্টেলের সিট থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার, প্রশ্ন দেখা দেয় নানা ক্ষেত্রে। এ ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ শুরু করে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্টরা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ফিলিপ ফ্রাই নামের এক আইনজীবী।

মার্কিন সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে চাকরি করা ফিলিপ ফ্রাই ত্রিশ বছর বয়সে নিজেকে নারী ঘোষণা করে। নাম নেয় ফিলিস। লিঙ্গ পরিবর্তনের সাথে জড়িত বিভিন্ন আইনি সমস্যার সমাধান এবং সামগ্রিকভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯২ সালে International Conference on Transgender Law and Employment Policy (ICTLEP) নামের কনফারেন্স আয়োজন করে ফ্রাই। আইসিটিএলইপি'র উদ্যোগে তৈরি হয় 'ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ ট্রান্সজেন্ডার রাইটস' নামে খসড়া আইন। নামে 'আন্তর্জাতিক' হলেও আসলে এটা ছিল অ্যামেরিকার হাতেগোনা কিছু নারী সাজা পুরুষের উদ্যোগ। এই 'আন্তর্জাতিক বিলে' নানা ধরনের দাবি ছিল। যেমন,

- ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারবে।
- কেউ লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।
- ব্যক্তি নিজেকে যে লিঙ্গের বলে পরিচয় দেবে তাকে ঐ লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশাধিকার দিতে হবে, ঐ লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত কাজে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

অর্থাৎ নিজেকে নারী দাবি করলেই যেকোনো পুরুষ নারীদের টয়লেট, হোস্টেল, কমনরুম ব্যবহার করতে পারবে। সুযোগ নিতে পারবে চাকরি বা সংসদে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কোটার। চাইলে সে অংশ নেবে নারীদের খেলাধুলায়।

ফ্রাইয়ের পাশাপাশি আইসিটিএলইপি'র আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল মার্টিন রথব্লাট। বিলের প্রথম খসড়া তারই তৈরি করা। রহস্যময় এক চরিত্র এই রথব্লাট। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। নাসা এবং হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের সাথে কাজ করা এই লোক একাধারে উকিল, বায়োটেকনোলজি উদ্যোক্তা, মেডিক্যাল এথিকসের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এবং অ্যাকটিভিস্ট। হিউম্যান জিনোম এবং মানবাধিকার নিয়ে তার উদ্যোগে তৈরি খসড়া ইউনেস্কোতে গৃহীত হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে জাতিসংঘের। ১৯৯৪ সালে মার্টিন রথব্লাট নিজেকে নারী ঘোষণা করে।

অ্যামেরিকানদের দেখে অনুপ্রাণিত হয় 'প্রেস ফর চেইঞ্জ' নামে ব্রিটেনের একটি ট্র্যান্সজেন্ডার সংগঠন। তাদের উদ্যোগে একই রকমের একটি খসড়া বিল তৈরি হয় ১৯৯৭ সালে। তাদের লবিয়িং-এর কল্যাণে লিঙ্গ পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন মূল্যায়নের জন্য ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ সরকার Interdepartmental Group on Transsexual Rights তৈরি করে। এর উপদেষ্টা বানানো হয় 'প্রেস ফর চেইঞ্জের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্টিফেন হুইটলকে। হুইটল একজন লেসবিয়ান বা সমকামী নারী, যে অপারেশন করে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

তখনো পর্যন্ত ট্র্যান্সজেন্ডার এবং ট্র্যান্সসেক্সুয়াল শব্দ দুটো সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। অ্যামেরিকাতে রথব্লাট আর ফ্রাইদের প্রস্তাবিত খসড়াতে 'ট্র্যান্সজেন্ডার' ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটেনের সরকার যখন আইন পুনঃবিবেচনা করছিল, তখন সেখানে ব্যবহার করা হয়েছিল 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল'।

২০০৪ সালে ব্রিটেনে 'জেন্ডার রেকগনিশন অ্যাক্ট' পাশ হয়ে যায়। এটি ছিল ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিসমের জন্য বড় একটা বিজয়। এ আইনে বলা হয়, অপারেশন না করেও যে কেউ সরকারি কাগজপত্রে নিজের পরিচয় বদলাতে পারবে। অপারেশন না করা পুরুষ নারী হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র বা লাইসেন্স নিতে পারবে। একইভাবে অপারেশন না করা নারী চাইলেই পুরুষ হিসেবে কাগজপত্র নিতে পারবে সরকারের কাছ থেকে। ব্রিটেনের এই আইন ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বৈধতার ক্ষেত্রে মাইলফলকে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশের ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্টরা মনোযোগী হয়ে উঠে নিজ নিজ দেশে একই রকমের আইন পাশ করাতে।

আন্তর্জাতিক

তারপর ব্যাপারটা চলে যায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ২০০৬ সালের নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগাকার্টা নামের শহরে জড়ো হয় একদল অ্যাকটিভিস্ট, উকিল, মানবাধিকারকর্মী এবং 'বিশেষজ্ঞ'। আন্তর্জাতিকভাবে সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনকে কীভাবে বৈধতা দেওয়া যায়, তার নকশা তৈরিই ছিল এনজিওদের উদ্যোগে আয়োজিত এ মিটিংয়ের উদ্দেশ্য।

প্রথম দিকে আলোচনা এগোচ্ছিল সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে। কিন্তু উপস্থিতদের মধ্যে কেউ কেউ বললো সমকামিতাকে সামনে রাখলে এশিয়া আর আফ্রিকার মতো অঞ্চলগুলোতে তীব্র সামাজিক বিরোধিতা দেখা দেবে। যৌনতার বদলে তাই জোর দিতে হবে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা 'লিঙ্গ পরিচয়'-এর মতো শব্দগুলোর ওপর। আইনিভাবে এগোনোর এটাই সবচেয়ে ভালো পন্থা। বিষয়টাকে এমন এক মোড়কে তুলে ধরতে হবে যা মানুষ তেমন একটা বোঝে না। এতে করে বিরোধিতা তুলনামূলক কম হবে।

এই মিটিংয়ের ফলাফলগুলোই ২০০৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইয়োগাকার্টা নীতিমালা' নামে প্রকাশ করা হয়। সোজা বাংলায় এই নীতিমালার উদ্দেশ্য মানবাধিকারের মোড়কে বিকৃত যৌনতা আর 'লিঙ্গ পরিবর্তন'কে প্রতিষ্ঠিত করা। বিভিন্ন দেশের আইন, পাবলিক পলিসি এবং শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এলজিবিটি আন্দোলনের সামাজিকীকরণ। এই নীতিমালায় নতুন একটি অ্যাক্রোনিম[৩৮০] প্রস্তাব করা হয় SOGI (Sexual Orientation & Gender Identity)। এর প্রথম অংশ, অর্থাৎ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন দ্বারা বিকৃত যৌনতা (বিশেষ করে সমকামিতা) বোঝানো হচ্ছে, আর জেন্ডার আইডেন্টিটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যেমন খুশি তেমন সাজো স্টাইলে পরিচয় পরিবর্তন।

সমকামিতার ব্যাপারে ইয়োগাকার্টা নীতিমালার কিছু অবস্থান দেখা যাক :

- পায়ুসঙ্গম-বিরোধী সব আইন বিলুপ্ত করতে হবে।
- সমকামিতাকে বৈধতা দিতে হবে। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতাকে অপরাধ গণ্য করা যাবে না, এর জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না বা গ্রেফতার করা যাবে না।
- সমকামীদের জনগণের টাকায় মেডিক্যাল চেকআপ এবং চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা দিতে হবে।
- মিছিল, মিটিং, প্রকাশনা, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ্যে এলজিবিটি এজেন্ডা প্রচারণার সুযোগ দিতে হবে।
- 'সমকামী বিয়ে'কে স্বীকৃতি দিতে হবে।

কেন? কারণ, এগুলো মানবাধিকারের প্রশ্ন!

অন্যদিকে লিঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারে ইয়োগাকার্টা নীতিমালায় জোর দিয়ে বলা হয়, প্রত্যেক দেশের উচিৎ লিঙ্গ পরিবর্তনের সমর্থনে ব্রিটেনের মতো আইন করা। দশ বছর পরের এক মিটিংয়ে ইয়োগ্যাকার্টা নীতিমালা আপডেট করা হয়। নাম দেওয়া হয় ওয়াইপি+১০। ততদিনে ব্রিটেনের পাশাপাশ আর্জেন্টিনা, মালটা এবং আয়ারল্যান্ডও মুখের দাবির ভিত্তিতে আইনিভাবে লিঙ্গ পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। ওয়াইপি+১০-এ

[৩৮০] অ্যাক্রোনিম (Acronym): অন্য শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দ; সংক্ষিপ্ত শব্দ।

আবারও বিশ্ব জুড়ে অনুরূপ আইন পাশ করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারা বলে,

- সব ধরনের জেন্ডার আইডেন্টিটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।
- সরকারগুলোর উচিৎ চাহিবামাত্র যেকোনো ব্যক্তিকে যেকোনো নথিপত্রে নিজের পরিচয় পরিবর্তন করতে দেওয়া।
- ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে পরিচয় দেয়, তা-ই সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যক্তির শরীর যাই হোক না কেন, মুখের দাবির ভিত্তিতে তাকে ক্রীড়াদলে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। অর্থাৎ পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করলে সে নারীদের ক্রীড়াদলে নারী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- সকল ট্র্যান্সজেন্ডারকে ইনসুরেন্স অথবা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চিকিৎসাসেবা (হরমোন থেরাপি এবং সার্জারির খরচ) দিতে হবে।

ইয়োগাকার্টা নীতিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্রহণ করেনি। তবে এলজিবিটি এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলো এই নীতিমালাগুলোকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকেই মানবাধিকারের আলোকে আইন, শিক্ষা ও মিডিয়ার মাধ্যমে এলজিবিটি এজেন্ডার স্বাভাবিকীকরণের একটি গোছানো কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও আর এলজিবিটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই কাঠামো অনুযায়ী কাজ চলতে থাকে বিশ্বের নানা প্রান্তে। 'যৌন সংখ্যালঘু', 'যৌন অধিকার', 'যৌন বৈচিত্র্য', 'বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়'-সহ বিভিন্ন পরিভাষার আলোকে চলতে থাকে বিকৃতির প্রচার।

আর এসবই হতে থাকে কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের ঠিক করা সেই চতুর কৌশলের আলোকে, বিকৃত আচরণের প্রশ্নকে অধিকারের প্রশ্নে পরিণত করার মাধ্যমে। অ্যালফ্রেড কিনসির চিন্তার কাঠামোর ওপর তৈরি যৌন শিক্ষা কারিকুলাম বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দাবানল

সমকামী আন্দোলন পশ্চিমে যত শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, ততই দুর্বল হচ্ছিল সমাজের নৈতিকতার ভিত্তি। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল বিকৃতির প্রতি বিরোধিতা আর প্রতিরোধের মনোভাব।

২০১৫ সালে অ্যামেরিকাতে সমকামিতা এবং 'সমকামী বিয়ে' বৈধতা পেয়ে যাবার পর দাতা, এনজিও, অ্যাকটিভিস্ট, মিডিয়া, উকিল, রাজনীতিবিদ আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিস্তৃত যে নেটওয়ার্ক এত বছর সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণে কাজ

করছিল, তারা এবার মনোযোগী হয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচার ও প্রসারে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ। স্কুল থেকে শুরু করে মিডিয়া, পপ কালচার, আইন, সরকারি পলিসি এবং চিকিৎসাক্ষেত্র—সব জায়গাতে ঢুকে পড়ে ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটির তত্ত্ব।

শুরুটা হয় ২০১৫ সালেই, ব্রুস জেনারের মাধ্যমে। এই চরিত্রের সাথে এরই মধ্যে পাঠকের পরিচয় হয়েছে। তার রূপান্তরের ঘটনা ফলাও করে প্রচার করে মিডিয়া। তার নাম চলে আসে গ্ল্যামার ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা নারীদের তালিকায়। তাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে বিখ্যাত ম্যাগাজিন ভ্যানিটি ফেয়ার। মিডিয়াতে তোলপাড় তৈরি করা হয় সুপরিকল্পিতভাবে।

পরের বছর দেখা দেয় বাথরুম বিতর্ক। নারীদের বাথরুমে নারী সাজা পুরুষদের ঢুকে পড়াকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক শুরু। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হঠাৎ করেই সক্রিয় হয়ে উঠে ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্টরা। 'ট্র্যান্সজেন্ডার স্টাডিস' নিয়ে চালু হয় আলাদা অনুষদ। মিডিয়ার পণ্ডিতরা মানুষকে বোঝাতে শুরু করে, একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে না নেওয়া আসলে গোঁড়ামি আর পশ্চাৎপদতার লক্ষণ। গল্প, সিনেমা এবং বিভিন্ন সিরিজের মাধ্যমে চলে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মতবাদের পক্ষে মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া।

অ্যামেরিকার বেশিরভাগ মানুষ ট্রান্সজেন্ডারবাদের নাম শোনার আগেই ২৫টি রাজ্যে জন্মসনদে ইচ্ছেমতো নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন বৈধ হয়ে যায়। জন্মসনদে নিজেকে নারীর বদলে পুরুষ বা পুরুষের বদলে নারী লেখার জন্য কোনো ধরনের সার্জারি বা কোর্ট অর্ডারের প্রয়োজন নেই এসব রাজ্যে।

বিকার ও বিকৃতির শিক্ষা ঢুকে যায় শিশুদের পাঠ্যবইয়ে। শিশুদের 'যৌন বৈচিত্র্য' নিয়ে শেখানো হয়। সেই সাথে বলা হয়, ছেলেমেয়ের বাইরে আরও অনেক জেন্ডার আছে, মানুষ ভুল দেহে জন্ম নিতে পারে। নারীদের পুরুষাঙ্গ থাকতে পারে, পুরুষের যোনী থাকতে পারে। পুরুষরা গর্ভধারণ করতে পারে। নারীর ঔরসে জন্ম হতে পারে সন্তানের।[৩৬১] কার দেহ কেমন সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। নিজের কী 'মনে হয়', সেটাই পরিচয়ের ভিত্তি। শিশু যদি বলে তার মনে হচ্ছে 'সে ভুল দেহে জন্ম নিয়েছে', তাহলে বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নেওয়া হবে। শিশুকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে স্কুল থেকেই।

আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক বছর বয়সী ছেলেশিশু তার পোশাকের বোতাম খুলে ফেললে সেটাকে বলা হচ্ছে ঐ শিশুর নিজেকে 'মেয়ে মনে করার

---

[৩৬১] প্রাইমারি স্কুলের বইতে থাকা বিভিন্ন গল্পের উদাহরণ পাবেন এখানে, Gender Ideology in Our Schools - https://www.youtube.com/watch?v=KkmmEHvlpTk
https://www.youtube.com/watch?v=eTT481OkOuA

লক্ষণ। হ্যামার্গ্রাউ দিতে শেখা মেয়ে চুলের ক্লিপ খুলে ফেললে বলা হচ্ছে এই শিশু হয়তো বলতে চাচ্ছে 'সে আসলে ছেলে'। শিশুদের আশেপাশে সময় কাটানো যেকোনো মানুষ বুঝবে এগুলো একেবারে ফালতু কথা। কিন্তু এই ফালতু কথাগুলোই জোরেশোরে প্রচার করছে ডিগ্রিধারী মনোবিদ আর অ্যাকাডেমিকরা।।[৩৬২]

গত ৭ বছরে মার্কিন মুলুকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে পরিচয় দেওয়া মানুষের সংখ্যা। ২০২২ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৭.১% নিজেদের এখন ট্র্যান্সজেন্ডার বা নন-বাইনারি হিসেবে পরিচয় দেয়। যাদের বয়স পঁচিশের নিচে, তাদের প্রায় ২১% নিজেদের সমকামী, উভকামী বা ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করে। ২০১৭ সালের আরেক জরিপ অনুযায়ী, অ্যামেরিকার প্রতি একশো জন হাইস্কুল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩ থেকে ৪ জন বলছে তারা ট্রান্সজেন্ডার বা ট্রান্সজেন্ডার 'হতে পারে'।[৩৬৩] অথচ যৌন বিপ্লবের আগে জন্ম নেওয়া প্রজন্মের মধ্যে নিজেদের 'এলজিবিটি গোষ্ঠীর সদস্য' হিসেবে পরিচয় দিতো মাত্র ২% মানুষ।[৩৬৪]

ব্রিটেনেও একই অবস্থা। ২০১১ সালে 'লিঙ্গ পরিচয়'-এর সমস্যার চিকিৎসার জন্য বছরে যেখানে ২৫০টির কম কেইস আসতো, সেখানে ২০২১ নাগাদ বছরে কেইস আসছে ৫০০০-এর বেশি। আগে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে আসা অধিকাংশই ছিল পুরুষ। এখন যারা আসছে তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মেয়ে।[৩৬৫]

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, শিশুরাও এখন লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাচ্ছে। লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা সব বড় বড় ক্লিনিক বলছে, গত কয়েক বছরে পশ্চিমা বিশ্ব জুড়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া শিশুদের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক হাজার শতাংশ।[৩৬৬]

---

[৩৬২] ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট ডাইঅ্যান এহরেনস্যাফট এক প্রশ্নের জবাবে বলছেন, কথা বলতে শুরু করেনি, এমন ১ বা ২ বছর বয়সী মেয়ে শিশু চুলের ক্লিপ টেনে খুলে ফেলে কাঁদছে, এটা তার পক্ষ থেকে বার্তা যে, সে আসলে মেয়ে না! - https://www.dailymotion.com/video/x7kqndw

[৩৬৩] Johns, Michelle M., Richard Lowry, Jack Andrzejewski, Lisa C. Barrios, Zewditu Demissie, Timothy McManus, Catherine N. Rasberry, Leah Robin, and J. Michael Underwood. "Transgender identity and experiences of violence victimization, substance use, suicide risk, and sexual risk behaviors among high school students—19 states and large urban school districts, 2017." Morbidity and Mortality Weekly Report 68, no. 3 (2019): 67.

[৩৬৪] GBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%. https://news. gallup.com/poll/389792/ lgbt-identification-ticks-up.aspx (ac- cessed Feb 5, 2023).

[৩৬৫] Gentleman A. 'An explosion': what is behind the rise in girls questioning their gender identity? The Guardian. 2022; published online Nov 24. https://tinyurl. com/57akuhbz

[৩৬৬] Malone, William. "Time to hit pause on 'pausing'puberty in gender-dysphoric youth." Medscape. Retrieved from medscape. com (2021).
Heneghan, Carl, and Tom Jefferson. "Gender-affirming hormone in children and adolescents." BMJ EBM Spotlight 25 (2019). https://tinyurl.com/svy5msmc

শিশুদের মধ্যে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করা মানুষের সংখ্যা বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজের এবং পপ কালচারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। বয়ঃসন্ধি অনেকের জন্যই একটা জটিল সময়। এসময় মানুষের মধ্যে কাজ করে নানা ধরনের বিভ্রান্তি আর আবেগ। আবেগতাড়িত হয়ে, খেয়ালের বশে মানুষ এসময় অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং তার পারিপার্শ্বিকতা।

আজ পশ্চিমা বিশ্বে অবাধ যৌনতার সবক দেওয়া হচ্ছে। সবক শুরু হচ্ছে স্কুল থেকেই। সেখানে পর্নোগ্রাফি সহজলভ্য, যৌনতা চারপাশে। শিশুরা দেখছে দু'জন পুরুষ 'বিয়ে' করতে পারে, দু'জন নারী 'বিয়ে' করতে পারে। এটা তাদের দেশের আইনে বৈধ। প্রাইমারি স্কুল থেকে শিশুদের শেখানো হচ্ছে আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে ট্রান্সজেন্ডারবাদের অবস্থান। মিডিয়াতে বারবার বলা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া খারাপ কিছু না, বরং ট্রান্সজেন্ডাররা বিশেষ ধরনের মানুষ। সমাজে তাদের আলাদা দাম আছে। রীতিমতো মগজধোলাই করা হচ্ছে তাদের। এছাড়া অনেক শিশু ছোটবেলায় যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। কৈশোরে অনেকে জড়িয়ে যাচ্ছে মাদকের সাথে। এ সবকিছু প্রভাব ফেলছে তাদের মনোজগতে। এসব স্রোতের টানে কৈশোরের নাজুক সময়টাতে অনেকেই নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলছে। যেমন সেইজ ব্লেয়ার বলেছিল। সব কিছু মিলিয়ে এক সামাজিক সংক্রমণ শুরু হয়েছে পশ্চিমে।[৩৬৭]

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারণার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরোধিতা করায় মামলা ঠুকে দেওয়া হয়েছে নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে। এ মতবাদের সমালোচনা করায় চাকরি খুইয়েছেন অনেকে। হয়রানির শিকার হয়েছে বিখ্যাত লেখিকা জেকে রৌলিং থেকে শুরু করে নাস্তিক বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিংস, এমনকি টেনিস চ্যাম্পিয়ন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাও। সবশেষে এলজিবিটি এজেন্ডা, বিশেষ করে ট্রান্সবাদের প্রসারকে রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসেবে গ্রহণ করেছে অ্যামেরিকা।[৩৬৮] মার্কিন সরকারের অর্থায়নে এলজিবিটি এজেন্ডার প্রচার ও প্রসারের কাজ হয়েছে ও হচ্ছে আমাদের এই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এ কথা স্বীকার করেছে খোদ মার্কিন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইউএসএইড।

অন্যান্য আন্দোলনগুলো কয়েক দশক কিংবা শতক জুড়ে যা অর্জন করেছে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ সেটা করে ফেলেছে মাত্র অল্প কয়েক বছরে।

---

[৩৬৭] Littman, Lisa. "Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults: A study of parental reports." PloS one 13, no. 8 (2018).

[৩৬৮] Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World. The White House, February, 2021. https://tinyurl.com/dexj233w

অধ্যায় ১৭

মাকড়সার জাল

এলজিবিটি আন্দোলনের সমর্থকরা একে উপস্থাপন করে সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবে। কিন্তু এ আন্দোলন যত ব্যাপকভাবে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমর্থন পেয়েছে, যতটা দ্রুতগতিতে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনকে প্রভাবিত করেছে, এর পেছনে যত শক্তিশালী লবি আছে—ইতিহাসে তা নজিরবিহীন।

কোন ধরনের বিপ্লব ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদ নিয়ে চলে? বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে কবে থেকে মাথা ঘামায় পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষরা এবং সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের প্রকল্পবিদরা? আসলে অধিকার আর বিপ্লবের বুলির আড়ালে এলজিবিটি এজেন্ডা এবং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পেছনে আছে মুনাফা, মতাদর্শ এবং ক্ষমতবানদের মাকড়সার জালের মতো এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

মেডিকাল সাম্রাজ্য

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ঝড়োগতির প্রসারের পেছনে পুঁজিবাদের একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। ১৯৮২ সালেই সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. ডোয়াইট বিলিংস এবং থমাস আরবান বলেছিলেন,

> 'লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের বৈধকরণ, বাজারজাতকরণ এবং যৌক্তিক অজুহাত তৈরির ফলে 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল' নামে একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে...'

তাদের মতে, অ্যামেরিকান ডাক্তার আর মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যৌন পরিতৃপ্তি এবং পরিচয়কে চড়া মূল্যের পণ্যে পরিণত করেছে। পরিচয় পরিবর্তনের এই পুরো প্রকল্প আসলে মানুষ ও পরিচয়কে পণ্য বানানোর পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে।[৩৬৯]

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচার প্রসারের জন্য কাজ করছে অ্যামেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবসায়িক লবি। অ্যামেরিকার হাসপাতাল আর নার্সিং হোমগুলো প্রতি বছর সরকারের পেছনে লবিয়িংয়ের জন্য ১০ কোটি ডলার খরচ করে। ওষুধ

---

[৩৬৯] Billings & Urban, The Socio-Medical Construction.

কোম্পানিগুলোর খরচের পরিমাণ আরও বেশি। ২০২০ সালের এক জার্নাল আর্টিকেল অনুযায়ী, ১৯৯৯ থেকে ২০১৮ এর মধ্যে লবিয়িং-এর পেছনে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে অ্যামেরিকার ওষুধ কোম্পানিগুলো। কংগ্রেস সদস্য আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নির্বাচনে পছন্দের লোকদের জিতিয়ে আনতে ঢেলেছে ৪১৪ মিলিয়ন ডলার। রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন প্রার্থী আর কমিটির পেছনে খরচটা আরও বেশি, ৮৭৭ মিলিয়ন![৩৭০]

এই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করার উদ্দেশ্য, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর জন্য লাভজনক আইন ও পলিসি পাশ করিয়ে নেওয়া। এবং এই লবিগুলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে কাজ করছে। কারণ এ মতবাদের প্রসারে আর কারও লাভ হোক বা না হোক, স্বাস্থ্যসেবা সেক্টরের লাভ হয়েছে আকাশচুম্বী।

একজন ট্র্যান্সজেন্ডার মানে একজন সারা জীবনের রোগী। আর সারা জীবনের রোগী মানে সারাজীবনের কাস্টমার। পিউবার্টি ব্লকার, হরমোন, সার্জারির মতো নানা খরচ তাদের লেগেই থাকে। এই চাহিদা পূরণে হাজির হয় ওষুধ ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি, হাসপাতাল, ডাক্তার এবং মনোবিদরা।

অর্থনীতির প্রথম পাঠ—চাহিদা বাড়লে যোগান বাড়ে। চাহিদা বাড়লে বিক্রি বাড়ে। গত এক দশকে পশ্চিমে ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত ক্লিনিকের সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বিশেষায়িত জেন্ডার ক্লিনিকের পাশাপাশি হাসপাতালগুলোতে খোলা হয়েছে আলাদা ইউনিট।[৩৭১]

এসব রোগীদের চিকিৎসার নামে ডাক্তার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর ওষুধ কোম্পানিগুলো ঠিক কী ধরনের লাভ করে, জানেন? আসুন, এক নজর দেখা যাক।

পিউবার্টি ব্লকার : শিশু-কিশোরদের 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' প্রথম ধাপ পিউবার্টি ব্লকার। পিউবার্টি ব্লকারের (Puberty blocker) কাজ হলো বয়ঃসন্ধিকে বিলম্বিত করা। বয়স বাড়ার সাথে শরীরে যে পরিবর্তনগুলো আসার কথা, এ ধরনের ওষুধ সেগুলো বন্ধ করে রাখে। এরকম একটা ওষুধের নাম লুপ্রন। এক মাস এই ওষুধ খেতে হলে খরচ পড়বে ৭৭৫ ডলার, পাঁচ বছরে খরচ ২৭,০০০ ডলার।[৩৭২] হেলথ ইনসুরেন্স না থাকলে এক বছরে একটা শিশুর পিউবার্টি ব্লকারের খরচ ৪০০০ থেকে ২৫ হাজার

---

[৩৭০] Wouters, Olivier J. "Lobbying expenditures and campaign contributions by the pharmaceutical and health product industry in the United States, 1999-2018." JAMA internal medicine 180, no. 5 (2020): 688-697.

[৩৭১] Block, Jennifer. "Gender dysphoria in young people is rising—and so is professional disagreement." bmj 380 (2023).

[৩৭২] Laidlaw, Michael K. "The gender identity phantom." - https://tinyurl.com/566am9ch Muoio, Dave. Transgender Patients: Calculating the Actual Cost. - https://tinyurl.com/he5y5j7y

ডলার পর্যন্ত হতে পারে।[৩৭৩] বছরের পর বছর কিশোর-কিশোরীদের এই ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

হরমোন থেরাপি : আমরা আগেই বলেছি, তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বিপরীত লিঙ্গের হরমোন নেওয়া। এ ধরনের হরমোন জীবনভর ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে হরমোনের প্রভাবে আসা পরিবর্তন ধীরে ধীরে আবার আগের অবস্থার দিকে ফিরে যায়। বিপরীত লিঙ্গের হরমোনের দাম পিউবার্টি ব্লকারের চেয়ে বেশ কম। এক মাসের ইস্ট্রোজেন ট্যাবলেট ২০ ডলারের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে এক মাসের টেস্টোস্টেরন জেলের দাম পড়বে ৩০০ থেকে ৩৫০ ডলার। তবে মনে রাখবেন, এই ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে জীবনভর। রোগীকে যত তাড়াতাড়ি এই ওষুধ ধরানো যাবে, ওষুধ কোম্পানির লাভ তত বেশি। ২০১৯ সালে হরমোন থেরাপির মার্কেটের আকার ছিল ২১.৮ বিলিয়ন ডলার। প্রতি বছর ৮% হারে এই মার্কেটের সাইয বাড়ার কথা।[৩৭৪] ভালো কথা, বছরের পর বছর হরমোন নেওয়ার ফলে এসব মানুষের ক্যান্সার হবার আশঙ্কা বাড়বে মুফতে।

সার্জারি : পিউবার্টি ব্লকার আর হরমোনের পর আসে সার্জারির বাজার। সার্জারির বাজারে আছে হরেক রকমের আকর্ষণীয় পণ্য।

- নারীদেহ থেকে স্তন অপসারণ আর পুরুষের দেহে নকল স্তন ইমপ্ল্যান্ট করার খরচ কমপক্ষে ১০ হাজার ডলার।
- ভ্যাজিনোপ্লাস্টি, অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ কাটাকুটি করে পুরুষের দেহে নকল 'যোনী' তৈরির খরচ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার।
- অরকিয়েকটমি অর্থাৎ অন্ডকোষ কেটে ফেলে দেওয়ার জন্য গুনতে হবে চার থেকে ছয় হাজার ডলার। আরও চার থেকে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করতে হবে ল্যাবিওপ্লাস্টির জন্য।
- নারীদেহ থেকে ডিম্বাশয় এবং জরায়ু ফেলা, তারপর হাত থেকে চামড়া আর কবজির পেশী কেটে এনে নকল 'পুরুষাঙ্গ' তৈরির খরচ পড়তে পারে ৫০,০০০-৩০০,০০০ ডলার।
- পুরুষের মুখকে 'নারীসুলভ' করার সার্জারিতে লাগতে পারে তিন থেকে চল্লিশ হাজার ডলার।

এই তালিকা অপূর্ণাঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রে ওপরের যেকোনো একটা প্রক্রিয়ার জন্য লাগতে পারে একাধিক সার্জারি। এছাড়া নিজেকে 'বিশ্বাসযোগ্যভাবে' বিপরীত

---

[৩৭৩] Turban, Jack L., Dana King, Jeremi M. Carswell, and Alex S. Keuroghlian. "Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation." Pediatrics 145, no. 2 (2020).

[৩৭৪] The trans war on the body, Mary Harrington. The Spectator, April 24, 2021. https://tinyurl.com/ye24t5vy

লিঙ্গের মানুষ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য আরও বিভিন্ন সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে। আছে সার্জারি পরবর্তী নানান জটিলতা আর সেগুলোর চিকিৎসা। যেগুলোর সমাধানের জন্য আবার একাধিক সার্জারির প্রয়োজন হয়।[৩৭৫] এমনও মানুষ আছে, বয়স বিশ হবার আগেই সার্জারির পেছনে যার ছয় লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেছে।

বিশাল এক মার্কেট, যার আকার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

শুধু অ্যামেরিকাতেই 'লিঙ্গ পরিবর্তন'-এর সার্জারির পেছনে বছরে খরচ হচ্ছে ত্রিশ কোটি ডলার। ২০২৭ পর্যন্ত প্রতি বছর এই বাজার ১৪.৪% হারে বড় হবার কথা। ২০২০ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত এ মার্কেটের কমপাউন্ড গ্রোথ রেট হবে বছরে ২৪.৫%। ধারণা করা হয়, ২০২৬ নাগাদ ট্রান্সজেন্ডার সার্জারির বাজার ১.৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।[৩৭৬]

বিভ্রান্তির দাম অনেক চড়া, বিকারগ্রস্ততার বাজারে লাভ অনেক। ট্রান্সজেন্ডারবাদ ভালো ব্যবসা। একজন ট্রান্সজেন্ডার মানে একজন সারাজীবনের রোগী। পুরো জীবন তাকে ডাক্তার আর ওষুধ ইন্ডাস্ট্রির ওপর নির্ভর করতে হবে। যত বেশি কিশোর ও তরুণ নিজেদের 'ভুল দেহে আটকা পড়া' মনে করবে, তত বাড়বে পিউবার্টি ব্লকার, হরমোন আর সার্জারির কাস্টমার। বাড়বে ওষুধ আর মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির প্রফিট। অন্যদিকে, সময়ের সাথে সাথে তাদের শরীরের ওপর চালানো অত্যাচারের প্রভাবগুলো সামনে আসবে, ভ্যাজাইনাল অ্যাট্রফি, কার্ডিওভাসকুলার জটিলতা, এমনকি ক্যান্সার। চিকিৎসা প্রয়োজন হবে সেগুলোর জন্যেও।

যত অল্প বয়সে একজন মানুষ ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ফাঁদে আটকা পড়বে, তত বেশি লাভ। আর তাই বুঝি আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিশু-কিশোররা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার মনে করে 'চিকিৎসা' খুঁজছে, আর সেই সাথে বাড়ছে এই 'চিকিৎসাসেবা' প্রদানকারীদের ব্যবসা। বিসনেস মডেলটা চমৎকার, তাই না?

বিস্তৃত মাকড়সার জাল

ট্রান্সজেন্ডারবাদের পেছনে সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি হলো এক বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক। যে নেটওয়ার্কের তিনটি অংশ—দাতা, এনজিও এবং অ্যাকটিভিস্ট। আমরা এরই

---

[৩৭৫] Laidlaw, The Gender Identity Phantom.

[৩৭৬] Sumant Ugalmugle and Rupali Swain, "Sex Reassignment Surgery Market Size by Gender Transition (Male to Female [Facial, Breast, Genitals], Female to Male [Facial, Chest, Genitals]), Industry Analysis Report, Regional Outlook, Application Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2020–2026," Global Market Insights, Report ID: GMI2926 (March 2020), https://tinyurl.com/4hexff8u ; Grand View Research, "U.S. Sex Reassignment Surgery Market Size, Share & Trends Analysis Report by Gender Transition (Male to Female, Female to Male), and Segment Forecasts, 2020–2027."

মধ্যে জেনেছি নব্বইয়ের দশকে সমকামী আন্দোলন এই মডেল গ্রহণ করেছিল। তারও আগে ষাটের দশকে এ মডেলের সফল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন। আজ সেই একই প্রক্রিয়ার অনুকরণ হচ্ছে, তবে আরও অনেক বিস্তৃত মাত্রায়। অল্প কিছু অবিশ্বাস্য রকমের ধনী মানুষ দু' হাতে টাকা ঢালছে এলজিবিটি আন্দোলনের পেছনে। এইসব বিলিয়েনেয়াররা কীভাবে বিকৃতির প্রসার, বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডারবাদের ধূমকেতুর মতো উত্থানে ভূমিকা রাখছে, তা দেখা যাক।

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের যে দানবীয় চেহারা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কাঠামো তৈরি হয়েছে আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে। এ সময়টাতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপক টাকা খরচ করে হাতেগোনা কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত এলজিবিটি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দাতাদের তালিকায় সবার ওপরে ছিল তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম,

- ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন – ৩.১ মিলিয়ন
- আরকাস ফাউন্ডেশন – ২.৮ মিলিয়ন
- টাওয়ানি ফাউন্ডেশন – ১.৩ মিলিয়ন

আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য আমরা এই তিন প্রতিষ্ঠানের পেছনের ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করব। এ আলোচনা থেকে পর্দার পেছনের বিস্তৃত মাকড়সার জাল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন পাঠক।[৩৭৭]

জন স্ট্রাইকার, আরকাস

জন স্ট্রাইকার, সমকামী বিলিয়েনার এবং আরকাস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সে খরচ করছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে। স্ট্রাইকার পরিবার সম্পদের উৎস স্ট্রাইকার কর্পোরেশন। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ অপারেশনের সরঞ্জাম আর সফটওয়ার বানানো। কেবল ২০১৮ সালে স্ট্রাইকার কর্পোরেশন মোট ব্যবসা করে ১৩.৬ বিলিয়ন ডলারের।[৩৭৮] তুলনা করার জন্য বলি, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে বাংলাদেশের রিসার্ভ ছিল ১৯ বিলিয়ন ডলার।

এলজিবিটি নিয়ে কাজ করার জন্য ২০০০ সালে আরকাস ফাউন্ডেশন নামের এনজিও শুরু করে জন স্ট্রাইকার। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আরকাস পরিণত হয়

---

[৩৭৭] এ অংশের তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে নারীবাদী লেখিকা জেনিফার বিলেকের গবেষণা থেকে। দেখুন, Bilek, Jennifer. "The Billionaire Family Pushing Synthetic Sex Identities (SSI)." Tablet (2022)., ও "Trans ideology awash with big money from big biomed and big pharma." News Weekly 3017 (2018): 14-17, এবং The Money behind the Transgender Movement. National Review (2022).

[৩৭৮] Statista, Stryker's net sales from 2011 to 2022 https://www.statista.com/statistics/575709/stryker-annual-net-sales/

এলজিবিটি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দাতাদের একটিতে। ২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বিভিন্ন এলজিবিটি সংস্থাকে মোট ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেয় আরকাস ফাউন্ডেশন। এর মধ্যে ৩০ মিলিয়ন দেয় জন স্ট্রাইকার নিজেই।[৩৭৯]

স্ট্রাইকারদের সাথে অনেক দিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে আরেক সমকামী ধনকুবের টিম গিল। গিল, স্ট্রাইকার আর তাদের ক্ষমতাবান বন্ধুরা মিলে বিভিন্ন সংস্থাকে অনুদান দিয়েছে মোট ৫০ কোটি ডলার।[৩৮০] এই বিপুল পরিমাণ অনুদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। আরকাসের সাথে জড়িত বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া কয়েকটা সংস্থার নাম ও পরিচয় নিচে দেওয়া হলো :

- ইলগা : International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়াতে ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে এলজিবিটি এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা সংস্থা। ২০১১ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) উপদেষ্টা মর্যাদা পায়। ইলগার নাগালের বাইরে নেই বাংলাদেশও। বাংলাদেশের একজন নারী সাজা পুরুষ তথা 'ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট', ২০২২ সালে ইলগার ওয়ার্ল্ড বোর্ডে ট্রান্সজেন্ডার স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ার নির্বাচিত হয়েছে।[৩৮১]
- ট্রান্সজেন্ডার ইউরোপ : ইউরোপ ও এশিয়ার ৪৩টা দেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে কাজ করা সংস্থা। বিভিন্ন দেশের সংস্থাকে অর্থায়ন ও সহায়তা দিয়ে থাকে।[৩৮২]
- জাতিসংঘের এলজিবিটিআই কোর গ্রুপ : জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রদের অনানুষ্ঠিক গ্রুপ, যার উদ্দেশ্য জাতিসংঘের মাধ্যমে এলজিবিটি এজেন্ডাকে মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে আছে অ্যামেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, দক্ষিণ অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘের অফিস অফ দ্যা হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (OHCHR)।[৩৮৩]

---

[৩৭৯] Nation's largest LGBT funder changing its focus?, Washington Blade. April 26. 2012. https://tinyurl.com/35m4rf6s

[৩৮০] Denver's Tim Gill has donated half a billion dollars to LGBTQ equality. Now the software geek turned activist reflects on 25 years of the struggle. The Denver Post, July 14. 2019. https://tinyurl.com/2ycpycvj

Kroll, Andy. "Meet the Megadonor Behind the LGBTQ Rights Movement." Rolling Stone (2017). https://tinyurl.com/362kak5s

[৩৮১] যুক্তরাষ্ট্রের ইলগা ওয়ার্ল্ডের বোর্ড সদস্য হলেন বাংলাদেশি তাসনুভা আনান। দৈনিক যুগান্তর, ১৮ জুন, ২০২২। https://tinyurl.com/y6v7myps

[৩৮২] Wikipedia. Transgender Europe.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_Europe

[৩৮৩] প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে Outright Action International এবং Human

- আরকাসের ফান্ড পাওয়া অন্যান্য সংস্থার তালিকায় আছে এসিএলইউ, সেন্টার ফর অ্যামেরিকান প্রগ্রেস, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, দা ট্রান্সজেন্ডার ল' সেন্টার, জিএলএসইএন প্রমুখ।

বিলিয়েনার ওয়ারেন বাফেটের ছেলে পিটার বাফেটের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান NoVo Foundation-এর সাথেও ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে নানা প্রকল্প নিয়ে একসাথে কাজ করছে আরকাস ফাউন্ডেশন।[৩৮৪]

অ্যামেরিকান মনোবিদদের অন্যতম প্রধান সংস্থা অ্যামেরিকান সাইকোলজিকাল ফাউন্ডেশন। এখানেও টাকা ঢালছে আরকাস।[৩৮৫] আরকাসের অনুদানের সুবাদে মনোবিদদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অনুযায়ী রীতিমতো গাইডলাইন তৈরি করছে এপিএফ। অন্যদিকে ফাউন্ডেশনের অনুদানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গবেষণা' হচ্ছে কুইয়ার তত্ত্ব নিয়ে।[৩৮৬]

অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনগুলোকেও এলজিবিটির সমর্থনে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করছে স্ট্রাইকার কর্পোরেশন। ১৩.৬ বিলিয়ন ডলারের দানবাকৃতি কর্পোরেশন যখন বাজারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তখন সেটা উপেক্ষা করা সহজ না। বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন আজ যেভাবে এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে তা থেকেই বোঝা যায়, আরকাস এক্ষেত্রে কতটা সফল।

জেইমস ওরফে 'জেনিফার' প্রিটযকার, টাওয়ানি

৬৩ বছর বয়সে নিজেকে নারী ঘোষণা করা, তিন বাচ্চার বাপ, বিখ্যাত প্রিটযকার পরিবারের উত্তরাধিকারী জেইমস ওরফে জেনিফারের সাথে আগেই পরিচিত হয়েছি আমরা। ২০১৮ সালের হিসেব অনুযায়ী প্রিটযকার আর তার ভাইবোনদের মোট সম্পদের পরিমাণ ২৮ বিলিয়ন ডলার। এই সম্পদের বিশাল একটা অংশ তারা বিনিয়োগ করেছে মেডিক্যাল সেক্টরে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বড় ভূমিকা রেখেছে জেইমস এবং তার পরিবার। তার কিছু 'অবদানের' তালিকা :

Rights Commission। আর কোর গ্রুপের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আছে আলবেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, এল সালভাদর, ফ্রান্স, জার্মানি, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, মন্টিনিগ্রো, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, যুক্তরাজ্য, ইউকে, ইউএস, উরুগুয়ে, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এদের সাথে আরও আছে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের অফিস।

[৩৮৪] Arcus, NoVo Foundation Announce Groundbreaking Philanthropy Initiative to Improve the Lives of Transgender People. Arcus Foundation Website, 2015. https://tinyurl.com/8pzv8her

[৩৮৫] Latest Round of Social Justice Grants Seek to Support World's At-Risk LGBT Communities. Arcus Foundation Website, 2013. https://tinyurl.com/4zu7r5cy

[৩৮৬] Spelman first historically black college to create chair in queer studies. NBC News. October 31, 2019, https://tinyurl.com/yrp6rcth

- প্রিটযকার টাওয়ানি ফাউন্ডেশন (Tawani Foundation) অ্যামেরিকাতে এলজিবিটি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ডোনারদের অন্যতম।
- স্কোয়াড্রন ক্যাপিটাল নামের কোম্পানির মালিক। স্কোয়াড্রন কাজ করে মেডিক্যাল ডিভাইস, প্রযুক্তি এবং অর্থোপেডিক ইমপ্ল্যান্ট নিয়ে।[৩৮৭]
- শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রিটযকার স্কুল অফ মেডিসিন'। অবশ্যই সেটা মুফতে আসেনি।[৩৮৮]
- ট্রান্সজেন্ডার স্টাডিস চালু করার শর্তে অ্যামেরিকার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় অনুদান দিয়েছে প্রিটযকার।[৩৮৯] ডোনেশনের মাধ্যমে এভাবে আরও প্রভাবিত করেছে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএলএ আইন অনুষদসহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে।[৩৯০]
- শিশুদের জন্য জেন্ডার ক্লিনিক চালু করা এবং সেগুলোর প্রসারের জন্য টাকা দিয়েছে মোটা অংকের।[৩৯১]

ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা প্রধান প্রতিষ্ঠান, হ্যারি বেঞ্জামিনের গড়ে তোলা WPATH-কেও ফান্ড দিচ্ছে প্রিটযকার। উল্লেখ্য, ট্রান্সজেন্ডার বিকারে ভোগা রোগীদের কী চিকিৎসা দেওয়া হবে, কীভাবে দেওয়া হবে, সেই স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার বা আন্তর্জাতিক গাইডলাইন ঠিক করে WPATH।[৩৯২] এ প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্ব থেকে আসা চিকিৎসকদের নিয়ে নানা কনফারেন্সের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান দেয়। প্রিটযকারের অর্থের প্রভাব অ্যামেরিকার সীমান্ত পেরিয়ে এভাবে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

নির্বাচনী রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় প্রিটযকাররা। ২০২০ সালে জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায় বড় ডোনার ছিল জেইমস ওরফে জেনিফার প্রিটযকার।[৩৯৩] বারাক ওবামার নির্বাচিত হবার পেছনে ভূমিকা রেখেছিল তার বোন

---

[৩৮৭] Bilek, The Money behind. https://tinyurl.com/43aste9n

[৩৮৮] Pritzker School of Medicine. https://pritzker.uchicago.edu/

[৩৮৯] Jennifer Pritzker's foundation donates $2 million for transgender studies. Chicago Tribune, January 19, 2016. https://tinyurl.com/2ye2dfkk

[৩৯০] Trans Billionaire Gives to U of T's Bonham Centre. Jennifer Pritzker's support will create a new third-year course in trans studies. University of Toronto. https://tinyurl.com/3c9nru6b

[৩৯১] Billionaire Jennifer Pritzker Helps Fund Clinic For Trans Kids At Lurie. Dnainfo, June 23, 2016. https://tinyurl.com/2s3mm6p3

[৩৯২] রোগীর চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল গাইডলাইন।

[৩৯৩] Billionaire Jennifer Pritzker, A Former Trump Donor, Makes Her First Contribution To Joe Biden. Forbes. September 24, 2020
https://tinyurl.com/ank2hrvh

পেনি প্রিটযকার।[৩১৪] ওবামার আমলে দায়িত্ব পালন করেছিল সেক্রেটারি অফ কমার্স হিসেবে। এ সময় ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারের জন্য মিটিংয়ের আয়োজন করেছিল খোদ হোয়াইট হাউসে। জেইমস প্রিটযকারের কাযিন হলো ইলিয়নের গর্ভনর জে.বি. প্রিটযকার। জেন্ডার আইডেন্টিটি আর ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ইলিনয়ে বিভিন্ন পলিসি নিয়েছে সে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিদ্যুৎগতির প্রসার ঠিক কীভাবে হচ্ছে, এর পেছনে কী ভূমিকা রাখছে অতি ধনী এবং ক্ষমতাবান লোকেরা, প্রিটযকার তার একটা ভালো দৃষ্টান্ত।

জর্জ সরোস

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারের পেছনে কাজ করা আরেক বিলিয়েনের হলো বিখ্যাত জর্জ সরোস। রোমানিয়ান বংশোদ্ভুত ইহুদি এই ধনকুবেরকে নিয়ে ইন্টারনেট জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। অ্যামেরিকার রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক থেকে শুরু করে ইউরোপীয়, এমনকি ভারতীয় ডানপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের অনেকেও মনে করে জর্জ সরোস আর তার প্রতিষ্ঠান ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন গোপন কোনো এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। সেসব তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ আমাদের নেই। আমরা এখানে শুধু এলজিবিটি আন্দোলনের পেছনে জর্জ সরোসের ভূমিকার দিকে তাকাবো।

জর্জ সরোসের তৈরি ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন ২০১৩ সালে এলজিবিটি সংক্রান্ত ইস্যুতে দান করে কমপক্ষে ২৭ লক্ষ ডলার। এই এজেন্ডা নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হলে একেবারে প্রথম দিকে থাকবে হিউম্যান রাইটস ক্যাম্পেইন-এর নাম। ২০১০ সালে এই এইচআরসি-কে ১০০ কোটি ডলার অনুদান দেয় সরোস।

একটু আগেই আমরা দেখেছি, ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে অ্যামেরিকাতে জনপরিসরে প্রথম বড় বিতর্ক দেখা দেয় ২০১৬ সালে। নারীদের বাথরুমে নারী সাজা পুরুষদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্ক উসকে দেওয়া এবং দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রাখে গে স্ট্রেইট অ্যালায়েন্স নেটওয়ার্ক (GSA Network) নামের সংগঠন। এদের অ্যাকটিভিস্টরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পেইন চালায়। কীভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে কথা বলতে হবে, কোন ধরনের যুক্তি আর পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে হবে, অ্যাকটিভিস্টরা কীভাবে ক্যাম্পেইন চালাবে, লবিয়িং করবে, এমনকি মিডিয়াতে কীভাবে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করবে—এ নিয়েও প্রশিক্ষণ দেয়। সবকিছু ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন হ্যান্ডবুকও প্রকাশ করে সংগঠনটি। ২০১৩ সালে সরোসের কাছ থেকে অনুদান পেয়েছিল এই

[৩১৪] Billionaire Bankster Penny PritzkerBreaks into Obama's Cabinet. Greg Palast, May 2, 2013. https://tinyurl.com/3mb7jedf

জিএসএ নেটওয়ার্ক।[৩১৫]

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে টাকা ঢালা অন্যান্য বিলিয়েনেয়ারদের সাথেও আছে সরোসের ঘনিষ্ঠতা আর রহস্যময় খাতির। সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের অ্যাড্রিয়ান কোমান ২০১৩ সালে আরকাস ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মসূচির পরিচালক পদ পায়। অন্যদিকে সরোস নিজেই আরকাস ফাউন্ডেশনের একজন ট্রাস্টি, এ ফাউন্ডেশনে লাখ লাখ ডলার দিয়েছে সে।

জন স্ট্রাইকারের বন্ধু টিম গিলের কথা মনে আছে? গিল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা? এই প্রতিষ্ঠানেরও একজন ট্রাস্টি সরোস, নিয়মিত এখানে সে টাকা ঢালে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ২০১৭-তে ২.৯ মিলিয়ন ডলার খরচ করা বোরিয়ালিস ফিলানথ্রোপি নামের প্রতিষ্ঠানকে সরোস এবং স্ট্রাইকার দুজনে মিলে টাকা দেয়।[৩১৬] ভালো কথা, ২০২০ সালে সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের ১ বিলিয়ন ডলারের একটা ফান্ড থেকে অনুদান পেয়েছে বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।[৩১৭]

কী, মাথা ঘুরছে? ঘোরারই কথা।

কোনো এক অজানা কারণে বিপুল অর্থসম্পদের মালিক বিকৃতির আইনি বৈধতার জন্য পাহাড়সম টাকা খরচ করে যাচ্ছে। টাকার জোরে প্রভাব কিনছে দেদারসে। একদিকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে যুক্ত প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা আর প্র্যাকটিসকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড আর কমিটিগুলোতে বসাচ্ছে নিজেদের লোক। বিকারে ভোগা রোগীদের ডাক্তার আর মনোবিদরা ঠিক কী বলবে, তাদের কোন ট্রিটমেন্ট বা ওষুধ দেওয়া হবে, ঠিক করে দিচ্ছে সেটাও। বিশ্বের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নানা কৌশল তৈরি করাচ্ছে জনমত নিয়ন্ত্রনের জন্য। নির্বাচিত হতে সাহায্য করছে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে এমন রাজনীতিবিদদের। প্রশাসনেও বসাচ্ছে নিজেদের পছন্দের লোক। প্রভাবিত করছে আইন, পলিসি ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

***

জর্জ সরোস একবার লিখেছিল,

---

[৩১৫] Riddell, Kelly. "George Soros: The money behind the transgender movement." The Washington Times. (2016).

[৩১৬] Bilek, Jennifer. The Billionaires Behind The Lgbt Movement. First Things (2020). https://tinyurl.com/me6z8jpw. Influence Watch, Arcus Operating Foundation. https://tinyurl.com/vu9j6bp5 Whatisawoman.uk, The Open Society Foundations. https://tinyurl.com/2z292ewb

[৩১৭] The Businesss Standard, Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund, 2020. https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/brac-uni-be-early-recipient-soross-1-billion-fund-39805

> আমি নিজেকে এক ধরনের দেবতা হিসেবে কল্পনা করতাম...সত্যি বলতে কী, ছোটবেলা থেকেই আমি নিজের ভেতরে জোরালো কিছু মেসায়ানিক[৩৯৮] ফ্যান্টাসি বয়ে বেড়াতাম। আমার মনে হতো এগুলোকে আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, তা না হলে এই ফ্যান্টাসিগুলো আমাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।[৩৯৯]

বহু বছর পর একজন সাংবাদিক তার কাছে এই কথাগুলোর অর্থ জানতে চাইলে সরোস বলে,

> নিজেকে ঈশ্বর মনে করা, সব কিছুর স্রষ্টা মনে করা, এটা এক ধরনের রোগ। তবে যখন থেকে আমি এভাবেই নিজের জীবনকে চালাতে শুরু করেছি, তখন থেকে আমি এটা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।[৪০০]

জর্জ সরোস আর তার বিলিয়েনেয়ার বন্ধুরা ঠিক কোন ধরনের পৃথিবী তৈরি করতে চায়, কোন ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে, কেমন নষ্ট দেবতা হিসেবে কল্পনা করে নিজেদের, তার একটা আভাস হয়তো বিশ্বজুড়ে বিকৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের গভীর আগ্রহ থেকে টের পাওয়া যায়।

---

[৩৯৮] মেসায়ানিক (messianic) অর্থ মসীহসংক্রান্ত। 'আল-মাসীহ' সাইয়্যিদিনা ঈসা আলাইহিস সালামের উপাধি। তবে ইংরেজি ভাষায় মসীহ কোনো জনগোষ্ঠীর ত্রাণকর্তা বা রক্ষাকারী অর্থেও ব্যবহার হয়। এখানে 'মেসায়ানিক ফ্যান্টাসি' বা 'মসীহসংক্রান্ত ফ্যান্টাসি' কথাটার দুটো অর্থ হতে পারে। সরোস নিজেকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা জাতীয় কিছু একটা হিসেবে দেখে। সে মনে করে, মানবজাতিকে রক্ষা করা তার অমোঘ নিয়তি। অন্য অর্থ হতে পারে, সরোস কোনো মসীহর জন্য অপেক্ষা করছে। আগের ও পরের বাক্য এবং পরের উদ্ধৃতির আলোকে প্রথম অর্থই এখানে প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশি।

[৩৯৯] Ehrenfeld, Rachel, and Shawn Macomber. "George Soros: The 'God'Who Carries Around Some Dangerous Demons." Los Angeles Times (2004): 2004.

[৪০০] Ibid

অধ্যায় ১৮

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা

'সমকামিতা যৌন বিকৃতি' থেকে 'সমকামী বিয়ে বৈধ'—এ অবস্থানে আসতে অ্যামেরিকার লেগেছে ছয় দশক। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এত সময় লাগছে না। কারণ, এরইমধ্যে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। আমরা দেখেছি সমকামিতার প্রচার, প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণের এই এজেন্ডা গ্লোবাল এবং বিশ্ব রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৫ সালে অ্যামেরিকায় সমকামী বিয়ে বৈধতা পাবার মাত্র তিন বছরের মাথায়, ভারতের মতো দেশে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অনুচ্ছেদ ৩৭৭ বাতিল করা হয়। বৈধতা দেওয়া হয় পায়ুসঙ্গমকে।

পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় সমকামিতার প্রচার ও প্রসারে নেওয়া পদক্ষেপগুলো একই বৈশ্বিক এজেন্ডার অংশ। বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে এলজিবিটি এজেন্ডার পক্ষে যা কিছু করা হচ্ছে, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে।[৪০১] আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইতিহাসকে আমরা চার পর্যায়ে ভাগ করতে পারি,

- প্রথম পর্যায় : এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য
- দ্বিতীয় পর্যায় : গবেষণা এবং যৌন অধিকার
- তৃতীয় পর্যায় : সমকামী অধিকার
- চতুর্থ পর্যায় : যৌন শিক্ষা এবং ট্র্যান্সজেন্ডার

তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক পর্যায় শেষ হবার পর নতুন আরেক পর্যায় শুরু হয়েছে,

---

[৪০১] বইয়ের কলেবর ছোট রাখার জন্য এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রাখার সুযোগ কম। আগ্রহী পাঠকেরা পড়তে পারেন পাঁচ পর্বের এই সিরিজটি - 'বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা?', আসিফ আদনান। https://chintaporadh.com/behind-the-curtain

ব্যাপারটা তা না। আন্দোলনগুলোর ইতিহাস সাধারণত এমন পরিপাটিভাবে আগায় না। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ওভারল্যাপ থাকে। এখানেও আছে। এই শ্রেণিবিভাগ আমি বোঝার এবং আলোচনার সুবিধার জন্য করেছি। কেউ চাইলে অন্য কোনোভাবেও শ্রেণিবিভাগ করতে পারেন।

এই চারটি পর্যায়ের প্রতিটিতে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়—

বিদেশি কানেকশন : বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল :

- পশ্চিমা ফান্ডিং
- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক
- দেশীয় এনজিও

পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি : বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশল হলো ধাপে ধাপে আগানো। প্রতি ধাপে তারা নীতিনির্ধারক এবং আমলাদের ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে। এ পদক্ষেপগুলো এমন যে, সেগুলো আলাদাভাবে খুব একটা চোখে পড়ার মতো না; কিন্তু দিনশেষে এগিয়ে যাওয়া যায় ধাপে ধাপে অনেকদূর।

মিডিয়া, সুশীল সমাজ, প্রগতিশীল : মোটামুটি শুরু থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া, সেলিব্রিটি, তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং প্রগতিশীলরা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহযোগী বা সমর্থক ভূমিকা পালন করে গেছে। প্রথমে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। আদর্শিকভাবে না হোক, অন্তত মুখ রক্ষার জন্য হলেও এলজিবিটি আন্দোলনের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিরোধিতা করা উচিৎ ছিল তাদের। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে ব্যাপারটাকে আর অদ্ভুত মনে হয় না। এলজিবিটি এজেন্ডার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক এনজিও নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশের সুশীল, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বড় একটা অংশ যেহেতু এনজিওজীবী, তাই বিরোধিতার কোনো ইচ্ছা থেকে থাকলেও ডলারের গরমে তা উবে গেছে দ্রুত। তাছাড়া প্রগতিশীলরা বিশ্বাসগতভাবেই পশ্চিম থেকে আসা যেকোনো মতবাদকে বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়। ক্রিটিকালি যাচাই করে না। তাই এলজিবিটি আন্দোলনের বয়ানও তারা গ্রহণ করে নিয়েছে বিনা প্রশ্নে।

শব্দজাদু : সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে বাংলাদেশে কাজ করা কঠিন। তাই শুরু থেকে এখানে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিকার শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আড়ালে। যেমন :

- Sexual Health বা যৌন স্বাস্থ্য

- MSM (Men Who Have Sex With Men) বা এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়
- Gender Identity বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়
- SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) বা যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার
- SOGI (Sexual Orientation And Gender Identity) যৌন রুচি এবং মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়
- SOGISEC (Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression And Sex Characteristic)
- Sexual Minorities বা যৌন সংখ্যালঘু
- Sexual Rights বা যৌন অধিকার
- Sexual Diversity বা যৌন বৈচিত্র্য
- Gender Diversity বা লিঙ্গ বৈচিত্র্য
- GDP (Gender Diverse Person) বা বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ
- CSE (Comprehensive Sexuality Education) যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা
- ট্র্যান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ যে নারী সাজে, অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী যে পুরুষ সাজে)

আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও এই সব কথাবার্তার মূল বক্তব্য এক। আর তা হলো, বিকৃত যৌনতা এবং ইচ্ছেমতো নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ। এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের এই কৌশল সম্পর্কে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।

প্রথম পর্যায় : এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে 'এইডস প্রতিরোধ'-এর ব্যানারে বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও। স্বাভাবিকভাবেই তখন (এবং এখনো) বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী। এইডস নিয়ে কাজ করার অর্থ ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা।

শিবানন্দ খান

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে উপমহাদেশে এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠে ভারতীয় সমকামী অ্যাকটিভিস্ট শিবানন্দ খান।[৪০২] শিবানন্দ উপমহাদেশে

[৪০২] Remembering Shivananda Khan, APCOM's founder on Human Rights Day, Dennis

এলজিবিটি নিয়ে কাজ করার জন্য নায ফাউন্ডেশন (NAZ Foundation International) নামে এনজিও তৈরি করে।[৪০৩] তার উৎসাহে সমকামী পুরুষদের **'যৌন স্বাস্থ্যসেবা'** ও 'সচেতনতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে তৈরি হয় বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।[৪০৪]

গবেষক আদনান হোসেইনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নায ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি শুরুতে বন্ধু-কে সহায়তা করেছিল 'ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি অ্যামেরিকান এনজিও।[৪০৫] অন্যদিকে বন্ধু'র ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ৯৬-এ যে প্রকল্প নিয়ে শিবানন্দ খান বাংলাদেশে এসেছিল, সেটাতে সহায়তা দিচ্ছিল অ্যামেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন।[৪০৬] অর্থাৎ শুরু থেকেই বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলন আমদানি করা হয়েছিল বিদেশি, বিশেষ করে, পশ্চিমা শক্তিগুলোর মদদে। সাথে ছিল ভারতীয় কানেকশন। এই প্যাটার্নের কথা আমরা আগেই বলেছি। পরেও আমরা এই প্যাটার্ন বারবার দেখতে পাবো।

এইডস মহামারি প্রতিরোধের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সহজেই বন্ধু'র মতো এনজিওগুলো কাজ করার সুযোগ পায়।[৪০৭] নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম। কিছুদিনের মধ্যে সমকামী পুরুষদের জন্য ড্রপ ইন সেন্টার (ডিআইসি) নামে ওয়ান স্টপ ক্লিনিক খোলে তারা।[৪০৮] বাহ্যিকভাবে যৌন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তৈরি হলেও ভেতরে ভেতরে এই সেন্টারগুলো হয়ে উঠে প্রচারণা, গণসংযোগ, নেটওয়ার্কিং, কমিউনিটি তৈরি এবং বিকৃতি চর্চার কেন্দ্র।[৪০৯]

এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রথম ধাপ।

Altman - https://www.apcom.org/remembering-shivananda-khan-apcoms-founder-on-human-rights-day-2/

[৪০৩] NAZ Org, UK. https://www.naz.org.uk/who-we-are#

QueerBio.com. Shivananda Khan.
https://queerbio.com/wiki/index.php/Shivananda_Khan

[৪০৪] Bandhu Social Welfare Society, About Us. https://www.bandhu-bd.org/about-bandhu (Accessed, Jan 15, 2024)

Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Annual Report 2021, p. 10

[৪০৫] Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

[৪০৬] BSWS, About Us. Ashoka Org. Shale Ahmed. https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed

Bangladeshi MSM activist awarded Ashoka Fellowship. The Daily Star. March, 2009. https://www.thedailystar.net/news-detail-80569

[৪০৭] Ashoka Org. Shale Ahmed.

[৪০৮] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115.

[৪০৯] Adnan. Section 377.

দ্বিতীয় পর্যায় : 'স্বাস্থ্য সেবা' থেকে 'যৌন অধিকার'

প্রথম দশ বছর কাজ চলে 'এইডস প্রতিরোধ' আর 'যৌন স্বাস্থ্য সেবা'র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/২০০৭ এর দিকে। এ সময়টাতে সমকামীদের 'যৌন সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের 'অধিকার' -এর দাবি নিয়ে আলাপ তোলা হয়। উলরিখসের বানানো সেই পুরোনো কৌশল বাস্তবায়িত হতে শুরু করে বাংলাদেশে। গবেষক ড. আদনান হোসেইন মন্তব্য করেছেন,

> সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো।[৪১০]

সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের এই সময়কার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ২০১১ সালে প্রকাশিত Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights: A Case Study From Bangladesh নামের নিবন্ধে।[৪১১] নিবন্ধের লেখকরা সবাই ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কার্যরত ছিলেন, অথবা আছেন। এই লেখকদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে যুক্তরাজ্যে আয়োজিত এক গবেষণা কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করার পর বাংলাদেশেও এ ধাচে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তারা।[৪১২] আবারও সেই পশ্চিমা কানেকশন।

সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতা নিয়ে (তাদের ভাষায় 'যৌন বৈচিত্র্য' নিয়ে) আলাপ তোলার জন্য ২০০৭ থেকে বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভা আয়োজন করতে শুরু করে ব্র্যাক। বিষয়টাকে তারা উপস্থাপন করে মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে। সমকামিতার সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার' (Sexual And Reproductive Health & Rights -SRHR) নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা।

২০০৭ এর জানুয়ারিতে ব্র্যাকের গবেষকদের উদ্যোগে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপটির ফান্ডিং করে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান DFID (Department of International Development)। ওয়ার্কশপের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন এখনো ব্রিটেনের সরকারি সাইটে বিদ্যমান।[৪১৩] ২০০৭ এর জুলাইয়ে,

---

[৪১০] Adnan. Section 377.

[৪১১] Rashid, Sabina Faiz, Hilary Standing, Mahrukh Mohiuddin, and Farah Mahjabeen Ahmed. "Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh." Health Research Policy and Systems 9, no. 1 (2011): 1-9.

[৪১২] Ibid, p 4

[৪১৩] Gov.uk. Summary Report: Sexuality and Rights Workshop, January 2007. https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/summary-report-sexuality-and-

'জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি' (লিঙ্গ ও যৌনতা) এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয় ব্র্যাক সেন্টারে। ব্র্যাকের গবেষকরা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> যেহেতু কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্র্যাক সেন্টারে এবং আয়োজক ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, তাই (কনফারেন্সের) বিষয়বস্তু বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। আমরা তাই নীতি-নির্ধারক এবং প্র্যাকটিশানারদের (নারীবাদী, অ্যাকটিভিস্ট, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, মিডিয়া প্রফেশনাল, ছাত্র, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, এনজিও, সমকামী, লেসবিয়ান এবং ট্র্যান্সজেন্ডার) বিভিন্ন গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিই।[৮১৪]

অল্প কিছুদিন পর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC) নামে একটি এনজিও যোগাযোগ করে জানায়, তারা বাংলাদেশে 'যৌন অধিকার' সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনুদান দিতে আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের এই এনজিও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে জাতিসংঘের পপুলেশন ফান্ড (UNFPA) এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে। এ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আছে অ্যামেরিকার রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথেও।[৮১৫]

অনুদানের অর্থ দিয়ে তিনটি কর্মশালা আয়োজন করে ব্র্যাকের গবেষকরা। এর মধ্যে দুটি ছিল প্রশিক্ষণের জন্য আর তৃতীয়টি ফলোআপ। প্রশিক্ষণে তিন ধরনের মানুষকে টার্গেট করা হয়—ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক, মিডিয়ার লোকজন এবং বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত মানুষ। অ্যাকাডেমিক ও মিডিয়ার লোকজনকে এলজিবিটি অধিকারের পক্ষে কথা বলতে উৎসাহিত করা হচ্ছিল, অন্যদিকে সমকামীদের বিভিন্ন সংগঠনকে দেওয়া হচ্ছিল সংগঠিত হবার সুযোগ ও এক্টিভিজম করার প্রশিক্ষণ।[৮১৬]

মিডিয়াতে সমকামিতাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার জন্য অভিনব এক কৌশল গ্রহণ করে ব্র্যাকের গবেষকর। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মুখ থেকেই শোনা যাক,

> ...যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাতে

---

rights-workshop-january-2007
ওয়ার্কশপের সামারি রিপোর্টের পিডিএফ –
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08ba8ed915d622c000e07/monograph_sexualityrights.pdf

[৮১৪] Ibid, p 4

[৮১৫] আইডাব্লিউএইচসি'র প্রতিষ্ঠাতা দুইজন। জোঅ্যান ডানলপ (Joan Dunlop) এবং অ্যাড্রিয়েন জার্মেইন (Adrienne Germain)। প্রথম জন এই প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে রকাফেলার ফাউন্ডেশনে কাজ করত। দ্বিতীয় জন কাজ করতো ফোর্ড ফাউন্ডেশনে। আইডাব্লিউএইচসি বিভিন্ন সময়ে রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানও পেয়েছে। দেখুন, Ford Foundation, Grants Database, https://tinyurl.com/3ve8vdnb

[৮১৬] Rashid et al. Creating. p 4

> সাংবাদিকদের লেখালেখি করতে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রকাশিত প্রতিটি নিউস আইটেম বা গল্পের জন্য সামান্য কিছু আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করি...[৪১৭]

২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়টায় আরও কাজকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে,

> '...বাংলাদেশ **দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার** তাৎপর্য নিয়েও একটি মিটিং আয়োজন করি আমরা।[৪১৮]

অনুচ্ছেদ ৩৭৭ নিয়ে তাদের মনোযোগী হবার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। উলরিখস, হার্শফেল্ড এবং হ্যারি হেইদের মতো বাংলাদেশেও বিকৃত যৌনতার প্রচারকরা পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দেওয়াকে তাদের মূল লক্ষ্য বানায়। নাম, পরিভাষা, সময় আর স্থান বদলালেও মূল এজেন্ডা থেকে যায় অপরিবর্তিত।

প্রভাব

ব্র্যাকের উদ্যোগ বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তারাই বাংলাদেশে প্রথম মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে বিকৃত যৌনতার পক্ষে আলাপ তোলে। পুরো ব্যাপারটাকে মুন্সিয়ানার সাথে দেখানো হয় 'নিরীহ গবেষণা' হিসেবে। 'সমকামিতার বৈধতা চাই' বলা হলে যেভাবে বাঁধা তৈরি হতো 'গবেষণা'র ক্ষেত্রে তা হয় না; বরং এভাবে তুলে ধরার কারণে অনেকের কাছে বিষয়টা গ্রহণযোগ্যতা পায়।[৪১৯]

এই 'অবদানের' স্বীকৃতিও পায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২০ সালে ১ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করে জর্জ সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন। এই তহবিলের জন্য পুরো পৃথিবী থেকে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোনীত করা হয়, যার মধ্যে একটি ছিল ব্র্যাক।[৪২০]

***

ব্র্যাকের উদ্যোগের পর বাংলাদেশে ক্রমশ এলজিবিটি আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। বন্ধু'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ব্র্যাকের আনা মানবাধিকার ও 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার'-এর আলাপ তাদের প্রচারণা এবং কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত করে নেয়। মিডিয়া, অ্যাকাডেমিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থনে

---

[৪১৭] Ibid. p 7

[৪১৮] Ibid. p 5

[৪১৯] Ibid, p 7

[৪২০] Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund. The Businesss Standard. January 28, 2020. https://tinyurl.com/2s4xhdz6

কিছু মানুষ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত লোকেরা অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাকটিভিসম সংক্রান্ত জরুরি প্রশিক্ষণ পায় ওয়ার্কশপগুলোতে। সক্রিয় হয়ে উঠে বিভিন্ন এলজিবিটি সংগঠন। এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আগ্রহী হয় বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামী আন্দোলন শুরু করার প্রতি। আর এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায় : প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাকটিভিসম

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্যাট গ্রুপ আর ফোরামের মাধ্যমে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তিদের এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে বাংলাদেশে। ১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি 'গে বাংলাদেশ' নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল বাংলাদেশে এ ধরনের প্রথম গ্রুপ। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য রেঙ্গু জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় পশ্চিমে কাটিয়েছিল।

বাংলাদেশের এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রতিটা ধাপেই বিদেশি কানেকশন খুঁজে পাওয়া যায়। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের শুরু বিলেতফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্যমে। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের 'অনুপ্রেরণা' আসে ব্রিটেনে কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণের পর। আর সমকামী ই-গ্রুপগুলোর পথচলা শুরু হয় বিদেশফেরত রেঙ্গুর মাধ্যমে। ২০০৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় রেঙ্গু। গে বাংলাদেশের কার্যক্রম থেমে যায় সেখানেই।[৪২১]

বয়েস অফ বাংলাদেশ (বব)

'গে বাংলাদেশ' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০২ গড়ে উঠে আরেকটি ই-গ্রুপ, বয়েস অফ বাংলাদেশ (Boys of Bangladesh/BoB)। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে 'গেট টুগেদার' এবং 'ডিজে পার্টি'র আয়োজন করতে শুরু করে বব। প্রথম পাঁচ বছর বব-এর কার্যক্রম অনলাইন নেটওয়ার্কিং আর অফলাইন 'ডিজে পার্টি'র মধ্যে সীমিত থাকে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। সে বছর ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বব। এই ওয়ার্কশপের পর অ্যাক্টিভিসমে আগ্রহী হয়ে উঠে তারা।

২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙ্গিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে অনুষ্ঠান করে বব। একে

[৪২১] BoB website (now defunct). History of the E-Groups and BoB's Evolution. Accessed through Wayback Machine, https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html (Accessed, Jan 15, 2024)

বাংলাদেশে কোনো সমকামী সংগঠনের প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে।[৮২২] বাংলাদেশে সমকামী সংগঠনগুলোর অধিকাংশ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হয়েছে জার্মান ইনস্টিটিউট, ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ এর প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এখানেও সেই একই পশ্চিমা কানেকশন।

২০০৯ সালে কক্সবাজারের হোটেল সী গালে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে বব।[৮২৩] ওয়ার্কশপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমত, বিকৃত যৌনতার বৈধতা আদায়ের জন্য জোট গঠন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য কাজ করা।[৮২৪] এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯-এ জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে ৩৭৭ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়।[৮২৫] জাতিসংঘে জমা দেওয়া বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এসআরআই (সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ-SRI) নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। আর এসআরআই-কে সহযোগিতা করে বব।[৮২৬] বয়েস অফ বাংলাদেশের মতো একটি অনিবন্ধিত, ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সংগঠন কত সহজে জাতিসংঘ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, তা থেকে বৈশ্বিক এলজিবিটি মাফিয়ার শক্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

২০১৩ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায় বব।[৮২৭] এ বছর আবারও জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে বাংলাদেশ সরকারকে ৩৭৭ নম্বর সেকশন বাতিল করতে বলা হলে বাংলাদেশ তা প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না।[৮২৮]

২০১৩ এর এপ্রিল ও মে মাসে ব্র্যাক জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আর বয়েস অফ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দুটি গোলটেবিল বৈঠক হয়। বাংলাদেশে

---

[৮২২] BoB website (now defunct). Our History. Accessed through Wayback Machine, https://web.archive.org/web/20240123165703/http://www.boysofbangladesh.org/

[৮২৩] Ibid

[৮২৪] Hossain, Adnan. "Section 377

[৮২৫] ইউনিভার্সাল পিরিওডিক জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়।

[৮২৬] Sexual Rights Initiative. "Report on Bangladesh–4th Round of the Universal Periodic Review–February 2009." (2009). BoB website (now defuct). Our History.

[৮২৭] The Universal Periodic Review and LGBTI Rights in Bangladesh, 17th October 2013, Alessia Valenza, ILGA Asia. Accessed through Wayback Machine,https://web.archive.org/web/20150303033427/https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

[৮২৮] Bangladesh Refuses To Abolish Criminalisation Of Consensual Same-Sex Ties, DNA. November 21, 2013. https://tinyurl.com/mrusjmvh

এলজিবিটি অধিকার আন্দোলনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আলোচনা হয় তা নিয়ে। এ অনুষ্ঠানে সমকামী সংগঠনগুলোর সদস্য এবং ব্র্যাকের গবেষকদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দূতাবাস এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও।[৪২৯]

২০১৪ সালে মার্কিন সরকারের স্টেইট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে 'প্রজেক্ট ধী' নামে একটি প্রকল্প শুরু করে বব। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে মুন্সিগঞ্জের একটি রিসোর্টে দুই দিন ব্যাপী 'ধী রেসিডেন্সি' নামের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৪৩০] বর্তমানে ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে খ্যাতি পাওয়া অনেকেই বয়েস অফ বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধী রেসিডেন্সিতে অংশ নেয়।[৪৩১]

এ বছরের অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'ধী' নামে কমিকবুক, যার প্রধান চরিত্র হলো একজন সমকামী নারী। এই কমিকের মোড়ক উন্মোচন হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলে। ডেইলি স্টার এবং ডয়েচে ভেলের মতো মিডিয়াগুলো অনুষ্ঠানটি নিয়ে ইতিবাচকভাবে নিউজ করে।[৪৩২] প্রজেক্ট ধী'র অংশ হিসেবে ২০১৬ নাগাদ দেশের ১৩টি জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন করে বয়েস অফ বাংলাদেশ।

রূপবান

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে এবং বব-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গড়ে উঠে আরও কিছু সমকামী সংগঠন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'রূপবান'। ২০১১ থেকে নেটওয়ার্কিং শুরু করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আত্মপ্রকাশ করে ২০১৪ সালে, 'রূপবান' নামে দেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে।[৪৩৩] এই ম্যাগাজিনের প্রচারণা চলে প্রিন্ট মিডিয়া এবং অনলাইনে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় তৎকালীন

---

[৪২৯] JPGSPH Hosts Round Table on SOGI Issues at Bangladesh UPR 2013. https://www.bracu.ac.bd/news/jpgsph-hosts-round-table-sogi-issues-bangladesh-upr-2013. Roundtable on LGBT movement. https://www.bracu.ac.bd/news/roundtable-lgbt-movement
Original links now defunct can be accessed through Wayback Machine, here
https://web.archive.org/web/20240122201634/https://www.bracu.ac.bd/news/jpgsph-hosts-round-table-sogi-issues-bangladesh-upr-2013
https://web.archive.org/web/20240122101659/https://www.bracu.ac.bd/news/roundtable-lgbt-movement

[৪৩০] BoB website (now defunct). Our History.

[৪৩১] প্রজেক্ট ধী-এর ইনস্টাগ্রাম – https://www.instagram.com/projectdhee/

[৪৩২] The Story of Dhee. The Daily Star. https://www.thedailystar.net/the-star/human-rights/the-story-dhee-140974
বাংলাদেশে সমকামী নারীদের নিয়ে কমিক স্ট্রিপ। ডয়েচে ভেলে।
https://www.dw.com/bn/বাংলাদেশে-সমকামী-নারীদের-নিয়ে-কমিক-স্ট্রিপ/g-18697567

[৪৩৩] Hossain Adnan. 2019. "Roopban." Pp. 1390–92 in The Global Encyclopedia of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer History, edited by H. Chiang and A. Arondekar. Farmington Hills, MI: Charles Scribner and Sons.

ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরও অনেকে। ম্যাগাজিনটির প্রকাশনার খবর ফলাও করে প্রচার করে ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসিসহ বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যম।[৪৩৪] বরাবরের মতো এখানেও সেই পশ্চিমা কানেকশন। রূপবানের প্রধান উদ্যোক্তা জুলহাস মান্নান মার্কিন দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা। ইউএসএইডের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল।[৪৩৫]

সমকামী অ্যাকটিভিস্ট তৈরির জন্য 'ইয়ুথ লিডারশীপ প্রোগ্রাম' নামে দেশজুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন করে রূপবান।[৪৩৬] প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের দিক থেকে রূপবান বেশ অনেকটা ছাড়িয়ে যায় বব-কে। ২০১৪ এবং ২০১৫-তে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে আয়োজন করে 'রংধনু র‍্যালি'। শাহবাগে রংবেরঙের পোশাক পরে মিছিল করে হিজড়া এবং সমকামী পুরুষরা। এ সময়টাতে রূপবান দুটি 'ফ্যাশন শো' ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যেগুলোর মূল থিম ছিল ট্র্যান্সজেন্ডার ও ক্রসড্রেসিং। অর্থাৎ সমকামী পুরুষদের নারীর পোশাকে সাজা।[৪৩৭] ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের বিষয়টি লুকানোর কোনো চেষ্টা এই সময়টাতে ছিল না।

নিষিদ্ধ সংগঠন আল-কায়েদা জুলহাস মান্নান ও তার সহগামী মাহবুবকে ২০১৬ সালে হত্যা করার পর স্তিমিত হয়ে আসে রূপবানসহ অন্যান্য সমকামী সংগঠনের কার্যক্রম। দেশ ছেড়ে চলে যায় অনেক অ্যাক্টিভিস্ট। প্রায় বন্ধ হয়ে যায় সমকামী অধিকার নিয়ে প্রকাশ্য কার্যক্রম। এমন পরিস্থিতিতে শুরু হয় বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়।

চতুর্থ পর্যায় : ট্র্যান্সজেন্ডার, হিজড়া ও যৌন শিক্ষা

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামনে আনে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে। এই পরিবর্তনের পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। ২০১৫-এর পর থেকে পশ্চিমা দাতারা ক্রমেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে অর্থায়নও শুরু করে আন্তর্জাতিক সংস্থা

---

[৪৩৪] First local magazine for gays launched. The Daily Star. January, 2014. https://tinyurl.com/3hzbuvem
First ever LGBT magazine launched. Dhaka Tribune. January, 2014. Accessed through Wayback Machine,
https://web.archive.org/web/20140123051238/http://www.dhakatribune.com/arts-amp-culture/2014/jan/20/first-ever-lgbt-magazine-launched

[৪৩৫] Hossain, Adnan. 2019. "Roopban.".

[৪৩৬] Roopbaan.org. Roopbaan Youth Leadership Program (2015, 2016) https://roopbaan.org/2017/09/23/roopbaan-youth-leadership-program-2015-2016/

[৪৩৭] Roopbaan.org. RB-SNS Trans Show (2014).
https://roopbaan.org/2017/09/23/rb-sns-trans-show-2014/
DragonBall (2015). https://roopbaan.org/2017/09/23/dragonball-2015/

এবং দাতারা। সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাতাদের পছন্দ, কৌশল মূল্যায়নসহ নানা দিক বিবেচনা করে দেশীয় এনজিও এবং সংগঠনগুলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে সামনে রেখে কাজে মনোযোগী হয়। আর এজন্য কাজে লাগায় হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গের মতো শব্দগুলিকে।

হিজড়া নিয়ে অ্যাকটিভিসম

২০০০ সালে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে 'বাঁধন হিজড়া সঙ্ঘ' নামে একটি এনজিও গড়ে ওঠে। পরের বছর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করার জন্য 'সুস্থ জীবন' নামে একটি এনজিও তৈরি করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।[৪৩৮] ২০১০ নাগাদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এনজিওগুলোর কাজ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে।[৪৩৯] তবে এসব এনজিও'র মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায়ের লাভ কতটুকু হয়েছে তা নিয়ে আছে মিশ্র অনুভূতি। হিজড়াদের অনেকে মনে করেন এনজিও চালানো লোকেরা নিজেরা প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলেও গরিব হিজড়াদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।[৪৪০]

২০০৭-এর পর এনজিওগুলো 'যৌন স্বাস্থ্য'-এর বদলে 'অধিকার'-এর আলাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে। এই দাবির পেছনেও মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। নেপালে এবং পাকিস্তানের পর, ২০১৩ সালে বাংলাদেশেও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় হিজড়াদের। দেশীয় এনজিও, তাদের বিদেশি ডোনার আর বৈশ্বিক এলজিবিটি আন্দোলন এই স্বীকৃতিকে দেখে তাদের সাফল্য হিসেবে। ২০১৫-তে ঢাকায় ব্যাপক জাঁকজমকের সাথে 'হিজড়া প্রাইড' নামে মিছিল আয়োজন করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা এরই মধ্যে দেখেছি 'প্রাইড প্যারেড' বা 'প্রাইড মিছিলের' ধারণাটা সরাসরি অ্যামেরিকান সমকামী আন্দোলন থেকে আসা।[৪৪১] এই মিছিলে হিজড়াদের পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন পশ্চিমা দূতাবাস আর দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদের।[৪৪২] হিজড়াদের তারা সংজ্ঞায়িত করে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যাদের জন্মগতভাবে 'যৌন এবং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী'। অর্থাৎ হিজড়া বলতে মানুষ ইন্টারসেক্স

---

[৪৩৮] Hossain, Adnan. "The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh." Culture, Health & Sexuality 19, no. 12 (2017): 1418-1431.

[৪৩৯] Ibid

[৪৪০] Adnan. Review of LGBT situation in Bangladesh.

[৪৪১] Pride Parade: https://en.wikipedia.org/wiki/Pride_parade

[৪৪২] Hossain, Adnan. The paradox.

বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বোঝায়। যেহেতু তাদের সমস্যা জন্মগত, এর ওপর তাদের কোনো হাত নেই, তাই এ ধরনের মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি আছে। সরকারি স্বীকৃতিতেও হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে'। যাদের জন্মগত সমস্যা আছে শুধু তাদেরকেই হিজড়া হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৪৪৩]

অর্থাৎ হিজড়ার সংজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক আর বাংলাদেশের সমাজ ও সরকারের অবস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার : শব্দের রাজনীতি

২০১৫ সালে সামাজিকীকরণের অংশ হিসেবে মোট চৌদ্দজন হিজড়াকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মেডিক্যাল টেস্টে দেখা যায় ঢাকা থেকে বাছাই করা ১২ জন হিজড়ার মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে। তারা সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। বাকি একজনও জন্মগতভাবে সুস্থ পুরুষ ছিল, এই পরীক্ষার বছর দুই আগে স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের লিঙ্গ আর অন্ডকোষ অপসারণ করেছে সে। এর পর বারো জনেরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়।[৪৪৪] এ ঘটনার পর থেকে এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাদের অবস্থানে পরিবর্তন আনে।

প্রথমত, তারা হিজড়া সনাক্তকরণে শারীরিক পরীক্ষা বাদ দিতে বলে।

দ্বিতীয়ত, হিজড়ার পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা সামনে আনতে শুরু করে।

শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারে তারা দাবি করে বসে, এতে নাকি যৌন হয়রানি হচ্ছে। অথচ ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী, বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসে কাজ করা মানুষদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা হয় নিয়মমাফিক, এ নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। কেবল হিজড়াদের ক্ষেত্রেই সমস্যা! যেখানে হিজড়াদের বিশেষ সুবিধা এবং স্বীকৃতি দেওয়াই হচ্ছে 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হবার কারণে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষা আবশ্যক। কোনো মানুষ যদি অন্ধ বা বধির হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পায়, ভাতা পায়, তাহলে সে আসলেই অন্ধ বা বধির কি না, তা যাচাই করা জরুরি। হিজড়াদের শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে এই আপত্তি তাই একেবারেই অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তা ব্যাখ্যা করি।

---

[৪৪৩] Ibid

[৪৪৪] বিবিসি নিউজ, ডাক্তারি পরীক্ষার পর ১২ 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত, ২০১৫। https://tinyurl.com/yftba43u

এলজিবিটি নেটওয়ার্ক চায় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি। তারা মনে করেছিল, হিজড়াদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধলো যখন সরকারিভাবে হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হলো 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে। কারণ, এভাবে সংজ্ঞা দেওয়ার ফলে, শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারটা চলে আসলো। আর পরীক্ষা হলে স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লোকেরা কিংবা অপারেশন ছাড়াই নারী সাজা পুরুষেরা ধরা পড়ে যাবে। এদের মধ্যে আগে যারা হিজড়া বলে পরিচিত ছিল, ধরা পড়বে তারাও। অর্থাৎ ২০১৩-এর স্বীকৃতির ফলে এলজিবিটি নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য তো অর্জিত হলোই না, উল্টো দেখা দিলো সমস্যা।

এ পরিস্থিতিতে তাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল,

- হিজড়া শব্দকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা অথবা
- হিজড়ার পাশাপাশি আইনে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাও যুক্ত করা।

হিজড়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে। পত্রপত্রিকাতে প্রায়ই পথেঘাটে চাঁদাবাজি, বাসাবাড়িতে হানা দেওয়া, দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে হিজড়াদের যুক্ত থাকার খবর দেখা যায়। এ ধরনের কার্যকলাপের কারণে সমাজের অনেকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। তবু সমাজ হিজড়াদের জায়গা দিচ্ছে, কারণ মানুষ মনে করে হিজড়ারা জন্মগতভাবে যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এ অবস্থার ওপর তাদের কোনো হাত নেই এবং তাদের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কেউ যদি এখন বলে বসে—হিজড়া আসলে শুধু জন্মগত সমস্যাযুক্ত মানুষ না, বরং শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষও স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে পারে—ঐ সহানুভূতিটুকু তখন আর থাকে না। কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারী সাজছে, সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উপদ্রব করছে, নানা অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, তারপর তারাই আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুবিধা চাইছে—এটা সমাজ মেনে নেবে না। সহানুভূতি উবে যাবে, থেকে যাবে ক্ষোভ। যার ফলাফল ভালো হবে না। কাজেই হিজড়া শব্দকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

বাংলাদেশে সক্রিয় এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তাই বেছে নেয় দ্বিতীয় রাস্তা। জোর দিতে শুরু করে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের ওপর। এতে করে একদিকে হিজড়া আর ট্র্যান্সজেন্ডারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে 'ট্র্যান্সজেন্ডার'দের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা যায়। অন্যদিকে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনে ঢুকিয়ে দেওয়া গেলে তৈরি হয়ে যায় সমকামিতার বৈধতার পথ। কারণ, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি।

এলজিবিটি অ্যাকটিভিস্টরা এসময় থেকে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে সামনে আনতে শুরু করে। তারা আরও দুটি কাজ করে। তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ' কথাটার বিরোধিতা

করে। কারণ, তৃতীয় লিঙ্গ দ্বারা আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হয়। কিন্তু তাদের দরকার মনে মনে 'মনে হওয়া'-র স্বীকৃতি। অন্যদিকে তারা বলতে শুরু করে, 'হিজড়া' কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি'।

এ কথা বলার মূল কারণ হলো, আইনে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ঢোকানোর অজুহাত তৈরি করা। তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, হিজড়াদের তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে, তোমরা ট্রান্সজেন্ডার শব্দ নিয়ে এত মাতামাতি করছো কেন? তখন তারা বলবে, 'হিজড়া কোনো জেন্ডার না, এটা একটি সংস্কৃতি। আর যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা সংস্কৃতি তাই অনেকে এই সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণ না-ও করতে পারে। হিজড়া নামে নিজেকে পরিচয় না-ও দিতে পারে তারা। তাদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করা উচিৎ। এই কারণে আইনের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা থাকা দরকার।'

আদতে মূল কারণ হলো, সুস্থ পুরুষের নারী পরিচয় দিয়ে এবং সুস্থ নারীর পুরুষ পরিচয় দিয়ে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার সামাজিক ও আইনি বৈধতা তৈরি। এই হলো হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার শব্দের পেছনের রাজনীতি।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রম

নতুন কৌশল নেবার পর থেকে গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের এলজিবিটি নেটওয়ার্ক বর্তমানে তাদের পুরো শক্তি একত্রিত করেছে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

আইন

বাংলাদেশে রীতিমতো আইন প্রনয়ন করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় প্রকাশিত *'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে'* শিরোনামে এক খবরে বলা হয়েছে,

> 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।...'[৪৪৫]

অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে এ ধরনের বিকৃতিতে মূলস্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তা করা হচ্ছে অধিকারের নামে। ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত *'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা'*, শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

---

[৪৪৫] ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১০, ২০২২
https://www.newsbangla24.com/news/182775/The-law-is-to-protect-transgender-people

> 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ 'শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, '...এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।'[৪৪৬]

যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ আইনের খসড়া হয়েছে এবং তা পাস করানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও এবং মার্কিন সরকার। বিষয়টি উঠে এসেছে মার্কিন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যেই।

মার্কিন কানেকশন

২০২৪ এর জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা এবং ফ্লোরিডা রাজ্যের গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা অ্যামেরিকান জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের অপচয়। অন্যদিকে রন ডিস্যান্টিসের বক্তব্যের সূত্র ধরে সিএনএন জানিয়েছে, এই প্রকল্প বাইডেনের সময়ে শুরু হয়নি, ২০১৮ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে শুরু হয়েছে।[৪৪৭] অর্থাৎ, অ্যামেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একমত।

ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাতে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে তারা সহায়তা দিচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ২০২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথমবারের মতো 'তৃতীয় লিঙ্গ'-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে,

> লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রকল্পে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া জমা দিয়েছে, যাতে যৌন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং

---

[৪৪৬] দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা: খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩
https://www.ittefaq.com.bd/669275/সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

[৪৪৭] CNN, Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump, 2023
https://edition.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html

অন্যান্য অধিকার বৃদ্ধি পায়।[৪৪৮]

অর্থাৎ, বাংলাদেশ ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করেছে 'নাগরিক সংগঠন'গুলো, তাও আবার ইউএসএইডের অর্থায়নে। সেই নাগরিক সংগঠন কারা? এ প্রশ্নের উত্তর আছে ইউএসএইডের আরেক প্রতিবেদনে। Final Performance Evaluation For USAID's Rights For Gender Diverse Populations (RGDP) Activity (২০২১), শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়েছে 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'কে।

ট্রান্সজেন্ডার আইনের পেছনে বন্ধু'র ভূমিকার কথা উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনেও। বন্ধু'র ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

> 'সমাজসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধুর সাথে সহযোগিতা করেছে এবং ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের খসড়া প্রস্তুত করেছে।'[৪৪৯]

এই সহযোগিতা ঠিক কেমন তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, বন্ধু'র আরেকটি প্রতিবেদনে। এ প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছে বন্ধু-ই। তারপর তারা সেটা জমা দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে।[৪৫০]

টাইমলাইনটা লক্ষ্য করুন। বন্ধু এবং তাদের অ্যামেরিকান মনিবরা বলছে, ২০২১ সালে তারা খসড়া বানিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে ২০২২ এর মার্চ মাসে সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখছি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে, '...আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি...'। তারপর আবার ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে বলা হচ্ছে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে'।[৪৫১] সবশেষে ২০২৩ এর ডিসেম্বরে পত্রিকায় এসেছে, 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে'।

অর্থাৎ এজেন্ডা আর পয়সা দিয়েছে অ্যামেরিকা ও এডিবি, তাদের ফরমায়েশ

---

[৪৪৮] USAID, 5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World. 2021. https://medium.com/usaid-2030/5-ways-usaid-promotes-lgbtqi-inclusion-around-the-world-dd665506c7ab

[৪৪৯] Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p 6

[৪৫০] Bandhu Annual Report 2021, p 32

[৪৫১] ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে, সাম্প্রতিক দেশকাল, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৩। https://tinyurl.com/3dy3p32z

অনুযায়ী আইনের খসড়া বানিয়েছে বন্ধু, আর সেটাই গৃহীত হয়ে গেছে!

ওপরের তথ্যগুলো ও স্বীকারোক্তি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অ্যামেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের নির্দেশনায় এবং এটি করা হচ্ছে বৈশ্বিক এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ হিসেবে।

শিক্ষা

সামাজিকভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার জন্য চলমান নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং অবাধ যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ। এখানে কাজ চলছে দুইটি ধারায়। একটি হলো সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের শিক্ষা। অন্যটি হলো যৌন শিক্ষার নামে অবাধ, বিকৃত যৌনতা এবং এলজিবিটি মতবাদের স্বাভাবিকীকরণ।

পাঠ্যপুস্তকে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেওয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

> 'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'

এ গল্পে 'শরীফা' নিজেই স্বীকার করছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ। যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সে নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

> '...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্র্যান্সজেন্ডার।'

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

> '...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

> 'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'
>
> '...এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

> '...একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।'[৪৫২]

কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের বক্তব্য। উলরিখস, হার্শফেল্ড, দ্য বোভয়া, জন মানি, হ্যারি বেঞ্জামিন, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, জুডিথ বাটলার আর জুলিয়া সেরানোদের চিন্তার জগাখিচুড়ি মিশেল। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে 'ট্র্যান্সজেন্ডার' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য থেকে যায় একই।

২৪ সালের বইয়ে শরীফার গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে- 'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'। নতুন বইয়েও শোনানো হয়েছে সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে মেয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প। ৪২ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে,

> 'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'[৪৫৩]

আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের।

শরীফার গল্প কি আসলে ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে?

আগের অধ্যায়গুলোর আলোচনার আলোকে যে-কেউ বুঝবেন 'শরীফার গল্প' ট্র্যান্সজেন্ডার নামের বিকৃতি নিয়ে। বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু অজ্ঞতা অথবা অন্য কোনো অজানা কারণে অনেকেই এ গল্পের সাথে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তাই স্পষ্ট বিষয়টাই আবার স্পষ্ট করে দিই।

দেখুন, গল্পটিতে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শরীফ জন্মেছে একজন সুস্থ পুরুষ হিসেবে। শারীরিকভাবে সে ত্রুটিহীন। কিন্তু নিজেকে সে নারী 'মনে করে'। তারপর গল্প গেছে হিজড়া নিয়ে আলোচনায়। অথচ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান অনুযায়ী

---

[৪৫২] ২০২৩ সালের বইয়ের লিংক, এনসিটিবির সাইট থেকে নেওয়া,
https://drive.google.com/file/d/1H5TCzUhmgAJxX03-fKLz8l5OApeeY4Y-/view

[৪৫৩] ২০২৪ সালের বইয়ের লিংক, এনসিটিবির সাইট থেকে,
https://drive.google.com/file/d/1vZAGTwOILI230gLfEycVbjVFzOCvT3m2/view

হিজড়া হলো 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' মানুষ। হিজড়াদের সমস্যা শারীরিক ও জন্মগত। অন্যদিকে শরীফ সুস্থ পুরুষের শরীর নিয়ে নিজেকে নারী বলে পরিচয় দিচ্ছে; যা মানসিক বিকৃতি। শরীফ হিজড়া না। কাজেই এ 'গল্পকে' কোনোভাবেই হিজড়াদের সাথে মিলিয়ে ফেলা যায় না।

এখানে ট্রান্সজেন্ডারবাদের বয়ানকে তুলে ধরা হয়েছে, যার মূল বক্তব্য হলো - একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি নিজেকে নারী দাবি করে তাহলে সে নারী। আবার নারীদেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে তাহলে সে পুরুষ।

'হিজড়া' শব্দ ব্যবহার হলেও পুরো গল্পে বর্ণনা এসেছে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, আপনি গরু রচনা লেখলেন; কিন্তু বর্ণনা দিলেন জলহস্তীর। তারপর বললেন এখানে জলহস্তী কোথায় আছে, আমি তো লিখেছি গরু! এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বইতে এবং শিক্ষা গাইডেও সরাসরি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিই এসেছিল।[৪৫৪]

পাঠ্যবইয়ে এই মতবাদ আসলো কীভাবে?

পাঠ্যবইয়ে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ঢোকানোর পেছনে আছে এনজিও এবং এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। এ ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকার কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপার্সন এবং নির্বাহী পরিচালকের লেখায় বলা হচ্ছে,

> 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাথে দৃঢ় লবিরিং এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া এবং লিঙ্গ রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত (কম্প্রিহেনসিভ) অংশ সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'[৪৫৫]

একই প্রতিবেদনের ৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এই আলোচনাগুলো এসেছে 'ক্লাস ৭ এর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে'।[৪৫৬]

শিক্ষাক্রমে এনজিওদের প্রভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে দেশের সংবাদপত্রগুলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও। ২৫শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলা ট্রিবিউনে

---

[৪৫৪] ২৫শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে, দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদন, 'কার ভুলে পাঠ্যবই বিতর্ক?'-এ লিখা হয়েছে, "এদিকে পাঠ্যবই থেকে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি তুলে নিয়ে থার্ড জেন্ডার লিখলেও শিক্ষক গাইডে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি উল্লেখ ছিল। গতকাল বুধবার সকালে শিক্ষক গাইড থেকেও শব্দটি পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড...সপ্তম শ্রেণির যে বইয়ে 'শরীফার গল্প' নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে সেই বইয়ের শিক্ষক গাইডেও বিতর্কিত শব্দগুলো ছিল।"
https://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2024/01/25/কার-ভুলে-পাঠ্যবই-বিতর্ক/

[৪৫৫] Bandhu Annual Report 2022, p 7

[৪৫৬] *Ibid*, p 9

প্রকাশিত 'গোঁজামিলে তৈরি হচ্ছে নতুন কারিকুলাম' প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে,

> জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নির্দেশিকাতেই নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে...অভিযোগ রয়েছে, ১৫ সদস্যের ওই গ্রুপের ছয়জন সদস্যকে বাইপাস করে ইউনিসেফ, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কারিকুলাম তৈরির কাজ হচ্ছে।[৪৫৭]

যৌন শিক্ষা ও এলজিবিটি

যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ এবং বৈধতার পেছনে কথিত 'যৌন শিক্ষা'র ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। শিশু-কিশোরদের মাথায় শুরুতেই যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—মানুষ ইচ্ছেমতো যৌনসঙ্গী বেছে নিতে পারে, ইচ্ছেমতো যৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, নিজের পরিচয় বেছে নিতে পারে ইচ্ছেমতো, সবই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়—তাহলে এক প্রজন্মের মধ্যেই সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের অবনতি নিয়ে আসা সম্ভব। আর আমরা আগেই জেনেছি, যৌন শিক্ষার ব্যানারে 'কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশান' নামে আজ যে কারিকুলাম বৈশ্বিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, তা তৈরি হয়েছে কলুষতার কারিগর অ্যালফ্রেড কিনসির বিকৃত ও জোচ্চুরিভরা গবেষণার ভিত্তির ওপর।

ইউনিসেফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের ক্রমাগত চাপে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষার অংশ যুক্ত করা হয়।[৪৫৮] এসব অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে অভিভাবক, সাধারণ জনগণ, এমনকি শিক্ষকরাও। প্রতিবাদের মুখে ২০১৪/১৫ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না পশ্চিমারা। ২০১৬ সালে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিডা (SIDA), আঞ্চলিক নারীবাদী এনজিও অ্যারো (ARROW), এবং দেশীয় নারীবাদী এনজিও 'নারীপক্ষ'-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যৌন শিক্ষার অবস্থা নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।[৪৫৯] 'সহায়তা' দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ প্রতিবেদনে

---

[৪৫৭] গোঁজামিলে তৈরি হচ্ছে নতুন কারিকুলাম। বাংলা ট্রিবিউন, ডিসেম্বর ২৫, ২০২১। https://www.banglatribune.com/educations/719932/গোঁজামিলে-তৈরি-হচ্ছে-নতুন-কারিকুলাম

[৪৫৮] Sabina, Nazme. Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and High Secondary Education in Bangladesh: Building New Constituencies for Women's Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR): Interlinkages Between Religion and SRHR. Naripokkho, 2016.

[৪৫৯] SIDA: The Swedish International Development Cooperation Agency, সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, https://www.sida.se/en

ARROW: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, আঞ্চলিক নারীবাদী সংগঠন, https://arrow.org.my

পাঠ্যবইগুলোর যৌন শিক্ষা অংশের বেশ কিছু দিকের সমালোচনা করা হয়। যেমন :

- বইগুলোতে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো কাজগুলোকে সমাজের জন্য হুমকি বলা হয়েছে।
- মাদরাসা বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে যিনা, সমকামিতা হারাম।
- বলা হয়েছে, যৌনতা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে।[৪৬০]

অর্থাৎ এনজিওদের মতে, শিশু-কিশোরদের শেখানো উচিৎ পর্নোগ্রাফি সমাজের জন্য হুমকি না, যিনা এবং সমকামিতা নিষিদ্ধ কিছু না, আর যৌনতা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যৌন শিক্ষা কারিকুলামের ব্যাপারে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'ইসলামী উগ্রবাদের' সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এ প্রতিবেদনের লেখিকা!

একই সুরে, ব্র্যাকের তৈরি ২০১৮-এর এক প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে এ কারিকুলামের। কারিকুলামকে অপূর্ণ বলা হয়েছে। কারণ, এতে—

- হস্তমৈথুন সংক্রান্ত আলোচনা নেই।
- জেন্ডার আইডিন্টিটি (ট্রান্সজেন্ডারবাদ) সংক্রান্ত আলোচনা নেই।
- বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে আলোচনা নেই।

ব্র্যাকের এই প্রতিবেদন অনুযায়ী এগুলোও পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করা দরকার।[৪৬১]

২০২৩ সালে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউয়ের জন্য বিভিন্ন দেশি-বিদেশি এনজিও'র জমা দেওয়া প্রতিবেদনে পাঠ্যপুস্তকের এসব আলোচনার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আপত্তি এবং এর সাথে এলজিবিটি এজেন্ডার সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

> নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং সিএসই পাঠ্যক্রম কিছু বিরোধিতা এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। যেমন, সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের 'লিঙ্গ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ পরিচয় এবং লিঙ্গ ভূমিকা' অংশের কিছু আলোচনা নিয়ে ইসলামপন্থী, রক্ষণশীল এবং সমাজের চরমপন্থী অংশগুলির দিক থেকে ব্যাপক বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যৌন শিক্ষার কিছু সেনসেটিভ বিষয়বস্তু (যেমন যৌন আনন্দ, সম্মতি, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার এবং ট্রানজিশন ইত্যাদি) কিশোর-কিশোরীদের চিন্তাকে কলুষিত করছে।[৪৬২]

---

[৪৬০] Sabina 2016, Religious Extremism

[৪৬১] Islam, Kuhel Faizul, Gazi Sakir Mohammad Pritom, and Nadia Farnaz. "A Review Report On Comprehensive Sexuality Education In Bangladesh." (2018). p 16

[৪৬২] Universal Periodic Review of Bangladesh, 44th Session, November 2023. Report submitted by: The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW). On behalf of Right Here Right Now and the Sexual Rights Initiative, p 4

এই বক্তব্যের দুটি দিক লক্ষণীয়।

- প্রথমত, তারা স্বীকার করছে এসব আলোচনার মাধ্যমে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ এলজিবিটি মতবাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
- দ্বিতীয়ত, এর বিরোধিতাকে তারা যুক্ত করেছে ইসলামপন্থা এবং চরমপন্থার সাথে। মানে আপনি যদি এলজিবিটি এজেন্ডার বিরোধিতা করেন, তাহলে আপনি চরমপন্থী!

প্রতিবেদনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে এলজিবিটির বৈধতা ও সামাজিকীকরণের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং এজন্যই শিক্ষাক্রমে যৌন শিক্ষা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আলোচনা যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের শেষে আবারও দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে এবং এলজিবিটিকে সামাজিক ও আইনি বৈধতা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে কাজ করেছে তিনটি আন্তর্জাতিক এনজিও—অ্যারো, রাইট হেয়ার রাইট নাও এবং সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ। আর বাংলাদেশ থেকে সাহায্য করেছে এবং এই প্রতিবেদনকে সমর্থন (এনডোর্স) করেছে, ব্র্যাক, নারীপক্ষ, নাগরিক উদ্যোগ, আরএইচএসটিইপি এবং অবয়ব। সবগুলো দেশি এনজিও। এর মধ্যে 'অবয়ব' হলো বয়েস অফ বাংলাদেশের নতুন নাম। বয়েস অফ বাংলাদেশ ২০১৮ সালের দিকে 'অবয়ব – ডাইভার্সিটি সার্কেল' নামে কাজ শুরু করে।[৪৬৩]

মিডিয়া

এসব কিছুর পাশাপাশি গত ২/৩ বছর ধরে মিডিয়াতে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং পরিচয়কে তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। নিউজ মিডিয়াতে নিয়মিত আসছে নানা প্রতিবেদন। বিনোদন জগতের মাধ্যমেও প্রচারণা চালানো হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতে নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রানারআপও হয়েছে![৪৬৪] নারী সাজা পুরুষদের অতিথি হিসেবে আনা হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের টকশোতে। তাদের মডেল বানিয়ে

---

[৪৬৩] Adnan. Section 377. LSE Blogs, "All we want to do is fit in. To be accepted. To be part of the group": Discussing LGBTQ rights in Bangladesh, 2018. PDF link: https://eprints.lse.ac.uk/91042/1/Bowers_All-we-want-to-do_Author.pdf (now defunct). Can be accessed through Wayback Machine, https://web.archive.org/web/20220709061134/https://eprints.lse.ac.uk/91042/1/Bowers_All-we-want-to-do_Author.pdf

[৪৬৪] সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার নারী রাদিয়া | DBC NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=WyB64zUFi7Y
সুন্দরী প্রতিযোগিতায় লড়বেন আরও এক ট্রান্সজেন্ডার | সময় টিভি
https://www.youtube.com/watch?v=Hhg_XzxRrxk

আলাদাভাবে নিউজ করা হয়েছে পত্রিকার ফ্যাশন সাময়িকীতে।[৪৬৫]

এ খবরগুলো দেখতে থাকলে যেকোনো মানুষের মনে হতে পারে, হয়তো আমাদের সমাজে দিন দিন 'ট্রান্সজেন্ডার' মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাদের এত ঘনঘন, এত জায়গাতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা আসলে তা না। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে, যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যায়। মিডিয়াতে আসা এই সব ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে একই দাতা-এনজিও-অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের অংশ।

ব্র্যাকের গবেষকরা যেমন এলজিবিটি নিয়ে ইতিবাচক খবর প্রকাশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল, ঠিক একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচকভাবে লিখলেই 'পুরস্কার' পাচ্ছে সাংবাদিকরা। এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। বন্ধু'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ৫৬ জন সাংবাদিককে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' দিয়ে পুরস্কৃত করেছে তারা। এছাড়া একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে 'ট্রান্স টক' নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে বন্ধু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরণের কাজ।[৪৬৬] বন্ধুর ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের 'দক্ষ ওয়াচডগে' পরিণত হয়েছে।[৪৬৭] অর্থাৎ, দেশি মিডিয়া এলজিবিটি নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষিত কুকুরের মতো আচরণ করছে। এই দাবির সাথে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

***

শুরু থেকে বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্যক্রম চলছে একটি পশ্চিমা প্রকল্প হিসেবে। যেখানে এনজিও-রা পশ্চিমাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে কিছু সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী লোকজন, কিছু পশ্চিমা দালাল, কিছু সমকামী অ্যাকটিভিস্ট।

পশ্চিমাদের ফান্ডিং নিয়ে তাদের এনজিওগুলো কিছু 'গবেষণা' করেছে। পশ্চিমাদের দেওয়া অনুদানের টাকায় কিছু বিকৃতকামী লোকজন সংগঠন বানিয়ে ওয়ার্কশপ, ফ্যাশন শো টাইপের কিছু কাজ করেছে। আবার এগুলোর ছবি আর রিপোর্ট দেখিয়ে পশ্চিমারা দাবি করেছে 'বাংলাদেশের সমকামীরা অধিকার চায়'। এটা একটা

---

[৪৬৫] প্রথম আলো, ট্রান্সজেন্ডার মডেল সকালকে দেখুন নতুন রূপে, ২০২৩
https://www.prothomalo.com/lifestyle/fashion/t89duuel20

[৪৬৬] Bandhu Annual Report 2021, p 52

[৪৬৭] Bandhu, A Tale Of Two Decades 20-Year Achievements Leading To Impacts 1996-2016, Bandhu Social Welfare Society , Executive Summary ,p- 9

চক্রাকার প্রক্রিয়া।

শত্রুপক্ষ জানে, রাতারাতি জনমত বদলে ফেলা যাবে না। সেটা তাদের উদ্দেশ্যও না। তাদের উদ্দেশ্য ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজের মূল্যবোধকে পালটে দেওয়া। হঠাৎ করে বড় পরিবর্তন সমাজে ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে পরিবর্তনকে উপস্থাপন করা হয় তখন এক পর্যায়ে গিয়ে সমাজ তা মেনে নেয়। সবকিছু যদি এইভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য সামনে অপেক্ষা করছে অত্যন্ত অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ। যা পশ্চিমে হয়েছে, তার সবকিছু আমাদের এখানেও হবে।

অধ্যায় ১৯

যৌন উপনিবেশবাদ

পশ্চিমা বিশ্ব তাদের 'যৌন বিপ্লব' রফতানি করতে চায়। যৌনতার ব্যাপারে তাদের ধারণা চাপিয়ে দিতে চায় বাকি বিশ্বের ওপর। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র তার সব ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই বিকৃত এজেন্ডা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। বিকৃতির বিশ্বায়নের এই প্রকল্প এক নব্য উপনিবেশবাদ। পুরোনো উপনিবেশবাদ নিয়ন্ত্রণ করতো আমাদের অর্থনীতি, ভূখণ্ড আর সম্পদকে। নতুন উপনিবেশবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আমাদের সমাজ, চিন্তা, দেহ ও আচরণকে। এ হলো যৌন এবং আদর্শিক উপনিবেশবাদ।

২০১১ তে ওবামা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'এলজিবিটি অধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য কূটনীতি এবং আর্থিক অনুদান কাজে লাগাবার।[৪৬৮] সে বছর জাতিসংঘে দেওয়া এক ভাষণে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ঘোষণা করে, '...*সমকামী অধিকার মানবাধিকার। আর মানবাধিকার হলো সমকামী অধিকার।*'[৪৬৯]

তারপর থেকেই সারা বিশ্বে, বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকাতে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তিকে কাজে লাগাতে শুরু করে অ্যামেরিকা। কখনো সমকামিতা-বিরোধী আইন বাতিল করার জন্য, কখনো বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির অর্থায়নের জন্য দেশে দেশে মার্কিনীরা খরচ করে কোটি কোটি ডলার।[৪৭০] এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ইউএসএইড-এর মতো সংস্থাগুলো। সংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি 'প্রাইড প্যারেড'-সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমর্থন ও সহায়তা দেওয়া হয় মার্কিন দূতাবাসগুলো থেকে।[৪৭১] আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কীভাবে এই প্রতিটি পদক্ষেপ বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে।

---

[৪৬৮] Obama tells US officials to use overseas aid to promote gay rights. The Guardian. December 6, 2011. https://tinyurl.com/2v3pr4u3

[৪৬৯] Hillary Clinton declares 'gay rights are human rights'. BBC. December 7, 2011. https://tinyurl.com/ye4a6e3h

[৪৭০] ;eKFF October 27, 2016. https://tinyurl.com/48uxkdr2

[৪৭১] Obama tells US officials, The Guardian. December 6, 2011.

পাশাপাশি শুরু হয় বিভিন্ন দেশের ওপর সরাসরি চাপ প্রয়োগ। ১১ তে ওবামা হুমকি দেয়, নাইজেরিয়া যদি 'সমকাম-বিরোধী' আইন পাশ করে, তাহলে তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৪৭২] ১৪ তে একই কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় উগান্ডাতে দেওয়া 'মানবিক অনুদান'।[৪৭৩] হুমকি দেওয়া হয় কেনিয়া, ঘানাসহ আফ্রিকার অন্যান্য আরও দেশকে। এশিয়াতে চলে একই পলিসি। মুসলিম দেশ ব্রুনেইয়ের শাসক ২০১৯ সালে সমকামিতার জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির ঘোষণা দিলে ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা হয় তাদের ওপর। তোপের মুখে আগের অবস্থান থেকে সরে আসে ব্রুনেইয়ের সরকার।

২০২১ এ মার্কিন সরকার ঘোষণা করে, এলজিবিটি ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোকে চাপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে তারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং ভিসা রেস্ট্রিকশান আরোপ করবে।[৪৭৪] এই ইস্যুতে ২০২৩-এ উগান্ডার সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভিসা রেস্ট্রিকশন আরোপ করে অ্যামেরিকা।[৪৭৫] জাতিসংঘ আর বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে ২০১৩ থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের ওপর।

একদিকে এলজিবিটি সংগঠন, নেটওয়ার্ক আর এনজিওগুলোকে অর্থ আর রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে সাহায্য করছে পশ্চিমারা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সরকারকে চাপ দিচ্ছে এলজিবিটি বিকৃতিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য। ভয় দেখাচ্ছে স্যাংশন আর ভিসা রেস্ট্রিকশানের।

এলজিবিটি অধিকারের নামে পশ্চিমারা তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং এজেন্ডা বাকি পৃথিবীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে উন্নয়ন, অনুদান আর সাহায্যকে। অনুদান তাদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছে জবরদস্তি শর্ত দেওয়ার উপকরণ হিসেবে। এভাবেই আসলে 'উন্নয়ন সহযোগিতা'গুলো ব্যবহার হয়ে এসেছে সবসময়।

লিবারেল মিশনারী

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল খ্রিষ্টান মিশনারীরা। কোনো জায়গায় ঘাঁটি গাড়ার সময় সাথে করে মিশনারীদের নিয়ে যেত তারা। উপনিবেশবাদী অফিসার আর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা ধার্মিক ছিল না।

---

[৪৭২] Obama Fights Nigerian Anti-Gay Bill, Threatens To Cut Off Aid. Forbes. December 9, 2011. https://tinyurl.com/3m8bzpzb

[৪৭৩] U.S. cuts aid to Uganda, cancels military exercise over anti-gay law. Reuters. June 20, 2014. https://tinyurl.com/5dy44xff

[৪৭৪] Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World. White House.

[৪৭৫] US restricts visas for Uganda, Zimbabwe officials, citing repression. Reuters. December 5, 2023. https://tinyurl.com/4ck2mkfk

কিন্তু কোনো অঞ্চলের লোকেরা মিশনারীদের কথাবার্তা মেনে নিতে শুরু করলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়, এ ব্যাপারটা তাদের চোখ এড়ায়নি।

উপনিবেশবাদ আর মিশনারীদের অংশীদারিত্বের এই সম্পর্ক টিকে আছে আজও। তবে খ্রিষ্টান মিশনারীর বদলে এসেছে লিবারেল মিশনারী। আজকের উপনিবেশবাদীরাও লক্ষ্য করেছে, কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমা চিন্তা ও ধ্যানধারণা প্রচলিত হয়ে গেলে সেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। নব্য উপনিবেশবাদ তাই এনজিও, অ্যাকটিভিস্ট, কালচারাল এবং ইয়ুথ আইকনদের এক বিশাল লিবারেল মিশনারী বাহিনী গড়ে তুলেছে। এদের কাজ হলো পশ্চিমের বিকৃতিগুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। দাসত্বকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখানো। বাংলাদেশেও এমন লিবারেল মিশনারীরা কাজ করে যাচ্ছে। অনেক দিন ধরে। আগের মতোই ঔপনিবেশিক সাদা মনিবদের হুকুম বাস্তবায়ন করে যায় তাদের বাদামি চামড়ার গোলামেরা।

ইউরোপীয় কলোনিয়ালদের সাফল্যের বিভিন্ন কারণ ছিল। যেমন, সহিংসতার সংগঠিত ব্যবহার, প্রতারণা ও মিথ্যাচারের চরম মুন্সিয়ানা। কিন্তু আমাদেরও বড় কিছু ভুল ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হলো, উপনিবেশবাদের সাথে ব্যবসায়ী আর মিশনারীদের গভীর সম্পর্ক দীর্ঘদিন যাবৎ বুঝতে না পারা। আর বুঝতে পারার পরও যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া। আজও আমরা সেই একই ভুল করছি। লিবারেল মিশনারীদের তাদের সত্যিকার নাম ও পরিচয়ে ডাকার বদলে আইকন বানিয়ে তুলে রেখেছি মাথার ওপর।

মাফিয়া ও স্যাংশনের রাজনীতি

মাফিয়া বা কোসা নোস্ট্রার কিছু অলিখিত নিয়ম আছে। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক, এসব নিয়মের বাইরে যাওয়া যায় না। মহল্লার সবচেয়ে গরিব সবজি বিক্রেতা যদি চাঁদা দিতে অস্বীকার করে, তাতে একজন মাফিয়া গডফাদারের কিচ্ছু আসে যায় না। সেটা নিয়ে তার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাফিয়ার অলিখিত নিয়ম বলে, বিরোধিতা যত ছোটই হোক সেটাকে দমন করতে হবে শক্ত হাতে।

এক সবজিওয়ালার অস্বীকৃতি যদি আরও দশজনকে উদ্বুদ্ধ করে? আজকে একজন যদি কালকে দশ জন হয়ে যায়? তাই গডফাদারের নির্দেশে তুচ্ছ সবজি বিক্রেতাকে শাস্তি পেতে হয়। টাকাটা এখানে মুখ্য না, গুরুত্বপূর্ণ হলো বার্তাটা—যদি মাফিয়ার বিরুদ্ধে যাও, তাহলে শাস্তি পেতে হবে।

অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাথে মাফিয়ার বেশ অনেকগুলো মিল আছে। এটা তার একটা। স্নায়ুযুদ্ধের সময় কোনো দেশ যদি অ্যামেরিকান নিয়ন্ত্রণ বলয়ের বাইরে চলে যাওয়ার কথা চিন্তাও করত, তৎক্ষণাৎ শক্ত হাতে তাকে দমন করা হতো। সেই দেশ যত ছোটই হোক, অ্যামেরিকা থেকে যত দূরেই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

অ্যামেরিকান মিডিয়ার তোলপাড় শুরু হয়ে যেত। গরম গরম বক্তব্য দেওয়া শুরু করতো সেনেটররা।

এখানেও কাজ করতো সেই একই নীতি। একই কোড। অবাধ্যতা, বিরোধিতা, ছকের বাইরে যাওয়া—তা যত তুচ্ছ ব্যাপারেই হোক—শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এলজিবিটির ক্ষেত্রে এই সমীকরণ কাজে লাগানো হচ্ছে। এজন্যই ছোট্ট বাংলাদেশ কিংবা সেই কোথাকার কোন উগান্ডাতেও এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে এত সিরিয়াস অ্যামেরিকা। এই মতবাদ চাপিয়ে দিতে পারা মার্কিন সাম্রাজ্য আর আধিপত্যবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ফিরিঙ্গিশ্রেষ্ঠত্ব

এলজিবিটি মতবাদ প্রচারের পেছনে আরেকটা ফ্যাক্টর হলো, পশ্চিমের এক পুরোনো অসুখ। পশ্চিমারা মনে করে, তারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সভ্য। না, ভুল বললাম। পশ্চিমারা মনে করে, কেবল তারাই সভ্য। বাকি সবাই অসভ্য। এই অসভ্য, বর্বর পৃথিবীকে সভ্য করে তোলা হলো পশ্চিমের মানুষদের মহান দায়িত্ব। সাদা মানুষের বোঝা। এইসব কথাবার্তা বলেই উপনিবেশবাদের বৈধতা দিয়েছিল তারা। কলোনিয়াল আগ্রাসনকে আদর করে নাম দিয়েছিল 'সিভিলাইযিং মিশন'। অর্থাৎ নিছক লুটপাটের জন্য তারা বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে না। তারা যাচ্ছে এসব অঞ্চলের মানুষকে সভ্য করে তোলার জন্য।

আজও সেই মনোভাব থেকে তারা বের হতে পারেনি। যৌনতার ব্যাপারে অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থান তাদের কাছে বর্বর এবং সেকেলে মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সরাসরি বলেই ফেলে—যৌনতার ব্যাপারে এত কড়াকড়ি, এত কঠোরতাই এসব সমাজের পিছিয়ে থাকার কারণ। পিছিয়ে পড়া এই সমাজগুলোকে যৌন বিপ্লবের নিয়ন আলোতে নিয়ে আসাকে পশ্চিম তার দায়িত্ব মনে করে। পশ্চিমের অনেক মানুষ সত্যিকারভাবেই মনে করে, এলজিবিটি মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে তারা আসলে বাকি পৃথিবীর মহা উপকার করছে। নব্য উপনিবেশবাদের অজুহাত তৈরি হয় সভ্য-অসভ্যের সেই একই সমীকরণের মারপ্যাঁচে।

বিশ্বাস

এলজিবিটি মতবাদ প্রচারে পশ্চিমের উঠেপড়ে লাগার পেছনে আরেকটা কারণ আছে। বিশ্বাস ও মতাদর্শ। এই আন্দোলন নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরে অধিকার, স্বাধীনতা ও প্রগতির ধারণাকে ব্যবহার করে। এ ধারণাগুলো আধুনিক পশ্চিমা জীবনদর্শনের মৌলিক স্তম্ভের মতো। এলজিবিটি তাই অল্প কিছু লোকের যৌনজীবনের প্রশ্ন না; বরং পশ্চিমের চোখে এর সাথে জড়িয়ে আছে তাদের দর্শন ও জীবনবোধ। পশ্চিমের মানুষদের, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন ও বুদ্ধিজীবীদের

উল্লেখযোগ্য একটা অংশ মতাদর্শিকভাবে এ আন্দোলনকে সমর্থন করে।

নতুন স্নায়ুযুদ্ধ আর রংধনুর রাজনীতি

এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে। এতকিছু থাকতে এলজিবিটি কেন? কেন পশ্চিমারা এটাকেই এত জোর দিয়ে প্রচার করার জন্য বেছে নিল?

এর পেছনে ব্যবসায়িক আর পুঁজিবাদী একটা দিক আছে। যা আমরা একটু আগে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। সেই সাথে আছে ভূরাজনৈতিক হিসেবনিকেশও। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে অ্যামেরিকা ছিল পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ার রাষ্ট্র। বিশ্বে মোড়ল ছিল সে একাই। কিন্তু সাড়ে তিন দশক পর আজ প্রেক্ষাপট পালটে গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অ্যামেরিকার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছে চীন, রাশিয়াসহ আঞ্চলিক নানা শক্তি। এমনকি ভারতের মতো দেশও আজ অ্যামেরিকাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। এককেন্দ্রিক বিশ্বের জায়গায় রূপ নিচ্ছে বহুকেন্দ্রিক এক বিশ্বব্যবস্থা। একক আধিপত্য ধরে রাখতে মরিয়া অ্যামেরিকা চীনের সাথে তার নতুন স্নায়ুযুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছে। আর নতুন স্নায়ুযুদ্ধে এলজিবিটি অ্যামেরিকার প্রধান সাংস্কৃতিক পণ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের সময় কমিউনিসমের স্লোগানগুলো ভালোই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। খোদ অ্যামেরিকাতেই এই মতাদর্শের অনুসারী ছিল অনেকে। যেমনটা হ্যারি হেইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। চতুর অ্যামেরিকানরা বুঝতে পেরেছিল, কমিউনিসমকে দমাতে হলে রাজনৈতিক আর সামরিক পরিকল্পনার পাশাপাশি লাগবে মতাদর্শিক কৌশল। কমিউনিসমের মোকাবিলায় বিপরীত স্লোগান দরকার ছিল অ্যামেরিকার। তাই তারা এনেছিল গণতন্ত্র, অধিকার আর স্বাধীনতার বুলি। কোকাকোলা, হলিউড, পপ কালচার আর ম্যাকডোনাল্ডসের স্বপ্ন।

নতুন স্নায়ুযুদ্ধেও একই ধরনের কৌশল নিয়েছে অ্যামেরিকা। গণতন্ত্র, অধিকার, স্বাধীনতার বুলি একই আছে। তবে এই প্যাকেজের প্রধান ফিচার হিসেবে এখন এসেছে এলজিবিটি। মানুষ যা ইচ্ছে করবে, যার সাথে, যখন ইচ্ছা করবে, যখন ইচ্ছে নিজের পরিচয় পাল্টাবে—এরচেয়ে বড় স্বাধীনতা, এরচেয়ে বড় অধিকার আর হয় না কি? এমন স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র কেবল মহান মার্কিনী গণতন্ত্রই দিতে পারে, আর কেউ না।

একদিকে কর্তৃত্ববাদী সরকারব্যবস্থা, অন্যদিকে মার্কিনী ধাঁচের গণতন্ত্র। একদিকে ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে স্বাধীনতা। একদিকে যুলুম, অন্যদিকে রংধনুর অধিকার। নতুন স্নায়ুযুদ্ধের বয়ানকে অ্যামেরিকা সাজাতে চায় এভাবে।

***

পশ্চিমারা নানাভাবে বাকি বিশ্বে তাদের হস্তক্ষেপের অজুহাত তৈরি করে। এজন্য একসময় তারা গণতন্ত্রের বুলি আওড়েছে, কখনো নারী অধিকারকে হাতিয়ার বানিয়েছে, এখন জপছে এলজিবিটির মন্ত্র। যৌনতার ব্যাপারে আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার দেশগুলোর মানুষের ধ্যানধারণা একেবারেই আলাদা। তবু পশ্চিমের ঠিক করে দেওয়া 'মানবতা' আর 'অধিকার'-এর মাপকাঠিই সবাইকে মানতে হবে। মানতে হবে ওদের বানানো সংজ্ঞা, ওদের মূল্যবোধ। তা না হলে অনুদান মিলবে না। বরং জুটবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের খেতাব।

এলজিবিটি হলো নব্য উপনিবেশবাদ আর সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র। নতুন স্নায়ুযুদ্ধে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের প্যাকেজ মোড়ানো থাকবে রংধনু পতাকায়।

আলো অন্ধকার

...আর সমান নয় অন্ধ আর চক্ষুষ্মান!

[৪০:৫৮]

অধ্যায় ২০

বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব

আমরা এ বই শুরু করেছিলাম দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা দিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে পম্পেই-এর অগ্নিসমাধির ঘটনাকে কেউ দেখবে অবাধ্যতা আর সীমালঙ্ঘনের আসমানি শাস্তি হিসেবে। আবার কেউ একে দেখবে প্রগতিশীল, স্বাধীনচেতা এক সমাজের সাথে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে। একই কথা আধুনিক এলজিবিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কারও চোখে এটা সীমালঙ্ঘন, বিকৃতি আর অবাধ্যতার চরম দৃষ্টান্ত। আবার কারও চোখে প্রগতি, অধিকার আর স্বাধীনতার বিজয়। দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার বিশ্বাসের কাঠামো। দুজন মানুষের মৌলিক বিশ্বাস আলাদা হলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা হবে।

এলজিবিটি মতবাদ নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাস কাঠামোর ফসল। অন্যদিকে এ ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান হলো, দ্বীন ইসলামের বহিঃপ্রকাশ। এলজিবিটি নিয়ে অবস্থানের পার্থক্যের গোড়াতে আছে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে বুঝতে হলে আগে এ দুই বিশ্বাস কাঠামোকে বুঝতে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আর তার জন্যে আমাদের যেতে হবে অন্য ধরনের এক আলোচনায়। এতক্ষণ আমরা যে পথে এসেছিলাম, সেটা ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢুকতে হবে অন্য এক যাত্রাপথে। ব্যাপারটাকে রেল ভ্রমণের মতো করে ভাবতে পারেন। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে কয়েকটি স্টেশন ঘুরে যেতে হবে আমাদের। এ সময়টাতে রেললাইনের দুপাশের দৃশ্যপট কিছুটা বদলাবে। তবে আশা করি, মন্দ লাগবে না। লম্বা জার্নির সময় মাঝেমধ্যে দৃশ্যপট বদলালে কিন্তু ভালোই লাগে।

আসুন তাহলে। সেই স্টেশনগুলো ঘুরে আসা যাক। ট্রেনে চেপে বসুন। জানালার ধারে আরামদায়ক একটা সিট বেছে নিন। ঝটিকা সফর দিয়ে আসি দর্শন আর বিশ্বাসের বিস্তীর্ণ চরাচরের মধ্য দিয়ে।

আমাদের যাত্রা শুরু হবে আর্কিমিডিসকে সাথে নিয়ে।

আর্কিমিডিসের লাঠি

বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ও গনিতজ্ঞ আর্কিমিডিসের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে—

> 'Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world.'
>
> 'আমাকে একটি দাঁড়ানোর জায়গা আর লম্বা লাঠি দাও, আমি পুরো পৃথিবীকে নড়িয়ে দেবো।'

আর্কিমিডিস এখানে পেটের ভেতরে থাকা লিভার বা কলিজার কথা বলছেন না। বলছেন পদার্থবিজ্ঞানের লেভারেজের (leverage)-এর কথা। একটা লম্বা লাঠি বা লিভার ব্যবহার করে অনেক ভারী জিনিসও কম শক্তি খরচ করে উঠানো যায়। তবে শুধু লিভার থাকলে হয় না, সেই লিভার বসানোর জন্য একটা অবলম্বন বা ফালক্রাম লাগে। 'দাঁড়ানোর জায়গা' লাগে।[৪৭৬] হাতে যথেষ্ট লম্বা লিভার দেওয়া হলেও দাঁড়ানোর জায়গা ছাড়া আর্কিমিডিস তেমন কিছুই নাড়াতে পারবেন না। তাই আর্কিমিডিসের উক্তিটা আসলে এভাবে লেখা যেতে পারে—'আমি যদি পৃথিবীর বাইরে দাঁড়ানোর একটু জায়গা পেতাম, আর হাতে যথেষ্ট লম্বা লিভার থাকতো, তাহলে পৃথিবীটাকেই নড়িয়ে দিতাম'।

এই দাঁড়ানোর জায়গা কিংবা অবলম্বনের গুরুত্ব আরও অনেক ক্ষেত্রে সত্য। ধরুন, আপনি কোনোকিছুর ভালো-মন্দ হিসেব করার চেষ্টা করছেন। প্রথমেই আপনার প্রয়োজন হবে ভালো-মন্দের একটা মানদণ্ড। সেই মানদণ্ড অনুযায়ী আপনি বিচার করবেন। পাহাড় বেশি সুন্দর না কি সমুদ্র—এই ধরনের হালকা প্রশ্নের উত্তরও নির্ভর করবে সৌন্দর্যের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা আর রুচির ওপর। নান্দনিকতা নিয়ে আলোচনাতেও আপনি উত্তর ঠিক করবেন নির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে।

যেকোনো ধরনের বিচারবিশ্লেষণ, তুলনা কিংবা সমালোচনার জন্য আগে একটা অবলম্বন প্রয়োজন হয়। আমরা যখনই কোনো কিছু বিচার করি, তখনই কোনো-না-কোনো বিন্দুকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করি। কোনো-না-কোনো অবস্থানকে গ্রহণ করি সত্য বা সঠিক হিসেবে। শূন্যের ওপর যেমন দাঁড়ানো যায় না, তেমনিভাবে বিশ্বাসহীন কোনো অবস্থান থেকে বিচার করা যায় না।

আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব তাদের বিভিন্ন অবস্থানকে নিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন হিসেবে

---

[৪৭৬] পদার্থবিজ্ঞানে লিভার মানে একটি সরল যন্ত্র। এমন একটি দণ্ড, যা কোনো বস্তুর ওপর ভর করে মুক্তভাবে উঠানামা করে। লিভারের মাধ্যমে ভারী বস্তুকে কম বল প্রয়োগে ওপরে তোলা যায়। লিভারের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হলো ঢেঁকি। চাল গুঁড়ো করার সময় ঢেঁকির সামনের প্রান্তের নিচে চাল রাখা হয়। অন্য প্রান্তে ঢেঁকির ওপর দাঁড়িয়ে চাপ দেওয়া হয় (বল প্রয়োগ)। তখন সামনের প্রান্তের অংশটি চালে আঘাত করে। ধীরে ধীরে চাল গুঁড়া হয়। এখানে ঢেঁকি হলো লিভার। মাঝখানে দণ্ডটির বা অবলম্বনের যে বিন্দুতে ভর করে ঢেঁকি উঠানামা করছে, তা হলো ফালক্রাম।

প্রচার করে। তাদের দাবি অনেকটা এরকম—ধর্মীয় অবস্থানগুলো আসে বিশ্বাসের জায়গা থেকে। কিন্তু আধুনিক পশ্চিম যেহেতু সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ, তাই তাদের অবস্থানগুলো নিরপেক্ষ। এ দাবি একেবারেই ভুল।

বিশ্বাস কেবল ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। একজন নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী কিংবা আগাগোড়া ধর্মনিরপেক্ষ লোকও মহাবিশ্ব, মানুষ, মানুষের উৎস, সমাজ, শাসন, ভালো-মন্দ, রাজনীতি, ইতিহাস ও ইতিহাসের গতিপথ—নানা বিষয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ আর বিশ্বাস লালন করে। কিছু বিষয়কে সে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে, কিছু মূলনীতিকে সে ব্যবহার করে মাপকাঠি হিসেবে। কিছু অবস্থানকে সে সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। এ কারণেই মানবাধিকার, গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোতে খুব শক্ত অবস্থান নেয় আধুনিক পশ্চিম।

সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ অবস্থান প্রায় হয় না বললেই চলে। প্রত্যেক বিশ্লেষণ, প্রত্যেক পর্যালোচনা কোনো-না-কোনো মানদণ্ডের সাপেক্ষে হয়। প্রত্যেক সমালোচনা শুরু হয় 'ভালো-মন্দ' এবং 'কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত'-এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থেকে। সবাই কোনো-না-কোনো জায়গাতে দাঁড়িয়েই কথা বলে। কেউ এটা সরাসরি স্বীকার করে, কেউ গোপন করার চেষ্টা করে। পার্থক্য এতটুকুই।

যেমন- অধিকার, স্বাধীনতা, প্রগতির মতো বিষয়গুলোকে আধুনিক সভ্যতায় খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এগুলোর মানদণ্ডে বিভিন্ন ধর্ম আর সংস্কৃতিকে তারা বিচার করে। আজকাল আমরাও করি। এই আলাপগুলো কিন্তু শূন্য থেকে আসে না। এগুলো আসে কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাসের জায়গা থেকে। মানবাধিকার নিয়ে যেকোনো আলাপে যাবার আগে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে। যেমন :

- মানুষ কী? তার পরিচয় ও উৎস কী?
- অধিকার কী?
- অধিকারের উৎস কী? অধিকার কোথা থেকে আসে? আর কে সেটা ঠিক করে?
- মানবাধিকার বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব কার? এই কর্তৃত্বের ভিত্তি কী?
- ভালো ও মন্দের মাপকাঠি কী? এই মাপকাঠি কে ঠিক করে?

এই প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট কিছু উত্তর ধরে নিয়েই পশ্চিমা বিশ্ব মানবাধিকারের এক ধরনের আলাপ তৈরি করেছে। তারপর সেটাকে প্রচার করেছে নিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন হিসেবে। চাপিয়ে দিয়েছে বাকি পৃথিবীর ওপর। এগুলোই হলো তাদের বিশ্বাস। অধিকারের যেকোনো ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য, তা এলজিবিটি হোক কিংবা নারী অধিকার। এই সবগুলো আলোচনা গড়ে উঠেছে

নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস, অবস্থান আর মূলনীতির ভিত্তিতে। এই আলাপগুলো আসলে হিমশৈলের মতো। খালি চোখে যার ১০% এর মতো দেখা যায়। বাকি ৯০% থেকে যায় চোখের আড়ালে। যদিও এই ৯০%-ই হলো আলাপের পেছনে মূল আকীদাহগত ভিত্তি।

আর্কিমিডিস বলেছিল, 'আমাকে একটি দাঁড়ানোর জায়গা আর লম্বা লাঠি দাও, আমি পুরো পৃথিবীকে নড়িয়ে দেবো।' আমি বলি, পর্যাপ্ত বুদ্ধি আর তর্ক করার দক্ষতা থাকলে যেকোনো অবস্থান থেকে যেকোনো কিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলা সম্ভব। তবে সবাইকে কোথাও না কোথাও দাঁড়াতে হয়। কেউ শূন্যের ওপর ভাসে না। মানুষ কোথায় দাঁড়াচ্ছে, তার অবলম্বন কী, সেটাই ঠিক করে দেয় তার চূড়ান্ত অবস্থান।

মানুষ যে জায়গাটাতে দাঁড়ায়, যে স্থানের সাপেক্ষে চারপাশকে সে দেখে, মাপে, বোঝে, সেটাই হলো তার বিশ্বাসের কাঠামো। এই কাঠামোকে আমরা 'ওয়ার্ল্ডভিউ' বলতে পারি।

ওয়ার্ল্ডভিউ

ওয়ার্ল্ডভিউ কী? ইংরেজি 'ওয়ার্ল্ডভিউ' (Worldview) শব্দটা এসেছে একটা খটমটে জার্মান শব্দ থেকে,

Weltanschauung (উচ্চারণ, ভেল্ট-আন-শাওং)

এই মারদাঙ্গা দাতভাঙ্গা শব্দটার দুটো ইংরেজি প্রতিশব্দ আছে, 'worldview' বা 'world intuition'। কিন্তু আমার জানামতে ভালো কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। বিশ্ববীক্ষা, বিশ্বদর্শন, দুনিয়াদর্শন বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে শব্দটাকে অনুবাদ করা যায়। কিন্তু পুরো অর্থটা ধরা পড়ে না। তাই বাংলা প্রতিশব্দের ঝক্কি বাদ দিয়ে শব্দটার পেছনের অর্থটা বলে ফেলি। তাহলে পুরো ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে।

সংক্ষেপে ওয়ার্ল্ডভিউ হলো, অস্তিত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যা। চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার মাধ্যমে এবং যার ভেতরে আমরা বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করি। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো চোখে থাকা চশমার মতো। এর মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি।

এই চশমা তৈরি হয় অস্তিত্ব, মহাবিশ্ব, স্রষ্টা, সৃষ্টি, সমাজ, শাসন, নৈতিকতা, মানবজীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস, মূল্যবোধ, পূর্বধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এ সবকিছুকে এক সূত্রে গেঁথে অস্তিত্বের একটা সামগ্রিক ব্যাখ্যা তৈরি করে ওয়ার্ল্ডভিউ।

ওয়ার্ল্ডভিউ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আবশ্যকতা। মানুষ সহজাতভাবেই অর্থ খোঁজে। অর্থহীনতা সে মেনে নিতে পারে না। মহাজাগতিক কাঠামোতে নিজের অস্তিত্ব আর অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন তার মধ্যে খেলা করে। এসব প্রশ্নের কোনো-না-কোনো

উত্তর তাকে বেছে নিতে হয়। আর এ উত্তরের ভিত্তিতেই বাকি সবকিছুর সাথে নিজের সম্পর্ককে সে বুঝতে শেখে। তাই প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। এর মাধ্যমেই মানুষ মহাবিশ্ব এবং এর মাঝে নিজের অবস্থানকে বোঝে। ওয়ার্ল্ডভিউ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। সব সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার কোনো-না-কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ আছে। হয়তো সবাই সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের বাস্তবতাটা থাকে কমবেশি সবার মধ্যেই।

দ্বীন

ওয়ার্ল্ডভিউকে বোঝানোর ক্ষেত্রে আরেকটা শব্দও ব্যবহার করা যায়, দ্বীন।

মক্কার কুরাইশদের কথা চিন্তা করুন। ইসলামের আবির্ভাবের আগে তাদের নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস ছিল, জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল, মূল্যবোধ ছিল, ছিল সমাজ ও শাসনের নির্দিষ্ট কাঠামো। পৃথিবীকে দেখার, ভালো-মন্দের সংজ্ঞা দেওয়ার, জীবন-মৃত্যুর কিছু চেনা পথ ও পদ্ধতি ছিল তাদের। বলা যায়, ইসলামের আগে কুরাইশের একটি ওয়ার্ল্ডভিউ ছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট দ্বীন-এর অনুসরণ করত।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল ﷺ-কে পাঠালেন নতুন এক জীবনবিধান দিয়ে। আপসহীন তাওহীদের বিশ্বাসের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ে আসলেন চিন্তা এবং জীবনযাপনের পূর্ণাঙ্গ এক কাঠামো। যে কাঠামো অস্তিত্বের একটি সার্বিক ব্যাখ্যা দেয়। যে কাঠামোর মাধ্যমে মানুষ মহাবিশ্বে তার ভূমিকা, কাজের ক্ষেত্র, সীমানা এবং আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ককে বুঝতে শেখে। সেখানে বাদ যায় না মানব অস্তিত্বের কোনো দিক, কোনো অক্ষ। সেই কাঠামোর আলোকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, পরিচয় ও সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে উঠে হাজার বছর জুড়ে রাজত্ব করা এক সমাজ ও সভ্যতা।

ওয়ার্ল্ডভিউকে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে বিশ্বাস ও জীবনধারা, আকীদাহ ও শরীয়াহর সমষ্টি হিসেবে 'দ্বীন' হিসেবে চিন্তা করা যায়।

ওয়ার্ল্ডভিউয়ের শক্তি

বাস্তবতাকে আমরা কীভাবে দেখি এবং ব্যাখ্যা করি, সেটা আমাদের ওয়ার্ল্ডভিউ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের মন ও মস্তিষ্কে বাস্তবতার যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তার সীমানা আর কাঠামো ঠিক করে ওয়ার্ল্ডভিউ। বাস্তবতা অবিকলভাবে আমাদের চোখে ধরা দেয় না। ফিল্টার হয়ে আসে চশমার ভেতর দিয়ে।

একজন মানুষের কথা চিন্তা করুন, যে জন্মের পর থেকেই ছোট্ট একটা ঘরে বন্দি। সে কখনো এ ঘরের বাইরে যায়নি। ঘরের এক দেয়াল জুড়ে বিশাল জানালা। সেখানে

স্বচ্ছ কিন্তু পুরু কাঁচ দেওয়া। এই জানালাই বাইরের দুনিয়ার সাথে তার সংস্পর্শের একমাত্র মাধ্যম। জানালার কাঁচটা নির্দিষ্ট একটা রং-কে বেশি ফুটিয়ে তোলে। ধরা যাক, সেই নির্দিষ্ট রংটা হলো হলুদ।

কুড়েঘরের এই বন্দি পৃথিবীকে দেখে হলুদ রঙের আভায়। গাছ, পাতা, পাখি, ফুল, ঘাস, আকাশ, সাগর—সবকিছুকে সে দেখে হলুদ রঙের ফিল্টারের মধ্য দিয়ে। সে মনে করে, বাইরের দুনিয়াটা হলদেটে। সমস্যাটা তার চোখে না, তার মস্তিষ্কে না। সমস্যা জানালার কাঁচে। হলুদ রঙের কাঁচ আমাদের এই বন্দির চিন্তাকে একটা নির্দিষ্ট রঙের বৃত্তে আটকে ফেলেছে। তাকে যদি বলা হয়, আকাশ আসলে নীল, সে বিশ্বাস করবে না। তাকে বিশ্বাস করাতে হলে জানালাটা ভাঙতে হবে। এটাই হলো ওয়ার্ল্ডভিউয়ের শক্তি।

ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মিশ্রণ

কেউ যদি দু'চোখে দুটো চশমার একটা করে লেন্স লাগিয়ে নেয়, তাহলে কী হবে চিন্তা করুন তো! চলতে গিয়ে বারবার সে হোঁচট খাবে। সমতল রাস্তাকে তার কাছে উঁচুনিচু মনে হবে, দেয়ালকে লাগবে এবড়োথেবড়ো। কাছের জিনিসকে দূরে আর দূরের জিনিসকে সে কাছে দেখবে। তালগোল পাকিয়ে ফেলবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর গভীরতার মাপে। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কাজও তার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে। জটিল এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে আটকে যাবে তার জীবন। কিন্তু এরচেয়েও বড় জটিলতা তৈরি হয়, যখন ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মিশ্রণ ঘটে।

বাস্তবতাকে দেখার ও বোঝার জন্য ইসলাম আমাদের একটা চশমা দেয়। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা দেয় আরেকটা চশমা। আধুনিকতা এবং ইসলাম দুটো আলাদা, স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ডভিউ, দুটো আলাদা দ্বীন। এ দুইয়ের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। এ দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি হিসেবে যে ধারণাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী। অর্থাৎ এই দুই চশমার লেন্স, রং, ছাঁচ আলাদা। কিন্তু আমরা এই দুই চশমা একইসাথে পরার চেষ্টা করছি। বিশ্বাসের দিক থেকে আমরা মুসলিম, কিন্তু আজ আমাদের চিন্তাচেতনা ও এবং আচরণ ঠিক করে দিচ্ছে পশ্চিম থেকে আসা চিন্তা ও বিশ্বাস।

মিশ্রণ কেন?

মানুষ যখন দীর্ঘদিন ভিন্ন কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ-এর অধীনে থাকে, তখন বুঝে-না-বুঝে সে তা গ্রহণ করে নিতে শুরু করে। 'গ্রহণ করা' কথাটা আসলে ঠিক হলো না। কারণ, প্রক্রিয়াটা সচেতন না। মানুষ আসলে সেই ওয়ার্ল্ডভিউ-এর ধারণাগুলো নিজের অজান্তে শুষে নিতে শুরু করে।

আমরা একদিকে মুসলিম, অন্যদিকে এই সভ্যতারই সন্তান। আমাদের বেড়ে ওঠা

আধুনিকতার মাঝে। মাছ যেভাবে পানির মধ্যে থাকে, সেভাবে আমরা আধুনিকতার তৈরি ব্যবস্থার মধ্যে থাকি। এই সভ্যতার অন্তর্নিহিত চিন্তাগুলো আমাদের প্রভাবিত করে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে, যাপিত জীবনের সাথে আধুনিক সভ্যতার ধ্যানধারণাগুলো আমরা শুষে নিই। নিজের অজান্তেই নানা বিষয়ে এমন অনেক অবস্থান গ্রহণ করে নিই, যেগুলো গভীরভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যেগুলোর উৎপত্তি ভিন্ন এক শেকড় থেকে।

আমরা একইসাথে দুটি সাংঘর্ষিক ওয়ার্ল্ডভিউ ধারণ করার চেষ্টা করি।

প্রাসঙ্গিকতা : এলজিবিটি

যৌন বিকৃতির মতবাদ ও আন্দোলনকে সঠিকভাবে বোঝা, মূল্যায়ন করা এবং মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এই মিশ্রণ এবং দ্বন্দ্ব বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলজিবিটি আন্দোলনের উত্থান ও প্রসার যে পাশ্চাত্যে ঘটেছে, তা কাকতালীয় কোনো ঘটনা না। পশ্চিমের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে এলজিবিটি মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আছে বলেই এত জায়গা থাকতে পশ্চিমা বিশ্বেই এ আন্দোলন শুরু হয়েছে। এত দ্রুত, এত ব্যাপকভাবে সেখানে এই আন্দোলন সফল হয়েছে এবং এ বিকৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়াকে পশ্চিমা বিশ্ব 'ফরয' দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

লক্ষ্য করে দেখুন, বিকৃত যৌনতার পক্ষে দেওয়া সব যুক্তি আর বক্তব্যকে মোটাদাগে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

১। অধিকারের যুক্তি

যেমন: প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসার অধিকার আছে। একজন সমকামীর অধিকার আছে সমলিঙ্গের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবার। সমকামী কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করার অর্থ সমকামীদের অধিকার বঞ্চিত করা। প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ার। মানুষের অধিকার আছে তার দেহকে পরিবর্তন করার।

২। স্বাধীনতার যুক্তি

যেমন: প্রত্যেক মানুষের নিজের আচরণ ও পরিচয় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। ভালোবাসার স্বাধীনতা আছে। আরেকজনের আচরণকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। মানুষের স্বাধীনতা আছে অন্যের ক্ষতি না করে, নিজের দেহ নিয়ে যা ইচ্ছে করার।

৩। প্রগতির যুক্তি

যেমন: আগেকার দিনের মানুষ অনেক কিছু জানতো না। অনেক ব্যাপারে তাদের অবস্থান ভুল ছিল। সময়ের সাথে সাথে মানবজাতির উন্নতি হচ্ছে।

মানুষ অনেক কিছু জানতে পারছে। আধুনিক মানুষ অতীতের এই ভুলগুলো কাটিয়ে উঠেছে, সংশোধন করেছে। যৌনতা, পরিচয়, নারী-পুরুষের ব্যাপারে পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আজকের দিনে মধ্যযুগীয় এসব অবস্থান আঁকড়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না।

অধিকার, স্বাধীনতা এবং প্রগতি নিয়ে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার নির্দিষ্ট কিছু অবস্থান ও মূলনীতি আছে। এ সভ্যতার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শিক বিভিন্ন অবস্থানের গোড়ায় এই ধারণাগুলোকে আমরা দেখতে পাই। এ ভাষাতেই আধুনিক মানুষ মানবাধিকার, নারী অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্রসহ নানা বিষয়ে কথা বলে। এগুলো তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ বা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অধিকার, স্বাধীনতা এবং প্রগতির এই ধারণাগুলো এলজিবিটি আন্দোলন যৌনতা, পরিচয় এবং দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। তারপর সমাজ ও শাসনের ব্যাপারে এমন কিছু দাবি নিয়ে আসে, যেগুলো মোটাদাগে আধুনিক পশ্চিমের বিশ্বাস ও অবস্থানগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর এখানেই তৈরি হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা। অধিকার, প্রগতি, স্বাধীনতার এই ধারণাগুলো নিজের অজান্তেই আমরা মুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। শুধু মুসলিমরা না, সারা পৃথিবীই মোটাদাগে এগুলো গ্রহণ করেছে সর্বজনীন সত্য হিসেবে। তাই এলজিবিটি মতবাদকে প্রাথমিকভাবে বিষাক্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলেও যখনই প্রগতি, স্বাধীনতা কিংবা অধিকারের জায়গা থেকে দাবিগুলো তোলা হয়, তখন কীভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে, তা আমরা আর বুঝে উঠতে পারি না। শুধু তাই না, অনেক সময় আমরা এ মতবাদের বিভিন্ন অবস্থানও মেনে নিতে শুরু করি। যৌন বিকৃতির মতবাদ ও আন্দোলনকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে হলে তাই শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। শুরু করতে হবে ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আলোচনা থেকে।

বিশ্বাসের বিশ্লেষণ

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি হুট করে বলে ফেললেন—আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা আর ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এর প্রমাণ কী?

প্রশ্নটা যৌক্তিক। আমি দ্বন্দ্বের কথা বলেছি, কিন্তু প্রমাণ দিইনি। এর পেছনে একটা কারণ আছে। এই দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের তুলনামূলক একটা মূল্যায়ন আমি আপনাদের সাথে নিয়ে ধাপে ধাপে করতে চাই। অঙ্কের মুখস্থ উত্তর বলে দেওয়ার বদলে আমি চাই অঙ্কটা আপনি নিজে করতে শিখুন। যাতে বইয়ের অঙ্ক পরীক্ষায় হুবহু না আসলেও উত্তর মেলাতে সমস্যা না হয়।

তুলনামূলক এই মূল্যায়নের জন্য আমরা ওয়ার্ল্ডভিউ অ্যানালিসিস নামে একটা

পদ্ধতি ব্যবহার করবো। পদ্ধতিটা সহজ,

- মৌলিক কিছু প্রশ্নের তালিকা করতে হবে।
- দুটো ওয়ার্ল্ডভিউ বেছে নিতে হবে। দেখতে হবে কীভাবে তারা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়।
- উত্তরগুলো থেকে আমরা দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, অনুমান আর পূর্বধারণাগুলো চিহ্নিত করবো।

তারপর খুব সহজেই আমরা বলতে পারবো, এই ওয়ার্ল্ডভিউ দুটির মধ্যে মিল-অমিল কতটুকু। কেন একটি ওয়ার্ল্ডভিউ একটি অবস্থান সমর্থন করছে আর অন্যটা বিরোধিতা করছে।

মৌলিক প্রশ্ন

প্রত্যেক ওয়ার্ল্ডভিউয়ের নির্দিষ্ট কিছু উপাদান থাকে। সহজভাবে বললে, ওয়ার্ল্ডভিউগুলোর কিছু রোকন বা স্তম্ভ থাকে। এই উপাদানগুলো গড়ে উঠে জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে মৌলিক কিছুর প্রশ্নের উত্তর নিয়ে। প্রশ্নগুলো খুবই সাধারণ। আমরা সবাই বুঝে-না-বুঝে, সচেতন বা অবচেতনভাবে এগুলোর কোনো-না-কোনো উত্তরকে সঠিক হিসেবে ধরে নিই। আসুন, প্রশ্নগুলো এক নজর দেখা যাক।

প্রথম প্রশ্ন : বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে

কী আছে, কী নেই? পরম ও প্রধানতম বাস্তবতা (প্রাইম রিয়েলিটি) কী? আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বের ধরন ও প্রকৃতি কী?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : জ্ঞান নিয়ে

জ্ঞান কী এবং এর উৎস কী? আমরা কীভাবে জানি?

তৃতীয় প্রশ্ন : মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা

মানুষ কী? সে কোথা থেকে এলো?

চতুর্থ প্রশ্ন : জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে

মানব ইতিহাসের অর্থ কী? মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী?

পঞ্চম প্রশ্ন : মৃত্যু নিয়ে

মৃত্যুর পর কী হয়?

ষষ্ঠ প্রশ্ন : নৈতিকতা নিয়ে

ভালো কী? মন্দ কী? ভালো-মন্দের মাপকাঠি কোথা থেকে আসে?

সপ্তম প্রশ্ন : সমাজ ও শাসন নিয়ে

সমাজের রীতিনীতি আর শাসনব্যবস্থার উৎস কী হবে?

***

প্রত্যেক সমাজ আর সভ্যতা এ প্রশ্নগুলো করেছে। হয়তো শব্দ ভিন্ন হয়েছে, হয়তো উপস্থাপনায় পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু মূল জিজ্ঞাসাটা উপস্থিত থেকেছে কোনো-না-কোনো চেহারায়। এগুলো মানব-অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরগুলো থেকে একটা ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অবস্থান ও বিশ্বাসগুলো খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ডভিউ অ্যানালিসিসের প্রশ্ন-তালিকা ওপরের সাতটি প্রশ্নের মধ্যে সীমিত না।[৪৭৭] এই তালিকাতে আরও অনেক কিছু আসতে পারে। তবে আমাদের আলোচনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

এই প্রশ্নগুলোর আলোকে আমরা আধুনিকতা ও ইসলাম—এ দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের তুলনামূলক মূল্যায়ন করবো। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ওয়ার্ল্ডভিউকে বোঝাতে আমরা এখানে 'আধুনিকতা' বা 'আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউ' শব্দগুলো ব্যবহার করবো।

প্রথমে আমরা দেখবো, কীভাবে আধুনিকতা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। উত্তরগুলো থেকে আধুনিকতার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, অনুমান আর পূর্বধারণাগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর আমরা দেখবো, এলজিবিটি আন্দোলন কীভাবে আধুনিকতার এই অবস্থানগুলোকে ব্যবহার করে। তাদের অবস্থান আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

শেষ ধাপে আমরা তাকাবো ইসলামের উত্তরগুলোর দিকে। আধুনিকতার সাথে ইসলামের মিল কিংবা অমিল এবং এলজিবিটি আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা তখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

চলুন তাহলে, আমাদের সফরের পরের স্টেশনে যাওয়া যাক।

---

[৪৭৭] ওয়ার্ল্ডভিউ অ্যানালিসিসের পদ্ধতি ও প্রশ্ন নিয়ে জানতে দেখুন,
James W. (2009). The universe next door. Downers Grove, IL: IVP Academic; and Sire, James W. Naming the elephant: Worldview as a concept. InterVarsity Press, 2014. Nash, Ronald H. Worldviews in conflict: Choosing Christianity in a world of ideas. Zondervan, 1992. Berghout, Abdel Aziz, ed. Introduction to the Islamic worldview: Study of selected essentials. IIUM Press, 2010, এবং Sharif El-Tobgui, Carl. "Negotiating Paradigms: Islam and the Modern Worldview." https://www.youtube.com/watch?v=7FsJ4SiGqug (accessed March 13, 2024).

অধ্যায় ২১

আধুনিকতা : সবার ওপর মানুষ সত্য

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে প্রচুর। পশ্চিমের লাইব্রেরিগুলো বোঝাই হয়ে আছে হরেক রকমের তত্ত্ব, দর্শন আর মতবাদে। এর মধ্যে অনেকগুলো একটা আরেকটার সাথে সাংঘর্ষিক। আপাতভাবে মনে হতে পারে, বিচিত্র এই সংকলনের মধ্যে মৌলিক কোনো মিল নেই। তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্ব, চিন্তা আর প্রতিচিন্তার বিশাল এই স্তূপের ভেতরে নেই নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্র। এমন কোনো শেকড় নেই, যেখানে এসে মেলে সবকিছু। আপাতভাবে এমন মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতা ভিন্ন। পার্থক্য থাকলেও আধুনিক সব তত্ত্ব, দর্শন আর মতবাদের শুরু ইতিহাসের নির্দিষ্ট এক প্রেক্ষাপট থেকে। সবকিছুর গোড়াতে আছে নির্দিষ্ট কিছু অবস্থান ও মূলনীতি। সেগুলো সম্পর্কে জানার আগে পশ্চিমা বিশ্ব কীভাবে আজকের অবস্থায় পৌঁছালো, সেটা আমাদের খুব সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে।

বংশগতি

পশ্চিমা বিশ্ব একসময় গভীরভাবে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মোটাদাগে ঐক্যবদ্ধ ছিল পোপতন্ত্রের (রোমান ক্যাথলিক চার্চ) অধীনে। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এক প্রগাঢ় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে গভীর পালাবদলের ইঙ্গিত নিয়ে প্রথমে আসে রেনেসাঁ। এসময় মুসলিমদের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান, এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি গভীরভাবে প্রভাবিত করে ইউরোপীয়দের। পাশাপাশি তারা গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যের দর্শন ও সংস্কৃতি অনুকরণের চেষ্টা শুরু করে সচেতনভাবে। অন্যদিকে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ক্যাথলিক চার্চের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকা দুর্নীতি, অন্যায় আর অত্যাচার নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষের মধ্যে।

রেনেসাঁর পায়ে পায়ে আসে প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। তীব্র যুদ্ধ শুরু হয় তাদের মধ্যে। একসময় প্রটেস্ট্যান্টরাও নানা ভাগে বিভক্ত হয়, যুদ্ধ লেগে যায় তাদের মধ্যেও। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। এই

যুদ্ধগুলোর পেছনে ধর্মীয় বিভক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ-পরিবার আর অভিজাত শ্রেণির মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বড় ভূমিকা রাখে। নিজেদের স্বার্থকে আড়ালে রেখে ক্ষমতাসীনরা যুদ্ধগুলোকে জায়েজ করে ধর্মের অজুহাতে।[৪৭৮]

টানা যুদ্ধের ফলে একদিকে ইউরোপের ওপর ক্যাথলিক চার্চের একচ্ছত্র আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে বাইবেলের ব্যাপারে মোহভঙ্গ ঘটে খ্রিষ্টানদের। ইউরোপের মানুষ হতাশ হয়ে আবিষ্কার করে বিশ্বাস, সমাজ, রাষ্ট্র—কোনো বিষয়েই বাইবেলের ভিত্তিতে তারা আর একমত হতে পারছে না। অভিজাতরা সিদ্ধান্ত নেয়, বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাবে না। সমাধান খুঁজতে হবে অন্য কোথাও।

ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রে সীমিত করে ফেলা হয় ধর্মের প্রভাবকে। বিশ্বাসের বদলে যুক্তি, দর্শন আর পর্যবেক্ষণের আলোকে জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে থাকে ইউরোপ। শাসন ও জনপরিসর থেকে ধর্মকে সরানোর ফলে তৈরি শূন্যস্থান পূরণের তাগিদ থেকে উদ্ভব হয় নানা মতবাদ আর দর্শনের। গড়ে উঠে পৃথিবীকে দেখার, মানব অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি। তৈরি হয় শাসন ও অর্থনীতির নির্দিষ্ট কাঠামো, বিভিন্ন মতবাদ, সামাজিক বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব। তৈরি হয় আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউ।

তিনটি মূলনীতি

আধুনিকতার কেন্দ্রে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়,

- স্রষ্টা ও আসমানি কিতাবের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান: আধুনিক চিন্তা সেক্যুলার। আধুনিকতা সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর স্রষ্টা কিংবা আসমানি কিতাবের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস সমাজ ও শাসনের ভিত্তি হতে পারবে না।
- মানুষকেন্দ্রিকতা: সব আধুনিক চিন্তা মানুষকেন্দ্রিক। এখানে মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি। মানবীয় বিচারবুদ্ধি মূল মানদণ্ড। এর মাধ্যমেই ঠিক হবে ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ। আকল দিয়ে মানুষ মহাবিশ্বকে বুঝবে, জীবনকে বুঝবে। সাজাবে, উন্নত করবে।
- সমাজ ও শাসনের ওপর মানবরচিত বাদ-মতবাদের কর্তৃত্ব: সব আধুনিক চিন্তা মনে করে, সমাজ ও রাষ্ট্র চলবে মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, মতবাদ ও তত্ত্ব দ্বারা। এই নীতিকে আগের দুই নীতির সংমিশ্রণ ও প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

এই মূল ভিত্তি থেকে শুরু করে ইউরোপ পুরোপুরিভাবে মানুষকেন্দ্রিক ও দুনিয়াকেন্দ্রিক

[৪৭৮] Cavanaugh, William T. "A fire strong enough to consume the house: The wars of religion and the rise of the state." Modern theology 11, no. 4 (1995): 397-420.

চিন্তা গ্রহণ করে। এই চিন্তার আলোকে তৈরি হয় সমাজ ও শাসনব্যবস্থা। পরবর্তীতে উপনিবেশবাদের মাধ্যমে ইউরোপ তাদের এই ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় পুরো বিশ্বজুড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমারা উপনিবেশগুলো ছেড়ে চলে গেলেও, রেখে যায় তাদের তৈরি করা শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থা, আইনি কাঠামো, বাদ-মতবাদ এবং তাদের তৈরি করা ক্ষমতাসীন অভিজাত শ্রেণি। তারা চলে গেলেও চলতে থাকে তাদেরই তৈরি ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপট থেকেই আধুনিক তত্ত্ব, দর্শন আর মতবাদগুলোর উদ্ভব। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার শেকড়ও যুক্ত এখানে।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, যদি একই প্রেক্ষাপট থেকেই সবকিছুর উদ্ভব হয়, তাহলে আপাতদৃষ্টিতে এত পার্থক্য কেন দেখা যায়?

এর উত্তর হলো, আধুনিক তত্ত্ব, দর্শন আর মতবাদগুলো আসলে মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির আলোকে চিন্তার সর্বজনীন কাঠামো তৈরির একেকটা প্রচেষ্টা। একজন চিন্তক বা দার্শনিক একটা তত্ত্ব দেয়, অন্যরা এসে সেটা ভেঙ্গে ফেলে। তারপর অন্য কেউ নতুন তত্ত্ব দেয় অথবা আগের তত্ত্বগুলোর ভাঙ্গা টুকরো কুড়িয়ে নতুন করে আরেকটা কাঠামো তৈরি করে। আবার কেউ এসে সেটা ভাঙ্গে। এভাবে চক্র চলতে থাকে। এজন্যই আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক চিন্তার মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখা যায়।

কিন্তু এসব কিছুর গোড়াতে আছে স্রষ্টা ও আসমানি কিতাবের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান, মানুষকেন্দ্রিকতা এবং সমাজ ও শাসনের ওপর মানবরচিত বাদ-মতবাদের কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বাস ও অঙ্গীকার।

মৌলিক প্রশ্নের উত্তর

এবার তাহলে দেখা যাক, কীভাবে আধুনিকতা আমাদের বাছাই করা মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়।

প্রথম প্রশ্ন : বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব

আমাদের তালিকার প্রথম প্রশ্ন ছিল বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে।

> পরম ও প্রধানতম বাস্তবতা (প্রাইম রিয়েলিটি) কী? কী আছে, কী নেই? আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বের ধরন ও প্রকৃতি কী?

যেকোনো ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক ভিত্তি হলো, বাস্তবতা ও অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর। আর এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন। স্রষ্টা বলে কেউ কি আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরই অন্য সব উত্তরের সীমানা ঠিক করে দেবে।

স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে আধুনিকতার সম্ভাব্য উত্তর তিনটি,

- স্রষ্টা বলে কেউ নেই।

- স্রষ্টা আছেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব না।
- মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন, তবে তিনি মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপ করেন না। সমাজ, শাসন, জ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর কিছু বলার নেই, অথবা বলার থাকলেও তা গুরুত্বপূর্ণ না।

প্রথমটি নাস্তিকতার অবস্থান। নাস্তিকরা বিশ্বাস করে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই। পরম বাস্তবতা হলো বস্তু অথবা প্রকৃতি। সমস্ত অস্তিত্বকে প্রাকৃতিক এবং মহাজাগতিক নিয়মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ ধরনের অবস্থানের একটা ভালো উদাহরণ হলো বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর এই বক্তব্য,

> 'সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই। বিশ্বকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না... আমি ভাবতে পছন্দ করি যে, সবকিছুকেই (স্রষ্টায় বিশ্বাস ছাড়া) অন্য আরেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সবকিছুকে প্রকৃতির নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।'[৪৭৯]

দ্বিতীয় অবস্থানটি অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism)। অজ্ঞেয়বাদীরা মনে করে, স্রষ্টা আছেন বা স্রষ্টা নেই, এ দুই অবস্থানের কোনোটার পক্ষেই মানবীয় বুদ্ধিমত্তা পর্যাপ্ত প্রমাণ দিতে পারে না। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নকে অজ্ঞেয়বাদীরা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না।

তৃতীয় অবস্থানটি হলো, Deism। এই শব্দের যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অনেকে অনুবাদ করেন 'যৌক্তিক একেশ্বরবাদ'। সেটাও ঠিক মানানসই না। সহজ ভাষায় Deism হলো ধর্ম বাদ দিয়ে স্রষ্টায় বিশ্বাস। এ ধরনের অবস্থান যারা গ্রহণ করে, তাদের বলা হয় ডীয়িস্ট (deist)। ডীয়িস্টরা মনে করে, মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি সৃষ্টিজগতের আইন ও প্রকৃতির নির্মাতা। তবে উদাস নির্মাতা। সব ঠিকঠাক করে দম দেওয়া ঘড়ির মতো মহাবিশ্বকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। সৃষ্টিজগতে তিনি আর হস্তক্ষেপ করেন না। কোনো ধর্ম পালন করে তাকে পাওয়া যাবে না। তাকে পাওয়ার উপায় হলো যুক্তি, বিজ্ঞান আর অনুসন্ধান। ভলতেয়ার, থমাস পেইন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনসহ এনলাইটেনমেন্টের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক এবং দার্শনিক ছিল ডীয়িস্ট। ভারতের রাজা রামমোহন রায় এবং তার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অনুসারীদেরকেও এক অর্থে ডীয়িস্ট বলা যায়।[৪৮০]

ব্যক্তিগতভাবে 'ধর্মে বিশ্বাসী' কিন্তু মতাদর্শিকভাবে সেক্যুলার বা 'ধর্মনিরপেক্ষ'

---

[৪৭৯] Hawking, Stephen. Brief answers to the big questions. Bantam, 2018.

[৪৮০] ব্রাহ্মসমাজ : উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন। এ আন্দোলন 'বাংলার পুনর্জাগরণের' (বেঙ্গল রেনেসাঁ) পুরোধা হিসেবে পরিচিত। রাজা রামমোহন রায় এ আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা এক 'নিরাকার ব্রহ্ম'-এর উপাসনা করতেন, তাই নিজেদের ধর্মের নাম রাখেন ব্রাহ্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশের পরিবারও ছিল ব্রাহ্মসমাজের অনুসারী।

মানুষেরাও তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সমাজে এ ধরনের অনেক মানুষ দেখা যায়। তারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করার কথা বলেন, সালাত, সিয়াম বা হজ্জের মতো ইসলামের কিছু বিধান পালনও করেন। আবার তারা সমাজ ও শাসন থেকে ইসলামকে সরিয়ে রাখার কথাও বলেন জোর দিয়ে। এ ধরনের মানুষদের 'সেক্যুলার ধার্মিক' জাতীয় কিছু একটা হয়তো বলা যায়। এদের অবস্থান কার্যত ডীয়িস্টদের মতোই।

স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে এই হলো আধুনিকতার অবস্থান। এই তিনটি অবস্থানের মধ্যে আপাত পার্থক্য থাকলেও, কার্যত তারা এক। স্রষ্টা থাকুক বা না থাকুক, তিন অবস্থানেরই অবধারিত ফলাফল হলো, রাষ্ট্র, সমাজ, শাসন চালাতে হবে স্রষ্টাকে সমীকরণ থেকে সরিয়ে রেখে। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'দা হিউম্যানিস্ট ম্যানিফেস্টো'-র[৪৮১] বক্তব্য থেকে এই অবস্থান খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাদের ভাষায়,

> 'অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ আমরা পাইনি। মানবজাতির টিকে থাকা এবং পরিপূর্ণতার প্রশ্নে এটি (অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব) হয় অর্থহীন অথবা অপ্রাসঙ্গিক।... আমরা মানুষকে দিয়ে শুরু করি, স্রষ্টাকে দিয়ে নয়। প্রকৃতিকে দিয়ে শুরু করি, দেবতাকে দিয়ে নয়।'[৪৮২]

আধুনিকতার কাছে পরম ও প্রধান বাস্তবতা হলো মানুষ এবং দুনিয়া। আধুনিকতা মানুষ ও দুনিয়াকেন্দ্রিক।

বাস্তবতা আর অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনায় স্রষ্টার অস্তিত্ব এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তবে একমাত্র প্রশ্ন না। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে থেকে যায়।

আপনার হাতে ধরা এই বইটির অস্তিত্ব আছে, বইটি বাস্তব। আপনি যে চেয়ার, সোফা বা বিছানায় বসে বইটি পড়ছেন তাও বাস্তব। আপনার পায়ের নিচের মাটি, মাথার ওপরের আকাশ বাস্তব। আমাদের চারপাশের বস্তুজগতের অস্তিত্ব আছে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু বস্তুজগতের সীমানার বাইরে কি কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে? রূহ, আখিরাত বা মৃত্যুর পরের জীবন, জিন, কিংবা ফেরেশতার কি অস্তিত্ব আছে?

এক্ষেত্রে আধুনিকতা বস্তু জগতের বাইরে অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না

---

[৪৮১] ১৯৭৩ সালে রচিত সেক্যুলার হিউম্যানিসম বা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ-এর একটি ইশতেহার। এই দর্শনের মূল অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি এই ইশতেহারে সংক্ষেপে ফুটে ওঠেছে। প্রকাশের সময় বিশ্বের ১২০ জন 'বিশিষ্ট নাগরিক' এতে সাক্ষর করেন। যাদের মধ্যে দার্শনিক অ্যালফ্রেড আইয়ার, বায়োলজিস্ট ও বুদ্ধিজীবী জুলিয়ান হাক্সলি, বিজ্ঞানী ফ্র্যান্সিস ক্রিক, বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক আইযাক আসিমভ, নারীবাদী নেত্রী বেটি ফ্রিডান, বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বিএফ স্কিনার, দার্শনিক জৌসেফ মারগোলিসের নাম উল্লেখযোগ্য।

[৪৮২] Kurtz, Paul, and Edwin H. Wilson. "Humanist manifesto II." The Humanist 33, no. 6 (1973): 4-9.

অথবা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। অতিপ্রাকৃত, অদৃশ্য এবং অতীন্দ্রিয়কে আধুনিকতা অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : জ্ঞান ও জ্ঞানের উৎস

বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের পরে আসে জ্ঞান ও জ্ঞানের উৎস নিয়ে প্রশ্ন।

> জ্ঞান কী? জ্ঞানের উৎস কী? জ্ঞানার্জনের পথ কী? আমরা কী জানি? কীভাবে জানি? জানার মানদণ্ড কী? জ্ঞানের সাথে ধারণা, দাবি, কুসংস্কার কিংবা ব্যক্তিগত মতের পার্থক্য কী? এই পার্থক্য যাচাইয়ের উপায় কী?

জ্ঞান ও জ্ঞানের উৎস নিয়ে অবস্থান ওয়ার্ল্ডভিউয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান। আর জ্ঞান নিয়ে অবস্থান নির্ভর করে বাস্তবতা ও অস্তিত্ব নিয়ে একজন মানুষের বিশ্বাসের ওপর।

আধুনিকতা মোটাদাগে জ্ঞানের দুটি উৎসকে স্বীকার করে।

- ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য (sense experience)
- মানবীয় বুদ্ধিমত্তা (reason)

আধুনিকতার অবস্থান হলো, মানুষ তার সহজাত বিচারবুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের শক্তি ব্যবহার করে জ্ঞানার্জন করতে পারে। স্পর্শ, দেখা, শোনা, স্বাদ আর গন্ধের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যকে আধুনিকতা জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করে। সেই সাথে মানবীয় বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেও জ্ঞানে পৌঁছানো যায়।

জ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মজবুত ক্ষেত্র বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানে এই দুটি দিকের ব্যবহারই দেখা যায়। প্রথমে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে (ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান) কিছু তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ করা হয়। তারপর তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অনুমান বা হাইপোথিসিস তৈরি হয় (মানবীয় বুদ্ধিমত্তা)। সবশেষে সেই অনুমানকে পরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

জ্ঞানের উৎস হিসেবে ওয়াহী বা আসমানি কিতাবকে আধুনিকতা স্বীকার করে না। কেউ চাইলে এগুলো বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু এগুলো জ্ঞানের বৈধ উৎস না।

তৃতীয় প্রশ্ন : মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা

আমাদের তালিকার তৃতীয় প্রশ্ন মানুষের প্রকৃতি ও উৎস নিয়ে।

> মানুষ কী? মানুষ কে? আমরা কোথা থেকে আসলাম? কোথায় যাচ্ছি? আমরা কি আদৌ কোথাও যাচ্ছি? মানুষের সত্যিকার প্রকৃতি কী?

আধুনিকতার অবস্থান হলো ডারউইনিসম বা বিবর্তনবাদের অবস্থান। মানুষের উৎপত্তি বনমানুষ (ape) জাতীয় কোনো প্রাণী থেকে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলা

বিক্ষিপ্ত এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের উৎপত্তির পেছনে কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশাল এ মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র এক কোণায়, সমীকরণের নানা চলক মিলে যাওয়ায় প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে বিকাশ ঘটেছে। উৎপত্তি হয়েছে নানা প্রজাতির। তারা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এ দিক থেকে অন্যান্য পশুর তুলনায় মানুষের কোনো বিশেষত্ব নেই। মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার চিন্তা, অনুভূতি এগুলো শরীরের ভেতরের বিভিন্ন কেমিক্যালের জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফসল, যা আমরা এখনো পুরোপুরিভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। আধুনিকতার চোখে মানুষ মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফসল। বিবর্তিত পশু, যে এখনো পশুই আছে।

একইসাথে আধুনিকতা মানুষকে ‘বিশেষ’ মনে করে। মানুষের প্রাণ, চিন্তা, অনুভূতির আলাদা দাম দেয়। এক্ষেত্রে যুক্তি হলো, প্রাণিজগতের মধ্যে কেবল মানুষই গভীর চিন্তা, ভাষার ব্যবহার, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণ করতে পারে। মানুষের মূল্যবোধ আছে, নীতিবোধ আছে, মানুষের আছে সংবেদনশীলতা। তাই মানুষ আলাদা। মানুষের চিন্তা, অর্জন, আকাঙ্ক্ষা, সীমাবদ্ধতা, তার স্বপ্ন, তার হতাশা, তার আনন্দ আর দুঃখবোধ, তার কল্পনা ও প্রতিভা তাকে প্রাণিজগতের মধ্যে ‘অসাধারণ’ করে তুলেছে।

প্রত্যেক মানুষ তার প্রকৃতি, ভবিষ্যৎ ও জীবনের পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রত্যেক মানুষের অনুভূতি, বিশেষ করে তার আত্মপরিচয়ের অনুভূতি মূল্যবান। ব্যক্তি, তার সার্বভৌমত্ব এবং তার স্বাধীনতা সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে পবিত্র। মানুষ তার নিজ অস্তিত্বের মালিক, নিজ নিয়তির স্থপতি।

মানুষ নিয়ে আধুনিকতার অবস্থানের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা আছে। মানুষ মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফসল, কিন্তু মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, সমাজ, সংস্কৃতি অর্থবহ, গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ পশু, কিন্তু ‘বিশেষ’ শ্রেণির পশু। মানুষের বিশেষ স্বাধীনতা এবং মর্যাদা আছে, যা অন্য পশুদের নেই। তার চিন্তা আর অনুভূতি জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফসল, কিন্তু সেগুলো আবার মূল্যবান। এই পরস্পরবিরোধিতা পরবর্তীতে আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

চতুর্থ প্রশ্ন : জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য

পরের প্রশ্ন মানবজাতির অস্তিত্বের অর্থ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে।

> মানব ইতিহাসের অর্থ কী? মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী? মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য কী? গন্তব্য কী? আদৌ কি কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য আছে? না কি আমরা সবাই নিজের মনমতো জীবনের একেকটা অর্থ আর উদ্দেশ্য বেছে নেবো?

এক্ষেত্রে আধুনিকতার জবাব হলো, জীবনের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। গভীরভাবে

চিন্তা করলে আমরা সবাই আসলে মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতায় ইতস্তত ভেসে বেড়ানো পরমাণুর সমষ্টি কেবল। প্রাণের পেছনে যেহেতু কোনো উদ্দেশ্য নেই, পরিকল্পনা নেই, কাজেই জীবনেরও সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। নেই গন্তব্য। তবে মানুষ নিজের মতো করে উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে পারে। ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারে নিজের পরিচয় আর জীবনের কোনো লক্ষ্য।

তবে এখানেও আছে পরস্পরবিরোধিতা। আধুনিকতার মধ্যে প্রগতিবাদের ধারণা পাওয়া যায়। প্রগতিবাদ বলে ইতিহাসের গ্রাফ সরলরৈখিক এবং ঊর্ধ্বমুখী। যত সময় যাচ্ছে, তত মানুষের অগ্রগতি হচ্ছে। এই অগ্রগতি সামগ্রিক। যত সময় যাবে মানুষ তত উন্নত হবে। সবসময় গতকালের চেয়ে আগামীর মানুষ শ্রেষ্ঠ হবে।

এই ধরনের বিশ্বাসের কারণে বিভিন্ন আধুনিক মতবাদের মধ্যে ইউটোপিয়ান প্রবণতা দেখা যায়। তারা দুনিয়াতে তৈরি করতে চায় নিখুঁত কল্পরাজ্য। মনে করে নির্দিষ্ট কিছু মতবাদ বিশ্বাস করলে, নির্দিষ্ট কিছু ধ্যানধারণা বাস্তবায়িত হলেই দুনিয়ার সব (বা অধিকাংশ) সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এই প্রবণতা দেখা যায় মার্ক্সবাদ থেকে শুরু করে লিবারেলিসমের মধ্যে। ফরাসি বিপ্লবী থেকে শুরু করে ইলন মাস্কের মধ্যে। তাদের কথা ও কাজে মানবজাতির অমোঘ মহাকাব্যিক নিয়তি নিয়ে এক ধরনের বিশ্বাস দেখা যায়। তারা বিশ্বাস করে এমন—কোনো মতবাদ, শাসনব্যবস্থা, প্রযুক্তি বা তত্ত্ব—কিছু না কিছু আছে, যার মাধ্যমে নিখুঁত এক জগৎ তৈরি হবে।

গত আড়াইশো বছর ধরে আধুনিকতা যতগুলো বিপথগামী রাজনৈতিক প্রকল্পের জন্ম দিয়েছে, প্রায় সবগুলোর কেন্দ্রে আছে প্রগতিবাদের বিশ্বাস আর কল্পরাজ্যের হাতছানি। এই মতবাদগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিখুঁত আগামীর স্বপ্ন দেখিয়েছে, তারপর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ।

আধুনিকতা জান্নাতকে উপেক্ষা করে দুনিয়াতে জান্নাত তৈরি করতে চায়। আধুনিকতা এক দিকে অস্তিত্বকে দুর্ঘটনা মনে করে, অন্যদিকে স্বপ্ন দেখে ইতিহাসের অমোঘ গন্তব্যের।

পঞ্চম প্রশ্ন : মৃত্যু

তারপর আসে মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন। মৃত্যু জীবনের একমাত্র সুনিশ্চিত সত্য। মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু মৃত্যুর পর কী হয়?

এক্ষেত্রে আধুনিকতার অবস্থান থেকে সবচেয়ে যৌক্তিক উত্তর হলো, কিছুই না।

মৃত্যুর পর কোনো চেতনা, কোনো সত্তা, কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকে না; থাকে কেবল পরম শূন্যতা। মৃত্যুর সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। হিউম্যানিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভাষায়,

> 'আমরা যতদূর জানি, মানুষের ব্যক্তিত্ব হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি জৈবিক জীবের অংশগ্রহণ ও কার্যক্রমের ফাংশন (ফলাফল)। দেহের মৃত্যুর পর প্রাণ টিকে থাকে, এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই।'

বিখ্যাত দার্শনিক এবং নাস্তিক বারট্রান্ড রাসেলের ভাষায়,

> 'মানুষ হলো এমন কিছু কারণের ফসল, যারা জানতোই না তারা ঠিক কী অর্জন করতে যাচ্ছে। মানুষের উৎস, বিকাশ, আশা এবং ভয়, তার ভালোবাসা আর বিশ্বাসগুলো পরমাণুর আকস্মিক সংযোজন আর সংকলনের ফলাফল ছাড়া আর কিছুই না। কোনো আগুন, কোনো বীরত্ব, কোনো চিন্তা কিংবা অনুভূতির কোনো তীব্রতাই মৃত্যুর পর জীবনকে রক্ষা করতে পারে না... মানুষের অর্জনের পুরো মন্দির অবধারিতভাবে মহাবিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়বে।'[৪৮৩]

তবে অনেক আধুনিক মানুষ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। অনেকে মনে করে মৃত্যুর পর তারা অস্তিত্বের উচ্চতর কোনো অবস্থানে রূপান্তরিত হবে। 'সেক্যুলার ধার্মিক'দের মধ্যে ধর্ম অনুযায়ী আখিরাতের বিশ্বাসও দেখা যায়। তবে স্রষ্টায় বিশ্বাসের মতো এই বিশ্বাসগুলোও স্রেফ তাত্ত্বিক কিছু অবস্থান। মৃত্যুর পর কিছু আছে কি না, তার ভিত্তিতে দুনিয়ার প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতে তারা আগ্রহী না।

ষষ্ঠ প্রশ্ন : নৈতিকতা

মানুষ নৈতিক প্রাণী। আমাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বোধ কাজ করে। কিন্তু ভালো-মন্দের মাপকাঠি কী হবে? কীভাবে আমরা ভালো আর মন্দকে চিনতে পারবো? কোথা থেকে আমার নৈতিকতার বোধ তৈরি হচ্ছে? কীসের ভিত্তিতে? নৈতিকতার মানদণ্ড কীভাবে আমাদের বেঁচে থাকতে বলে?

এগুলো নিয়েই আমাদের ষষ্ঠ প্রশ্ন।

আধুনিকতা মনে করে নৈতিকতার ভিত্তি মানুষ। যদি স্রষ্টা বলে কেউ না থাকে, যদি মহাবিশ্বের পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে ভালো-মন্দের চিরন্তন কোনো সংজ্ঞা, মাপকাঠি, এমন অস্তিত্বও থাকার কথা না। তবে সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে মানুষ নিজেই কিছু নৈতিক অবস্থান বানিয়ে নেয়। সময়ের সাথে সাথে সেগুলো বদলায়। প্রগতির বিশ্বাস বলে, সময়ের সাথে সাথে মানুষের সব দিক থেকে উন্নতি হচ্ছে। তাই আধুনিক মানুষ মনে করে, তার নৈতিক অবস্থান এবং মূল্যবোধ আগেকার যুগের মানুষের চেয়ে উন্নত। নৈতিকতার ব্যাপারে মোটা দাগে আধুনিকতার দুটি অবস্থান আছে।

---

[৪৮৩] Russell, Bertrand. A free man's worship. Vol. 97. TB Mosher, 1923.

১। **উপযোগবাদ (utilitarianism)**; যা বলে নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো সুখ ও কষ্ট। আনন্দ ও বেদনা। যা মানুষকে সুখ দেয়, যা সুখ বাড়ায়, তা ভালো। যা সুখ কমায় বা কষ্ট সৃষ্টি করে তা মন্দ। উপযোগবাদের আধুনিক দর্শনের জনক জেরেমি বেন্থামের ভাষায়,

> 'প্রকৃতি মানবজাতিকে দুই সার্বভৌম মালিকের অধীন করেছে, কষ্ট ও আনন্দ। আমাদের কী করা উচিত এবং আমরা কী করব, এটা নির্ধারণের কাজ কেবল এ দুজনেরই।'[৪৮৪]

কাজেই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ অর্জন আর কষ্টকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। আরেক ব্রিটিশ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল এর সাথে হার্ম প্রিন্সিপাল বা ক্ষতির মূলনীতি যুক্ত করে। এই মূলনীতি বলে, 'নিজের সুখের জন্য মানুষের যেকোনো কিছু করার অধিকার ও স্বাধীনতা আছে, যতক্ষণ না তা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়।' এই নীতির ব্যাপারে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

২। **ডিঅনটোলজিকাল এথিক্স (deontological ethics)**; এ শব্দটি এসেছে গ্রিক deon থেকে, যার অর্থ দায়িত্ব। নৈতিকতার এই তত্ত্বের কেন্দ্রে আছে দায়িত্বের ধারণা। এই অবস্থান বলে, চিরন্তন কিছু নৈতিক সত্য আছে। কিছু কাজ সত্তাগতভাবে ভালো, কিছু কাজ সত্তাগতভাবে খারাপ। কাজের ফলাফল কী, এ থেকে লাভ হচ্ছে না কি ক্ষতি, তা মুখ্য না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ডিঅনটোলজিকাল নৈতিকতার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবক্তাদের অন্যতম। কান্টের মতে, সর্বজনীন মানবীয় বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সর্বজনীন নৈতিক সত্যগুলোতে পৌঁছানো সম্ভব।

উপযোগবাদের বক্তব্য হলো, সর্বজনীন ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। ভালো-মন্দ নির্ধারণ হবে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনার ক্যালকুলাস থেকে। ডিঅনটোলজিকাল নৈতিকতার মতে ভালো-মন্দের সর্বজনীন ধারণা আছে, তবে সেগুলো আবিষ্কার করা হবে মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে। দুটোই শেষ পর্যন্ত মানুষকে নৈতিকতার মাপকাঠি বানাচ্ছে। উপযোগবাদ আনন্দ-বেদনার হিসেব করছে মানুষের ভিত্তিতে। ডিঅনটোলজিকাল এথিক্স 'সর্বজনীন নৈতিক সত্য' খুঁজছে মানবীয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে। পাশাপাশি এ দুই অবস্থানই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে; সব ধরনের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারাকে, কেন্দ্রীয় নৈতিক মূল্যবোধ মনে করে।

নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের তালিকার আগের পাঁচটি প্রশ্নের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। আগের প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে একজন মানুষের অবস্থানই নৈতিকতার ব্যাপারে তার অবস্থান ঠিক করে দেবে।

---

[৪৮৪] Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (789), ed. by J." H Burns and HLA Hart, London (1970).

সপ্তম প্রশ্ন : সমাজ ও শাসন

আমাদের তালিকার সর্বশেষ প্রশ্ন সমাজ ও শাসন নিয়ে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে শাসন কাঠামোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু, সমাজের রীতিনীতির উৎস কী হবে? শাসনের ভিত্তি কী হবে? কী হবে আইন প্রণয়নের উৎস? আইনের কোন উৎসগুলো বৈধ? আইন কে বানাবে? কীসের ভিত্তিতে বানাবে? শাসক ও অধীনস্তদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে? আইন বৈধ না কি অবৈধ, ন্যায্য না কি অন্যায্য সেটা আমরা কীভাবে বুঝবো?

সমাজ ও শাসন নিয়ে প্রশ্নের উত্তরও সরাসরি আগের প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক আইনি ব্যবস্থা নৈতিকতা এবং ভালো-মন্দের সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। নৈতিকতার ব্যাপারে অবস্থান আবার নির্ভর করে বাস্তবতা, অস্তিত্ব, জ্ঞান, মানুষের উৎস, জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং মৃত্যুর পর কী হয়, তা নিয়ে একটি সমাজের অবস্থানের ওপর।

তাই আইন মাত্রই দ্বীন-নির্ভর। সব আইন কোনো-না-কোনো ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাপেক্ষে গড়ে উঠে। আইনের উদ্দেশ্য মানুষের আচরণকে সীমিত করা, নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া, মানুষের স্বার্থ রক্ষা, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথে ওয়ার্ল্ডভিউ যুক্ত। মানুষের মৌলিক বিশ্বাস অনুযায়ী কল্যাণ আর স্বার্থের সংজ্ঞা, তালিকা আর অগ্রাধিকার পালটে যায়। আসে অধিকারের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আর সীমানা।

সুতরাং, আইন এবং শাসন কখনোই দ্বীন-নিরপেক্ষ হতে পারে না। ইসলামী শরীয়াহ হোক, বেদের শাসন হোক কিংবা হোক আধুনিক সেক্যুলার আইন—প্রত্যেকটির উৎপত্তি কোনো-না-কোনো দ্বীন বা ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে। কিছু বিশ্বাস থেকে। রাষ্ট্র এবং শাসন কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না।

সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে আধুনিকতার উত্তর বাকি সব প্রশ্নের চাইতে সোজাসাপ্টা। আধুনিকতা বলে, সামাজিক রীতিনীতি ও আইন-কানুনের ভিত্তি হবে মানবীয় বিচারবুদ্ধি। মানুষের বানানো বিভিন্ন তত্ত্ব, মতবাদ আর দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও শাসন চলবে। মানুষই উৎস, মানুষই মাপকাঠি। প্রত্যেক আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন—তা হোক উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অরাজবাদ (anarchism) কিংবা অন্য কিছু—সবাই এখানে একমত।

সংক্ষেপে এই হলো আধুনিকতার উত্তরপত্র। বাহ্যিক খুঁটিনাটি নানা পার্থক্য থাকলেও এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে সব আধুনিক তত্ত্ব, মতবাদ এবং জীবনদর্শনের উত্তর মোটাদাগে এমনই হবে।

আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা

এখানে কেউ হয়তো পোস্ট-মডার্নিসম বা উত্তর-আধুনিকতাবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। বলা হয়, গত প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর ধরে আমরা আধুনিকতার যুগ পার হয়ে উত্তর-আধুনিকতা বা পোস্ট-মডার্নিটির যুগে বাস করছি।। আর উত্তর-আধুনিকতাবাদ আধুনিকতার অনেক অবস্থানের খণ্ডন করে। আধুনিকতার বিপরীতে অবস্থান নেয়।

কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা আসলে আধুনিকতা থেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা না। বরং আধুনিকতারই যৌক্তিক উপসংহার বা এর আরেকটি পর্যায়। আধুনিকতার অনেক অবস্থানের সমালোচনা উত্তর-আধুনিকতাবাদ করে, এ কথা সত্য। কিন্তু মৌলিক প্রশ্নগুলোর জায়গাতে আধুনিকতার অঙ্গীকারগুলো থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদ মুক্ত হতে পারেনি।

আধুনিকতার মতো উত্তর-আধুনিকতাও সেক্যুলার। স্রষ্টা ও আসমানি কিতাবের কর্তৃত্ব সে-ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আধুনিকতার মতো সে-ও মানুষকেন্দ্রিক। সে-ও সমাজ ও শাসনের ওপর মানবরচিত বাদ-মতবাদের কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে।

তাহলে পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য হলো, আধুনিকতা মনে করে মানবীয় বিচারবুদ্ধির একটা সর্বজনীন রূপ আছে। কান্ট যেমন মনে করতো সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি দিয়ে সর্বজনীন নৈতিক সত্য আবিষ্কার করা যাবে। উত্তর-আধুনিকতাবাদ বলে, এমন কোনো সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি নেই, সত্যও নেই। সবই আপেক্ষিক। সবই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক প্রেক্ষাপটের ফসল।

তবে এখানে দ্বিমত করলেও উত্তর-আধুনিকতাবাদ কিন্তু মানুষকেন্দ্রিকতা থেকে বের হচ্ছে না। সে এখনো বলছে মানুষের চিন্তা, বিবেচনা, ধ্যানধারণা অনুযায়ী সমাজ চলবে, শাসন চলবে। নৈতিকতার মাপকাঠি ঠিক হবে। তবে এখানে নির্দিষ্ট কোনো সঠিক উত্তর নেই। একেক সমাজ ও সংস্কৃতি একেকভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এ সবগুলো উত্তরই সমপর্যায়ের, অর্থাৎ একই মাত্রায় সঠিক অথবা ভুল। একটার ওপর আরেকটাকে প্রাধান্য দেওয়ার কিছু নেই।

অর্থাৎ পোস্ট-মডার্নিসমও দিনশেষে মানুষকে কেন্দ্র বানাচ্ছে। সে কেবল একটা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যোগ করে বলছে, এসব বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) নেই, বরং ইখতেলাফ (বৈধ মতপার্থক্য) আছে।

একইসাথে ব্যক্তির স্বাধীনতা, অধিকার, এবং আত্মপরিচয় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সাথে উত্তর-আধুনিকতার অবস্থানের মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য

নেই; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতার অবস্থান আরও চরমপন্থী।

***

আমরা মৌলিক প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আধুনিকতার উত্তর দেখলাম। এবার আমরা দেখবো আধুনিকতার এই অবস্থানগুলো কীভাবে বিকৃত যৌনতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থানগুলোকে প্রভাবিত করেছে এবং যৌন বিকৃতির আন্দোলন কীভাবে আধুনিকতার রোকনগুলোকে ব্যবহার করে।

অধ্যায় ২২

ব্যবচ্ছেদ

আধুনিকতার মৌলিক বিশ্বাসগুলো যদি গাছ হয়, তাহলে বিকৃত যৌনতার মতবাদ সেই গাছের ফল। আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম, বিকৃত যৌনতার পক্ষে দেওয়া সব যুক্তি আর বক্তব্যকে মোটাদাগে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়,

১. স্বাধীনতার যুক্তি (প্রত্যেক মানুষের ক, খ, গ কাজ করার স্বাধীনতা আছে)

২. অধিকারের যুক্তি (মানুষের চ, ছ, জ-এর অধিকার আছে)

৩. প্রগতির যুক্তি (যেহেতু আমরা আধুনিক, তাই আমাদের ট, ঠ, ড অবস্থান মেনে নেওয়া উচিৎ)

আর এই প্রতিটা অবস্থানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে গত অধ্যায়ে দেখা মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর। কিন্তু সমস্যা রয়ে গেছে সেই উত্তরগুলো নিয়ে। আসুন, ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

স্বাধীনতার যুক্তি

বিকৃত যৌনতার পক্ষে স্বাধীনতার যুক্তি অনেকটা এরকম, প্রত্যেক মানুষের নিজের আচরণ ও পরিচয় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। ভালোবাসার স্বাধীনতা আছে। সমকামিতার পক্ষে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। মানুষের স্বাধীনতা আছে অন্যের ক্ষতি না করে নিজের দেহ নিয়ে যা ইচ্ছে করার।

স্বাধীনতার এই যুক্তির ভিত্তি হলো আধুনিকতার দুটি অবস্থান :

- স্বাধীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ
- ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব

আধুনিকতার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক মূল্যবোধ। সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। যে শাসনব্যবস্থা যত বেশি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে পারবে, সেই শাসনব্যবস্থা তত ভালো। ব্যক্তি কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল—তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারা। স্বাধীনতা মানেই ভালো। স্বাধীনতা সীমিত হওয়া মানেই খারাপ।

একইসাথে আধুনিক মানুষ মনে করে, ব্যক্তি তার দেহের সার্বভৌম মালিক। দেহের ওপর তার আছে সর্বময় কর্তৃত্ব। নিজের খেয়ালখুশি মতো সে একে ব্যবহার করবে। ইচ্ছে হলে ওষুধ, অস্ত্রোপচার কিংবা অন্য কোনো প্রযুক্তি দিয়ে দেহকে সে বদলে ফেলবে। দেহ তার ইচ্ছাপূরণের কাঁচামাল। অন্য কারও ক্ষতি না করলেই হলো।।

একবার এমন অবস্থান গ্রহণ করে নিলে আনন্দের পেছনে ছোটাকে বাধা দেওয়ার কিংবা সীমিত করার কোনো যুক্তি থাকে না। বরং এগুলোই হয়ে দাঁড়ায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এমন অবস্থান অবধারিতভাবে মানুষকে নিয়ে যায় ভোগবাদ, বস্তুবাদ, 'যা ইচ্ছে তাই করা' আর সাময়িক শারীরিক সুখের মধ্যে জীবনের পূর্ণতা খোঁজার দর্শনে।

এ ধরনের চিন্তার আরেকটা ফলাফল হলো, জীবনের যে দিকগুলো একসময় অমোঘ, অপরিবর্তনীয় গণ্য করা হতো, ধীরে ধীরে সেগুলো বদলে ফেলা। অতীতে মনে করা হতো, বিয়ে মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আধুনিকতার চোখে বিয়ে আসলে মানুষের বানানো সামাজিক প্রচলন কেবল। বিবর্তনের কোনো এক পর্যায়ে সমাজ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তাই তখন একে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অতীতের সেই পর্যায় আধুনিক মানুষ পার করে এসেছে। বিয়ে আর পরিবারের সেকেলে ধারণা এখন আর জরুরি না। বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এখন ফুরিয়ে গেছে অনেকটাই। কেউ ইচ্ছে হলে বিয়ে করবে, ইচ্ছে হলে করবে না। যৌনসম্পর্কের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক জরুরি না।

যৌনতাও কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। যৌনতার কোনো নির্দিষ্ট, 'প্রাকৃতিক' কিংবা 'সঠিক' সংজ্ঞা নেই। তা হতে পারে নারী ও পুরুষের মধ্যে, নারী ও নারীর মধ্যে, পুরুষ ও পুরুষের মধ্যে কিংবা অন্য কোনো বৈচিত্র্যময় ঢঙে। একই কথা প্রযোজ্য পরিচয়ের ক্ষেত্রেও। নারী-পুরুষের আলাদা পরিচয়, আলাদা সামাজিক ভূমিকা একটা সময় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা আধুনিক মানুষেরা সেই প্রয়োজন পার করে এসেছি। তাই একে অমোঘ, প্রাকৃতিক সত্য হিসেবে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেকোনো ধরনের যৌনতার স্বাধীনতা মানুষের আছে। আছে যেভাবে ইচ্ছে নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ারও স্বাধীনতা।

কাজেই বিকৃত যৌনতায় আসক্ত কোনো ব্যক্তি যদি বলে, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতাকে নিষিদ্ধ করে রাখার অর্থ তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় বাধা দেওয়া, তাহলে তার এই বক্তব্য আধুনিকতার জায়গা থেকে সঠিক। যেহেতু সে তার দেহের মালিক, তাই এই দেহ নিয়ে সে কী করছে, কার সাথে শুচ্ছে, এটা একান্তই তার ব্যাপার। আপনার বা আমার কাছে তার এসব কাজ পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু তার স্বাধীনতায় আমরা বাধা দিতে পারি না। বরং আমাদেরকে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এলজিবিটি আন্দোলনের স্বাধীনতার যুক্তি আধুনিকতার অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিকৃত যৌনতা নিয়ে আধুনিকতার অবস্থানের পেছনে কাজ করছে মানবপ্রকৃতি এবং মালিকানা নিয়ে মৌলিক বিশ্বাসগুলো। মানুষ বিশ্বাস করছে সে তার দেহের মালিক। নিজের ব্যাপারে মানুষই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। মানুষই ঠিক করবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও সীমানা। এটি আধুনিকতার মানুষকেন্দ্রিকতারও উদাহরণ।

অধিকারের যুক্তি

বিকৃত যৌনতার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় অধিকারের যুক্তি। এই পুরো বই জুড়ে অধিকারের যুক্তির বিভিন্ন সংস্করণ আমরা দেখেছি। ঐচ্ছিক আচরণকে ভিত্তি বানিয়ে কৃত্রিম পরিচয় বানানোর কারসাজি, তারপর 'সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার'-এর কথা বলে সেই আচরণকে বৈধ বানানোর কৌশল নিয়েও আলোচনা করেছি আমরা। এ ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেই আজ বলা হয়,

> প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসার অধিকার আছে। একজন সমকামীর অধিকার আছে সমলিঙ্গের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবার। প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ার। মানুষের অধিকার আছে তার দেহকে পরিবর্তন করার।

অধিকারের ব্যাপারে এলজিবিটি আন্দোলনের অবস্থানও আধুনিকতার বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে অধিকারের যে বয়ান ব্যবহার করে বিকৃত যৌনতার পক্ষে এসব আলাপ তোলা হয়, সমস্যা আছে তার গোড়াতেই।

তেলাপোকার দিবাস্বপ্ন

প্রথমে অধিকারের ব্যাপারে আধুনিকতার অবস্থান দেখা যাক। আধুনিকতা বিশ্বাস করে,

> প্রত্যেক মানুষের কিছু অধিকার আছে যেগুলো সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ কিংবা অন্য যেকোনো শ্রেণিভেদে প্রত্যেক মানুষের এই অধিকারগুলো আছে। এগুলো জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য।

আধুনিক মানুষ মানবাধিকারে শুধু বিশ্বাস-ই করে না; বরং একে অতি পবিত্র কিছু একটা মনে করে। কিন্তু সর্বজনীন মানবাধিকার নিয়ে এই বিশ্বাস আসলে কতটা যৌক্তিক? মানবাধিকারের ব্যাপারে অনেক বড় বড় দাবি করা হয়। কিছু অবস্থানকে তুলে ধরা হয় অমোঘ সত্য হিসেবে। এসব দাবির ভিত্তি কী? সব মানুষ সমান, সব মানুষের জন্মগত অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে—এসব কথার প্রমাণ কী?

বিবর্তনবাদের জায়গা থেকে চিন্তা করলে মানুষ স্রেফ আরেকটা পশু। বিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বনমানুষ জাতীয় প্রাণী থেকে সে আজকের এ অবস্থায় এসে

পৌঁছেছে। পৃথিবীতে লক্ষ কোটি প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষের আলাদা কিছু অধিকার আছে, তাও আবার জন্মগত—এমনটা কেন ধরে নেওয়া হবে? কোন যুক্তিতে? মানুষকে এই 'জন্মগত অধিকার' কে দিলো? বিবর্তনের প্রক্রিয়ার কোনো এক পর্যায়ে 'প্রকৃতি' এসে শুধু মানুষকেই নির্দিষ্ট কিছু অধিকার বুঝিয়ে দিয়ে গেছে? এমন কিছু?

বিবর্তন একটা বস্তুগত প্রক্রিয়া। অধিকার মানুষের বানানো ধারণা। সহজাত অধিকার, মানবাধিকার—মানুষের চিন্তার বাইরে এগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। মানবাধিকারের এই ধারণাগুলোকে অঙ্ক কষে, ল্যাবরেটরিতে কিংবা অন্য কোনো বস্তুগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব না। বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে 'জন্মগত', 'অবিচ্ছেদ্য' অধিকার-এর ধারণা হাস্যকর। এসব অধিকার অন্য কোনো প্রাণীর নেই, শুধু মানুষেরই আছে, মায়ের পেট থেকে কোনো এক জাদুবলে মানুষ এগুলো নিয়ে আসছে, এসব কথা রূপকথার গল্পের মতো শোনায়।

কেউ বলতে পারেন, প্রাণিজগতের মধ্যে মানুষই গভীর চিন্তা, ভাষার ব্যবহার, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণের ক্ষমতা রাখে। মানুষের চিন্তা, অর্জন, আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন, হতাশা, তার কল্পনা ও প্রতিভা, তার আনন্দ তার দুঃখবোধ মানুষকে প্রাণিজগতের মধ্যে 'অসাধারণ' করে তোলে। তাই তার আলাদা অধিকার আছে।

কিন্তু কথাগুলো ধোপে টেকে না। মানুষের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে মানলাম। তাই বলে তার আলাদা অধিকার কেন থাকবে? আর সেটা জন্মগতই বা কেন হবে? অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকলেই আলাদা অধিকার কেন থাকতে হবে?

অনেক প্রাণীর এমন সব ক্ষমতা আছে, যা অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে সেভাবে দেখা যায় না। টিকটিকি আর গিরগিটি লেজ খসাতে পারে, তারপর আবার নতুন করে গজাতে পারে। এক ধরনের ব্যাঙ আছে যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য শীতনিদ্রায় চলে যায়। এ সময় হৃদপিণ্ড আর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে কার্যত 'মারা যায়' ব্যাঙগুলো। এ অবস্থায় কাটিয়ে দিতে পারে টানা সাত মাস। শীতকাল শেষ হলে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তারা। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে টিকটিকি বা ব্যাঙ নিজেদের 'বিশেষ' কিছু মনে করতেই পারে। কিন্তু তার মানে তো এই না যে, তাদের আলাদা 'জন্মগত অধিকার' আছে এবং সেটা 'সর্বজনীন'। মানুষ কিছু কাজ করতে পারে যা অন্য প্রাণীরা পারে না, এই যুক্তিতে মানুষেরও আলাদা অধিকার থাকার যুক্তি নেই।

আধুনিকতার অবস্থান অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, আবেগ, কল্পনা—এগুলো শরীরের ভেতরের বিভিন্ন জৈবিক আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফসল। আমরা নিজেরাই এগুলোকে 'বিশেষ' খেতাব দিয়ে এগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের 'বিশেষ' বলে দাবি করছি। ব্যাপারটা অনেকটা নিজেকে নিজে মেডেল দেওয়ার মতো।

পৃথিবীতে মানুষের অনেক আগে থেকে তেলাপোকা বসবাস করছে। তেলাপোকার সংখ্যা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ লেগে গেলে অথবা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে, মানবজাতি ধ্বংস হয়ে গেলেও তেলাপোকার টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে। এসব কারণে তেলাপোকা মনে করতেই পারে, তারা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তাদের এমন কিছু অধিকার আছে যা আর কারও নেই। কিন্তু দিনশেষে এগুলো তেলাপোকাদের দিবাস্বপ্ন। ঠিক যেভাবে মানবাধিকার মানুষের সামষ্টিক দিবাস্বপ্ন।

ভিত্তিহীন বিশ্বাস

হ্যাঁ, কেউ চাইলে বিশ্বাস করতে পারে, বা ধরে নিতে পারে যে, মানুষের কিছু সহজাত অধিকার আছে। কিন্তু এটা স্রেফ বিশ্বাস, এর বেশি কিছু না। একে সংস্কার কিংবা কুসংস্কারও বলা যায়, কিন্তু সর্বজনীন বলা যায় না। মানবাধিকার একটা সামাজিক নির্মাণ। মানুষের বানানো বিষয়। এখানে একেক জনের একেক রকমের ধরনের ধারণা থাকবে। কেউ একটা বিষয়কে অধিকার মনে করতে পারে। অন্যজনের কাছে সেটাকে অধিকার মনে না-ও হতে পারে। কোনো একটা অবস্থানকে বাকি সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাই মানুষের চিরন্তন কিছু অধিকার আছে এবং দুনিয়ার সব মানুষ এই অধিকারগুলোকে জানতে, চিনতে ও এগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

স্রষ্টায় বিশ্বাসী একজন লোক বলতে পারে, মানুষের সর্বজনীন সহজাত অধিকার আছে, কারণ স্রষ্টা মানুষকে এই অধিকার দিয়েছেন। ব্রিটিশ দার্শনিক জন লককে লিবারেলিসমের জনক বলা হয়। অধিকারের ধারণাকে লক ব্যাখ্যা করেছিল স্রষ্টার মাধ্যমে। তার বক্তব্য ছিল অধিকার দু ধরনের হয়—আইনি অধিকার (legal rights) আর সহজাত অধিকার (natural rights)। আইনি অধিকারগুলো আসে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো থেকে। এগুলো মানুষের বানানো, যা পরিবর্তন, সংশোধন ও প্রত্যাহার করা যায়। অন্যদিকে সহজাত অধিকার হলো এমন অধিকার, যেগুলো নির্দিষ্ট আইন, সমাজ, রাষ্ট্র বা শাসন কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল না। এই অধিকারগুলো প্রত্যেক মানুষের থাকে, এগুলো মৌলিক, সর্বজনীন এবং অবিচ্ছেদ্য। মানুষের বানানো আইন দিয়ে এগুলো রদ করা যায় না। কারণ, এই অধিকারগুলো মানুষকে দিয়েছেন স্রষ্টা।[৪৮৫]

খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আসা সহজাত অধিকারের এই ধারণা থেকেই পরে সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারণা এসেছে।[৪৮৬] কিন্তু আধুনিক পশ্চিম সহজাত অধিকারের

---

[৪৮৫] অ্যামেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যেমন আছে, 'আমরা এই সত্যগুলোকে স্ব-প্রমাণিত মনে করি যে, প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট এবং স্রষ্টা তাদেরকে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছেন...'

[৪৮৬] Swanson, Scott G. "The medieval foundations of John Locke's theory of natural rights: Rights of subsistence and the principle of extreme necessity." History of Political

ধারণাকে গ্রহণ করলেও এর ভিত্তি হিসেবে স্রষ্টাকে মানে না। আধুনিকতার চোখে মানবাধিকারের ভিত্তি মানুষ নিজেই। কিন্তু মানুষকে ভিত্তি বানালে এসব অধিকারকে আর সহজাত বলা যায় না, সর্বজনীনও বলা যায় না। অধিকার তখন একটা আপেক্ষিক সামাজিক নির্মাণে পরিণত হয়।

মানবাধিকারের ব্যাপারে আধুনিকতার ধারণা তার মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

আপেক্ষিকতা

তাহলে উপায় কী? কীভাবে মানবাধিকারকে সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয় প্রমাণ করা যায়? এ প্রশ্নের ধরাবাঁধা একটা উত্তর আছে। সেটা হলো, জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র আছে, যেখানে বিভিন্ন দেশ স্বাক্ষর করেছে। এভাবে এক ধরনের ঐকমত্য গঠিত হয়েছে। এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমরা জাতিসংঘের ঠিক করা মানবাধিকারগুলোকে সর্বজনীন হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু এ অবস্থানেও সমস্যা প্রচুর। প্রথম সমস্যা হলো, স্বাক্ষর করেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকেরা, জনগণ না। এইসব রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি তাদের জনগণের অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে, এটা বেশ দুর্বল দাবি। এই দাবির বিপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, শাসকশ্রেণি আসলেই নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। তবু এখানে শক্তির একটা ভারসাম্যহীনতা থেকে যায়। জাতিসংঘকে নিয়ন্ত্রণ করে অল্প কয়েকটা দেশ। তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন পাওয়া যায় জাতিসংঘে। তাদের উদ্যোগে খোলা এই সংস্থা তাদের স্বার্থের সীমানার বাইরে কখনো যায় না। এর উদাহরণ ভূড়ি ভূড়ি। তাছাড়া জাতিসংঘ একটা প্যাকেজ অফারের মতো। কোনো রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘ থেকে একটা সুবিধা নিতে চায়, তাহলে তাকে পুরো প্যাকেজটাই কিনতে হয়।

তাই এমনটা হতেই পারে যে, পৃথিবীর অনেক দেশের সরকার লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পাবার জন্যে বাধ্য হয়ে এই ঘোষণাপত্র মেনে নিয়েছে। আসলে তারা এসব অধিকারের ব্যাপারে একমত না। বরং এর অনেক কিছুই তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। এসব দেশের সরকারগুলোর বিভিন্ন বক্তব্য ও কার্যক্রম থেকে এ অবস্থানের পক্ষে অনেক, অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- জাতিসংঘের পিরিওডিক রিভিউতে বাংলাদেশের ব্যাপারে সুপারিশের আলোচনাতে আমরা দেখলাম।[৪৮৭]

Thought 18, no. 3 (1997): 399-459. Martin, Rex. "Are human rights universal." Human rights: the hard questions (2013): 59-76. Brown, Chris. "Universal human rights: a critique." The International Journal of Human Rights 1, no. 2 (1997): 41-65.

[৪৮৭] অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য।

এখন কেউ হয়তো বলতে পারে—ঠিক আছে মানলাম, জাতিসংঘের অবস্থান পৃথিবীর সব মানুষের অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না। তবে মানবাধিকারের ব্যাপারে মোটাদাগে এক ধরনের ঐকমত্য বিশ্বে তৈরি হয়েছে, যার ভিত্তিতে আমরা এটাকে সর্বজনীন বলতে পারি।

কিন্তু এতেও আসলে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এখানে বৈধতার ভিত্তি ধরা হচ্ছে 'ঐকমত্য'-কে। কিন্তু ঐকমত্যকে ভিত্তি ধরলে আরও অনেকগুলো সমস্যাজনক প্রশ্ন তৈরি হয়। যেমন ধরুন, একসময় পৃথিবীর প্রায় সব সমাজে দাসপ্রথা চালু ছিল। দাসপ্রথার বৈধতার ব্যাপারে কার্যত এক ধরনের ঐকমত্য ছিল। আধুনিক পশ্চিম কি বলবে, তখন দাসপ্রথা সঠিক ছিল? আজ যদি পৃথিবীর অনেক মানুষ দাসপ্রথাকে সমর্থন করে, তাহলে কি পশ্চিম সেটাকে সঠিক বলে মেনে নেবে? অবশ্যই না। বরং তাদের অবস্থান হলো, যে যাই বলুক, দাসপ্রথা খারাপ। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে খারাপ।

আজ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ যৌন বিকৃতির বিরুদ্ধে। বিশ্বজুড়ে গণভোট হলে অধিকাংশ মানুষ 'এলজিবিটি অধিকার'-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে নিশ্চিতভাবেই। পশ্চিম কি তখন এই ঐকমত্যকে মেনে নেবে? না, তারা বলবে, 'এলজিবিটি অধিকার' সর্বজনীন, এটা মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে না। কাজেই ঐকমত্যকে ভিত্তি হিসেবে পশ্চিমারাই গ্রহণ করে না।

তাছাড়া 'মোটাদাগে ঐকমত্য' হয়েছে বলার মানেই হলো পূর্ণ ঐকমত্য হয়নি। আর পূর্ণ ঐকমত্য না হলে সেটা সর্বজনীন কীভাবে হয়? তাছাড়া পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি এসব অধিকার মেনে চলার ব্যাপারে একমত হয়েও যায়, তাও তো সেগুলো 'জন্মগত' বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। সামাজিক নির্মাণ হিসেবেই থাকছে। কাজেই, 'ঐকমত্য'-ও আসলে মানবাধিকারের দাবিগুলোর ভিত্তি হতে পারে না।

ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিকতা

তাহলে মানবাধিকারের ভিত্তি কী? আর কীভাবে একে জাস্টিফাই করা যায়? মানবাধিকার কি এমন কিছু, যা কেবল উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর অল্প কিছু পশ্চিমা দেশের লোকজন চিনতে পেরেছে? কারণ তারা বেশি সভ্য, বেশি বুদ্ধিমান, বেশি উন্নত? আর বাকি পৃথিবীর মানুষ বোকাসোকা, তাদের বিশ্বাস, নৈতিকতা, সমাজ, সংস্কৃতি সবই ভুল? সাদা মানুষেরা ভেবে ভেবে যা বের করেছে তাই সঠিক, অ-সাদা মানুষদের এখন এগুলো মেনে নিতেই হবে। এমন কিছু?

অনেকদিন পর্যন্ত পশ্চিমারা এ ব্যাখ্যাকে বেশ গর্বের সাথেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন তারা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছে যে, হাস্যকর হবার পাশাপাশি এটা অত্যন্ত বর্ণবাদী একটা চিন্তাধারা। তাই মনে মনে এ বিশ্বাস রাখলেও, আজ আর তারা মুখে

এটা বলে না।

অসংলগ্নতা

তাহলে শেষ পর্যন্ত সমাধান কী?

সমাধান নেই। মানবাধিকারকে জন্মগত, সর্বজনীন, চিরন্তন বলার যৌক্তিক কোনো ভিত্তি নেই। মানবাধিকার হলো অধিকার নিয়ে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের এক ধরনের বিকৃত সংস্করণ বা অপভ্রংশ। যে বিশ্বাস শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আধুনিকতা তাই জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কথা বলবে; কিন্তু এই অধিকারের ভিত্তি কী, সেটার জবাব দিতে পারবে না। মানুষ ছাড়া, মানুষের ওপরে আর কোনো কিছুর কথা সে বলতে পারে না। মানবাধিকার হলো মানুষের কল্পনা। মানুষের বানানো কিছু ভিত্তিহীন বিশ্বাস।

প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতি মনে করে, মানুষের কিছু বিশেষ জন্মগত অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকারগুলো কী, তা নিয়ে আছে মতপার্থক্য। মানুষ নিজেই যদি মাপকাঠি হয়, তাহলে এই মতপার্থক্যের মীমাংসা করা সম্ভব না। মানবাধিকারের ব্যাপারে পশ্চিমের ধারণা আর মানবাধিকারের ব্যাপারে অ্যামাজন জঙ্গলের গভীরে বসবাস করা কোনো গোত্রের ধারণা মৌলিকভাবে একই পর্যায়ের। একটা আরেকটার ওপর প্রাধান্য পেতে পারে না। দুটোই মানুষের বানানো। দুটোই একই মাত্রায় ভুল কিংবা সঠিক। মীমাংসা করার জন্য চূড়ান্ত কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকলে মানবাধিকার সাংঘর্ষিক দাবির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। যেখানে এক সমাজ বলবে বিকৃত যৌনতার অধিকার দিতে হবে, আরেক সমাজ বলবে বিকৃতি থেকে সমাজকে রক্ষার অধিকার দিতে হবে। যার সামর্থ্য থাকবে সে অন্যের ওপর তার অবস্থান চাপিয়ে দেবে।

পশ্চিমা বিশ্ব তাদের নিজস্ব অবস্থানকে সর্বজনীন বলে চালিয়ে দেয়। তাদের তৈরি 'আন্তর্জাতিক' সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে আইন বানায়। এটা অন্যের ওপর তাদের বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। এ কাজটা তারা করে তাদের আদর্শিক এবং ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সাবা মাহমুদের মতো বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক তাদের গবেষণাতে দেখিয়েছেন কীভাবে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই পশ্চিমা শক্তিগুলো অধিকারের আলাপকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহার করে এসেছে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে।[৪৮৮]

এলজিবিটি আন্দোলনের দেওয়া অধিকারের যুক্তি আধুনিকতার অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু মানবাধিকারের এই বয়ানই অসংলগ্ন। পশ্চিমের তৈরি অধিকারের বয়ানকে সর্বজনীন হিসেবে গ্রহণ করা, এর ভিত্তিতে যৌন বিকৃতি মেনে নেওয়া

---

[৪৮৮] Mahmood, Saba. Religious difference in a secular age: A minority report. Princeton University Press, 2015.

একেবারেই অযৌক্তিক। পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণকারী ছাড়া বাকি সবার কাছে এটা স্পষ্ট হবার কথা।

প্রগতির যুক্তি

প্রগতির ধারণা ব্যবহার করেও বিকৃত যৌনতার পক্ষে আলাপ তোলা হয়। যেমন :

> আগেকার দিনের মানুষ অনেক কিছু জানতো না। অনেক ব্যাপারে তাদের অবস্থান ভুল ছিল। সময়ের সাথে সাথে মানবজাতির উন্নতি হচ্ছে। মানুষ অনেক কিছু জানতে পারছে। আধুনিক মানুষ অতীতের এই ভুলগুলো কাটিয়ে উঠেছে, সংশোধন করেছে। যৌনতার ব্যাপারে পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আজকের দিকে মধ্যযুগীয় এসব অবস্থান আঁকড়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না।

এখানে মূলত প্রগতিবাদের ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমনটা আমরা গত অধ্যায়ে দেখেছি, প্রগতির ধারণার সম্পর্ক হলো ইতিহাস এবং জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিকতার অবস্থানের সঙ্গে। আধুনিক পশ্চিম বলে, যত সময় যাচ্ছে তত অগ্রগতি হচ্ছে। এই অগ্রগতি সামগ্রিক। জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা, নৈতিকতা, প্রযুক্তি; অগ্রগতি হচ্ছে সব দিকে।

এভাবে চিন্তা করলে এলজিবিটি আন্দোলনের দাবি আধুনিকতার প্রগতিবাদের বিশ্বাসের সাথে মেলে। যেহেতু প্রগতি হচ্ছে, যেহেতু আগের যুগের লোকেরা নৈতিকতার ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল, তাই যৌনতা সম্পর্কে আধুনিক অবস্থান ঠিক আর অতীতের অবস্থান ভুল। আর আধুনিক অবস্থান হলো, মানুষের যে-কারও সাথে যৌন সম্পর্ক করার স্বাধীনতা এবং অধিকার আছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় প্রগতির এ ধারণা নিয়েই। প্রগতিবাদের এ ধারণার মধ্যে বেশ কিছু অন্ধবিশ্বাস আছে। পরিবর্তন মানেই ভালো, আজকের অবস্থান অতীতের অবস্থানের চেয়ে বেশি নৈতিক—এই বিশ্বাসগুলোর ভিত্তি কী? কোন মাপকাঠিতে এখানে ভালো-মন্দ বিচার করা হচ্ছে?

উন্নতি না কি অধঃপতন?

আধুনিক সময়ে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে বলেই নৈতিকতার অগ্রগতি হয়েছে, এটা কেন ধরে নেওয়া হবে? আমাদের বিমান আছে, টেলিস্কোপ আছে, রকেট, কম্পিউটার, এআই আছে—তার মানেই কি আমরা বেশি নৈতিক?

আধুনিক যুদ্ধগুলোতে আমরা এমন সব ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। এই ধ্বংসযজ্ঞগুলো হয়েছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মতো বিভিন্ন আধুনিক মতবাদের নামে। আধুনিক সময়ে

আমরা কুৎসিত মাত্রার সম্পদ ও জীবনযাত্রার বৈষম্য দেখেছি। সহিংসতা, খুন, ধ্বংস, জাতিগত নিধন, টর্চার, মানুষ মারার নতুন নতুন প্রযুক্তি, অভূতপূর্ব মাত্রায় গণহত্যা, আর সমাজ ও নৈতিকতার অধঃপতন দেখেছি। মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো লোকেদের সক্রিয় সমর্থনে গাযাতে সারাবিশ্বের চোখের সামনে গণহত্যা চলতে দেখেছি। আধুনিক মানুষ হিসেবে নিষ্ক্রিয় থেকেছি। পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে দেখছি। আমরা দেখেছি, আধুনিক সময়ের মানুষ ইতিহাসের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি বিষণ্ণ, হতাশাগ্রস্ত এবং মানসিকভাবে অসুস্থ।[৪৮৯]

তাহলে কোন বিচারে আধুনিকতায় মানুষের নৈতিক উন্নতি হয়েছে?

অগ্রগতি কীভাবে?

সমস্যা আছে সময়ের সাথে নৈতিক অগ্রগতির ব্যাপারে বিশ্বাস নিয়েও। অগ্রগতির এ ব্যাপারটা আসলে কীভাবে কাজ করে? আগে অনেক নৈতিক সত্য মানুষের অজানা ছিল, এখন সেগুলো মানুষ জানতে পেরেছে, এমন কিছু? নতুন নতুন নৈতিক সত্য জানার ব্যাপারটা কীভাবে হচ্ছে? বিজ্ঞান, প্রযুক্তি কিংবা অর্থনৈতিক উন্নতি মাপার কিছু পদ্ধতি আছে। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে পদ্ধতি কী? এগুলো আমরা কীভাবে সনাক্ত করছি? কী দিয়ে দেখছি? কী দিয়ে মাপছি?

তাছাড়া সময়ের সাথে সাথে যদি নৈতিকতার ধারণা বদলায়, তাহলে যেটাকে আজকে খারাপ মনে করা হচ্ছে, হয়তো আগামীতে সেটাকে মানুষ ভালো মনে করবে। বর্ণবাদকে এখন খারাপ মনে করা হয়, হয়তো এক সময় গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করবে বর্ণবাদ ভালো। আমরা যেমন ভালো-মন্দের ব্যাপারে অতীতের অবস্থানগুলো বাদ দিয়েছি, তেমনি আমাদের অবস্থানও হয়তো ভবিষ্যতে বাদ দেওয়া হবে। আজ বিকৃত যৌনতার বৈধতা দেওয়াকে সঠিক অবস্থান মনে করা হচ্ছে, কিন্তু কাল এটা বদলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বর্তমানের অবস্থানগুলোকে চিরন্তন সত্য বলে মেনে নেওয়া অযৌক্তিক। এগুলোকে বড়জোর সাময়িক অবস্থান বলা যেতে পারে।

আবারও আপেক্ষিকতা

একইসাথে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেসব অবস্থানকে চিরন্তন নৈতিক সত্য বলা হচ্ছে, তার অনেকগুলোই আসলে পশ্চিমের নিজস্ব অবস্থান। পৃথিবীর অন্যান্য

---

[৪৮৯] বিস্তারিত আলোচনা এবং তথ্যের জন্য দেখুন, Dutton, Edward. Spiteful mutants: evolution, sexuality, religion, and politics in the 21st Century. Radix, 2022. Abramov, Dimitri Marques, and Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto. "Does contemporary Western culture play a role in mental disorders?" Frontiers in Psychiatry 13 (2022): 978860. Greenfeld, Liah. The West's Struggle for Mental Health. Wall Street Journal (2022). Gallup. U.S. Depression Rates Reach New Highs, 2023. European Commission. Mental health and related issues statistics, 2024.

অঞ্চল ও সমাজের অনেক মানুষ পশ্চিমের সাথে নানা বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। বিকৃত যৌনতা নিয়ে বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থানই এই মতপার্থক্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাহলে পৃথিবীর নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ধারণাকে কেন চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে? নৈতিকতার ব্যাপারে বর্তমান পশ্চিমের ধারণাকে কেন বাকি পৃথিবীকে মেনে নিতে হবে? কোনো অবস্থানকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হলে আগে পরম কোনো মানদণ্ড লাগবে। কিন্তু অধিকারের আলোচনাতে আমরা এরই মধ্যে দেখেছি এমন কোনো মানদণ্ড মানুষের পক্ষে বানানো সম্ভব না।

অর্থহীনতা

এটাও মনে রাখা দরকার যে, আধুনিকতা মনে করে মহাবিশ্ব, প্রাণ এবং মানব অস্তিত্বের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ সবকিছু এক অর্থে মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফসল। যদি তাই হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত জীবন এবং অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই। নৈতিকতার মানদণ্ড আর নৈতিক প্রগতির পুরো ধারণাগুলোই সেক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

অধিকারের মতোই প্রগতির যুক্তিগুলোও নিজ দাবি প্রমাণে অক্ষম এবং দিনশেষে অসংলগ্ন। আগে যা বিশ্বাস করা হতো তা ভুল, এখন আমরা যা বিশ্বাস করি তাই ঠিক। যারা এটা মানে না তারা পশ্চাৎপদ—এগুলো অন্ধবিশ্বাস থেকে আসা কিছু বুলি আর অন্তঃসারশূন্য দাবি কেবল। এখানেও সব কথার শেষ কথা হলো, পশ্চিমের বেছে নেওয়া অবস্থানকে সর্বজনীন সত্য বলে মেনে নেওয়ার আবদার।

ক্ষতির ক্যালকুলাস

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আরেকটা আলোচনা এসে যায়। হার্ম প্রিন্সিপাল বা ক্ষতির মূলনীতির আলাপ। দেখবেন, সমকামিতা বা ট্র্যান্সজেন্ডারিসম-এর পক্ষে কথা বলতে গিয়ে অনেকেই বলছে,

- ওরা একে অপরকে ভালোবাসে, আমরা কেন ওদের বাধা দেবো? ওরা তো কারও ক্ষতি করছে না!
- সে তার নিজের প্রয়োজনে নিজের পরিচয় বদলেছে, শরীর বদলেছে। কারও ক্ষতি তো করেনি, আপনার কী সমস্যা?
- যতক্ষণ না অন্যের ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ সবার অধিকার আছে নিজের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

এই ধরনের বক্তব্যগুলো আসছে হার্ম প্রিন্সিপাল (Harm Principle) বা ক্ষতির মূলনীতি থেকে। এই নীতি বলে,

> মানুষের যা ইচ্ছে করার অধিকার এবং স্বাধীনতা আছে, যতক্ষণ না সেটা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। যদি অন্য কারও ক্ষতি না হয়, তাহলে মানুষের

> কোনো কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। বাধা কেবল তখনই দেওয়া যাবে, যখন ব্যক্তির কাজ অন্যের ক্ষতির কারণ হবে।

হার্ম প্রিন্সিপালের নাম শোনেনি, এমন অনেকেও আজ এভাবে চিন্তা করেন। এই নীতিকে অনেকটা চিরন্তন, স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই নীতিও আসলে নড়বড়ে।

এই নীতি অধিকার এবং স্বাধীনতার কথা বলে। ক্ষতির এই ক্যালকুলাস কাজ করে আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর ওপর ভর দিয়ে। কিন্তু আমরা দেখেছি, আধুনিকতার এই অবস্থানগুলো সর্বজনীন এবং প্রশ্নাতীত না। অধিকার এবং স্বাধীনতার ব্যাপারে আধুনিকতার অবস্থানগুলোকে যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে এই নীতি ধ্বসে পড়ে।

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞায়নের বিপত্তি

সমস্যা আছে 'ক্ষতি' নিয়েও। হার্ম প্রিন্সিপাল বলছে 'অন্যের ক্ষতি না করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করা যাবে।' কিন্তু ক্ষতির সংজ্ঞা কী? সেটা কী ঠিক করে দিচ্ছে?

যেভাবে অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, তেমনিভাবে ব্যক্তি এবং সমাজভেদে ক্ষতির সংজ্ঞা নিয়েও আছে মতভিন্নতা। যে আখিরাতে বিশ্বাস করে আর যে করে না, তাদের লাভ-ক্ষতির হিসেবনিকেশ স্বাভাবিকভাবেই আলাদা হবে। যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, আর যে পরিবার বা সমাজকে বেশি গুরুত্ব দেয়, ক্ষতির ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হবে স্বাভাবিকভাবেই। কাজেই এই নীতি সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করতে গেলে ক্ষতির একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা ঠিক করতে হবে। এই সংজ্ঞা কে ঠিক করবে? কীসের ভিত্তিতে?

আধুনিকতা ক্ষতির হিসেব করে কেবল ব্যক্তির সাপেক্ষে। ক্ষতিকে দেখে উপযোগবাদের লেন্সের ভেতর দিয়ে, হিসেব করে বস্তুবাদী মাপকাঠিতে। যেমন- আধুনিক মানুষ অবাধ যৌনতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলে,

> পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মানুষ যে যৌন আচরণেই লিপ্ত হোক না কেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, তারা কারও ক্ষতি করছে না।

এখানে ক্ষতির খুব সীমিত একটা সংজ্ঞা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা অন্যভাবে দেখা যায়। পশ্চিমের দিকে তাকালে আমরা দেখি যৌন বিপ্লবের পর সেখানে পরিবারব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়েছে, হতাশাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ বেড়েছে, অপরাধ বেড়েছে, বেড়েছে মাদকের ব্যবহার। সমকামী আন্দোলনের হাত ধরে এসেছে এইডস মহামারি। সমাজে সামগ্রিকভাবে অস্থিরতা

এবং বিশৃঙ্খলা বেড়েছে।

তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেও নিই যে, অবাধ যৌনতার ফলে স্বল্পমেয়াদে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি হচ্ছে না, তাও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা। এত এত ক্ষতিকে সরিয়ে রেখে কেন আমরা কেবল ব্যক্তির নিরিখে ক্ষতির স্বল্পমেয়াদি হিসেব করবো?

অসুস্থ উপসংহার

এছাড়া হার্ম প্রিন্সিপাল যদি শক্তভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে তা আমাদের অনেক বীভৎস উপসংহারে পৌঁছে দেয়। এই নীতি দিয়ে পশুকাম, মৃতকাম, অজাচারসহ নানান বিকৃতির বৈধতা দেওয়া সম্ভব। উদাহরণ দিচ্ছি।

অজাচার বা Incest অর্থ একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক। আপন ভাইবোনের মধ্যে বা পিতামাতার সাথে সন্তানের যৌনসম্পর্ক। ধরুন, কিছু মানুষ দাবি করলো তারা অজাচারকামী। তারা অজাচার করতে চায়, এই চাওয়ার ওপর তাদের কোনো হাত নেই। এভাবেই তারা জন্মেছে। অজাচার বেআইনি হবার কারণে অত্যাচার আর বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের। তারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অজাচারের বৈধতা চায়। যেহেতু তারা কারও ক্ষতি করছে না, তাই সমাজের এখানে বাধা দেওয়া উচিৎ না। বরং সমাজের উচিৎ অজাচারকে বৈধতা দেওয়া।[৪৯০]

ক্ষতির মূলনীতির জায়গা থেকে এখানে কি আপত্তি করা যায়?

কেউ বলতে পারেন, অজাচারের ফলে জন্ম হওয়া শিশুদের মধ্যে মারাত্মক জেনেটিক সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। এটা একটা ক্ষতি। ঠিক আছে, মানলাম এটা ক্ষতি। কিন্তু যদি সন্তান জন্ম দেওয়া না হয়? যদি জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়? অথবা ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, বোনের সাথে বোনের কিংবা পিতার সাথে পুত্রের যৌনতা হয়? তাহলে সন্তান জন্ম নেওয়ার প্রশ্নটা তো আর থাকছে না। সেক্ষেত্রে কি অজাচার মেনে নেওয়া উচিৎ? হার্ম প্রিন্সিপালের জায়গা থেকে এখানে যুতসই কোনো আপত্তি করা যায় না।

একইভাবে যুক্তি দেখানো যায় পশুকামের পক্ষে। অনেকে বলবেন, পশু তো সম্মতি বা কনসেন্ট জানাতে পারে না। তাই পশুর সাথে যৌনতা সঠিক না। কিন্তু পিটার সিঙ্গারের মতো অনেক আধুনিক দার্শনিক ও অ্যাকাডেমিক যুক্তি দিয়ে ধাপে

---

[৪৯০] এ ধরনের আলাপ এরই মধ্যে পশ্চিমে তোলা হয়েছে, সামনে আরও তোলা হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। Consensual incest' should be decriminalized, advocates say. New York Post, April 2021. https://tinyurl.com/33zej72f

ধাপে দেখিয়েছেন, পশু সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে পারে।[৪৯১] পোষা কুকুর বা বিড়াল তাদের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করতে পারে। মালিক মারা যাবার পর কুকুর প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মারা গেছে, এমন অনেক উদাহরণ আছে। পশুকে আদর করলে সে লেজ নেড়ে, চোখ বুজে, মাথা কাত করে বা অন্য কোনোভাবে তার সম্মতি জানান দেয়। একইভাবে পশুকে যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো হয়, তখন সে বাধা দেয়।[৪৯২] পোষা কুকুর বা বিড়ালকে গোসল করানোর অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা এ বিষয়টা হাড়ে হাড়ে জানেন।

কাজেই পশুকে দিয়ে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনকর্ম করানো হলে, স্বাভাবিকভাবেই কিছু না কিছু বাহ্যিক চিহ্ন থাকবে যা থেকে তার বিরোধিতা বোঝা যাবে। একইভাবে এই চিহ্নগুলো না থাকলে ধরে নেওয়া যাবে সে সায় দিচ্ছে। তাহলে যথাযথ 'নিরাপত্তা' গ্রহণ করে পশুর সাথে যৌনতায় সমস্যা কী? হার্ম প্রিন্সিপালের জায়গা থেকে? কারও ক্ষতি যেহেতু হচ্ছে না?

কিংবা ধরুন, এক মহিলা মারা যাবার আগে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে স্ট্যাম্প করা কাগজে লিখে গেল মৃত্যুর পর তার দেহের পূর্ণ মালিকানা তার স্বামীর। মৃত্যুর পর স্বামী যদি এই মৃতদেহের সাথে যৌনকর্ম করে, তাহলে সমস্যা কী? কারও ক্ষতি তো হচ্ছে না?

হার্ম প্রিন্সিপাল এখানে অকেজো। যে নীতি আমাদেরকে এ ধরনের উপসংহারে পৌঁছে দেয়, সেটা আসলে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? কতটুকু অনুসরণীয়? এ ধরনের উপসংহারগুলো প্রমাণ করে হার্ম প্রিন্সিপালের দেওয়া মাপকাঠি নষ্ট।

***

এলজিবিটি আন্দোলনের দাবিগুলো স্বাধীনতা, অধিকার এবং প্রগতির আধুনিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এই ধারণাগুলোই প্রশ্নবিদ্ধ। এসব বিষয়ে আধুনিকতার অবস্থান আসলে পরস্পরবিরোধী। আধুনিকতার মৌলিক বিশ্বাসের জায়গা থেকেই, ইসলামের কথা না এনেই এই পরস্পরবিরোধিতা ও অসংলগ্নতাগুলো খুব সহজে দেখানো যায়, যেমনটা আমরা এ অধ্যায়ে দেখলাম। তবে আধুনিক মানুষ এই পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পায় না, বা পেলেও উপেক্ষা করে যায়। কারণ, এ নিয়ে খুব বেশি ভাবতে গেলে তার চিন্তার পুরো কাঠামোই ভেঙ্গে পড়বে।

---

[৪৯১] Singer, Peter. "Heavy petting." (2001). Miletski, Hani. "Zoophilia: Another Sexual Orientation?" Archives Of Sexual Behavior 46, No. 1 (2017): 39-42. Andrianova, Anastassiya. "Can the Animal Consent?" Gender and Sexuality in Critical Animal Studies (2021): 181.

[৪৯২] Healey, Richard, and Angie Pepper. "Interspecies justice: Agency, self-determination, and assent." Philosophical Studies 178 (2021): 1223-1243.

আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিকৃত যৌনতার মতবাদ যেহেতু আধুনিকতার ফসল, তাই আধুনিকতার মৌলিক অবস্থানগুলো মেনে নিয়ে কার্যকরীভাবে এলজিবিটি এজেন্ডার বিরোধিতা করা সম্ভব না। কেউ যদি স্বাধীনতা, প্রগতি কিংবা অধিকারের ব্যাপারে আধুনিকতার অবস্থান মেনে নেয়, তাহলে কোনো-না-কোনো মাত্রায় এলজিবিটি মতবাদকেও তার মেনে নিতে হবে। এ কারণেই দেখবেন, পাশ্চাত্যের রক্ষণশীল বা কনসারভেটিভরা এ আন্দোলনের দাবিগুলো আস্তে আস্তে মেনে নিয়েছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারেনি। কারণ, এই দুই ধর্মের অনুসারীরা স্বাধীনতা, অধিকার আর প্রগতির ঐ মৌলিক অবস্থানগুলো মেনে নিয়েছে, যেগুলো এলজিবিটি মতবাদের ভিত্তি। একই কথা প্রযোজ্য বাংলাদেশের রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল, দুধরনের সেক্যুলারদের ক্ষেত্রেও। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, পশ্চিমের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ইসলামের 'সংস্কার' করতে চাওয়া 'মডারেট মুসলিম' গোষ্ঠীর মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

দিনশেষে কার্যকরী এবং মজবুতভাবে এলজিবিটি মতবাদের বিরোধিতা এবং খণ্ডন করতে হলে আধুনিকতার লেন্স চোখ থেকে খুলে ফেলতে হবে। আমাদেরকে যেতে হবে দ্বীন ইসলামের কাছে। আমাদের যাত্রার পরের স্টেশন সেই আলোর উপত্যকার দিকে।

অধ্যায় ২৩

দ্বীন ইসলাম : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ওয়ার্ল্ডভিউ সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলোর তালিকা আমরা করেছি, কুরআন ও হাদীসে এগুলো ধরে ধরে আলোচনা আসেনি। তবে কুরআন এবং সুন্নাহতে এমন অনেক আলোচনা আছে, যেখানে খুব অল্প কথায় এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন। এই স্পষ্টতা ও সরলতা দ্বীন ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমি সংক্ষেপে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের প্রথম এবং সর্বাধিক পঠিত সূরা। প্রত্যেক সালাতে আমরা এই সূরাটি একাধিকবার পড়ি। মজার ব্যাপার হলো, সংক্ষিপ্ত এই সূরা থেকেই ওয়ার্ল্ডভিউ সংক্রান্ত দ্বীন ইসলামের মৌলিক সব অবস্থান পাওয়া যায়। লক্ষ্য করুন,

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের রব
যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু
বিচার দিনের মালিক
আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি
আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন
তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন
তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তাওহীদের শিক্ষা

এই সূরার প্রথম আয়াতগুলোতে আমরা তাওহীদের বিভিন্ন দিকের শিক্ষা দেখতে পাই। *সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের রব*—এ আয়াত থেকে আমরা মহাবিশ্বের ওপর মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব, মালিকানা এবং ক্ষমতার ব্যাপারে জানতে পারি। মহান আল্লাহ জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক। তিনিই সবকিছুর মালিক,

সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। একইভাবে *'বিচার দিনের মালিক'* আয়াত থেকে মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ বা তাঁর একচ্ছত্র মালিকানার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু—এ আয়াত থেকে আমরা মহান আল্লাহর সম্পর্কে জানতে পারি। মহান আল্লাহ আর-রহমান, আর-রহীম। কর্তৃত্ব ও মালিকানার মতো তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলিতেও একক।

আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি—এ আয়াত আমাদের শেখায়, ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্য। ইবাদতে আর কাউকে, আর কোনো কিছুকে শামিল করা যাবে না। মানুষ আল্লাহর গোলাম এবং কেবল তাঁরই কাছ থেকে সাহায্য চাইবে।

গায়িব ও আখিরাত

এই আয়াতগুলো থেকে আমরা গায়িব বা অদৃশ্য জগতের সম্পর্কে জানতে পারছি। আল্লাহ বলছেন, *সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের রব*—আমরা মানুষরা কেবল একটি জগতই দেখি, কিন্তু এখানে একাধিক জগতের কথা বলা হচ্ছে। সূরা ফাতিহা আমাদেরকে আখিরাতের ব্যাপারেও জানাচ্ছে। মহান আল্লাহ হলেন *'বিচার দিনের মালিক'*, যার অর্থ দুনিয়ার এই জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে। যেখানে বিচারের একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে রাখা হয়েছে। এই প্রতিটি বিষয় গায়িব বা অদৃশ্য জগৎ-সংক্রান্ত, যা বস্তুবাদী দৃষ্টভঙ্গি স্বীকার করে না।

উৎস, পরিচয়, উদ্দেশ্য ও নৈতিকতা

সূরা ফাতিহা থেকে আমরা মানুষের উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারছি। মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ আছে। এই সবকিছু মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পরিচয় হলো, সে মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর দাস। সূরাতে বলা হচ্ছে–

> *আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।*

অর্থাৎ জীবনে সফল হবার একটি নির্দিষ্ট পথ আছে—*আস-সীরাতুল মুস্তাকীম*। এ পথ ঠিক করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হতে হলে এই পথ অনুসরণ করতে হবে।

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারছি জীবনের নির্দিষ্ট অর্থ, উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য আছে। ভালো ও মন্দ মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইতিহাসের অর্থ

সূরা ফাতিহার শেষে বলা হচ্ছে,

...তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

অতীতে এমন মানুষ এসেছেন, যাদের ওপর মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার এমনও মানুষ এসেছে, যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার ফসল। যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তারা এক ঐতিহাসিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। একইসাথে আমরা আরও জানতে পারছি যে, মানবজাতির উন্নতি বা অবনতির সম্পর্ক সময়ের সাথে না; বরং তা নির্ভর করে মহান আল্লাহর দেখানো সরল পথের অনুসরণের ওপর। তাঁকে সন্তুষ্ট করার ওপর। যারা সীরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণ করবে তারা সফল, যারা এ থেকে বিচ্যুত হবে তারা ব্যর্থ, তাদের ঐতিহাসিক সময়কাল যাই হোক না কেন।[৪৯৩]

সূরা ফাতিহার আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে একদম প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকেই আমাদের সামনে ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক অবস্থানগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি কুরআনের আরও অনেক পবিত্র আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের ব্যাপারেও সত্য।

মৌলিক প্রশ্নের উত্তর

দ্বীন ইসলামের সামগ্রিক অবস্থানের ব্যাপারে একটা ধারণা আমরা পেলাম। এবার আসুন, আমাদের সেই প্রশ্ন-তালিকা অনুযায়ী ইসলামের উত্তরগুলো লিখে ফেলা যাক। এই কাজটা করার সময় আধুনিকতার অবস্থানের সাথে দ্বীন ইসলামের মৌলিক পার্থক্যগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথম প্রশ্ন : বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে।

> কী আছে, কী নেই? পরম ও প্রধানতম বাস্তবতা (প্রাইম রিয়েলিটি) কী? আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বের ধরন ও প্রকৃতি কী?

আমরা বলেছিলাম, অস্তিত্ব এবং বাস্তবতা নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, স্রষ্টা নিয়ে প্রশ্ন। এক্ষেত্রে ইসলামের উত্তর জোরালো এবং স্পষ্ট।

তাওহীদ : পরম বাস্তবতা

দ্বীন ইসলামের প্রথম এবং প্রধানতম ভিত্তি হলো তাওহীদ। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, একমাত্র সত্য ইলাহ বা উপাস্য। সমস্ত অস্তিত্ব ও জীবন তাঁর সৃষ্টি। এই মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু ঘটে, সবকিছুর ওপর তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করা।

---

[৪৯৩] সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরের জন্য দেখুন, তাফসীর আস-সাদি, শাইখ আবদুররহমান ইবনু নাসির বিন আসসাদী

'কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই।' [তরজমা, সূরা মুহাম্মাদ, ১৯]

আল্লাহই হলেন চূড়ান্ত বাস্তবতা। অস্তিত্বের কেন্দ্র। সমস্ত অস্তিত্বকে তিনি আশ্রয় দেন, টিকিয়ে রাখেন। তাঁর অজ্ঞাতে, তাঁর নিয়ন্ত্রণের ও সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু হয় না। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর ইচ্ছা এবং রাহমাহর মুখাপেক্ষী। তিনিই রিযিকদাতা, বিধানদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তাঁর কোনো তুলনা নেই, কোনো শরিক নেই।

'বলুন, "তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।"' [তরজমা, সূরা ইখলাস, ১-২]

'...আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।' [তরজমা, সূরা আয-যুমার, ৬২]

'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' [তরজমা, সূরা আশ-শূরা, ১১]

তিনি-ই সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অপ্রতিরোধ্য। সমগ্র সৃষ্টির অবস্থান কাফ আর নুনের মাঝখানে,

'তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, "হও (কুন)", ফলে তা হয়ে যায় (ফা য়াকুন)।' [তরজমা, সূরা ইয়াসিন, ৮২]

দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ

মহাবিশ্ব আল্লাহর সৃষ্টি। এর শুরু হয়েছে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে এর সমাপ্তি ঘটবে। দৃশ্যমান বস্তুগত জগতের বাইরেও অন্য জগৎ আছে, যা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় না। মালাইকা, জিন, বারযাখের জীবন, বিচার দিবস, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নাম, আল্লাহর আরশ ও কুরসি, রূহসহ এমন অনেক কিছুর কথা মহান আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, যা গায়িব বা অদৃশ্য জগতের বিষয়। অদৃশ্য জগতের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর।

'আলিফ লাম মিম; এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এ গ্রন্থ পথনির্দেশ। যারা গায়িবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে...' [তরজমা, সূরা আল-বাকারাহ, ১-৩]

'আর গায়িবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না...' [তরজমা, সূরা আল-আনআম, ৫৩]

সমগ্র সৃষ্টিজগতের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশে আমরা বসবাস করি। আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপ্তি ও বিশালতা আমাদের কল্পনারও নাগালের বাইরে। দুনিয়ার জীবনের পর আছে আখিরাতের জীবন, যা মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য।

> বলুন, 'আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা কার? বলুন, 'আল্লাহরই', দয়া করা তিনি তাঁর জন্য কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না।। [তরজমা, সূরা আল-আনআম, ১২]

এই আয়াতগুলোর আলোকে বাস্তবতা ও অস্তিত্ব নিয়ে ইসলামের অবস্থানের সাথে আধুনিকতার পার্থক্যগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই বিশ্বাসগুলো আমাদের এমন এক অবস্থানে নিয়ে যায়, যা আধুনিকতার চেয়ে একেবারেই আলাদা। আধুনিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করে। অন্যদিকে দ্বীন ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হলো তাওহীদ। আধুনিকতা মহাবিশ্বকে দেখে বস্তু, শক্তি আর কিছু নিয়মের সমষ্টি হিসেবে। অস্তিত্ব সেখানে মহাজাগতিক এক দুর্ঘটনা। কেবল। অন্যদিকে পৃথিবীকে আমরা দেখছি মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে। যেখানে সব সৃষ্টি (জিন ও মানবজাতির কাফিররা ছাড়া) আল্লাহর একত্ব ও বড়ত্বের ঘোষণা দেয়।

> 'সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাঁদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পারো না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।' [সূরা আল ইসরা, ৪৪]

আধুনিকতা গায়িব বা অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করে। আখিরাতকে উপেক্ষা করে। অন্যদিকে মুসলিমরা সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আখিরাতই হলো প্রকৃত জীবন।

> 'তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে গাফিল। তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ্ আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তো তাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে কাফির। [তরজমা, সূরা আর-রূম, ৬-৭]

বাস্তবতা এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে আধুনিকতা এবং ইসলামের অবস্থানের মধ্যে গভীর বৈপরীত্য দেখা যায়। যা প্রভাবিত করে অন্যান্য অবস্থানগুলোকেও।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : জ্ঞান ও জ্ঞানের উৎস

বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের পরে আসে জ্ঞান ও জ্ঞানের উৎস নিয়ে প্রশ্ন।

> জ্ঞান কী? জ্ঞানের উৎস কী? জ্ঞানার্জনের পথ কী? আমরা কী জানি? কীভাবে জানি?

দ্বীন ইসলাম থেকে এ প্রশ্নগুলো নিয়েও সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। জ্ঞান ও এর

উৎসের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানকে এভাবে তুলে ধরা যায়।

ওয়াহী : নিখুঁত জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওয়াহী। আল্লাহ মানবজাতিকে শিখিয়েছেন ওয়াহীর মাধ্যমে, আসমানি কিতাবের মাধ্যমে। ওয়াহী সুনিশ্চিত জ্ঞান, যাতে কোনো ভুল নেই, সংশয় নেই, ত্রুটি নেই।

> 'আলিফ লাম মিম। **এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই,** মুত্তাকীদের জন্য এ গ্রন্থ পথনির্দেশ... [তরজমা, সূরা আল-বাকারাহ, ১-৩]

> 'আর-রাহমান, তিনিই **শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,** তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, **তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাষা**...' [তরজমা, সূরা আর-রাহমান, ১-৪]

> 'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, **শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।**' [তরজমা, সূরা আলাক, ১-৫]

মহান আল্লাহ্ পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী। অন্যদিকে মানুষসহ সকল সৃষ্টির জ্ঞান সীমিত এবং ত্রুটিপূর্ণ।

> '...তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না।' [সূরা আল-বাকারাহ, ৩০]

> 'তোমাদের ওপর লড়াই করাকে ফরয করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ করো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। **আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।**' [সূরা আল-বাকারাহ : ২১৬]

রিসালাত : মহান আল্লাহ মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন রিসালাতের মাধ্যমে। মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে তিনি প্রেরণ করেছেন নবী-রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)। তাঁদেরকে দিয়েছেন আসমানি কিতাব। নবী-রাসূলগণ ওয়াহীর শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। মানবজাতির সূচনা হয়েছে একজন নবীর মাধ্যমে (আদম আলাইহিস সালাম)। সব নবী-রাসূলগণের মূল শিক্ষা ছিল এক, যার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হলো তাওহীদের শিক্ষা।

> আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, **তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।** [তরজমা, সূরা আন-নাহল : ৩৬]

সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সেই মহান মানুষ, যার কাছে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন।

আল-কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা।

বর্ণনা : বর্ণনা (reports) বা রিওয়ায়াহ ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক আরেকটি উৎস। বর্ণনার সিলসিলার মাধ্যমেই কুরআন, সুন্নাহ এবং শরীয়াহর জ্ঞানগুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে। বর্ণনা ইসলামে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বর্ণনা যাচাইবাছাই করা, মূল্যায়ন করা, এমনকি বর্ণনাকারীদের অবস্থা যাচাই করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে ইসলামী জ্ঞানের আলাদা আলাদা শাস্ত্র গড়ে ওঠেছে, যেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্য এবং সমৃদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্তব্য অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্ম হলো সাহাবিগণ, তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈগণের প্রজন্ম।[৪৯৪] দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অবস্থান আদর্শ। এই অবস্থানগুলো জানার ক্ষেত্রেও বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানবীয় বিচারবুদ্ধি : মানবীয় যুক্তি, চিন্তা এবং বিজ্ঞানকে ইসলাম জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টির মাঝে থাকা নিদর্শন, ওয়াহীর মাধ্যমে পাওয়া সত্য এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা নিয়ে মহান আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তা করার আহ্বান করেছেন।

> তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট হতে আসতো, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৮২]

> নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আর্তনের মধ্যে রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন... [তরজমা, সূরা আলে ইমরান, ১৯১]

ইসলাম ও আধুনিকতা : জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্য

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম ও আধুনিকতার অবস্থানের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো ওয়াহী এবং রিসালাতের ক্ষেত্রে। আমরা ওয়াহী এবং রিসালাতকে স্বীকার করি এবং জানি এগুলো জ্ঞানের সবচেয়ে নিখুঁত উৎস। আধুনিকতা জ্ঞানের বৈধ উৎস হিসেবে এগুলোকে স্বীকার করে না। অন্যদিকে বর্ণনা বা রিওয়ায়াহ ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আধুনিকতা একে খুব একটা গ্রাহ্য করে না।

এগুলোকে উপেক্ষা করে আধুনিকতা জ্ঞানের ভিত্তি দাবি করে ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য, মানবীয় বুদ্ধিমত্তা, মানুষের বানানো বিভিন্ন ধ্যানধারণাকে। জ্ঞানের উৎস হিসেবে এগুলোকে স্বীকৃতি দিলেও, ইসলাম এই সত্যও স্বীকার করে যে, মানবীয় বিচারবুদ্ধি

[৪৯৪] 'আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো যুগ হলো আমার যুগ, যে যুগের মানুষের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবিগণ), আর তাদের পরেই সবচেয়ে ভালো তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবিয়িগণ), আর এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবি-তাবিয়িগণ)।' বুখারী, আস-সহীহ, ৩৬৫০।

এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত জ্ঞান প্রকৃতিগতভাবেই সীমিত, অনুমাননির্ভর এবং পরিবর্তনশীল।

আধুনিকতার চোখে জ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানের অবস্থান ক্রমপরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের তত্ত্ব বারবার বদলায়। এর বড় একটা অংশ জুড়ে থাকে নানা অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব একসময় সত্য বলে গৃহীত হবার পর ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এ নিয়ে এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। কাজেই বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস হতে পারে, কিন্তু তা একমাত্র এবং চূড়ান্ত উৎস না। চূড়ান্ত মাপকাঠি ওয়াহী। মানবীয় বিচারবুদ্ধির ফলাফলকে মাপতে হবে ওয়াহীর আলোকে, উল্টোটা না।

তাছাড়া মানুষের বিচারবুদ্ধি নিরপেক্ষ যন্ত্রের মতো কাজ করে না, বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। আবেগ-অনুভূতি, স্বার্থ, মতাদর্শিক অবস্থানের মতো অনেক কিছুই মানুষের 'যুক্তিকে' নির্দিষ্ট পথে চালিত করে। তাই মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতিটি উপসংহারকে 'জ্ঞান' হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব না। বিশেষ করে আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো ইসলামের মানদণ্ডে জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার মতো না। এগুলো নিছক কিছু অনুমান আর খেয়ালখুশির ফসল মাত্র।

> আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই সত্যের বিপরীতে ধারণা তো কোনো কাজে আসে না; তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। [তরজমা, সূরা ইউনুস, ৩৬]

বাস্তবতা ও অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থানের মতো জ্ঞান ও জ্ঞানের উৎস নিয়েও ইসলাম ও আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য আছে।

তৃতীয় প্রশ্ন : মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা

> মানুষ কী এবং সে কোথা থেকে এলো?

কুরআনে আল্লাহ আমাদের স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ মানবজাতির পিতামাতা আদম ও হাওয়া (আলাইহিস সালাতু ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের প্রাথমিক নিবাস ছিল জান্নাতে। আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ এমন কিছু জ্ঞান ও সক্ষমতা দান করেছেন, যা অন্য সৃষ্টিকে দেননি।[৪১৫] তাঁকে (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর খলীফা হিসেবে। সৃষ্টিজগতের মানুষকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ মর্যাদা এবং দায়িত্ব।

> আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন 'নিশ্চয়ই আমি জমিনে খলীফা সৃষ্টি করছি...'.. [তরজমা, সূরা আল-বাকারা, ৩০]

---

[৪১৫] সূরা আল-বাকারা, ৩১-৩৪ দ্রষ্টব্য।

আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি আর আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। [তরজমা, সূরা আল-ইসরা, ৭০]

মানুষ এলেমেলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কালক্রমে বনমানুষ জাতীয় কোনো প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়নি। বরং মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ আকারে।

'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।' [তরজমা, সূরা ত্বীন, ৪]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাওহীদ এবং নৈতিকতার ব্যাপারে সহজাত বোধসহ।

'আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম-সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা বলেছিল, "হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম।" এটা এ জন্যে যে, যাতে কিয়ামত-দিবসে তোমরা বলতে না পারো—আমরা তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।' [তরজমা, সূরা আল-আ'রাফ, ১৭২]

মানুষের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে সচেতনতা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের প্রবণতা কাজ করে জন্মগতভাবে। একইসাথে কাজ করে সহজাত কিছু মূল্যবোধ। এই সহজাত বোধকে বলা হয় ফিতরাহ। তবে পরিবেশ, নিজের আমল এবং বিশ্বাসের প্রভাবে ফিতরাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।[৪৯৬]

'কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' [তরজমা, সূরা আর-রূম, ৩০]

সব মানুষ একই উৎস থেকে এসেছে। মানুষের মধ্যে সম্মান ও অবস্থানের পার্থক্য হয় ঈমান, তাকওয়া এবং নেক আমলের ভিত্তিতে। সম্পদ, জাতীয়তা, শ্রেণি, সামাজিক অবস্থান, বর্ণ কিংবা জন্মস্থানের মতো বিষয়গুলোর কারণে কেউ কারও ওপর প্রাধান্য পাবে না।

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে

---

[৪৯৬] প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর অর্থাৎ ঈমান ও সত্য-ন্যায়ের যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি বানায় অথবা নাসরানী বানায় অথবা অগ্নিপূজারি বানায়।-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩৮৫

অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। [তরজমা, সূরা আল-হুজুরাত , ১৩]

চতুর্থ প্রশ্ন : জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য

মানবইতিহাসের অর্থ কী? মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী? মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য কী? গন্তব্য কী?

ইসলাম আমাদের শেখায়, সৃষ্টিজগতের এবং মানবজীবনের সুনির্দিষ্ট অর্থ, উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য আছে।

'আর আসমান, জমিন ও যা এতদুভয়ের মধ্যে আছে তা আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি খেলার উপকরণ গ্রহণ করতে চাইতাম, তবে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই করতাম। কিন্তু আমি তা করিনি।' [তরজমা, সূরা আল-আম্বিয়া, ১৬-১৭]

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য।

'আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।' [তরজমা, সূরা আয-যারিয়াত, ৫৬]

মানবজীবনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর ইবাদাত। আর ইবাদাত অর্থ তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করা, তাঁর নির্ধারিত শরীয়াহ অনুসরণ করা। এবং ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই।

পঞ্চম প্রশ্ন : মৃত্যু

মৃত্যুর পর কী হয়?

দ্বীন ইসলাম আমাদের শেখায়, দুনিয়ার জীবনের পর আছে আখিরাতের জীবন। আর আখিরাতের জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। মৃত্যুর পর আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো।

'অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' [তরজমা, সূরা আয-যুমার, ৪৪]

'প্রত্যেক প্রাণকে মৃত্যু আস্বাদন করতো হবে। আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদেরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' [তরজমা, সূরা আল-আম্বিয়া, ৩৫]

দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষার। এ পরীক্ষা বিশ্বাস ও আমলের। আখিরাতের জীবন হিসাব ও প্রতিদানের। দুনিয়াতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব রাখা হচ্ছে। এই

হিসেব নিয়ে চূড়ান্ত বিচার করবেন মহান আল্লাহ। মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুত্থিত হবে। বিচারের দিন মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা, শাস্তি কিংবা পুরস্কার ঠিক হবে পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কাজের ভিত্তিতে।

'মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আর মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেবো এবং মাটি থেকেই তোমাদের পুনরায় বের করে আনা হবে।' [তরজমা, সুরা ত্ব হা, ৫৫]

আধুনিকতা আখিরাতকে উপেক্ষা করে। আধুনিকতার কাছে অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই সব হিসেব দুনিয়াকেন্দ্রিক। দুনিয়ার এ জীবনকে যতটা পারা যায় লম্বা করতে হবে, যতটা সম্ভব উপভোগ্য করতে হবে। কারণ জীবন তো একটাই! ইসলাম আমাদের শেখায়, দুনিয়ার এই জীবন *'ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়'*[৪১৭]। মানুষের প্রকৃত জীবন হলো আখিরাতে। এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী; মানুষ দুনিয়াতে মুসাফির, তার গন্তব্য আখিরাতের অনন্ত জীবনের দিকে।

> 'আর এ দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত!' [তরজমা, সূরা আল-আনকাবূত, ৬৪]
>
> 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ো? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।' [তরজমা, সূরা আত-তাওবাহ, ৩৮]

ষষ্ঠ প্রশ্ন : নৈতিকতা

> ভালো আর মন্দের মাপকাঠি কী? কীভাবে আমরা ভালো আর মন্দকে চিনতে পারবো? কোথা থেকে আমার নৈতিকতার বোধ তৈরি হচ্ছে? কীসের ভিত্তিতে?

ইসলামের উত্তর হলো, নৈতিকতার কেন্দ্র এবং ভিত্তি হলেন আল্লাহ। তিনিই ভালো-মন্দের সংজ্ঞা ও সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন ওয়াহী এবং রিসালাতের মাধ্যমে। একইভাবে তিনি মানুষকে তৈরি করেছেন ফিতরাতের ওপর, সহজাত মূল্যবোধ দিয়ে। মুসলিম হিসেবে আমরা স্বীকার করি নৈতিকতার পরম মাপকাঠি আছে। ভালো-মন্দের আছে সর্বজনীন, চিরন্তন সংজ্ঞা। আর চিরন্তন এ মাপকাঠি অনুযায়ী সবচেয়ে বড় অপরাধ শিরক।

---

[৪১৭] 'আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।' [তরজমা, সূরা আলি ইমরান, ১৮৫]

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন...' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৪৮]

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ট্রেন্ড বা খেয়ালখুশি অনুযায়ী ভালো-মন্দের সংজ্ঞা বদলায় না। স্রেফ কাজের ফলাফলের ওপর ভালো-মন্দ নির্ভর করে না। মানুষের কী মনে হয়, তা দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না আল্লাহর সিদ্ধান্তকে। সৃষ্টির প্রশ্নপত্রে স্রষ্টা পরীক্ষা দেন না। মানুষের দায়িত্ব হলো, মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণ করা। নিজের রবের প্রতি এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি যথাযথ আচরণ করা।

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলো, সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।' [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৩৩]

সপ্তম প্রশ্ন : সমাজ ও শাসন

তালিকার সর্বশেষ প্রশ্ন হলো সমাজ ও শাসন নিয়ে।

সমাজের রীতিনীতির উৎস কী হবে? শাসনব্যবস্থার ভিত্তি কী হবে? কে বানাবে? কীসের ভিত্তিতে বানাবে? শাসক ও অধীনস্তদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে?

ইসলামের অবস্থান হলো সমাজ ও শাসনের ভিত্তি হবে ইসলামী শরীয়াহ। আগের প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর নির্ধারিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ একমাত্র সার্বভৌম সত্ত্বা, বিধানদাতা। সমাজ এবং শাসনের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়ার অধিকার ও কর্তৃত্ব তাঁর। আর কারও না। মহান আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বে ঈমান আনার দাবি হলো, সমাজ ও শাসনের ওপর তাঁর নাযিলকৃত শরীয়াহর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া।[৪৯৮]

'বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি আদেশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত না করতে। এটাই শাশ্বত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' [তরজমা, সূরা ইউসুফ, ৪০]

'তারা কি জাহিলী যুগের আইন বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ?' [তরজমা, সূরা আল-মায়িদাহ, ৫০]

'তোমার রবের কসম, তারা ততক্ষণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে (রাসূলুল্লাহকে) বিচারক নির্ধারণ

[৪৯৮] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, 'অপরিহার্য শরীয়াহ', শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

করবে...' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৬৫]

এখানেও আধুনিকতার সাথে ইসলামের তীব্র বৈপরীত্য দেখা যায়। আধুনিকতা সমাজ ও শাসনের ওপর স্রষ্টার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে ইসলামের অবস্থান হলো, মানবজীবনের বাকি সব দিকের মতো সমাজ ও শাসনও চলবে মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী।[৪৯৯]

***

আধুনিকতার সাথে দ্বীন ইসলামের আরেকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা দেখেছি আধুনিকতার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা আছে। আধুনিকতার বিভিন্ন দাবি তার মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু ইসলামের মধ্যে এমন কোনো অসংলগ্নতা নেই। ইসলাম অভ্যন্তরীণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সততার সাথে চিন্তা করলে ইসলামে অবিশ্বাস করা লোকও এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে।

[৪৯৯] ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে দ্বীন ইসলামের অবস্থান নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Sharif El-Tobgui, Carl. Islam and LGBT: Gender, Sex, and Morality in the Modern Age. 2023.

অধ্যায় ২৪

দ্বীন ইসলামের লেন্সে এলজিবিটি মতবাদ

বলেছিলাম, আধুনিকতা এবং ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। গত তিন অধ্যায় জুড়ে ধাপে ধাপে এই দ্বন্দের শেকড় আমরা খুঁজে বের করেছি। কিছুটা সময় লাগলেও পুরো সমস্যাটাকে গোড়া থেকে বোঝার জন্য এই আলোচনার দরকার ছিল। এই দ্বন্দ্বকে বুঝতে না পারার কারণে নানা বিভ্রান্তি এবং সংশয় তৈরি হয়। মৌলিক অবস্থানের পার্থক্যগুলো না জানলে থেকে যায় পা পিছলে যাবার আশঙ্কাও। আদর্শিকভাবে এলজিবিটি মতবাদের মোকাবিলা করতে হলে তাদের এবং নিজেদের অবস্থানের ভিত্তির ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

আসুন, গত কয়েকটি অধ্যায়ের আলোচনাগুলো সারনির্যাস দেখে নেওয়া যাক।

প্রমিথিউস বনাম খলীফা

গ্রিক পুরাণে প্রমিথিউস নামে এক দেবতার কথা পাওয়া যায়। দেবতাদের মধ্যে দুই দল ছিল, টাইটান আর অলিম্পিয়ান। প্রমিথিউস ছিল টাইটান। সে কাঁদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করে। তাকে দেবতাদের মতো কাঠামো দেয়। এতে অসন্তুষ্ট হয় অন্যান্য দেবতারা। মানুষকে অধীনস্ত করে রাখার জন্য পৃথিবী থেকে সব আগুন তুলে নেয় দেবতাদের রাজা যিউস। কিন্তু মানুষের যে আগুনের প্রয়োজন, আগুন ছাড়া সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব। প্রমিথিউস তখন স্বর্গ থেকে চুরি করে আগুন এনে দেয় মর্ত্যের মানুষকে। সেই আগুন পরিণত হয় সভ্যতার চালিকা শক্তিতে। জন্ম হয় প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের, গড়ে উঠে শিল্পসাহিত্যের চোখ ধাঁধানো ভান্ডার।

প্রমিথিউস মানুষকে মহত্ব আর মুক্তি এনে দেয়। কিন্তু স্বর্গের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের জন্যে চরম মূল্য দিয়ে হয় তাকে। যিউস তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে পাহাড়ের সাথে। প্রতি সকালে এক বিশাল ঈগল এসে হাজির হয় বন্দি প্রমিথিউসের কাছে। দিনভর ঠুকরে ঠুকরে খায় তার কলিজা। রাতে সেই কলিজা নতুনের মতো হয়ে যায়। পরদিন সকালে আবার আসে ঈগল। চক্র চলতে থাকে।

আধুনিকতা মানুষকে দেখে প্রমিথিউসের ছাঁচে। গ্রিক পুরাণের দেবতারা ছিল মানবতাবিরোধী। তারা মানুষকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

মানুষের মুক্তির সংগ্রাম ছিল দেবতাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার অর্থ ছিল আসমানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়া। প্রমিথিউস মানুষকে মুক্তি এনে দিয়েছিল জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর শিল্পের মাধ্যমে। আগুনের মাধ্যমে।

আধুনিকতাও মনে করে স্বাধীনতার অর্থ হলো আসমানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ধর্ম আর স্রষ্টার 'শাসন' থেকে মুক্ত হয়ে মানবীয় বিচারবুদ্ধিকে চূড়ান্ত মাপকাঠি বানানো। মানুষ দীর্ঘ এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens) হয়ে ওঠেছে। হোমো স্যাপিয়েন্স এর শাব্দিক অর্থ বিজ্ঞ মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ।[৫০০] এই বিজ্ঞ মানুষ আসমানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। সে কারও গোলামি করে না, নিজের নিয়তি নিজেই ঠিক করে নে। সে পৃথিবীকে দখল করতে চায়, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, রাজত্ব করতে চায় মহাবিশ্বের ওপর। বিজ্ঞ মানুষ আসমানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দুনিয়ার দিকে। নিজেকে সে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসায়। নিজের বিবেককে বানায় পরম মাপকাঠি। মানুষই ভালো-মন্দ ঠিক করে। মানুষই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপর নাই!

ইসলাম মানুষকে সংজ্ঞায়িত করে উবুদিয়্যাহ আর খিলাফাহর মাধ্যমে। কুরআনে আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, মানুষ আল্লাহর গোলাম। তাঁর সম্মানিত সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন, সক্ষমতা দিয়েছেন। মর্যাদা দিয়েছেন অন্যান্য সৃষ্টির ওপর। তার মধ্যে পাশবিক দিক আছে, একই সাথে আছে মহত্বের সম্ভাবনা। মানুষ মাটির তৈরি, কিন্তু মাটির এ পৃথিবী তার আসল ঠিকানা না। তাঁর আসল বাড়ি জান্নাত। সে আখিরাতের মুসাফির, যে দুনিয়াতে অবস্থান করছে অল্প কিছু সময়ের জন্য। মৃত্যুর পর আল্লাহ সব মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। দুনিয়ার জীবনের কাজের ভিত্তিতে মানুষের তখন বিচার হবে, কেউ পুরস্কৃত হবে, কেউ পাবে শাস্তি।

মানবজাতির পিতা আদম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলাম এবং পৃথিবীতে তাঁর খলীফা হিসেবে। বনী আদম—আদমের সন্তানদের সম্মান, মর্যাদা, জীবনের উদ্দেশ্য—সব কিছু তাঁদের পিতার এই পরিচয়ের সাথে যুক্ত। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। বনী আদমকে পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, একই সাথে দেওয়া হয়েছে দায়িত্বও। মানুষের দায়িত্ব—পৃথিবীতে এক আল্লাহর ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহর হক এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। দুনিয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করা।

আধুনিকতা মানুষকে প্রমিথিউসের ছাঁচে দেখে। ইসলাম বলে খিলাফাহর কথা। আধুনিকতা আসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে সাফল্য খুঁজে পায়। ইসলাম বলে সাফল্যের চাবিকাঠি তাওহীদ আর তাকওয়া। সাফল্য মহান আল্লাহর আনুগত্য তথা

---

[৫০০] Sapiens/স্যাপিয়েন্স শব্দের অর্থ বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী।

উবুদিয়্যাহর মধ্যে। আধুনিকতা মানুষকেন্দ্রিক, তার চিন্তার সীমানা দুনিয়াকেন্দ্রিক। ইসলাম বলে সবকিছুর কেন্দ্র হলেন আল্লাহ। আসল জীবন হলো আখিরাত। আধুনিকতা মানুষের বিবেককে মাপকাঠি বানায়। দুনিয়াকে চালাতে চায় মানুষের বানানো বাদ-মতবাদ দিয়ে। ইসলাম বলে আল্লাহ একাই হলেন মালিক। তিনিই নৈতিকতা নির্ধারণ করেন, বৈধ আর অবৈধ ঠিক করেন, ইবাদাত ও আইন; সর্বক্ষেত্রে তিনিই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

আধুনিকতা আর ইসলাম, এই দুই দ্বীনের মধ্যে বিরাজ করে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব। অমোচনীয় বৈপরীত্য। আর এই বৈপরীত্যগুলো এলজিবিটি মতবাদের মোকাবিলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

দ্বীন ইসলামের আলোকে এলজিবিটি আন্দোলনের অবস্থান

এলজিবিটি আন্দোলনের অবস্থানগুলো আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আধুনিকতার মানুষকেন্দ্রিকতাকে প্রত্যাখ্যান করলে যৌন বিকৃতির মতবাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

স্বাধীনতা : আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী এলজিবিটি আন্দোলন বিশ্বাস করে মানুষ সার্বভৌম এবং স্বাধীন। মানুষ তার দেহের মালিক। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী নিজের পরিচয়, জীবন, জীবনের উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করার স্বাধীনতা তার আছে।

এই অবস্থান সরাসরি ইসলামের সাথে এবং তাওহীদের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, ইসলাম আমাদের শেখায় এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে; যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা কিছু অদৃশ্য, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি মালিকুল মুলক। আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। আমাদের শরীর, সুস্থতা, আয়ু, জীবন, সম্পদ—সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। এই শরীরের প্রকৃত মালিক আল্লাহ, আমরা না। তাই এই শরীর নিয়ে ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু আমরা করতে পারি না।

ব্যাপারটাকে সম্পদের মালিকানার সাথে তুলনা করা যায়। দুনিয়াতে মানুষ সম্পদের মালিক হতে পারে। কিন্তু মালিকানার এই অধিকারে মানুষ সার্বভৌম না। সবকিছুর মতো মানুষের সম্পদের প্রকৃত মালিকও আল্লাহ। দুনিয়ার জীবনে তিনি আমাদের এগুলো ব্যবহার করতে দিয়েছেন সীমিত সময়ের জন্য। এই সম্পদ অনেকটা আমানতের মতো। মানুষ নিজের চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ খরচ করতে পারবে। তবে সম্পদের প্রকৃত মালিকের বেঁধে দেওয়া নিয়মগুলো মেনে। সে হারামের পেছনে খরচ করতে পারবে না। ধনীদের সম্পদে আল্লাহ যেহেতু গরিবদের অধিকার ঠিক করে দিয়েছেন, তাই তাকে সাদাকাহ করতে হবে। সম্পদের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ তাকে দান করতে হবে যাকাত হিসেবে। সম্পদের ওপর আমাদের মালিকানা সীমিত। ইচ্ছেমতো যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।

একই কথা প্রযোজ্য নিজের শরীরের ক্ষেত্রেও। শরীরের ওপর আমাদের মালিকানা সার্বভৌম না। চাইলেই আমি এই শরীর বদলাতে পারি না। যে কারও সাথে, যেকোনোভাবে শরীরের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারি না। যা ইচ্ছে তাই খেতে পারি না। বরং যিনি এই শরীর দিয়েছেন তাঁর নির্ধারিত বিধান আমাকে মেনে চলতে হয়। সম্পদ ব্যবহারের যেমন নিয়ম আছে, তেমনি নিয়ম আছে খাবার, পোশাক এবং যৌনতার ক্ষেত্রেও। হ্যাঁ, মানুষ চাইলে আল্লাহর বিধান অমান্য করতে পারে, কিন্তু আখিরাতে এই অবাধ্যতার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।

কাজেই 'মাই বডি, মাই চয়েস, দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার'—এ ধরনের অবস্থান ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে, মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

অধিকার : এখানেও আধুনিকতা আর ইসলামের চিন্তার ছক একেবারেই আলাদা। স্কুলে থাকতে আমরা গ্রাফ বা লেখচিত্র তৈরি করতে শিখেছি। সহজে এই দুই দ্বীনের পার্থক্য বোঝার জন্য গ্রাফের আদলে চিন্তা করা যেতে পারে। সাধারণত গ্রাফের দুটো অক্ষ থাকে—উলম্ব (vertical) এবং আনুভূমিক (horizontal)। জীবনেও মানুষকে দুটো অক্ষে চিন্তা করতে হয়। ভারটিকাল অক্ষ, যা হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক, আর হরাইযনটাল অক্ষ, যা হলো অন্য সৃষ্টির সাথে–মানুষ, পরিবার, সমাজ, শাসন, প্রকৃতি, প্রাণিজগতের সাথে বান্দার সম্পর্ক।

উলম্ব বা ভারটিকাল অক্ষ হলো তাওহীদের আকীদাহ। আল্লাহকে নিজের ইলাহ এবং নিজেকে তার বান্দা হিসেবে স্বীকার করা। তাঁর পক্ষ থেকে আসা সত্য ও জীবনবিধানকে কবুল করে নেওয়া। মানুষের ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনিই বিধানদাতা, এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। আর আনুভূমিক অক্ষ হলো অন্য মানুষ ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক। আল্লাহর হক, সৃষ্টির হক। দুটো অক্ষ। প্রতিটি অক্ষে আমাদের আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। নিজের শরীর থেকে শুরু করে, একটা বিড়াল বা কুকুরের সাথেও আমাদের আচরণের সীমানা কী হবে—সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ হয় নির্দিষ্ট নিয়ম দিয়েছেন অথবা মূলনীতি দিয়েছেন, কিংবা ঠিক করে দিয়েছেন নির্দিষ্ট সীমানা।

আধুনিকতা ভারটিকাল অক্ষকে অস্বীকার করে। সে আল্লাহকে অস্বীকার করে, উপেক্ষা করে বা ভুলে থাকে। সবকিছুর মাপকাঠি বানায় মানুষকে, ব্যক্তিকে। সে বলে, দুনিয়া চালাতে হবে মানুষের মতবাদ, যুক্তি, আর বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে। সবকিছুর উৎস ব্যক্তি। সবকিছু প্রবাহিত হয় মানুষ থেকে। ইসলাম বলে, সব উৎস, উদ্দেশ্য, অধিকার সবকিছু নির্ধারিত হয় ওপর থেকে। সবকিছু নির্ধারিত হয় আরশের অধিপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

ইসলামে আল্লাহর হক এবং সৃষ্টির হকের ধারণা আছে। তবে দেহ, জান, মাল, সময়, সম্পদ, সমাজ—সব ক্ষেত্রে সব অধিকারের উৎস হলেন আল্লাহ। মানুষ নিজে তার অধিকার আবিষ্কার করে না। রাষ্ট্র বা অন্য কোনো পার্থিব শক্তি অধিকার তৈরি করে না। জাতিসংঘের কোনো দলিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র, অর্ধশতাব্দী আগের কোনো সংবিধান কিংবা সামসময়িক মানুষের ধ্যানধারণা থেকে অধিকার আসে না। সৃষ্টির অধিকার আসে সৃষ্টির মালিকের কাছ থেকে। পার্থিব কর্তৃপক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে কেবল সেই অধিকারের বাস্তবায়ন এবং রক্ষায়। এর বেশি কিছু না। আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তার বাইরে আর কিছু করার অনুমোদন মানুষের নেই। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তার অনুমোদন দেওয়ার অধিকারও মানুষের না।

মানুষ যৌন আচরণের ভিত্তিতে একটা 'পরিচয়' বানিয়ে নেবে, তারপর আবার সেটার ভিত্তিতে 'অধিকার' দাবি করে বসবে, এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আধুনিক মানুষ জাতিসংঘ, জাতিরাষ্ট্র বা গত দুই শতাব্দীর তত্ত্ব বা মতবাদকে অধিকারের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মুসলিম পারে না। আল্লাহর পরিবর্তে এ ধরনের কোনো সত্তাকে অধিকারের উৎস এবং কর্তৃপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা শিরকের শামিল। দুনিয়াবি এই মিথ্যা ইলাহদের মুসলিম অস্বীকার করে।

প্রগতি : আধুনিকতা ইতিহাসকে দেখে এমন এক সরলরেখা হিসেবে, যা সময়ের সাথে সাথে ওপরের দিকে উঠছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান বাড়ছে, বস্তুগত উন্নতি হচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে নৈতিকতারও। আমরা এরই মধ্যে দেখেছি যে, এই অবস্থানের আসলে তেমন কোনো ভিত্তি নেই। ইতিহাসের গতিপথ ভিন্ন।

মহাবিশ্বের শুরু এবং শেষ আছে। মানবজাতির একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্য আছে, একটি চূড়ান্ত বিন্দুর দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার মানে এই না যে, সময়ের সাথে সাথে আমাদের উন্নতি হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে অবনতিও হতে পারে। আল্লাহ আমাদের কুরআনে জানিয়েছেন, আমাদের আগেও অনেক সমৃদ্ধ সভ্যতা এসেছিল। আদ ও সামুদের মতো পরাক্রমশালী জনপদ ছিল। কিন্তু তাওহীদের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হবার কারণে, অবাধ্যতা ও প্রত্যাখ্যানের অপরাধে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে কালের গহ্বরে। যারা আল্লাহর নির্ধারিত পথ অনুসরণ করবে তারা সফল হবে। আধুনিকতার ক্ষেত্রে আমরা বস্তুগত উন্নতি দেখলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে চরম অবনতি দেখি। সভ্যতা বলে আজ যে ধারণাগুলোকে মহাযত্নে মানুষ আঁকড়ে ধরেছে, সেগুলো আসলে চরম পর্যায়ের জাহিলিয়্যাহ।

ইচ্ছা, আচরণ, পরিচয়

আধুনিকতা এবং এলজিবিটি আন্দোলন মানুষের কামনাবাসনাকে তার পরিচয় বানায়। কামনা থাকলেই সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। ইচ্ছা হলেই কাজ করে

ফেলতে হবে। তারপর সেই কাজ বা যৌন আচরণ হবে পরিচয়ের ভিত্তি।

এই অবস্থানও সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কামনাবাসনা মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি না। মানুষের পরিচয়ের মৌলিক অক্ষ দুটো। মানুষের প্রথম পরিচয় হলো, সে মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর গোলাম। মানুষ তা স্বীকার করুক বা না করুক। পরিচয়ের দ্বিতীয় অক্ষ হলো, মানুষ হয় মুমিন বা কাফির। এভাবেই আল্লাহ কুরআনে মানবজাতিকে ভাগ করেছেন। এভাবেই তিনি আখিরাতে মানুষকে ভাগ করবেন। এর বাইরে জাতি, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, গোত্রভেদে পরিচয়ের আরও অনেক শাখা-প্রশাখা থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলো কখনোই এই দুই মূল অক্ষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে পরিচয় তৈরির পুরো ধারণাটাই অগ্রহণযোগ্য। মানুষের অনেক কিছু করার ইচ্ছে হতে পারে। স্রেফ ইচ্ছা থাকলেই সেটা অনুযায়ী কাজ করে ফেলা যায় না। ইচ্ছে থাকলেই কাজটা নৈতিক বা বৈধ হয়ে যায় না। মানুষ হবার অর্থ নিজের ইচ্ছে আর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা। মনে যা আসে তা করে ফেলার নাম মনুষ্যত্ব না। কিন্তু আধুনিকতার চোখে যেহেতু ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; মূল্যবোধ, স্বাধীনতা আর নৈতিকতার ভিত্তি যেহেতু ব্যক্তি নিজেই, তাই কামনাবাসনা আর খেয়ালখুশি এখানে মানুষের ইলাহ হয়ে ওঠে।

বাস্তবতার নির্মাণ?

এলজিবিটি আন্দোলন বাস্তবতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে চায়। বানোয়াট পরিচয়কে চালিয়ে দিতে চায় সর্বজনীন এবং চিরন্তন বলে। সবশেষে আধুনিকতার দেওয়া স্বাধীনতা, অধিকার, প্রগতির ধারণাকে কাজে লাগিয়ে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের বিকৃত আচরণকে।

এক অর্থে বাস্তবতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার এই চেষ্টার সবচেয়ে চরম উদাহরণ হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। পদে পদে এই মতবাদ বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মূলত ভাষা, উচ্চারণ আর প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু এই ক্ষমতা কেবলই আল্লাহর,

> 'তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন—হও (কুন); ফলে তা হয়ে যায় (ফায়া কুন)।' [তরজমা, সূরা ইয়াসিন, ৮২]

যখন আল্লাহ বলেন 'হও', তখন নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি হয়। যখন মানুষ কথা বলে, তখন কেবল শব্দ হয়। আল্লাহর কালাম বাস্তবতা তৈরি করে। মানুষের কথা বাস্তবতার বর্ণনা তৈরি করতে পারে কেবল। মানুষ অর্থ তৈরি করতে পারে না। অর্থ সৃষ্টির মধ্যে নিহিত, পূর্বনির্ধারিত।

যৌন বিকৃতির মতবাদ বদলে দিতে চায় নৈতিকতাকেও। তারা প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত

হয়। প্রবৃত্তি তাদের ঠেলে নিয়ে চলে আনন্দ আর সুখের খোঁজে। নিজেদের বিকৃতিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ক্রমাগত তারা ভালো ও মন্দ, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের সীমানা ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর তা করতে গিয়ে তারা আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করে যায় বারবার।

***

রাব্বুল আলামীনকে প্রত্যাখ্যান করে, আখিরাতকে অস্বীকার করে আধুনিকতা মানুষকে দেবতা বানানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মানুষকে রব বানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আধুনিকতা মানুষকে নামিয়ে আনে অবমানবের পর্যায়ে। আধুনিক মানুষ জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য, নিজের আত্মপরিচয়সহ সবকিছু ভুলতে বসেছে। স্বাধীনতার নামে নিজের খেয়ালখুশির দাস বনে গেছে। যে মানুষও না, পশুও না; বরং দুটোর নিকৃষ্টতম মিশ্রণ। বিকৃত যৌনতার এই আন্দোলন এই অবনতি আর অবক্ষয়ের সবচেয়ে প্রকট দৃষ্টান্ত। আধুনিকতার তৈরি এই অবমানবদের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় চৌদ্দশ বছর আগে নাযিল হওয়া কুরআনের এই আয়াতগুলোতে,

> আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?
>
> তারা বলে, 'দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি আর আমাদেরকে কেবল কালই ধ্বংস করে।' অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণাই করে।' [তরজমা, সূরা আল-জাসিয়াহ, ২৩-২৪]

অধ্যায় ২৫

যৌনতা ও যৌন বিকৃতি : ইসলামের অবস্থান

এবার আসুন, সংক্ষেপে যৌনতা ও যৌন বিকৃতির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান জেনে নেওয়া যাক। যৌনতার ব্যাপারে সংক্ষেপে ইসলামের অবস্থান :

১। যৌনতা শুধুমাত্র বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে বৈধ। বিয়ের বাইরে নারী পুরুষের যৌনসম্পর্ক জায়েজ নেই। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো দাসীর সাথে সম্পর্ক।[৫০১] এক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান আছে।

২। যিনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি বেত্রাঘাত, বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড।

৩। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নাজায়েজ। নির্জনে তো বটেই, জনপরিসরেও সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকতে হবে। শরীয়াহসম্মত কারণ ছাড়া অনর্থক কথা বলা যাবে না। পর্দা এবং নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের এই নিয়ম মেনে চলতে হবে মাহরাম ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে। মাহরাম হলো এমন সব নারী-পুরুষ, যাদের সাথে বিয়ে হারাম।[৫০২]

৪। নারী-পুরুষ উভয়কেই পর্দা করতে হবে। পোশাক পরতে হবে শরীয়াহর নির্দেশনা অনুযায়ী। কেবল শরীর ঢাকা যথেষ্ট না, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শরীরের কাঠামো বোঝা না যায়। এই কথা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে দু'জনের জন্য পর্দা করার মাত্রা ভিন্ন, পর্দা নারীর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৫। নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে। তবে পুরুষের জন্য চোখের হিফাযত বিশেষভাবে জরুরি ও প্রযোজ্য।

---

[৫০১] দেখুন, সূরা আল মাআরিজ, ২৯-৩১; সূরা আল-মুমিনুন, ৫-৭; সূরা আল-ফুরক্বান, ৬৮; সূরা আল ইসরা, ৩২।

[৫০২] মেয়েদের জন্য মাহরাম হলো– বাবা, দাদা, চাচা, মামা, নিজ ভাই, দুধ ভাই ইত্যাদি। ছেলেদের জন্য মাহরাম হলো মা, খালা, ফুপি, দাদি, নানি, নিজ বোন, দুধ বোন ইত্যাদি। এদের সাথে শরীয়াহ নির্ধারিত পর্দা করতে হবে না। বাকি সবার ক্ষেত্রে পর্দা ও পৃথকীকরণের বিধান প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, মামাতো, চাচাতো, খালাতো, ফুপাতো ভাইবোন, দেবর-ভাবী, দুলাভাই-শালী একে অপরের মাহরাম না।

৬। চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। উল্লেখিত বিধিবিধানগুলোর অন্যতম লক্ষ্য, যিনার কাছে যাওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা। যেসব কাজ বা আচরণের মাধ্যমে যিনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, তার সবই ইসলাম প্রতিরোধ করে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ এবং তা কতই না মন্দ পথ! (যা অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়)।' [তরজমা, সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২]

একই সাথে ইসলাম বিয়েকে উৎসাহিত করে। নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর পর মানুষ যখন নিজের ভেতরে যৌন চাহিদা অনুভব করবে, তখন সে বিয়ে করবে। এভাবে সে হালালভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

৭। যৌনতা নিছক বিনোদন কিংবা শারীরিক চাহিদা মেটানোর পদ্ধতি না। মহান আল্লাহ এর সাথে সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকেও যুক্ত করে দিয়েছেন। যৌনতা পরিবারের সাথে যুক্ত, আর পরিবার হলো সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি। এজন্যই যৌনতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্ট এবং কঠোর নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। যিনার শাস্তি এতটা গুরুতর হবার এটি অন্যতম কারণ। পরিবার এবং বংশগতির সুরক্ষা ইসলামী শরীয়াহর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

দৃষ্টিভঙ্গি

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইসলাম যৌনতাকে সত্তাগতভাবে নেতিবাচক বা খারাপ কিছু মনে করে না। এটা মানুষের সহজাত চাহিদা এবং বৈধ যৌনতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন।[৫০৩] আরেক হাদীসে এসেছে, স্ত্রীর সাথে যৌনতা সাদাকাহ।[৫০৪] যদি নিয়ত সঠিক থাকে, যদি যৌনতার উদ্দেশ্য হয় হালালভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করা, নিজেদের হারাম থেকে সুরক্ষিত রাখা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পূরণ করা

---

[৫০৩] আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ, আমাদের তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের তুমি যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো। সহিহুল বুখারি : ১৪১; সহিহ মুসলিম : ৩৬০৬

[৫০৪] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) হচ্ছে সাদাকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) হচ্ছে সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে সাদাকাহ, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেওয়া হচ্ছে সাদাকাহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে সাদাকাহ। আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সাদাকাহ।
তারা (সাহাবিগণ) জিজ্ঞাসা করেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্ক্ষা সহকারে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে?
তিনি বলেন: তোমরা কি দেখো না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গুনাহ্গার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধভাবে করে, তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সওয়াব পাবে।" [মুসলিম: ১০০৬]

অথবা নেক সন্তান কামনা করা, তাহলে যৌনতা নেক আমল হিসেবে গণ্য হতে পারে। এখানে খ্রিষ্টবাদের সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের এই অবস্থান আধুনিক পশ্চিম মানতে পারে না। যিনা, পর্দা, নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে বিধানগুলো তাদের কাছে 'শোষণমূলক' মনে হয়। আবার প্যারাডক্সিকালভাবে বৈধ যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানকেও তারা দেখে নেতিবাচকভাবে। ইসলামকে তাদের কাছে 'শরীর-নির্ভর' ধর্ম। একদিকে তারা যৌনতার ব্যাপারে মুসলিমদের 'গোঁড়ামি', 'মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র সমালোচনা করে। অন্যদিকে মুসলিমদের কামুক আর ইসলামকে 'বস্তুবাদী' ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করে।

যৌনতার প্রতি মানুষের সহজাত চাহিদা এবং সমাজ ও সভ্যতার ওপর অবাধ যৌনতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে রাব্বুল আলামীন সম্যক অবগত। তিনিই তো মানুষসহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। এ কারণেই ইসলামে যৌনতাকে অস্বীকার করা হয়নি; বরং নির্দিষ্ট কাঠামোর ভেতরে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

> 'নারী-পুরুষের আদিম সম্পর্কের এই বাস্তবতাগুলোকে ইসলাম অস্বীকার করে না। ইসলাম আমাদের কাছে অতিমানবীয় কোনো কিছু দাবি করে না। যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষের ফিতরাহ এবং নারী ও পুরুষের জৈবিক আকর্ষণের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ যৌনতা ও আকর্ষণের বিষয়গুলোকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে, শৃঙ্খলের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন, যেন শয়তান মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে। আর এ বিধিবিধান মানার প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
>
> ইসলাম শুধু মানুষকে নিষেধ করে না, বরং এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেয়, যা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বকাঠামো এমন এক চিন্তাধারা এবং ব্যবস্থা তৈরি করে, যা ক্রমাগত মানুষকে ঠেলে দেয় গুনাহর দিকে, বিকৃতির দিকে।'[৫০৫]

ইসলামী শরীয়াহ মানুষের সহজাত তাড়নাকে এমনভাবে চালিত করে, যাতে তা ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার জন্য কল্যাণকর হয়। আত্মকেন্দ্রিক সুখের বদলে অর্জিত হয় সামগ্রিক কল্যাণ। কিন্তু আধুনিকতা ব্যক্তিস্বাধীনতা আর প্রগতির নামে যৌনতাকে পরিবার, বিয়ে, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে। চূড়ান্ত মাপকাঠি বানায় ব্যক্তির সুখ, উপযোগ আর সম্মতিকে। এর অনিবার্য প্রভাব পড়ে সমাজ, পরিবার এবং সভ্যতায়।

---

[৫০৫] আকাশের ওপারে আকাশ, লস্ট মডেস্টি, ২০২২, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা কবীরা গুনাহ। জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধের কারণে আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের সত্তরের বেশি আয়াতে লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পাঠানো শাস্তির আলোচনা এসেছে।

> লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য (প্রেরিত) একজন বিশ্বস্ত রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহর ভয় অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো। 'আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই আছে। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরাই কি কেবল পুরুষদের সাথে উপগত হও? আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা ত্যাগ করে থাকো। বরং তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'
>
> তারা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'
>
> লূত বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি।' 'হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, তারা যা করে তা থেকে রক্ষা করুন।'
>
> অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজন সবাইকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অন্যদের সকলকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিলাম। আর আমরা তাদের ওপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। [তরজমা, সূরা আশ-শুআরা, ১৬০-১৭৪]
>
> 'আমি তাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব দেখো! গুনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।' [তরজমা, সুরা আল-আ'রাফ, ৮৪)
>
> 'অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসলো, তখন আমরা জনপদকে উলটে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর।' [তরজমা, সূরা হূদ, ৮২]

উল্লেখ্য, 'পশ্চাতে অবস্থানকারী বৃদ্ধা' ছিল লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই গুনাহতে লিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু যারা এই কাজ করতো তাদের সমর্থক ছিলেন, তাদের সহায়তা করেছিলেন। এ অপরাধের কারণে একজন নবীর

স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, নবীর দুআ সত্ত্বেও, তিনি মহান আল্লাহর আযাবের ভেতর পড়ে গেছেন। আল্লাহ শুধু বিকৃত যৌনাচারীদের শাস্তি দেননি, যারা কেবল সমর্থন দিয়েছে, তাদেরকেও শাস্তির আওতায় এনেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> যারা কুফরি করে, আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর, তারা ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো। [তরজমা, সূরা তাহরীম, ১০]

আজ যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করার পর মানবাধিকার, স্বাধীনতা কিংবা সেক্যুলারিসমের নামে বিকৃত যৌনতার সমর্থনে কথা বলে, কুরআনের আয়াতে তাদের জন্য স্পষ্ট হুশিয়ারি আছে।

সীমালঙ্ঘন

ইসলামের দিক থেকে সমকামিতা শুধু হারাম না, বরং চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন। পুরুষে পুরুষে যৌনতা যিনার চেয়েও গুরুতর গুনাহ। কুরআনে আল্লাহ যিনার ব্যাপারে বলেছেন, *'নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ'*।[৫০৬] এ আয়াতে যিনার ক্ষেত্রে ফাহিশাহ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষের পুরুষে যৌনতার ব্যাপারে বলা হয়েছে,

> আর আমি প্রেরণ করেছি লূতকে। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি'? [তরজমা, সূরা আল-আ'রাফ, ৮০]

এই আয়াতে 'আল-ফাহিশাহ' ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে 'আল' যুক্ত হয়ে এই কাজের তীব্রতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ করেছে।[৫০৭] নবী ﷺ বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর! যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর! যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর!'[৫০৮]

নবী ﷺ এখানে তিনবার লানতের বদদুআ করেছেন। তিনি কিন্তু যিনাকারীকে তিনবার

---

[৫০৬] দ্রষ্টব্য সূরা আল-ইসরা, ৩২

[৫০৭] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, তার গ্রন্থ আল-জাওয়াবুল কাফীতে একদল আলিমের সূত্রে এই অবস্থান তুলে ধরেছেন। দেখুন, https://islamqa.info/en/answers/38622/the-punishment-for-homosexuality

[৫০৮] মুসনাদু আহমাদ, ২৯১৫

লানত করেননি। সমকামিতা যিনার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।[৫০৯]

আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এর সুবাদে পশ্চিমা চিন্তা থেকে প্রভাবিত হয়ে এবং পশ্চিমা সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় গত দুই দশক ধরে 'মডারেট ইসলাম' নামে নতুন একটি ধারা তৈরি হয়েছে। এদের প্রধান কাজ হলো, আধুনিকতার ছাঁচে ইসলামের নতুন নতুন 'ব্যাখ্যা' তৈরির চেষ্টা করা। এই ধারার অনেকেই সমকামিতাকে যিনার সাথে তুলনা করতে চায়। তারা বলে, ইসলামে যেহেতু বিয়ে-বহির্ভূত সব ধরনের যৌনতাই হারাম, তাই সমকামিতাও হারাম। সমকামিতা যিনার মতোই। ওপরের হাদীস এবং এ ব্যাপারে আলিমগণের বক্তব্যই তাদের এ অবস্থানকে ভুল প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে আরেকটি হাদীস প্রাসঙ্গিক। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে কোনো জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে কওমে লূতের অনুরূপ (অর্থাৎ সমকামিতা) করে।'[৫১০]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষে পুরুষে যৌনতার তুলনা করেছেন পশুসঙ্গমের সাথে, যিনার সাথে না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে পশুসঙ্গম আর যিনা—দুটিই মারাত্মক সীমালঙ্ঘন। কিন্তু দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক আকর্ষণ সহজাত। এই আকর্ষণ অস্বাভাবিক না। কিন্তু বিয়ের বাইরে এই আকর্ষণকে বাস্তবায়ন করা নিষিদ্ধ। অন্যদিকে কোনো মানুষের মধ্যে পশুর সাথে সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা থাকবে, এটি চরম অস্বাভাবিকতা এবং বিকৃতি। এর সাথে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের তুলনা হয় না। এই ধরনের জঘন্য আকাঙ্ক্ষা কারও মধ্যে তৈরি হবার অর্থ হলো, তার মধ্যে বিকৃতি আছে। একই কথা প্রযোজ্য সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার ক্ষেত্রে। এই আচরণ বিকৃতি, কারও মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা থাকাও বিকৃতি।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করুন। ওপরের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *'ঐ ব্যক্তির ওপরে আল্লাহর অভিশাপ'*। তিনি কিন্তু বলেননি 'ঐ কাজের ওপর অভিশাপ'। আধুনিক সমাজে একটা কথা খুব প্রচলিত, 'পাপকে ঘৃণা করুন, পাপীকে নয়'। এসব সস্তা বুলি ব্যবহার করে অনেকেই সমকামিতার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস তাদের এ ধরনের চিন্তাধারাকে সরাসরি খণ্ডন করে। আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন,

> 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না, যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়।'[৫১১]

---

[৫০৯] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওয়াবুল কাফী, ১/১৬৯

[৫১০] মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ২৮১৬; মুসতাদরাকে হাকেম ৮০৫২

[৫১১] ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৮০৩; তিরমিযি, হাদীস নং ১১৬৫

এখানেও ব্যক্তির কথা এসেছে। যারা এই গুনাহ্ করবে আল্লাহ্ তাদের দিকে রাহমাহর দৃষ্টিতে তাকাবেন না, নবী ﷺ এর এই বক্তব্যের সাথে কোনোভাবেই 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে না'—জাতীয় চিন্তাভাবনাকে মেলানো যায় না।

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার শাস্তি

ইসলামের অবস্থান হলো, পুরুষে পুরুষের যৌনতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

> 'তোমরা যাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখো, সেই পাপাচারী এবং যার ওপর ঐ কুকর্ম করা হয়েছে, উভয়কে হত্যা করো।'[৫১২]

সমকামে লিপ্ত পুরুষকে হত্যার ব্যাপারে সাহাবিগণের ঐকমত্য আছে। তবে হত্যার ধরন নিয়ে আছে মতপার্থক্য। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন,

> 'তোমরা ওপর-নিচের উভয়কেই রজম করে হত্যা করো।'[৫১৩]

আবু বকর, আলী, আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং হিশাম ইবন আব্দুল মালিক রহিমাহুল্লাহ সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন।[৫১৪] অন্যদিকে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন,

> 'সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার ওপর পাথর মারা হবে।'[৫১৫]

এই শাস্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসন করা শাসকের। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার ব্যাপারে আলিমগণের অবস্থানের সারমর্ম তুলে ধরে ইমাম ইবনু ক্বাইয়্যিম বলেছেন,

> 'সমকামিতা যেহেতু সামাজিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়, তাই এই জঘন্যতম অপরাধ দমন ও নির্মূলে শরীয়তও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। সমকামিতার অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য প্রণয়ন করেছে কঠোর শাস্তির বিধান...
>
> আবু বকর, আলী, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু যায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মা'মার—প্রমুখ সাহাবি

---

[৫১২] ইবনু মাজাহ, ২৫৬১,আবু দাউদ, ৪৪৬২, তিরমিযি ১৪৫৬
উল্লেখ্য, এখানে স্বেচ্ছায় সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত লোকেদের কথা বলা হচ্ছে। কাউকে জোর করে এ কাজে বাধ্য করা হলে, সে দোষী হবে না। তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে না।

[৫১৩] ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২৬১০

[৫১৪] বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৩৮৯

[৫১৫] ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীসং ২৮৩২৮; বায়হাক্বী: ৮/২৩২

রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন এবং ইমাম যুহরী, রবীআহ ইবনু আবী আব্দির রহমান, ইমাম মালিক, ইসহাক ইবনু রাহুয়াই, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল প্রমুখ আলিমের নিকট সমকামিতার শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির চেয়েও কঠোর। সমকামী পুরুষ বা নারী বিবাহিত[৫১৬] হোক বা অবিবাহিত, সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে...

যারা এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা উম্মাহর জুমহুর এবং একাধিক আলিম এ ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে ইজমা থাকার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা (সাহাবাগণ) বলেছেন, আর কোনো গুনাহ সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার মতো ভয়াবহ ফাসাদ নিয়ে আসে না। ফাসাদের দিক থেকে কুফরের পরই এর অবস্থান। এবং সম্ভবত এর ফাসাদ হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট হতে পারে।'[৫১৭]

এ তো গেল দুনিয়ার শাস্তি। আর এ ধরনের লোকের জন্য আখিরাতের শাস্তি হলো আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।

'ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ'-এর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

যেমনটা আমরা এরইমধ্যে দেখেছি, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবস্থান নানা দিক থেকে ইসলামের মৌলিক আকীদাহ ও অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে আমরা সংক্ষেপে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরছি।

মানুষ নারী এবং পুরুষ : আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ, 'ট্র্যান্সজেন্ডার', 'জেন্ডার ফ্লুয়িড', 'নন-বাইনারি' বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের তৈরি শ্রেণিবিভাগ।

- আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন; পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আন-নাজম, আয়াত ৪৫]
- আর শপথ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আল-লাইল, আয়াত ৩]
- বস্তুতঃ পুত্র কন্যার মতো নয়। [তরজমা, সূরা আলি ইমরান, আয়াত ৩৬]
- হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি

---

[৫১৬] সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত নারীর শাস্তির ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ফকীহদের বড় একটি অংশ বলেছেন, দু'জন নারী যদি একে অপরের সাথে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে সেটিও কবীরা গুনাহ হবে। তবে শাস্তি পুরুষ সমকামীর চেয়ে ভিন্ন হবে।
বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, https://islamqa.info/en/answers/21058/what-is-the-punishment-for-lesbianism, এবং ইসলামের শাস্তি আইন, ড. আহমদ আলী।

[৫১৭] ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওয়াবুল কাফী,
قال اصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهي تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل
বিস্তারিত: https://islamqa.info/ar/answers/38622
ytilauxesomoh-rof-tnemhsinup-eht/22683/srewsna/ne/ofni.aqmalsi//:sptth

> করেছেন একই ব্যক্তি হতে আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১]

দেহ আর জেন্ডারের পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। জেন্ডার আধুনিক পশ্চিমের কিছু তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের তৈরি করা বানোয়াট ধারণা, শরীয়াহতে যার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। ব্যক্তির কী 'মনে হয়' তা দিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বদলায় না। মহান আল্লাহ দেহ আর আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। শরীয়াহতে জন্মগত লিঙ্গ আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। ইসলাম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন সে পুরুষ। যাকে তিনি নারীদেহ দিয়েছেন সে নারী। এবং মহান আল্লাহ ভুল করেন না। কেউ ভুল দেহে জন্মায় না। যদি কারও মনে হয় সে ভুল দেহে আটকা পড়েছে, তাহলে তার সমস্যা মনে। চিকিৎসার মাধ্যমে মনের রোগের সমাধান করতে হবে। শরীরকে বদলানো যাবে না।

মুসলিম হিসেবে আমরা স্বীকার করি যে, নারী ও পুরুষের দেহের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য ও ভূমিকা আছে, যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দেহের পাশাপাশি সৃষ্টিগতভাবেই নারী ও পুরুষের চিন্তা, চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। শরীয়াহ এই পার্থক্যগুলোকে আমলে নেয়। এ কারণেই সামগ্রিকভাবে শরীয়াহর বিধান নারী ও পুরুষের জন্য এক হলেও, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে (পোশাক, উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য ইত্যাদি) শরীয়াহর হুকুমের পার্থক্য হয়।

তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই : ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই। যদি কোনো মানুষের দেহে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় আন্তঃলিঙ্গ বা Intersex হয়, সেক্ষেত্রেও তাকে নারী অথবা পুরুষ গণ্য করা হবে। তৃতীয় কিছু না। ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায় এ ধরনের মানুষকে বলা হয় 'খুনসা'।

যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে, তাদের শরীরেও পুরুষ বা নারী কোনো একটি দিকের প্রাধান্য থাকে। সেটা অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়। দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি এমন 'হিজড়া'দেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষ হিসেবে এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি এমন 'হিজড়া'দের নারী হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫১৮]

কিন্তু এমন ব্যক্তি নারী নাকি পুরুষ, তা বোঝা যাবে কীভাবে? এ নিয়ে আলিমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে তাদের অবস্থান হলো, কারও মধ্যে

---

[৫১৮] সুনানে বাইহাকী কুবরা, হাদীস নং ১২৯৪

যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থাকে (অত্যন্ত দুর্লভ), সেক্ষেত্রে সে কোন দিক দিয়ে প্রস্রাব করছে, তার ভিত্তিতে তাকে নারী অথবা পুরুষ গণ্য করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, এ ধরনের কোনো ব্যক্তির প্রস্রাব যদি পুরুষাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয় তাহলে সে পুরুষ এবং সে সমাজ ও আইনের চোখে পুরুষ হিসেবেই গণ্য হবে। সে স্বাভাবিকভাবে পুরুষের মতোই জীবনযাপন করবে। যদি এভাবে বোঝা সম্ভব না হয়, তাহলে বয়ঃসন্ধির সাথে জড়িত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো হবে।

একেবারে কোনোভাবেই যদি বোঝা না যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরের প্রজননব্যবস্থা শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, নাকি ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তা খুব সহজে জানা সম্ভব। কাজেই ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই।

অস্ত্রোপচার

কোনো ব্যক্তির প্রজননব্যবস্থা পুরুষের, অর্থাৎ তার দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, কিন্তু যৌন বিকাশের ত্রুটির কারণে বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন স্তনের মতো অঙ্গ) আছে—এমন ক্ষেত্রে সেই ত্রুটি দূর করার জন্য শর্তসাপেক্ষে অস্ত্রোপচারের বৈধতা বর্তমান যুগের আলিমগণ দিয়েছেন। একই কথা প্রযোজ্য নারীর ক্ষেত্রেও। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক কন্যাশিশুর জন্মের সময় যোনীপথ বন্ধ থাকে, যা অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব, এ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণকে ইসলাম নিষিদ্ধ বলে না।

উল্লেখ্য, এ ধরনের অস্ত্রোপচার সীমিত পরিসরে জায়েজ এবং এর উদ্দেশ্য, একজন মানুষের শরীরকে তার দেহের প্রজননন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। বিকলাঙ্গতা দূর করা। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ বা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে যে 'লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি' করা হয়, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের 'লিঙ্গ পরিবর্তন' জাতীয় কোনো অস্ত্রোপচার ইসলামী শরীয়াহতে বৈধ না।[৫১১]

শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু আচরণ বিপরীত লিঙ্গের মতো

এ তো গেল আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্সের কথা। যাদের শারীরিক ত্রুটি নেই কিন্তু আচার-আচরণ বিপরীত লিঙ্গের মতো, তাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করা এবং অনুকরণ করা নিষিদ্ধ। শারীরিকভাবে সুস্থ কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নারীর অনুকরণ করে এমন পুরুষদের শরীয়াহতে মুখান্নাস বলা হয়। তাদের ব্যাপারে অবস্থান কী হবে, এ নিয়েও হাদীস

---

[৫১১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Vaid, Mobeen. "'And the Male Is Not like the Female': Sunni Islam and Gender Nonconformity." Muslim Matters (2017).

থেকে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন:

> নবী ﷺ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন: নবী ﷺ অমুককে বের করেছেন এবং উমার অমুককে বের করে দিয়েছেন।[৫২০]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

> হাতে পায়ে মেহেদি রাঙানো একজন মুখান্নাসকে নবীর কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই লোকের কী হয়েছে? তাঁকে বলা হলো: আল্লাহর রাসূল! সে নারীদের চলন-বলনের অনুকরণ করে। তাই তিনি (ﷺ) তার ব্যাপারে দেশান্তরের আদেশ জারি করলেন এবং তাকে আন-নাক্বি নামক স্থানে নির্বাসন দেওয়া হলো।[৫২১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন,

> 'আল্লাহ সেসব মানুষদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনে...।'[৫২২]

কাজেই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর নিয়ে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে, অনুকরণ করে এবং 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করে, তাহলে এর সবগুলোই হারাম।

যদি জন্মগতভাবে কারও স্বভাবে (দেহে না) বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন ছোটবেলা থেকেই কোনো পুরুষের স্বভাব ও চালচলনে যদি মেয়েলী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এক্ষেত্রে তার আবশ্যক দায়িত্ব হলো সাধ্যমতো সেগুলো বদলানোর চেষ্টা করা। যথাসাধ্য চেষ্টার পরও যদি পরিবর্তন না আসে এবং সে যদি হারাম কোনো কাজ না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে না। অন্যদিকে সে যদি নিজেকে বদলানোর চেষ্টা না করে উল্টো নারীদের পোশাক পরতে শুরু করে, নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কাজেই কোনো দিক থেকেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বৈধতা ইসলামে নেই। এটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।[৫২৩]

একটি বিষয় এখানে মাথায় রাখা জরুরি। তা হলো, কোনো মেয়ে খেলাধুলা করতে পছন্দ করে বা কোনো ছেলে রান্না করতে ভালোবাসে, এর ভিত্তিতে তাদের বিপরীত

---

[৫২০] বুখারী ৫৮৮৬, https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=30483। আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৫৪)

[৫২১] সুনানু আবী দাউদ, ৪৯২৮। https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=62296

[৫২২] বুখারী, হাদীস নং ৪৮৮৬

[৫২৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, Vaid, Mobeen, and Waheed Jensen. "“And the Male Is Not like the Female”: Sunni Islam and Gender Nonconformity (Part II)." (2020).

লিঙ্গের মানুষ বলা বা তারা 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে', এমন দাবি শরীয়াহতে অগ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রচলন বা উরফ থাকে। ইসলামী ফিকহের আলোচনায় সামাজিক প্রচলন বা উরফকে আমলেও নেওয়া হয়। কিন্তু সামাজিক প্রচলন বা রীতিনীতি কোনো অবস্থাতেই শরীয়াহর স্পষ্ট বিধান এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা নির্ধারিত বাস্তবতা, যেমন মানবদেহের বাস্তবতার ওপর স্থান পারে না।

বিদ্রোহ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। বিতাড়িত হবার সময় ইবলীস মহান আল্লাহকে বলেছিল,

> '...অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করবো। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, মিথ্যা আশ্বাস দেবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেবো, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করবো, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৮-১১৯]

এ আয়াতের স্পষ্ট প্রতিফলন আজ আমরা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মধ্যে দেখতে পাই। ট্র্যান্সজেন্ডার আক্ষরিক অর্থেই একটি শয়তানি এজেন্ডা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> 'আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৯]

যাদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা আছে, তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

বিকৃত যৌনতায় আসক্ত মানুষদের মোটাদাগে দুটি শ্রেণি আছে। একদল হলো ঐসব লোক, যারা জেনেবুঝে বিকৃতিকে বেছে নেয়। একে উপভোগ করে, তৈরি করে বৈধতার অজুহাত। এরা হলো উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসি, মানি আর এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টদের মতো লোকেরা। এই দলের লোকেরা খুব ভালো করে জানে তারা আসলে কী চায় এবং কী করছে। তারা বিকৃতিকে পরিচয় বানায়। রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের বিকৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সমাজ ও সভ্যতা জুড়ে। এরা কওমে লূতের উত্তরসূরী, এদের মোকাবিলা করতে হবে।

আরেক দল হলো ঐসব মানুষ, যারা কোনো কারণে এমন বিকৃত আচরণে আসক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তারা এ থেকে বের হয়ে আসতে চায়। শৈশবে বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরা, সাজগোজ করা, যৌন নির্যাতন, মানসিক সমস্যা, সমকামী পর্ন-আসক্তি ইত্যাদি কারণে কোনো কোনো ব্যক্তির সমলিঙ্গের প্রতি ক্ষণিক আকর্ষণ জন্মাতে পারে অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তৈরি হতে পারে বিভ্রান্তি।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, আমরা মানুষকে তার কাজ দিয়ে বিচার করি। কারও মধ্যে যিনা করার কিংবা মাদক ব্যবহারের ইচ্ছা থাকতে পারে। এই ইচ্ছার কারণে আমরা কাউকে দোষী বলি না। যদি সে এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে, তখন তাকে দোষী বলা হয়। তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কাজেই কেউ যদি নিজের মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন না করে তাহলে স্রেফ অতটুকু কারণে আমরা তাকে দোষী বলবো না। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এমন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করা স্বাভাবিক না। বরং বিকৃতি ও অসুস্থতা।

ইসলাম আমাদের সবার সাথে ইনসাফ করতে শেখায়। মানুষের সাথে আমাদের আচরণ হতে হবে নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী এবং শরীয়াহর বিধানগুলোর আলোকে। এমন মানুষ যদি সাহায্য চায়, তাহলে তাকে সাহায্য করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আক্রমণ করা, কটু কথা বলা কিংবা একঘরে করে রাখার বদলে চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। একইভাবে কেউ যদি গুনাহ করে ফেলার পর অনুতপ্ত হয়, তাওবাহ করে ফিরে আসতে চায়, এবং ভবিষ্যতে এই গুনাহ থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিৎ। এজন্য দরকার ইসলামী শরীয়াহর আলোকে যথাযথ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

সহানুভূতি বনাম স্বীকৃতি

কিন্তু ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি আর অসুস্থতার স্বীকৃতি এক না। অনেক পথশিশু দারিদ্র্য আর ছোটবেলার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কারণে অল্প বয়সে মাদক ব্যবহার করা শুরু করে, অনেকে ব্লেড দিয়ে কাটাকাটি করে নিজের শরীরে। আমরা এসব শিশুদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করি। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলে আমরা কিন্তু তাদের মাদক ব্যবহার কিংবা শরীরে কাটাকাটি করার অভ্যাসকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে, 'এগুলো যার যার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। যতক্ষণ অন্য কারও ক্ষতি না হচ্ছে, এ ধরনের আচরণে কোনো সমস্যা নেই।'

ঐ শিশুদের সাহায্য দরকার এটা যেমন সত্য, তেমনি ঐ আচরণ যে অস্বাভাবিক, তাও সত্য। আমাদের দায়িত্ব ঐ শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করা, এই অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া না। নিজের শরীর বা আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যায় ভোগা মানুষদের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান একই হওয়া উচিত।

স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতার নামে অসুস্থতাকে আমরা মেনে নিতে পারি না। বিকৃত আচরণকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না। এটা অসম্ভব। অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকতা বলা, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলার ফলাফল হলো পুরো সমাজকে অসুস্থ

আর অস্বাভাবিক করে তোলা। এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাস এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। অস্বাভাবিকতার স্বীকৃতির অর্থ সেটার প্রসার। এতে করে যারা অসুস্থ তাদের উপকার হবেই না, বরং দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি হবে। অপরিমেয় ক্ষতি হবে সমাজেরও।

***

এলজিবিটি আন্দোলন মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং চরম সীমালঙ্ঘন। একজন মুসলিমের পক্ষে কোনোভাবেই সমাজবিধ্বংসী এই মতবাদ ও আন্দোলনকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। পুরো পৃথিবীও যদি এই মতবাদকে গ্রহণ করে তবু আমাদের এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হলো আল-ফুরকান, যার অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, হারাম-হালাল নির্ধারিত হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করা।

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্যপথ হতে দূরে সরে পড়লো।' [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৬]

অধ্যায় ২৬

কিছু আপত্তি ও তার জবাব

এলজিবিটি এজেন্ডার পক্ষে এবং ইসলামের অবস্থানের বিরুদ্ধে ধরাবাঁধা কিছু যুক্তি ও আপত্তি আমাদের সমাজের সেক্যুলার ও প্রগতিশীল অংশের দিক থেকে দেখা যায়। কিছু কিছু যুক্তির ফাঁকফোকর নিয়ে এরইমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি, যেমন- সমকামিতা বা ট্র্যান্সজেন্ডারিসম জন্মগত হবার দাবি নিয়ে একাধিক অধ্যায়ে আলোচনা এসেছে। এ অধ্যায়ে আমরা আরও কিছু যুক্তি, আপত্তি এবং সেগুলোর জবাবের দিকে তাকাবো।

১। অনেক মুসলিম সমাজে সমকামিতা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা সমকাম নিয়ে কবিতাও লিখেছেন।

এই আপত্তির জবাব হলো, ইতিহাসের কোন সময়ে মুসলিমরা কী করেছে তা শরীয়াহর দলিল না। এর ভিত্তিতে ভুল-শুদ্ধ, হারাম-হালাল ঠিক হয় না। ইতিহাস জুড়ে অনেক মুসলিম সুলতান এমন অনেক কাজ করেছেন, যা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যায়। অনেকে যুলুম করেছেন। অনেক সুলতান মদপান করতেন। অনেকে ক্ষমতার জন্য খুনোখুনি করেছেন। কেউ কেউ হত্যা করেছেন নিজের পিতা বা ভাইদের। তার মানে এই না যে, এই কাজগুলো এখন বৈধ হয়ে গেছে। যেহেতু আগে মুসলিমরা করেছে তাই এখন আমরাও এগুলো করবো।

কোন মুসলিম শাসক কী করেছেন, কোন মুসলিম সাম্রাজ্যে কী হয়েছে, তা মুসলিমদের মাপকাঠি না। আমাদের মাপকাঠি কুরআন, সুন্নাহ এবং সামষ্টিকভাবে সাহাবিগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মত।

আরেকটি বিষয় হলো, মুসলিম ইতিহাসে কিছু সাম্রাজ্যে এবং সমাজের অল্প কিছু অংশের মধ্যে যৌন বিকৃতি দেখা গিয়েছে। কবিদের কেউ কেউ এ বিষয়টিকে মহিমান্বিত করার জঘন্য চেষ্টাও হয়তো করেছে। কিন্তু আলিমগণ এবং মূল সমাজ কখনো এ বিষয়গুলো আধুনিক পশ্চিমের মতো মেনে নেয়নি। বরং শক্তভাবে এবং ঘৃণাভরে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই মুসলিম উম্মাহ যৌন বিকৃতিকে বৈধতা দেয়নি, আলহামদুলিল্লাহ। কাজেই এ ব্যাপারগুলোকে দলিল

হিসেবে দেখানোর সুযোগ তো নেই-ই, এগুলোকে সমাজের মূলধারার প্রবণতা হিসেবেও দেখানো সম্ভব না।

২। মাদরাসাতে ছেলে শিশুদের বলাৎকার করা হয়।

এই আপত্তির মধ্যে আসলে কোনো যুক্তিতর্ক নেই। এই কথাটা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য, বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মাদরাসা ছাত্রের মধ্যে অল্প কিছু ছাত্র ধর্ষিত হয়, হাজার হাজার মাদরাসা শিক্ষকের মধ্যে অল্প কিছু শিক্ষক এই জঘন্য অপরাধ করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়?

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানের ঠিক কোন দিকটা এখানে বদলাচ্ছে? এতে করে কি প্রমাণ হচ্ছে যে, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা ইসলামে বৈধ? যারা বলাৎকার করছে তারা কি এই কাজের তাত্ত্বিক কোনো বৈধতা তৈরি করেছে? এতে কি প্রমাণ হচ্ছে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা মেনে নেওয়া উচিৎ?

এই কথা বলে সর্বোচ্চ মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট মানুষদের ব্যাপারে দ্বিচারিতা বা ডাবলস্ট্যান্ডার্ডের একটা আপত্তি তোলা যায়। কিন্তু এতে করে সামগ্রিকভাবে ইসলামের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সম্ভব না। কিছু কিছু মাদরাসাতে অর্থ আত্মসাতের ঘটনাও ঘটে। তার মানে কি অর্থ আত্মসাৎ ইসলামে বৈধ?

তাছাড়া মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের জঘন্য আচরণের ঘোরবিরোধী। এই বিরোধিতার শিক্ষা তারা ইসলাম থেকেই পেয়েছেন। ইসলামে পোপতন্ত্র নেই। মাদরাসার লোকেরা ব্রাহ্মণ জাতীয় কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ না যে, তারা কিছু করলেই সেটা সঠিক হয়ে যাবে। যারা এই কাজ করছে তারা জঘন্য অপরাধ করেছে। মুসলিমরা এই অপরাধ বিন্দুমাত্র সমর্থন করে না। বরং ইসলামী শাসন থাকলে এদের অনেকেরই মৃত্যুদণ্ড হতো। ব্যস, কথা শেষ।

৩। তোমরা ব্রিটিশদের বিরোধিতা করো, উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করো। তোমরাই আবার ব্রিটিশদের বানানো পায়ুসঙ্গম-বিরোধী আইন অনুচ্ছেদ ৩৭৭ সমর্থন করো কেন?

এই ধরনের কথা বলা লোকেরা সম্ভবত 'চিন্তা করা' ব্যাপারটার সাথে ঠিক পরিচিত না। কারণ, আধা মিনিট মাথা খাটালেই এ কথার অযৌক্তিকতা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন।

বাংলাদেশের আইনে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ এবং খুন দণ্ডনীয় অপরাধ। এই দণ্ডবিধি গড়ে উঠেছে ব্রিটিশদের বানানো আইনের ভিত্তিতে। আমরা ব্রিটিশ আইনের বিরোধী, আমরা চাই সামগ্রিকভাবে শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী সমাজ ও শাসন চলুক। তার মানে কি আমাদের এখন চুরি, ডাকাতি, খুন আর ধর্ষণের বৈধতার পক্ষে অবস্থান

নিতে হবে?

অবশ্যই না। কারণ, এগুলো ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকেও অপরাধ। অর্থাৎ, দেশের সেক্যুলার আইন এবং ইসলামী শরীয়াহ—দুটো অনুযায়ীই এ কাজগুলো অপরাধ। পার্থক্য হলো, আইনের উৎস আর শাস্তির মাত্রা নিয়ে। ইসলামী আইনের ভিত্তি ওয়াহী, আর সেক্যুলার আইনের ভিত্তি মানুষ। ইসলামী শরীয়াহতে এসব অপরাধের শাস্তি আরও গুরুতর।

একই কথা প্রযোজ্য বিকৃত যৌনতার ক্ষেত্রেও। আমরা সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার বিরোধিতা করি, কারণ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী এটি হারাম, কবীরা গুনাহ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ব্রিটিশদের আইনের কারণে আমরা এটার বিরোধিতা করি না। অনুচ্ছেদ ৩৭৭-এ যেসব শাস্তির কথা এসেছে, সেগুলো ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ না। আমাদের আপত্তি ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া লিগ্যাল সিস্টেম নিয়ে, ঐ কাজটা অপরাধ হওয়া নিয়ে না।

সহজভাবে বলি। ইসলামী আইন থাকলে স্রেফ দুই বছর কারাদণ্ড আর আর্থিক জরিমানা দিয়ে বিকৃতচারীরা পার পেত না।

৪। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরান এবং তুরস্কের মতো মুসলিম দেশে ট্রান্সজেন্ডার বৈধ। বাংলাদেশের মুসলিমরা কি বাকি সবার চেয়ে বেশি বুঝে?

সম্প্রতি অনেকেই এই ধরনের একটা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই যুক্তির বেশ কয়েকটা সমস্যা আছে। এখানে যে দাবি করে হচ্ছে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা আছে। সমস্যা আছে দাবির সত্যতা নিয়েও। তবে এই অবস্থানের প্রধান সমস্যা হলো, নৈতিকতা এবং আইনের উৎস নিয়ে এখানে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে।

দ্বীন ইসলামে নৈতিকতা এবং আইনের ভিত্তি শরীয়াহ। কোনো রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়াহর দলিল না। পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশটার মতো জাতিরাষ্ট্র আছে, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সবগুলো রাষ্ট্র সুদকে বৈধতা দিলেও সুদ অবৈধই থাকে। কারণ বিধানদাতা, শরীয়াহপ্রণেতা সুদকে হারাম করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর রাসূল তাই শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সুদকে হারাম গণ্য করেছেন। একই অবস্থান নিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের ইমামগণ। আজ যদি পুরো বিশ্বের সব মুসলিম, সব রাষ্ট্র, সব ফতোয়াবোর্ড সুদকে হালাল বলে, তাও সুদ হারামই থাকবে।

একই কথা লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি বা বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান স্পষ্ট। কোন রাষ্ট্র কী করলো, তার ভিত্তিতে আমাদের মাপকাঠি এবং অবস্থান বদলাবে না। পুরো আলোচনা এখানেই শেষ করে দেওয়া যায়, তবু আরও কিছু দিক সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক।

ইরান ছাড়া ওপরের সবগুলো ঘোষিত সেক্যুলার রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্র চলে সেক্যুলার আইন ও সংবিধান দ্বারা। যদিও একটুআধটু ইসলামের মিশেল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সেক্যুলার সংবিধানের। আর সেক্যুলার রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত কিংবা সেক্যুলার আইনের উপসংহার ইসলামী শরীয়াহর আলোচনায় মূল্যহীন।

তুরস্কে এক সময় আরবির বদলে তুর্কি ভাষায় আযান দেওয়ার নিয়ম ছিল। তুরস্কে হয়েছে বলে এখন বাংলাদেশেও কি বাংলায় আযান দেওয়া শরীয়াহর দিক থেকে বৈধ হয়ে যাবে? ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দর্শনের নাম হলো পঞ্চশিলা। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র, এই যুক্তি দিয়ে কি বাকি পৃথিবীর মুসলিমদেরও এই দর্শন গ্রহণ করতে বলা হবে? এই নীতিকে ইসলামী বলা হবে? এগুলো একেবারেই হাস্যকর অবস্থান। তুরস্ক বা ইন্দোনেশিয়াতে লিঙ্গ পরিবর্তন সেক্যুলার আইন অনুযায়ী বৈধ বলে বাকি পৃথিবীর মুসলিমদেরও একে বৈধ বলে মেনে নেওয়া উচিৎ—একই মানের কথা।

তাছাড়া এই দাবির সত্যতা নিয়েও সমস্যা আছে। তুরস্ক, ইরান এবং ইন্দোনেশিয়াতে লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন বৈধ। কিন্তু মালায়শিয়াতে স্রেফ 'মনে হওয়া'র কারণে একজন সুস্থ পুরুষ নারী পরিচয় গ্রহণ করবে, পুরুষ নারীর পোশাক পরবে এমন কিছুর আইনগত বৈধতা নেই।[৫২৪] মিশরের অবস্থাও প্রায় একই।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতি সাইয়্যিদ তানতাউয়ীর ১৯৮৮ সালের একটি ফতোয়াকে এক্ষেত্রে অনেকে সামনে আনার চেষ্টা করেন। দাবি করেন, তানতাউয়ী এই ফতোয়াতে লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু এই ফতোয়ার বক্তব্য অস্পষ্ট এবং একে অপারেশনের পক্ষ-বিপক্ষ, দু দিকেই ব্যবহার করা যায়। ফতোয়ার শেষে তানতাউয়ী বলেছেন, নারী বা পুরুষের কোনো অঙ্গ যদি শরীরের ভেতরে থাকে বা লুকায়িত থাকে, তাহলে তা স্পষ্ট ও প্রকাশ করার জন্য অপারেশন করা যেতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে ডাক্তার। স্রেফ মনের ইচ্ছার কারণে অপারেশন করা যাবে না।

একদম সাদামাটাভাবে দেখলে মনে হয়, তানতাউয়ী এখানে স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এবং ইন্টারসেক্স বা জন্মগত সমস্যার ক্ষেত্রে অপারেশনের পক্ষে মত দিয়েছেন।[৫২৫] যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নিই তানতাউয়ীর ফতোয়া 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে ডাক্তারদের মূল্যায়নের পর লিঙ্গ পরিবর্তনের পক্ষে, সেক্ষেত্রেও এই এক ফতোয়ার বিপরীতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে আল-আযহারসহ

[৫২৪] Transgender people and Shariah law in Malaysia: Where do we go from here? Malay Mail. March 17, 2021. https://tinyurl.com/3np3a8ay

[৫২৫] Skovguard-Peterson, Jakob. "Sex change in Cairo: Gender and Islamic law." Journal of the International Institute 2, no. 3 (1995).

মিশরের ভেতরে এবং বাইরের একাধিক প্রতিষ্ঠানের মুফতিদের ফতোয়া দেখানো সম্ভব। বর্তমানে মিশরে একজন ব্যক্তি বৈধভাবে পরিচয় বদলাতে পারেন কেবল অপারেশনের পর, আর অপারেশনের অনুমোদন দেওয়া হয় যদি ব্যক্তির শারীরিক সমস্যা থাকে, অর্থাৎ তিনি যদি ইন্টারসেক্স হন।[৫২৬] কাজেই তানতাউয়ীর ফতোয়া যদি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে হয়েও থাকে, মিশরের বর্তমান অবস্থান এর বিপরীত।

সাথে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল-আযহার অনেক দশক ধরেই একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অবস্থানগুলো বাইরে তো বটেই, মিশরের ভেতরেও নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। খোদ সাইয়্যিদ তানতাউয়ীর অনেক বিতর্কিত ফতোয়া আছে। ১৯৮৯ সালে তানতাউয়ী ফতোয়া দিয়েছিলেন, সরকারি বন্ড এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে পাওয়া 'ইন্টারেস্ট' আসলে রিবা বা সুদ না।[৫২৭] তাই হারামও না। এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল এমন এক প্রেক্ষাপটে যখন মিশরে ইসলামী ব্যাংকিং ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। আর ব্যাপারটা সরকারের পছন্দ হচ্ছিল না। এই ফতোয়া প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শরীয়াহতে এর কোনো মূল্য নেই। কাজেই সাইয়্যিদ তানতাউয়ীর একটি ফতোয়া কিংবা পুরো আল-আযহারের অবস্থান দিয়েও ইচ্ছেমতো পরিচয় বদলের বৈধতা দেওয়া সম্ভব না, যেখানে এ ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইরানে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি বৈধ। সার্জারি করার পর ব্যক্তি সেখানে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের পরিচয় বদলাতে পারে। এ কারণে ইরানে প্রচুর লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন হয়। সস্তায় অপারেশনের জন্য ইরানকে বেছে নেয় অনেকেই। এই অবস্থানের ভিত্তি হলো, খোমেনীর ১৯৮৭ সালের একটি ফতোয়া যা পরে আলি খামেনিও পুনর্ব্যক্ত করেছে। খোমেনী এবং ইরানের ফতোয়ার ব্যাপারে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তারা ইমামী শিয়া। তাওহীদের প্রশ্নেই এই ধরনের শিয়ারা নবী ﷺ এর পথ থেকে বিচ্যুত।[৫২৮] শরীয়াহ এবং এর উৎসের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থান ভিন্ন। কাজেই খোমেনী কিংবা অন্য কোনো শিয়ার ফতোয়ার জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্য আমাদের কাছে নেই।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন করা যায়, ইরানে এমন অনেক আইন আছে, যা সেক্যুলার, প্রগতিশীল এবং তাদের পশ্চিমা মনিবদের পছন্দ না। যেমন বাধ্যতামূলক হিজাবের বিধান। তারা কি এসব আইনের ব্যাপারেও বলবে, ইরানে আছে তাই বাংলাদেশসহ

---

[৫২৬] The "Chromosome Trap": Anti-Trans Narratives and Policy in Egypt https://timep.org/2023/06/29/chromosome-trap-anti-trans-narratives-and-policy-in-egypt

[৫২৭] Tantawi May Have Been Moderate, But He Was Ignored. Newsweek, March 11, 2010. https://tinyurl.com/mwrrkem7

[৫২৮] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, https://islamqa.info/en/answers/101272/the-status-of-the-imams-of-the-ithna-ashari-shiah

বাকি মুসলিম দেশগুলোতেও এসব আইন থাকা উচিৎ? নাকি শুধু 'লিঙ্গ পরিবর্তন' এর ক্ষেত্রেই ইরানের অনুসরণ করতে হবে?

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন, জর্ডান, সৌদি আরব, লিবিয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারি ফতোয়া বোর্ড থেকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।[৫২৯] বিশ্বজুড়ে এমন হাজার হাজার আলিম ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, যারা কোনো রাষ্ট্রের চাকরি করেন না। এই সবকিছু ছাপিয়ে কেন তানতাউয়ী কিংবা খোমেনীর দুয়েকটা ফতোয়াকে আঁকড়ে ধরা হবে? এটা স্রেফ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তর্কে জেতার কৌশল ছাড়া আর কিছুই না।

৫। ইসলামী আইনে চারটি জেন্ডারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে – নারী, পুরুষ, আন্তঃলিঙ্গ (খুনসা/ইন্টারসেক্স), মুখান্নাস (ট্র্যান্সজেন্ডার)। কিন্তু ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীরা এই সত্যকে চাঁপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই দাবিরও সমস্যা আছে বেশ কিছু জায়গায়। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিকতা শুধু কিছু হুকুম-আহকাম বা বিধিবিধান নিয়ে না। এই মতবাদের ভিত্তি, অন্তর্নিহিত বিশ্বাস এবং উপসংহারগুলো ইসলামের মৌলিক অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক। এই মতবাদ যে ধরনের সমাজ ও আইন চায়, তা ইসলামী শরীয়াহর উদ্দেশ্যের বিপরীত। এখানে আকীদাহ এবং দ্বীনের দ্বন্দ্ব আছে।

তাছাড়া ইসলামের অবস্থান হলো,

- বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ, তাদের বেশভূষা ধারণ
- ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরকে বদলানো ('লিঙ্গ পরিবর্তন')
- মনে হয়েছে তাই নিজেকে 'বিপরীত লিঙ্গ' বলে দাবি
- সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা

এই সবগুলো কাজ হারাম। অনেক ক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিষয়গুলো কুরআনের আয়াত এবং নবী ﷺ এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো কোনো পরিচয় না, কোনো অধিকারের বিষয়ও না। এগুলো কিছু নির্দিষ্ট আচরণ, যেগুলোর সাথে নৈতিকতা এবং সমাজের শৃঙ্খলা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। এই চারটি হারাম উপাদানই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশে। কাজেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ কোনোভাবেই ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না। এটাই প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, শরীয়াহতে ইন্টারসেক্স (খুনসা) এবং শারীরিকভাবে সুস্থ কিন্তু চালচলনে মেয়েলী এমন পুরুষের (মুখান্নাস) আলোচনা এসেছে সত্য। কিন্তু তাদের বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণের বৈধতা দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে,

[৫২৯] বেশ কিছু ফতোয়ার লিংক সংকলন করা হয়েছে এখানে, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে বিভিন্ন দেশের আলিমগণের ফতোয়া- https://chintaporadh.com/fatwa-trans/

- পুরুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েলী আচরণ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। তাকে এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, তাকে বিরত রাখতে হবে।
- সহজাতভাবে কোনো পুরুষের মধ্যে মেয়েলী স্বভাব থাকলে সে দোষী হবে না, তবে তার দায়িত্ব হলো সাধ্যমতো এগুলো বদলানোর চেষ্টা করা। সে যদি নিজেকে বদলানোর চেষ্টা না করে, তাহলে গুনাহগার হবে।

এ অবস্থানকে কোনো অর্থেই মেয়েলী আচরণের স্বীকৃতি বলা যায় না। মেয়েলী স্বভাবের পুরুষের আচরণকে মেনে নেয়া হয়নি, সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থান ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে যায়, পক্ষে না।

তৃতীয়ত, 'জেন্ডার' একটা সাম্প্রতিক ধারণা। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট, অ্যাকাডেমিক, তাত্ত্বিক এবং মনোবিদ এই ধারণা তৈরি করেছে। তারা শারীরিক লিঙ্গ বনাম মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধের বিভাজনের তত্ত্ব হাজির করেছে। তারপর বলেছে, নারী ও পুরুষ পরিচয় সামাজিকভাবে নির্মিত। এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। এটা তাদের বানানো একটা তত্ত্ব কেবল।

জেন্ডার নামক এই ধারণা কুরআন, সুন্নাহ কিংবা ইসলামী ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ফকীহরা 'চারটি জেন্ডারের স্বীকৃতি দিয়েছেন' বলা নিরেট নির্বুদ্ধিতা। যে ধারণার জন্মই হয়েছে ৭০ বছর আগে, অতীতের ফকীহগণ কীভাবে সেটার স্বীকৃতি দেবেন? এখানে আধুনিক একটা ধারণা নিয়ে জোর করে সেটার অতীতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমরা জানি, ফিলিস্তিনের ওপর দাউদ ও সুলাইমান (আলাহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা শাসন করতেন মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী। কুরআনেও আল্লাহ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৫৩০] এ নিয়ে আলোচনা করেছেন মুফাসসির এবং ইতিহাসবিদরা।

মনে করুন, কোনো এক যায়োনিস্ট এসে বলা শুরু করলো, ফিলিস্তিন তো এক সময় ইসরাইল ছিল। তাই ফিলিস্তিনের মাটির মালিকানা আসলে ইহুদিদের। এই যে দেখো, তোমাদের আলিমরাই বলছে। তোমরা এখন ইসরাইলকে মেনে নাও। খুনসা ও মুখান্নাস সংক্রান্ত আলোচনা থেকে 'জেন্ডার' এর স্বীকৃতি আবিষ্কার করার ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম।

এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। কেউ যদি কোনো বিষয়ে ইসলামী শরীয়াহর অবস্থান নিয়ে কথা বলতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। তাফসীর করা, হুকুম ইস্তিম্বাত

---

[৫৩০] দেখুন সূরা সাদ, ২৬, এবং সূরা আল-বাকারাহ, ২৫১

করা, ইজতিহাদ করা শাস্ত্রীয় কাজ। যে কেউ হুট করে এটা করতে পারে না। কোনো একটা ওয়েবসাইটে বা গবেষণাপত্রে কেউ কিছু লিখেছে আর সেটাকে ইসলামের অবস্থান বলে চালিয়ে দেওয়া হবে, ব্যাপারটা এত সোজা না।

যারা বলতে চান ইসলাম ট্রান্সজেন্ডার অথবা চার জেন্ডারের স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের দাবির ভিত্তি কী? তাদের দলিল কী? শরীয়াহর উৎসগুলো ব্যাখ্যা আর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি কী? কীসের ভিত্তিতে তারা সুনির্দিষ্ট হাদীস অস্বীকার করছে? উপেক্ষা করছে মুসলিম আলিমদের চৌদ্দ শতকের অবস্থান? তাদের যোগ্যতাই বা কী? কেন আলিমগণের অবস্থান বাদ দিয়ে আমরা তাদের দাবি গ্রহণ করবো? বিশেষ করে তাদের অবস্থান যখন কুরআনের আয়াত, নবী ﷺ-এর হাদীস এবং সালাফুস সালিহীন এবং ইমামগণের অবস্থানের বিপরীত?

এই প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দেওয়ার আগে এসব 'ব্যাখ্যা' হাজির করা লোকেদের কথা পাত্তা দেওয়াই উচিৎ না।

৬। 'এগুলো আমি নিজের জন্য সঠিক মনে করি না, কিন্তু আরেকজনের অধিকার সমর্থন করি।'

এলজিবিটির পক্ষে এ ধরনের একটা কথা বেশ শোনা যায়। এ ধরনের অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় সহিষ্ণুতা, অধিকার, সম্প্রীতির মতো মুখোরোচক শব্দ ব্যবহার করে। এ ধরনের সব বক্তব্যের কথার্বাতার ব্যাপারে দুটি বিষয় বোঝা উচিৎ।

- এই অবস্থান যৌক্তিকভাবে অসংলগ্ন।
- এটি সেক্যুলারিসমের মৌলিক বক্তব্য, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

অসংলগ্নতা : কেউ যদি বলে, সে বিকৃত যৌনতাকে অন্যায় মনে করে, তাহলে সেখানে অধিকারের কথা বলার আর কোনো সুযোগ থাকে না।

- আমি 'ক' কাজকে অন্যায় মনে করি।
- কিন্তু আমি 'ক' কাজ এর বৈধতা চাই। অন্যের 'ক' কাজ করার 'অধিকার' চাই।

এই দুটি অবস্থান সাংঘর্ষিক। যদি 'ক' কাজ অন্যায় হয়, তাহলে আপনি সেটার 'বৈধতা' আর 'অধিকার' কীভাবে চাচ্ছেন? বৈধতা চাওয়ার অর্থই হলো আপনি সেটাকে আর অন্যায় বা অনৈতিক মনে করছেন না। আপনি মূলত বলছেন, আমি নিজে হয়তো এটা করবো না, কিন্তু আমি মনে করি এটি সমাজে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য কাজের সীমার ভেতরে পড়ে। শুধু তাই না, কেউ চাইলে যেন এমন করতে পারে তাও নিশ্চিত করা উচিৎ।

সেক্যুলারিসম : আধুনিকতা এবং সেক্যুলারিসম ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে

করে। সেক্যুলারিসমের অবস্থান হলো, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; বরং তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। ফরাসি চিন্তক ভলতেয়ারের নামে একটা বিখ্যাত উক্তি প্রচলিত আছে, 'আমি তোমার কথার সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য আমি জীবন দেবো।'

আমি নিজে অমুক কাজ করি না, কিন্তু আরেকজনের ঐ কাজ করার অধিকার সমর্থন করি—এটাকে ওপরের এই উক্তির একটা পরিবর্তিত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

এখানে যে অবস্থানটা ফুটে ওঠেছে, সেটা সেক্যুলারিসমের অন্যতম প্রধান বক্তব্য। সব বিশ্বাস, সব নৈতিকতা, সব স্বার্থের ওপর ব্যক্তির অধিকার আর স্বাধীনতা প্রাধান্য পাবে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, এই অবস্থান ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী নিজে বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিকৃতচারীদের সহায়তা করেছিলেন। এই জন্য তাকেও আযাবের স্বাদ পেতে হয়েছে।

ব্যক্তির সিদ্ধান্তে শাসক হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এটা নিছক একটা সেক্যুলার অবস্থান। শরীয়াহ অনুযায়ী শাসক জনপরিসরে ব্যক্তির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কেউ ঘরের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খেলো কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব শাসকের না। কিন্তু কেউ যদি রাস্তায় প্রকাশ্যে মদ খায়, তাহলে তাকে থামানো শাসকের দায়িত্ব।

তাছাড়া অবাধ ও বিকৃত যৌনতার প্রভাব পড়ে পুরো সমাজের ওপর। এর প্রচুর উদাহরণ আমরা এরইমধ্যে দেখেছি। ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ফলাফল শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখেও এ ধরনের 'অধিকার' সমর্থন করার কোনো সুযোগ থাকে না। মুসলিমদের মধ্যে যারা এ ধরনের কথা বলেন তারা আসলে বুঝে বা না-বুঝে সেক্যুলারিসমের অবস্থান প্রচার করছেন। তারা আধুনিক পশ্চিমের মূল্যবোধ শুষে নিয়েছেন।

ভেবে দেখুন, যারা এভাবে এলজিবিটির পক্ষে কথা বলেন তারা কি পশুকামিতা, অজাচার কিংবা মৃতদেহকামিতার পক্ষেও একই অবস্থান নেবেন? তারা কি বলবেন, আমি নিজে কখনো অজাচার করবো না। আমি নিজের জন্য এটাকে সঠিক মনে করি না। তবে কেউ অজাচার করতে চাইলে, আমি বাধা দিতে যাবো না?

না, তারা বলবেন না। যদিও হুবহু একই যুক্তি এখানেও দেওয়া যায়। কেন এলজিবিটির পক্ষে এই যুক্তি দিলেও অন্য ক্ষেত্রে তারা দেন না? কারণ, এলজিবিটি আন্দোলনকে পশ্চিমা বিশ্বে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের অবস্থানগুলো পশ্চিমা মূল্যবোধের অংশ হয়ে গেছে। তাই এলজিবিটি সংক্রান্ত বিকৃতি আর জঘন্যতার ব্যাপারে পশ্চিমের অনুকরণ করা এই মানুষদের বিবেক অবশ হয়ে

গেছে। অজাচারের ক্ষেত্রে এখনো সেটা হয়নি। তাই তারা প্রথমটার অধিকার সমর্থন করলেও পরেরটা করবেন না। পশ্চিমা চিন্তার অনুকরণকারীরা মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছেন, কিন্তু ঐ বুলির বাস্তবতা আর তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করছেন না।

৭। বিজ্ঞান বলেছে এটা ঠিক।

আধুনিকতায় বিজ্ঞানকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস মনে করা হয়। তাই যেকোনো বিষয়কে বৈধতা দেওয়ার সময় বিজ্ঞানের ডাক পড়ে। বিজ্ঞানীরা এক অর্থে আধুনিকতার পুরোহিতের মতো। যেকোনো কথার আগে 'বিজ্ঞানীরা বলেছেন', 'বিজ্ঞান বলেছে' বলে দিলেই সেটা এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়।

তবে বিজ্ঞান আসলে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। আমরা এরইমধ্যে দেখেছি, সমকামিতা জন্মগত হবার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পুরো মতবাদই গড়ে উঠেছে বাস্তব পৃথিবীকে উপেক্ষা করে কল্পনা আর অনুভূতিমগ্নতার মাধ্যমে। যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একেবারে বিপরীত বলা যায়। প্রতি পদে পদে এ মতবাদের সাথে বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের অবস্থানের দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

তবে এখানে আরেকটি বিষয় বোঝা জরুরি। বিজ্ঞান বাস্তবতার বর্ণনা দিতে পারে। বস্তুজগতে কী আছে, কোন প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে—এই ব্যাপারে কিছু তথ্য জানাতে পারে বিজ্ঞান। কিন্তু কী হওয়া উচিৎ, কী করা উচিৎ, তা বিজ্ঞান বলতে পারে না। ভালো-মন্দ, নৈতিকতা নিয়ে কোনো উপসংহার দেওয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞান রাখে না। পারমাণবিক বোমা কীভাবে বানাতে হয়, কোন বিক্রিয়া আর প্রক্রিয়াতে এই বোমা কাজ করে, বিজ্ঞান আপনাকে বলতে পারবে। কিন্তু এই বোমা বানানো উচিৎ কি না, এই বোমা ব্যবহার করা সঠিক কি না—তা বিজ্ঞান বলতে পারবে না।

এলজিবিটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হলো কিছু নির্দিষ্ট কাজ ও আচরণের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আর আইন বদলে দেওয়া। পরিচয়, পরিবার ও সমাজকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা। এগুলো বাস্তবতা, নৈতিকতা, মানবপ্রকৃতি, সমাজ ও শাসন নিয়ে প্রশ্ন। মৌলিক বিশ্বাসের প্রশ্ন। ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রশ্ন। বিজ্ঞানের এখানে তেমন কোনো কার্যকারিতা নেই।

কাজেই বিজ্ঞানীরা যদি কখনো এসে বলে, 'সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডারিসম এগুলো খুব ভালো জিনিস, খুব উপাদেয়। সবার এগুলো মেনে নেওয়া উচিৎ'—তাতেও এই কাজগুলোর নৈতিকতার প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। বরং সেটা হবে এমন এক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অনুপ্রবেশ, যেখানে তাদের শাস্ত্র অক্ষম। সহজ ভাষায় এটা হবে তাদের অযাচিত ও অযৌক্তিক মাতুব্বরি।

***

প্রিয় পাঠক, আমরা আমাদের গল্পের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। যে গল্প শুরু হয়েছিল দু'শো বছর আগে, উত্তর জার্মানির ছবির মতো সুন্দর এক গ্রামে, সেই গল্পের স্রোত আমাদের ঘুরিয়ে এনেছে বার্লিন-ব্যাবিলন শুরু করে স্যান ফ্র্যানসিসকোর নিয়ন অন্ধকারের বাথহাউস থেকে, ক্রুস আর ব্রেন্ডার গল্প থেকে শরীফ ও শরীফার গল্পে। বিচিত্র এ গল্পের স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে গেছে দর্শন, ইতিহাস আর বিশ্বাসের সুপ্রাচীন প্রান্তরে প্রান্তরে। অনেক কিছু দেখেছি আমরা, অতিক্রম করে এসেছি অনেক কিছু।

এবার গল্প শেষ করার পালা।

সভ্যতার ওপর সন্ধ্যা নামছে খুব গাঢ় হয়ে। গোধূলির ওপার থেকে উঠে আসছে প্রাগৈতিহাসিক এক আভা। ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে এখন তাকাবার পালা দিগন্তের দিকে।

***

অধ্যায় ২৭

অবক্ষয়কাল

গল্পটা সম্ভবত সবাই শুনেছেন।

টগবগে ফুটন্ত পানিতে জীবন্ত ব্যাঙ ছেড়ে দিলে সেটা পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু ব্যাঙটাকে যদি সাধারণ তাপমাত্রার পানিতে রেখে ধীরে ধীরে পানি গরম করা হয়?

এবার ব্যাঙ তার জায়গাতেই থাকবে। পালানোর চেষ্টা করবে না। খাপ খাইয়ে নেবে বাড়তে থাকা তাপমাত্রার সাথে। একসময় পানি ফুটতে শুরু করবে। কিন্তু তখন আর ব্যাঙ পালাতে পারবে না। অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে, সে আর লাফ দিতে পারছে না। পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে একসময় ব্যাঙটা জ্যান্ত ফ্রাই হয়ে যাবে।

ব্যাঙের ব্যাপারে এই গল্প কতটা সঠিক, তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। কিন্তু মানবসমাজের আচরণ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে রূপক হিসেবে গল্পটা বেশ মানানসই। মানব সভ্যতায় বারবার এই প্রবণতা দেখা যায়। গবেষক পিটার সেনজি তার বেস্টসেলিং বই 'দা ফিফথ ডিসিপ্লিন'-এ এই প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, লম্বা সময় ধরে চলা ছোট ছোট পরিবর্তনগুলোকে আমাদের মস্তিস্ক গুরুত্ব দিতে চায় না। হঠাৎ ঘটা বড়, শোরগোল তোলা সমস্যাগুলোই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক বড় পরিবর্তনের পেছনে পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থাকে, যা আমরা খেয়াল করি না।

আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এরকম একটা প্রক্রিয়া চলছে। বিকৃত যৌনতার উত্থান এবং আন্দোলন এই প্রক্রিয়ার অংশ। কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখার কারণে পুরো ছবিটা আমরা দেখছি না। আমরা বরং খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। যেভাবে ধীরে ধীরে গরম হতে থাকা পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেয় ব্যাঙ। আধুনিক সভ্যতায় চলা এই প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে বর্তমানকে আমাদের দেখতে হবে ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে।

ভবিষ্যৎবাণী

১৯৫৬ সালে *'দা অ্যামেরিকান সেক্স রেভ্যুলুশান'* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়।

লেখকের নাম পিটিরিম সরোকিন। রাশিয়ান বংশোদ্ভূত সরোকিন ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ভদ্রলোককে সমাজবিজ্ঞানে গত শতাব্দীর অন্যতম মহারথী মনে করা হয়।

সরোকিন তার এই বইতে মার্কিন সমাজ নিয়ে বেশ কিছু পূর্বাভাস দেন। খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেন, অ্যামেরিকার সমাজ খুব দ্রুত নৈরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। আর এর প্রধান কারণ হবে, যৌনতার ব্যাপারে মার্কিন সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন। বই প্রকাশের বছরটা আবার খেয়াল করুন। ১৯৫৬। সরোকিন কথাগুলো বলেছিলেন অ্যামেরিকাতে যৌন বিপ্লব শুরু হবার আগে। নিজের সমাজের ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

> মার্কিন সমাজ যৌনতা নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে...আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায় যৌনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে...যৌনতার ক্রমবর্ধমান জোয়ার আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে।[৫৩১]

সরোকিনের বিশ্বাস ছিল, মার্কিন সমাজ এমন এক যৌন বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, যা সমাজের মূল্যবোধের কাঠামো আমূল বদলে দেবে। এর ফলে হুমকির মুখে পড়বে পুরো সমাজের অস্তিত্ব। যৌন নৈরাজ্যের হাত ধরে আসবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য। বাকিরা যখন স্বাধীনতা, প্রগতি আর অধিকারের বুলি আওড়াচ্ছিল, সেই সময়ে ঐতিহাসিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে দিগন্তে গভীর বিপর্যয় দেখতে পেয়েছিলেন সরোকিন। মার্কিন জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিলেন,

> যৌন নৈরাজ্যের প্রতি আমাদের প্রবণতা এখনো ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরিণতি তৈরি করেনি। তবে, এক মারাত্মক রোগের প্রথম উপসর্গগুলো এরই মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে।[৫৩২]

মারাত্মক এই রোগের ফলাফল কী হতে পারে, তাও বিস্তারিত লিখেছিলেন সরোকিন। তার ধারণা ছিল, আসন্ন যৌন বিপ্লবের ফলে সমাজে চেইন রিয়্যাকশনের মতো কিছু ব্যাপার ঘটবে। প্রথমে, নারীর ক্ষমতায়নের নামে ঘর থেকে স্থায়ীভাবে বেড়িয়ে পড়বে গৃহিনীরা। তারপর তারা পরকীয়ায় জড়াবে। ধীরে ধীরে পোশাক শালীন থেকে অশালীন হতে থাকবে, ক্রমশ উন্মুক্ত হবে ঢেকে রাখা দেহগুলো।[৫৩৩] বাড়বে বিবাহপূর্ব এবং বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা। পরিবার দুর্বল হবে, ডিভোর্স বাড়বে। নারী পুরুষালী হয়ে উঠবে, আর পুরুষরা মেয়েলী হতে থাকবে। ধর্মহীনতা, অশ্লীলতা, পতিতাবৃত্তি বাড়বে। যৌনতার ব্যাপারে 'উদার' দৃষ্টিভঙ্গির হাত ধরে আসবে যৌন

---

[৫৩১] Sorokin, Pitirim Alexandrovitch. "The American sex revolution." (1956). 19
[৫৩২] Ibid, p 132-133
[৫৩৩] Ibid., p. 95.

বিকৃতি। প্রথম দিকে অবক্ষয়ের প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেবে অভিজাত শ্রেণি। তারপর তা ছড়িয়ে পড়বে পুরো সমাজে। একসময় এগুলো সমাজের কাছে স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করবে।[৫৩৪]

যৌনতা যত অবাধ হবে, ততই দুর্বল হবে সামাজিক মূল্যবোধ। ভোগবাদ, লাম্পট্য, কামুকতার প্রভাবে বিয়ে আর পরিবারের মতো ব্যাপারগুলো মানুষের কাছে বোঝা মনে হবে। নৈতিকতা আর মূল্যবোধকে মনে হবে অপ্রাসঙ্গিক বা আপেক্ষিক। আক্রান্ত হবে নারীত্ব, পুরুষত্ব, পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের সংজ্ঞাও। খেয়ালখুশি মতো এগুলো বদলাতে চাইবে মানুষ।[৫৩৫] একই ব্যাপার ঘটবে সম্মান, মর্যাদা, ধর্ম এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রেও। ধর্ম যেহেতু সংযমের কথা বলে, তাই ধর্মকে আক্রমণ করা হবে। যৌন সংযমের নৈতিকতাকে দেখা হবে পশ্চাৎপদ, অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিক, নির্বুদ্ধিতা, কিংবা জঘন্য ধ্যানধারণা হিসেবে।[৫৩৬]

নৈতিকতা ক্রমশ যৌনতাকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। যৌনতা গ্রাস করে নেবে সমাজ ও জীবনের সব অক্ষকে। সমাজের মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং সবশেষে প্রতিষ্ঠান, একে একে ধ্বসে পড়বে সবই। জীবনের ব্যাপারে, পৃথিবীর ব্যাপারে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাবে। পালটে যাবে সমাজ, বিজ্ঞান এমনকি সৌন্দর্যের ব্যাপারে ধারণাও।[৫৩৭] মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞানের মতো শাস্ত্রগুলোকে দখল করে নেবে যৌনতাকেন্দ্রিক দর্শন। এমনকি শিশুদেরও দেওয়া হবে অবাধ যৌনতার শিক্ষা।[৫৩৮]

এক থেকে দুই প্রজন্মের মধ্যে জন্মহার কমতে শুরু করবে। যৌন উন্মাদনায় মগ্ন মানুষ সন্তান জন্ম দেওয়া আর লালনপালনের দায়িত্ব নিতে চাইবে না। গর্ভপাত, জন্মবিরতিকরণ, যৌনরোগসহ নানা কারণে সমাজের জন্মহার কমে যাবে নাটকীয়ভাবে। ইতিহাসে অনেকবার এর দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, এভাবেই লাম্পট্য আর বিকৃতির মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজপরিবার।[৫৩৯]

অবাধ যৌনতা নিয়ে আসবে মানসিক আর আধ্যাত্মিক রোগ। সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে নানা রকমের বাতিক, বিকার, আর মানসিক ব্যাধি। ক্রমাগত শরীরী সুখের পেছনে ছুটে চলার জীবন তৈরি করবে অস্থিরতা। একের পর এক নৈতিক স্খলন সেই অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুলবে। ভোগবাদে মগ্ন হয়ে ক্রমেই অবশ আর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে মানুষ। ভোতা হয়ে আসবে অনুভূতি, ভালো-মন্দের বোধ। সমাজের

[৫৩৪] Ibid., pp. 100–101.
[৫৩৫] Ibid., p. 89.
[৫৩৬] Ibid., p. 44.
[৫৩৭] Ibid., p. 15.
[৫৩৮] Ibid., p. 53.
[৫৩৯] Ibid., p. 79

ওপর চেপে বসবে স্থবিরতা আর আলস্যের চাদর। সৃজনশীলতা আর জীবনীশক্তি উবে যাবে। ক্ষয় হতে থাকবে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা। শরীরের সুখে মত্ত মানুষ ভরণপোষণের আশা করবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে।[৫৪০]

অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হবার তিন প্রজন্মের মধ্যে পতনের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে সমাজ।

বাস্তবতা

পিটরিম সরোকিনের হুশিয়ারি তার সমাজ আমলে নেয়নি। কিন্তু ইতিহাস তার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। প্রায় সত্তর বছর পর আজ তার অধিকাংশ ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সরোকিনের পূর্বাভাসগুলোর সাথে আজকের পশ্চিমের ছবিটা মিলিয়ে নিন,

> '...ক্ষয় হতে হতে অ্যামেরিকার অধিকাংশ পরিবার আজ ফাঁপা খোলসে পরিণত হয়েছে। অ্যামেরিকায় জন্ম হওয়া মোট শিশুর প্রায় ৪১%-ই আক্ষরিক অর্থে জারজ। যেসব ক্ষেত্রে বিয়ের পর বাচ্চা হচ্ছে, সেই বিয়েগুলোরও বড় একটা অংশ টিকছে না। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রতি ৪ জনে ১ জনের ঘরে বাবা নেই। আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি, ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬৫ জনের ঘরেই বাবা নেই।
>
> বাবাকে ছাড়া বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের অস্থিরতা আর অসুখ। বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের অপরাধে জড়িত হবার প্রবণতা বেশি থাকে... গবেষণার পর গবেষণা জানাচ্ছে—মাদক, খুন, ম্যাস কিলিং, সিরিয়াল কিলিং, ধর্ষন, মাস্তানি, গ্যাংবাজি করা এবং বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ভোগা মানুষদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য কমন–তাদের ঘরে বাবা নেই, তাদের বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে।
>
> ... করোনার সময় অ্যামেরিকাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে বৃদ্ধাশ্রমে। ছোটবেলায় কোলেপিঠে করে মানুষ করা বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথবা বৃদ্ধ বাবা-মা কোনোমতে একা ফ্ল্যাটে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরের কোণে পড়ে থাকছে তাদের বিস্মৃত জীবনের বিস্মৃত লাশ।
>
> ...একটা সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেই সমাজের পরিবারগুলোতে কমসেকম গড়ে ২.১ জন সন্তান থাকতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জন্মহার গড়ে ১.৬। কানাডা আর অ্যামেরিকাতে জন্মহার ঘোরাফেরা করে ১.৩ থেকে ১.৮ এর মাঝে। প্রায় সবগুলো উন্নত দেশে

[৫৪০] Ibid., p. 95.

জনসংখ্যার হার এমন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও তাদেরকে অনুসরণ করছে। বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেট-এ এক গবেষণাতে বলা হচ্ছে ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জন্মহার নেমে আসবে ১.৭-এ!

...CDC এর ডাটা বলছে ২০২০ সালে অ্যামেরিকাতে ৯ লাখ ৩০ হাজার ১৬০টি গর্ভপাত হয়েছে। যার ৯% করেছে ১৩-১৯ বছর বয়সীরাই। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে, গর্ভপাত করা নারীদের শতকরা ৮৫ ভাগই অবিবাহিত। ১৯৭৩ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দেবার পর গত ৪৭ বছরে কেবলমাত্র অ্যামেরিকাতেই ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে।

...যৌনরোগ, গর্ভপাত, বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, পর্ন-আসক্তি, খুনোখুনি, সহিংসতা আগের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ভয়াবহ মাত্রায় হতাশা আর বিষণ্ণতায় ভুগছে তারা। আত্মহত্যার হার তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। প্রতি ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। অ্যামেরিকার টিনেজারদের মৃত্যুর দুই নম্বর কারণই হচ্ছে সুইসাইড! প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানের ১ জন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের প্রতি ৫ জনে একজন মনোযাতনায় ভুগছে।!

...পশ্চিমে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তরুণ-তরুণীরা ক্ষুব্ধ, একা। ওরা বিভ্রান্তিতে ভুগছে আত্মপরিচয়, নিজের দেহ, পৃথিবীতে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা—সবকিছু নিয়েই। নারীর দেহে আটকা পড়া পুরুষ, পুরুষের দেহে আটকা পড়া নারী, মানুষের দেহে আটকা পড়া পশু—এমন হাস্যকর সব বিভ্রান্তিতে দিন পার করছে ওরা।

পতনোন্মুখ সভ্যতায় যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে, দেখা যাচ্ছে তার সবকটিই।[৫৪১]

আর যৌন বিকৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে কী হয়েছে, তার ফিরিস্তি তো আমরা জানিই।

অবিশ্বাস্য মাত্রায় বাস্তবতার সাথে মিলে গেছে সরোকিনের ভবিষ্যৎবাণী। তবে পিটিরিম সরোকিন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন না। জাদুর কোনো আয়না ছিল না তার কাছে। তিনি কেবল অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, ইতিহাসের চেনা ছকের আলোকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতের চেহারা। সরোকিনের পূর্বাভাসগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করে, তার ধারণা সঠিক ছিল। কিন্তু কী ছিল তার ধারণার ভিত্তি?

---

[৫৪১] লস্ট মডেস্টি, আকাশের ওপারে আকাশ, ২০২২। ইলমহাউস পাবলিকেশন। উদ্ধৃত অংশের সবগুলো তথ্যের সূত্র পাবেন এখানে, https://chintaporadh.com/sexrev-results/

যৌনতা ও পতন

সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলোজিস্ট জৌসেফ ড্যানিয়েল আনউইন ৫,০০০ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ৮৬টি আদিম গোত্র এবং ৬টি সভ্যতার ওপর এক পর্যালোচনা করেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত *Sex & Culture* বইতে দীর্ঘ এ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন সভ্যতা ও সেগুলোর পতনে আনউইন দেখতে পান একটা স্পষ্ট প্যাটার্ন। কোনো সভ্যতার বিকাশ সেই সভ্যতার যৌনসংযমের সাথে সম্পর্কিত। যৌনতার ব্যাপারে কোনো সমাজ যত বেশি সংযমী হবে, বিকাশ ও অগ্রগতির হার তত বৃদ্ধি পাবে। সহজ ভাষায় বললে, সভ্যতার বিকাশের জন্য যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

আনউইন আবিষ্কার করলেন, সুমেরিয়, ব্যাবলনীয়, গ্রিক, রোমান, অ্যাংলো-স্যাক্সনসহ প্রতিটি সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে এমন সময়ে, যখন যৌনতার ব্যাপারে সংযম ও নৈতিকতাকে কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। কিন্তু উন্নতির সাথে সাথে প্রতিটি সভ্যতায় শুরু হয় অবক্ষয়। সফলতা পাবার পর সভ্যতাগুলো নিজেদের নৈতিকতা হারাতে শুরু করে। ক্রমেই 'উদার' হতে থাকে যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি। বিকৃত যৌনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সমাজ সেগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের সাথে সাথে কমতে থাকে সমাজের মানুষের সংহতি, দৃঢ়তা ও স্পৃহা। একবার শুরু হয়ে গেলে আর থামানো যায় না অবক্ষয়ের সিলসিলা। এই অবস্থায় পৌঁছবার পর সভ্যতার পতন ঘটে দুটি উপায়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে—অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অথবা আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ। আনউইন উপসংহার টানেন,

> 'যেকোনো সমাজকে সামাজিক শক্তি অথবা যৌন স্বাধীনতার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। আর এর পক্ষে প্রমাণ হলো, কোনো সমাজ এক প্রজন্মের বেশি এ দুটো একসাথে চালিয়ে যেতে পারে না।'[৫৪২]

আনউইনের মতে, ৫,০০০ বছরের ইতিহাসজুড়ে, প্রতিটি সভ্যতা ও সমাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। আনউইনের মতো সরোকিনও মনে করতেন, সভ্যতার সাথে গভীর সম্পর্ক আছে যৌন সংযমের। যখন থেকে যৌনতার ব্যাপারে কোনো সভ্যতার মূল্যবোধের বাঁধন আলগা হতে শুরু করে, তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় সভ্যতার পতনের প্রক্রিয়া।

সভ্যতার জীবনচক্র

আনউইনের বিশ্লেষণ ছিল অতীত নিয়ে। সরোকিনের পূর্বাভাস ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু দুজনের চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল এক। ইতিহাসের গতিপথের ব্যাপারে অভিন্ন

---

[৫৪২] Unwin, Joseph Daniel. Sex and culture. Oxford University Press, H. Milford, 1934.

দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের। আধুনিক সভ্যতা নিরন্তর প্রগতিতে বিশ্বাসী। ইতিহাসের ব্যাপারে আধুনিক মানুষের অবস্থান হলো, এই সভ্যতা মানব উৎকর্ষের শিখর, মানবইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়। উন্নয়ন, প্রগতি আর বিকাশের এই ধারা চলতে থাকবে অবিরত। সবাই মুখে স্বীকার না করলেও এরকম অবস্থানের ওপর এক ধরনের ঐকমত্য আছে আধুনিকতার মধ্যে। এ কারণেই অতীতকে আমরা খুব সহজে উপেক্ষা করি। অতীতের শিক্ষাগুলো আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে।

তবে ইতিহাসের ব্যাপারে বিকল্প একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যেখানে মন ভালো করে দেওয়া বুলির বদলে তাকানো হয় অতীত সভ্যতার উত্থানপতনের কার্যকরণের দিকে। অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করা হয়। এই ধারার ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে সরলরৈখিক মনে করেন না। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ হিসেবে দেখেন না তারা। তাদের মতে ইতিহাস চক্রাকার। প্রত্যেক সভ্যতায় একই ধরনের কিছু প্রবণতা আর ছক ফিরে ফিরে আসে। তবে পরিস্থিতি আর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী একেক সভ্যতায় সেগুলোর প্রকাশ ঘটে একেকভাবে।

চোখ বন্ধ করে একটা বিশাল নদী কল্পনা করুন। যে নদী পাক খেতে খেতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সে সরলরেখায় আগায় না, আবার বৃত্তের মতো এক জায়গায় ঘুরতে থাকে না। তার গতিপথ অনেকটা স্প্রিংয়ের মতো। ইতিহাস এই নদীর মতো। প্রতি অধ্যায়ে নাম বদলায়, চরিত্র বদলায়, বদলায় নানা খুঁটিনাটি। কিন্তু সভ্যতায় একই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি হয়। এই হলো চক্রাকার ইতিহাসের তত্ত্ব।

জৌসেফ আনউইন এবং পিটিরিম সরোকিন দুজনেই এভাবে ইতিহাসকে দেখতেন। শুধু তারা নন ইতিহাসের ব্যাপারে কাছাকাছি ধরনের বিশ্লেষণ এনেছেন অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার, আরনল্ড টয়েনবি, পিটার টারচিনসহ আরও অনেকে।[৫৪৩] তবে এই ধারার ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবার প্রথমে আসে ইবনু খালদুনের নাম। পরবর্তী সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার বিশ্লেষণ থেকে প্রভাবিত হয়েছেন কোনো-না-কোনো মাত্রায়।

সংক্ষেপে ইতিহাসের ব্যাপারে ইবনু খালদুনের মত হলো, সূচনার পর প্রত্যেক সভ্যতা বা সাম্রাজ্য ধাপে ধাপে বিকাশের একটি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়, তারপর স্থবিরতা জেকে বসে। স্থবিরতার পর আসে অবনতি। একসময় সেই সভ্যতার পতন

[৫৪৩] দেখুন অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলারের The decline of the West, আরনল্ড টয়েনবির A Study of History, পিটিরিম সরোকিনের The Crisis of Our Age, টয়েনবির ব্যাপারে সরোকিনের মূল্যায়ন, Arnold J. Toynbee's Philosophy of History। পিটার টারচিনের Historical Dynamics: Why States Rise and Fall, Figuring Out the Past;এবং টারচিনের উদ্যোগে সভ্যতার জীবনচক্র নিয়ে গবেষনার জন্য প্রতিষ্ঠিত জার্নাল, Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution। একই ধরনের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করছেন জ্যাক গোল্ডস্টোন, লিওনিদ্ গ্রিনিন, আন্দ্রেই কোরোতায়েভসহ আরও অনেকে।

ঘটে। ইতিহাসের মঞ্চ প্রস্তুত হয় নতুন কোনো সভ্যতার উত্থানের জন্য। এভাবে বারবার উত্থানপতনের চক্র চলতে থাকে। প্রত্যেক সাম্রাজ্য কিংবা সভ্যতা নির্দিষ্ট কিছু পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। সভ্যতার পালাবদলের এই পর্যায়গুলোকে মোটাদাগে ৭টি পর্যায়ের ভাগ করা যায়,[৫৪৪]

১. পথিকৃৎদের উত্থান
২. সামরিক প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি
৩. বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিস্তৃতি
৪. সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য
৫. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে উৎকর্ষ
৬. অবক্ষয়
৭. পতন

শুরুটা হয় একদল পথিকৃতের মাধ্যমে। তাদের মধ্য কাজ করে শক্তিশালী সামাজিক সংহতি এবং সামষ্টিক পরিচয়ের অনুভূতি (আসাবিয়্যাহ)। এই সংহতির ভিত্তি হতে পারে গোত্র বা জাতিগত পরিচয়, কোনো মতাদর্শ কিংবা দ্বীন। তাদের বুকের ভেতর আগুন থাকে, চোখে থাকে স্বপ্ন। তারা যুদ্ধংদেহী, কষ্টসহিষ্ণু, বেপরোয়া। নিজেদের বন্ধন আর লড়াকু মনোভাবকে পুঁজি করে পথিকৃৎরা ঐক্যবদ্ধ হয়। অস্তিত্ব রক্ষার তাড়না, যুদ্ধজয়ের স্পৃহা আর অস্ত্রের শক্তির মাধ্যমে গোড়াপত্তন করে সভ্যতার।

সামরিক প্রতিষ্ঠার পর আসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। শত্রুর আক্রমণ থেকে নিশ্চিন্ত হবার পর শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়। তখন শুরু হয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিস্তৃতি। বাড়ে স্বচ্ছলতা, সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্য। মানুষ তখন মনোযোগী হয়ে উঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিল্পচর্চায়। এ সময় সভ্যতা বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ঠিক তারপর ঘটে ছন্দপতন। প্রথমে স্থবিরতা দেখা দেয়। সভ্যতা তার অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। আত্মপরিচয়ের ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে তাদের সংহতি। নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়। ভাঙন ধরে সমাজে। পতনের ঠিক আগে প্রত্যেক সভ্যতা তীব্র অবক্ষয়ের একটা পর্যায় অতিক্রম করে। যে পর্যায়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যৌন নৈরাজ্য আর যৌন বিকৃতি। আর তারপর আসে পতন।

অবক্ষয়েরকালের আলোচনা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। কেবল প্রাসঙ্গিক না, অত্যন্ত জরুরি। কারণ, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা এখন এই পর্যায় পার করছে। এলজিবিটি আন্দোলন ও এর প্রসার এই অবক্ষয়েরই নিদর্শন। এটাই এই আন্দোলনের

[৫৪৪] ইবনু খালদুন নিজে উত্থান ও পতনের চক্রকে ৭টি পর্যায় ভাগ করেননি। তার আলোচনার আলোকে [illegible] গবেষকদের কেউ চার ভাগে, কেউ পাঁচ ভাগে আবার কেউ সাত ভাগে এই প্রক্রিয়াকে ভাগ করেছেন।

সভ্যতাগত তাৎপর্য। পঞ্চাশের দশকেই সরোকিন বুঝতে পারছিলেন এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

নৈরাজ্য

পিটরিম সরোকিন পূর্বাভাস করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তার প্রায় পাঁচ দশক পর একই রকমের উপসংহারে পৌঁছেছেন লেসবিয়ান ফেমিনিস্ট গবেষক ক্যামিল পা'লিয়া। পশ্চিমা সভ্যতার শিল্পের ইতিহাসে অবক্ষয়–বিশেষ ভাবে যৌন অবক্ষয় নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর সভ্যতার অবক্ষয়কালের সাথে বিকৃত যৌনতা আর নারী-পুরুষের বিভেদ মুছে দেওয়ার প্রবণতার গভীর সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন তিনি। পা'লিয়ার মতে এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় প্রত্যেক বড় বড় সভ্যতার মধ্যে।

সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষত্ব এবং পরিবারকে মহিমান্বিত করা হয়। অবক্ষয়ের পর্যায়ে মহিমান্বিত করা হয় যৌন বিকৃতিকে। বিস্ফোরণ ঘটে সমকামিতা, উভকামিতা, অজাচার, পশুকামিতা, স্যাইডোম্যাসোকিযম, বন্ডেজ, জেন্ডার গেইমসসহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির। বিকৃত আচরণগুলো অর্জন করে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। বিকৃত যৌনাচারের পাশাপাশি নারী-পুরুষের বিভেদ মুছে দেওয়ার অদ্ভুত প্রবণতা দেখা দেয় অবক্ষয়কালে। সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে পুরুষত্বের বদলে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। রোমান সভ্যতার শুরুর দিকের ভাস্কর্যগুলো যুদ্ধংদেহী, অ্যালফা-মেইল (Alpha Male)। শেষের দিকে আঁকাবাঁকাভাবে দাঁড়ানো মেয়েলী ডেইভিডদের জয়জয়কার।

কিন্তু ঐ সভ্যতার মানুষ এগুলোকে অবক্ষয় ও পতনের চিহ্ন হিসেবে দেখে না; তাদের কাছে এগুলোকে মনে হয় নিজেদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। অভিজাত মুক্তচিন্তা। যৌনতার ব্যাপারে এমন মুক্তবাজারি দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা সংজ্ঞায়িত করে প্রগতি আর উন্নতির নামে। এটাকেই তারা মনে করে সভ্যতার মাপকাঠি।

কিন্তু ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে দেখা যায়, এই সভ্যতা নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। নিজ শরীর ও সত্তার ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে সভ্যতার নাগরিকেরা। আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়ে নিজের পুরুষত্বকে প্রশ্ন করছে, প্রশ্ন করছে নিজের পরিচয়কে। যা কিছুর মাধ্যমে সভ্যতা একসময় মাহাত্ম্য অর্জন করেছিল, তার সাথে সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে অবক্ষয়কালের মানুষ।

পশ্চিমের বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে কথাগুলো খাপে খাপে মিলে যায়। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সব বাঁধন খুলে ফেলে যৌনতাকে দিয়েছে মানুষের ওপর অনিয়ন্ত্রিত রাজত্ব। ফলে যৌন নৈরাজ্য থেকে জন্ম নিয়েছে সামাজিক নৈরাজ্য।

ডায়োনাইসাস এবং বিপ্লব

আধুনিকতার এই যৌন নৈরাজ্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চমকপ্রদ একটা আলোচনা এনেছেন পা'লিয়া। তার মতে, যৌন বিপ্লব আসলে ছিল খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের ওপর পৌত্তলিকতার বিজয়ের চিহ্ন। মধ্যযুগে ইউরোপের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল ক্যাথলিক চার্চের। এক অর্থে ক্যাথলিক চার্চই আধুনিক পশ্চিমের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছিল। কিন্তু গ্রিক ও রোমান সভ্যতার শিরকি মূল্যবোধ আর সংস্কৃতিকে তারা পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে পারেনি। চার্চের দৌরাত্ম্যে কয়েক শতাব্দীর জন্য গা ঢাকা দিয়েছিল পৌত্তলিকতা। অনেকে ক্ষেত্রে খ্রিষ্টবাদের মধ্যে নিজেকে গেঁথে নিয়েছিল গোপনে। কিন্তু রেনেসাঁ এবং এনলাইটেনমেন্টের মাধ্যমে আবার তা পশ্চিমে ফিরে আসে মাথা উঁচু করে।

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী মদ, মত্ততা, উৎসব, উর্বরতা, নাটক আর উন্মাদনার দেবতা হলো ডায়োনাইসাস। আবেগ, কাম আর প্রবৃত্তি নিয়ে তার লেনদেন। ডায়োনাইসাস মদমত্ততা আর তীব্র আনন্দের প্রতীক। ডায়োনাইসাসের রোমান নাম ব্যাকাস। এই দেবতার সম্মানে প্রতি বছর ব্যাকান্যালিয়া নামে উৎসবের আয়োজন করতো রোমানরা। রাতের অন্ধকারের নারী-পুরুষ একত্রিত হতো। পূজার প্রধান প্রসাদ হিসেবে থাকতো মদ। পানির মতো মদ গিলত সবাই। তারপর বুনো সঙ্গীতের তালে তালে মেতে উঠতো উদ্দাম নাচে। একসময় সেই নাচ গিয়ে ঠেকতো অবাধ, উন্মত্ত, নেশাগ্রস্থ গণযৌনতায়।

ক্যামিল পা'লিয়ার মতে, যৌন বিপ্লবের চেতনার সাথে ডায়োনাইসাসের শিষ্যদের শিক্ষার অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। জীবন ও যৌনতার ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি আজ পশ্চিমে রাজত্ব করছে, তা গ্রিক আর রোমান সভ্যতার ধারাবাহিকতা। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা ডায়োনিসিয়।[৫৪৫]

পেন্ডুলাম

কিছুটা ভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ড. মালিক আল-বাদরির কাছ থেকে। সুদানের এই গবেষক ও মনোবিদকে আধুনিক সময়ে ইসলামী মনোবিজ্ঞানের পুরোধা মনে করা হয়। আধুনিকতার যৌন বিপ্লবের মাঝে গ্রিস আর রোমের প্রেতাত্মা খুঁজে পান মালিক বাদরি। তবে এর সাথে খ্রিষ্টবাদেরও একটা সম্পর্ক চিহ্নিত করেন তিনি।

মালিক বাদরির মতে, পশ্চিমের ইতিহাস প্রতিক্রিয়াশীলতার ইতিহাস। ওয়াহীর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সমাজের আচরণ প্রান্তিকতায় চলে যায়। প্রত্যেক প্রান্তিকতা জন্ম দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়ার। পেন্ডুলাম একবার এক দিকে হেলে,

---

[৫৪৫] Paglia, Camille. Sexual Personae: Art & Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. Vintage, 1991.

আরেকবার অন্য দিকে। অনেক সময় তীব্রতা ও চরমপন্থার দিক থেকে ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায় প্রতিক্রিয়া। এটাই বারবার ঘটছে পশ্চিমে।

যৌনতার ব্যাপারে গ্রিকরা ছিল অসংযত। প্রাচীন গ্রিসে বালক ও কিশোরদের সাথে মধ্যবয়স্ক পুরুষদের পায়ুকামী সম্পর্ক বা Pederasty প্রায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু ছিল। দার্শনিক প্লেটো তার রিপাবলিক ও ল'স রচনাতে বালককামিতা এবং সমকামিতার ব্যাপক প্রচলনকে গ্রিসের অধঃপতনের একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। গ্রিসদের কাছ থেকে অবাধ যৌনতার এই মনোভাব গ্রহণ করে রোমানরা। তবে তারা একে নিয়ে যায় আরও চরম পর্যায়ে। যৌন আচরণের কোনো নিয়ন্ত্রণ কিংবা সীমানা রোমান সমাজে ছিল না। রোমান সম্রাটরা নিয়মিত লিপ্ত হতো মদমত্ত গণযৌনতায়। অন্যদেরও উৎসাহিত করত।

সম্রাট ক্যালিগুলা তার প্রাসাদকে আক্ষরিক অর্থে গণিকালয় বানিয়ে ফেলেছিল। তার আয়োজিত উৎসবগুলো ছিল যৌন বিকৃতির আসর। সেখানে পশুর সাথেও চলতো যৌনসঙ্গম। নিজের বোনদের সাথে অজাচারে লিপ্ত হতো ক্যালিগুলা।[৫৪৬] জঘন্য সব প্রবণতা ছিল অন্য রোমান সম্রাটের মধ্যেও। নবজাতক শিশুদের যৌন কাজে ব্যবহার করতো সম্রাট টাইবেরিয়াস।[৫৪৭] কুখ্যাত নিরো ছিল অজাচারী এবং উভকামী। রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে একাধিক পুরুষের সাথে 'বিয়ে বসেছিল' সে।[৫৪৮] আরেক কুখ্যাত রোমান সম্রাট এলগ্যাব্যালুস সমকামিতার পাশাপাশি নিয়মিত যৌনাচার করতো পশুর সাথে।[৫৪৯] অনেকের মতে, খোদ জুলিয়াস সিযারও ছিল উভকামী।[৫৫০]

অশ্লীলতা আর বিকৃতি মিশে গিয়েছিল পুরো সমাজেই। রোমের অভিজাত শ্রেণি নানা উৎসবের উসিলায় নিয়মিত গণযৌনতায় লিপ্ত হতো। সমকামিতা, বালককামিতা, পুরুষপতিতা ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সফরে বের হওয়া অভিজাতদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাস্তার পাশে সরাইখানার মতো সাজানো থাকত পতিতালয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় ক্যাথলিক চার্চ। রোমানদের সীমালঙ্ঘন ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অবাধ যৌনতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্যাথলিক চার্চ চলে যায় আরেক প্রান্তিক অবস্থানে।

---

[৫৪৬] Rathus, S.A. (1983). Human sexuality. New York, NY: Holt, Rinehart & Winston. (Rathus, 1983, p. 9).

[৫৪৭] PBS - Tiberius. https://tinyurl.com/mhb926td

[৫৪৮] Live Science – Emperor Nero: Facts & Biography. Walker, Cayce. "The Reign of Nero: A Delusional Journey to Suicide." (2020).

[৫৪৯] Encyclopedia Britannica – Elagabalus, Roman Emperor

[৫৫০] Suetonius. The Lives of the Twelve Caesars

ক্যাথলিক খ্রিষ্টবাদ আদি পাপের কথা শেখায়। তাদের বক্তব্য: আদম আর হাওয়া (আলাইহিমুস সালাম) জান্নাতে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে পাপ করেছিল। পুরো মানবজাতি আজও সেই পাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। আর আদি পাপ যেহেতু পুরো মানবজাতির মাঝে ছড়িয়েছে প্রজনন আর বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে, তাই যৌনকামনা এবং কর্ম, দুটোই প্রকৃতিগতভাবে পাপের সাথে যুক্ত।[৫৫১] অর্থাৎ যৌনতা মাত্রই মন্দ এবং ঘৃণ্য। খ্রিস্টবাদের রূপকার পল শুরু থেকেই সব ধরনের যৌনতা থেকে বিরত থাকা তথা সন্যাসব্রতের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। বিয়ে ছিল ব্যভিচারের তুলনায় মন্দের ভালো।[৫৫২]

পলের পর যৌনতার ব্যাপারে খ্রিস্টধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে অগাস্টিন এবং অ্যাকুইনাসের চিন্তা।[৫৫৩] দুজনের চোখেই যৌনতা ছিল যাবতীয় অকল্যাণ আর খারাবির উৎস। অগাস্টিনের মতে, যৌন আকাঙ্ক্ষা আদি পাপের অংশ। শুধুমাত্র বংশবিস্তারের স্বার্থে বাধ্য হয়ে যৌনতাকে তারা মেনে নিয়েছিল।[৫৫৪] অর্থাৎ যৌনতার একমাত্র বৈধ কারণ প্রজনন। আনন্দের জন্য নিজের স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক করাটাও ছিল 'সন্দেহজনক'। এমনও সময় ছিল যখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 'মাত্রাতিরিক্ত' ভালোবাসাকে ক্যাথলিক চার্চে নেতিবাচকভাবে দেখা হতো। সেইন্ট জেরোম নামের এক সন্ত বলেছিল, যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে 'অতি উদগ্রীবভাবে' ("too ardently") ভালোবাসে, সে ব্যভিচারী। ১৯৮০ সালেও পোপ দ্বিতীয় জন পল এই অবস্থানকে সমর্থন করেছে।[৫৫৫] লক্ষ্য করুন, যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান একেবারেই আলাদা। আদি পাপেরও কোন ধারনাও ইসলামে নেই।[৫৫৬]

মানবপ্রকৃতি এবং যৌনতার ব্যাপারে ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি পুরো ইউরোপেজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রভাব বিস্তার করে। যেভাবে রোমান সভ্যতার সীমালঙ্ঘন ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে চার্চের প্রান্তিক অবস্থান জন্ম দেয় আরেক চরম প্রতিক্রিয়ার। চার্চের অত্যাচারে ত্যাক্ত-

---

[৫৫১] Augustine, Saint. The confessions. Clark, 1876.

[৫৫২] Ibid, p. 248

[৫৫৩] সেইন্ট অগাস্টিন (মৃত্যু: ৪৩০) বা Augustine of Hippo প্রাচীন যুগের খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ, গীর্জা পদ্ধতির লাতিন জনকদের একজন। এবং সম্ভবত সন্ত পল-এর পরেই খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। ইংরেজভাষীদের কাছে তিনি সেইন্ট অগাস্টিন নামে পরিচিত, বাংলায় তাকে সাধু অগাস্টিন বলা হয়।
সেইন্ট টমাস আকুইনাস (মৃত্যু: ১২৭৪) একজন ক্যাথলিক ধর্মবেত্তা এবং সন্নাসীপন্থী যাজক। মধ্যযুগে পশ্চিমা রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের প্রধান ব্যাখ্যাদাতা। তার রচনার মধ্যে সুমমা থিওলজিকা বিখ্যাত। অ্যাকুইনাস অ্যারিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন।

[৫৫৪] Fromer, M.J. (1983). Ethical issues in sexuality and reproduction. St Louis: C.V. Mosby.

[৫৫৫] Rathus. Human sexuality.

[৫৫৬] দেখুন, What Does Islam Say About Redemption? https://islamqa.info/en/answers/42573/what-does-islam-say-about-redemption

বিরক্ত ইউরোপ যখন সেক্যুলার হয়ে উঠতে শুরু করে, তখন তারা গ্রিস আর রোমের সংস্কৃতিতে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা বোধ করে।

রেনেসাঁর সময় প্রাচীন গ্রিক দর্শন, সংস্কৃতি আর রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করে ইউরোপ। তারা একে দেখে চার্চের অধীনে 'অন্ধকার যুগের' পর ইউরোপের পুনর্জন্ম হিসেবে। রেনেসাঁ থেকে জন্ম হয় এনলাইটেনমেন্টের। মানবীয় বিচার বুদ্ধিকে এনলাইটেনমেন্ট পরম বিচারকের আসনে বসায়। জন্ম হয় সেক্যুলার হিউম্যানিসমের। আজ অবাধ যৌনতা থেকে শুরু করে সমকামিতা আর 'লিঙ্গ পরিবর্তন'-এর মতো যতসব বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ হয়েছে, তার সবকিছুর দার্শনিক, নৈতিক ও আইনি ভিত্তি গড়ে উঠেছে সেক্যুলার হিউম্যানিসমের দর্শনের ওপর।

আধুনিক পশ্চিম তার আত্মপরিচয়ের শেকড় খুঁজে পায় গ্রিক আর রোমান সভ্যতায়। একইসাথে ধর্মের ব্যাপারে শিথিলতা আর যৌনতার ব্যাপারে 'উদারতা'র ক্ষেত্রেও গ্রিক আর রোমানদের অনুসরণ করে তারা। অ্যামেরিকান পাঠ্যবইগুলোতে গর্বের সাথে বলা হয়, গ্রিক সমাজে সমকামিতা স্বাভাবিক ছিল। এতটাই স্বাভাবিক ছিল যে, সমকামিতাকে বলা হতো 'গ্রিক যৌনতা'। অর্থাৎ গ্রিক ও রোমান সভ্যতা কেবল সেক্যুলার, বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই পশ্চিমের পূর্বসূরি না; বরং অবাধ যৌনতার ক্ষেত্রেও তাদের পূর্বসূরী।

মালিক বাদরির মতে পশ্চিমা বিশ্ব ক্যাথলিক চার্চের প্রতি এক তীব্র প্রতিশোধমূলক তাড়না দ্বারা চালিত হচ্ছে। এক অর্থে আধুনিক পশ্চিমা চিন্তার পুরো ইতিহাস চার্চের যুলুমের বিপরীতে চরমপন্থী প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা যায়। পশ্চিমা মন ট্রমার শিকার রোগীর মতো। তার মধ্যে পরিমিতি নেই। বারবার সে প্রান্তিক অবস্থান নেয়। গ্রিস আর রোমের অশ্লীলতা আর বেলেল্লাপনার প্রতিক্রিয়ায় আসে চার্চের অতি কঠোরতা। চার্চের অবস্থানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আসে রেনেসাঁ, এনলাইটেনমেন্ট। আর তারপর ধাপে ধাপে যৌন বিপ্লব।[৫৫৭]

সময়ের সাথে সাথে পেন্ডুলাম যায় একেক প্রান্তে।

অবক্ষয়

সভ্যতার অবক্ষয়কালের সবচেয়ে প্রকট চিহ্ন হলো যৌন নৈরাজ্য। তবে এই পর্যায়ের আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার সবই আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে দেখা যায়।

---

[৫৫৭] Badri, Malik, and Colleen Ward. "The Nature of Man in Secular Humanism and Islam: A Psychospiritual Conflict of Worldviews." (2017). and Badri. The AIDS crisis: A natural product of modernity's sexual revolution. Human Behaviour Academy. 1997.

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নিত্যনতুন বিনোদনের আয়োজন করতো সেই সময়কার ক্ষমতাসীনরা। গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ, রথ চালানো, নাচগানের উৎসব, হরেকরকমের ভোজ—একের পর এক উৎসব চলতেই থাকতো রোমে। পতন যত এগিয়ে আসছিল, ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বিনোদনের আয়োজন।

আধুনিক সভ্যতায়ও এ ব্যাপারটা দেখা যায়। বিশ্বকাপ, লা লিগা, প্রিমিয়ার লীগ, ফর্মুলা ওয়ান, টি-টোয়েন্টি, ইউএফসি, হলিউড, বলিউড, রিয়েলিটি টিভি, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া—সহজলভ্য বিনোদনের বন্যায় অনুভূতিগুলোকে অবশ করে রাখে মানুষ। আধুনিক মানুষ বিনোদনের জন্য বাঁচে। সভ্যতার এই পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠে নানা জাতের 'সেলিব্রিটি', খেলোয়াড় আর 'ইনফ্লুয়েন্সররা'। ঘরের দেয়ালে, রাস্তার মাঝখানে, এমনকি পকেটে পুরে রাখা স্ক্রীনেও শোভা পায় আমোদপ্রমোদের এই ফেরিওয়ালাদের ছবি। অন্ধকে পথ দেখায় অন্ধের দল।

অবক্ষয়কালে শিল্পের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা, বাতিক ও বিকৃতি ঢুকে পড়ে। যৌন নৈরাজ্যের প্রভাব পড়ে শিল্প এবং সংস্কৃতিতে। কী যেন একটা হারিয়ে ফেলার অনুভূতি কাজ করে মানুষের মধ্যে। কেউ দামি খাবার, দামি পোশাক, মাদক, উচ্ছৃঙ্খল যৌনতার মধ্যে জীবনের সেই স্বাদ খুঁজে বেড়ায়। আবার কেউ ডুব দেয় কল্পজগতে। মজে থাকে কমিক বুকের সুপারহিরোদের গল্প, সোশ্যাল মিডিয়ার মরীচিকার জগৎ, অথবা ভিডিও গেইমের জাদুবাস্তবতার মধ্যে।

সভ্যতা তার আত্মপরিচয় ভুলে যায়। নিজের অতীতকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। নিজের মূল্যবোধগুলোকে দেখে নেতিবাচকভাবে। তৈরি হয় নারীবাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ আর কুইয়ার তত্ত্ব। মানুষ এসব করে এক তিক্ত সত্যকে ভুলে থাকার জন্য: জীবন, সমাজ, সভ্যতা সবকিছু সব অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, কোনো কিছুরই আর মূল্য নেই, অর্থ নেই।

অবক্ষয়কালে সভ্যতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়তে শুরু করে। দেখা দেয় ফুলেফেপে ওঠা অদক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্র, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, তীব্র রাজনৈতিক বিভক্তি, যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি, মুনাফাখোর আর মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, ক্ষমতাসীন ও অভিজাত শ্রেণির জনবিচ্ছিন্নতা, জনগণের হতাশা আর ক্রমশ বাড়তে থাকে নৈরাজ্য।

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, অবক্ষয়কালের মানুষ আসন্ন পতনকে দেখতে পায় না। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে বাস্তবতাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে যায় মানুষ। ঔদ্ধত্য তাদের অন্ধ করে রাখে। নিজেদের ক্ষয়ে যাওয়া সভ্যতার বাস্তবতা স্বীকার করতে

পারে না তারা। বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে তারা এমন এক কল্পরাজ্যে আশ্রয় নেয়, যেখানে প্রবেশাধিকার থাকে না কঠিন ও অপ্রিয় সত্যগুলোর। অবক্ষয় আসে যখন রোম পুড়ে যাবার সময় নিরোরা বাঁশি বাজায়। অবক্ষয় আসে যখন মানুষ নক্ষত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বেচ্ছায় মদের সমুদ্রে অবগাহন করে।

***

পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ অবক্ষয়কাল অতিক্রম করছে। গত শতাব্দীর শুরুর দিকেই পতনের মুখোমুখি পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপ। ভেঙ্গে পড়ার এই চিহ্ন দেখা গিয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধে, নাৎসিবাদ আর কমিউনিউসমের মতো সেক্যুলার আদর্শের নামে কোটি কোটি মানুষের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে। হার্শফেল্ডদের বার্লিনের অবক্ষয়ও পতনের এই সময়রেখার সাথে মিলে যায়।

কিন্তু ইউরোপকে বাঁচিয়ে দেয় অ্যামেরিকা। পতনের ঠিক আগের মুহূর্তে অ্যামেরিকা গ্রহণ করে পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্বের ভার। বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হয় পরাশক্তি হিসেবে। অ্যামেরিকার বিপুল অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির কল্যাণে পশ্চিমা সভ্যতার জীবনচক্রের মেয়াদ কিছুটা বাড়ে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কমিউনিসমের পতনের পর গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদের বিজয় ঘোষণা করে পশ্চিম। হাজার বছরের সাফল্যের আগাম গল্প লিখতে শুরু করে অনেকেই। কিন্তু ইতিহাসের চক্র অনিবার্য। ততদিনে সভ্যতার সুপ্রাচীন ব্যাধি বাসা বেঁধে ফেলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যের ভেতরে। পরের তিন দশক জুড়ে এই পচন তৈরি করে ব্যাপক যৌন ও সামাজিক নৈরাজ্য। যা এখনো চলমান।

পাশ্চাত্য কেন এলজিবিটি এজেন্ডা প্রচার করে?

একটা প্রশ্ন অনেকের মনে দেখা দিতে পারে। পশ্চিমা বিশ্ব কেন এলজিবিটি এজেন্ডা সারা বিশ্বজুড়ে প্রচার করছে? পাশ্চাত্য যদি পতনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলে কেন তারা পৃথিবী জুড়ে এখনো এসব চাপিয়ে দিচ্ছে? দিতে পারছে? কেন তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করতে চাচ্ছে?

এ প্রশ্নের দুটো অংশ আছে। প্রথম অংশ পাশ্চাত্যের এলজিবিটি প্রচার নিয়ে। পাশ্চাত্য কেন এলজিবিটি এজেন্ডা প্রচার করে, তার বেশ কিছু দিক নিয়ে আমরা এরইমধ্যে আলোচনা করেছি। তারা এটা প্রচার করছে, কারণ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অনেকগুলো মৌলিক ব্যাধি এর মধ্যে একত্রিত হয়েছে।

এলজিবিটি প্রচারের একটা কারণ পুঁজিবাদী শক্তি। এই আন্দোলনের সাথে দাতা, এনজিও, অ্যাক্টিভিস্টদের বিশাল এক নেটওয়ার্ক যুক্ত। এর সাথে যুক্ত ব্যবসা আর মুনাফা। অন্যদিকে নতুন স্নায়ুযুদ্ধে এলজিবিটি অ্যামেরিকার প্রধান সাংস্কৃতিক পণ্য। এটি পশ্চিমের নব্য উপনিবেশবাদের প্রতীক ও হাতিয়ার। তাছাড়া এজেন্ডার সাথে

জড়িয়ে আছে পশ্চিমের দ্বীন এবং আকীদাও। পশ্চিমের মানুষদের, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন ও বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ আকীদাহগতভাবে এই মতবাদ ও আন্দোলনকে সমর্থন করে। একইসাথে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি যৌন বিপ্লব সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিতে তাদের চালিত করে।

তবে কুরআনের আলোকে পাশ্চাত্যের এই তাড়নার পেছনে আরও কিছু কারণ আমরা দেখতে পাই। লূত আলাইহিস সালাম যখন তাঁর কওমের বিকৃতির বিরোধিতা করেছিলেন, তখন তারা উপহাস আর ঘৃণা ভরে বলেছিল, এদেরকে বের করে দাও, এরা তো 'অতি পবিত্র' হতে চায়।[৫৫৮] এই আয়াত থেকে বিকৃতির নেশায় আসক্ত মানুষের চিরন্তন এক মনস্তত্ত্ব আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যারা সীমালঙ্ঘন করে, নিজেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা তারা মেনে নিতে পারে না। অন্যদেরকেও তারা নিজেদের মতো বানাতে চায়। কারণ এটাই তাদের বিকৃতিকে স্বাভাবিক বানানোর উপায়। পশ্চিমের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায়।

কুরআন থেকে এ ব্যাপারে আরও একটি শিক্ষা পাই আমরা। ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে সম্পদ খরচ করেছিল, এই প্রবণতা এখনো বিদ্যমান। আল্লাহ কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন,

> 'মূসা বললেন, "হে আমাদের রব! আপনি তো ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছেন, হে আমাদের রব! যা দ্বারা তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করছে..."' [তরজমা, সূরা ইউনুস, ৮৮]

এ আয়াতের এক ধরনের প্রতিফলন আমরা আজকের পৃথিবীতে দেখতে পাই। আজও পৃথিবীতে যৌন বিকৃতির এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাবার পেছনে কাজ করছে একদল অতি সম্পদশালী, অতি ক্ষমতাবান মানুষ। নব্য ফিরআউন আর তার পরিষদবর্গ।

সবশেষে, এলজিবিটি এজেন্ডার পেছনে অবশ্যই মানবজাতির আদি ও প্রধান শত্রুর একটি ভূমিকা আছে। কুরআনে মহান আল্লাহ আমাদের জানিয়েই দিয়েছেন, শয়তান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছে, সে মানুষকে বিচ্যুত করবে, বিভ্রান্ত করবে। যখন আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়েছিল, তখনো সেখানে তার ভূমিকা ছিল। নূহ আলাইহিস সালামের কওমের পূর্বপুরুষেরা যখন জড়িয়ে পড়েছিল শিরকে, তখনো সেখানে ভূমিকা ছিল তার। কুরাইশরা যখন দারুন নাদওয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, সেখানেও উসকানি দিয়েছিল ইবলীস। তার উপস্থিতি ছিল বদরের দিনেও।

---

[৫৫৮] তরজমা, সূরা আল-'আরাফ, ৮২। "উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিস্কার করো, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।'

ইবলীস মানব ইতিহাসে একটি সক্রিয় শক্তি। এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই আধুনিক শিরক ও আধুনিকতার জাহিলিয়্যাতের পেছনে কোনো-না-কোনোভাবে ইবলীসের ভূমিকা আছে, এই ধারণা অযৌক্তিক না।

পতনকালের ব্যাপ্তি

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সভ্যতার পতন নিয়ে। সভ্যতা আর সাম্রাজ্যের পতন রাতারাতি হয় না। পতন একটা লম্বা প্রক্রিয়া। ক্ষয় হয়ে ফাঁপা হয়ে যাবার পরও একটা বড় গাছ পড়তে সময় লাগে। বিশাল পরিত্যাক্ত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে লেগে যায় বছরের পর বছর। রোমান সাম্রাজ্য ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বসে পড়তে সময় লেগে গিয়েছিল প্রায় এক শতাব্দী। পাশ্চাত্য সভ্যতার পতনেও সময় লাগবে, তবে কয়েক শতাব্দীর বদলে কয়েক দশক হয়তো।

নিজেদের অধঃপতনের ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যে এলজিবিটি মতবাদের প্রচারণায় ব্যস্ত হয়ে আছে, এটা আসলে আমাদের বিশ্লেষণের সাথে সাংঘর্ষিক না; বরং ঐতিহাসিক চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পতনের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে মানুষ এর বাস্তবতা স্বীকার করতে চায় না। বরং অতীতের গৌরবের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন হঠকারী পদক্ষেপ নিতে থাকে। পতনের একদম কাছাকাছি গিয়েও গ্রিক, রোমান, বাইযেন্টাইন, পারস্য সব সাম্রাজ্য অর্থহীন বিভিন্ন সংঘাত আর প্রকল্পে ব্যস্ত ছিল। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নিজেদের বানানো কল্পজগতে বন্দি হয়ে থাকলে এ ব্যাপারটা ঘটে। ঐতিহাসিক অ্যালফ্রেড ম্যাকয়ের ভাষায়,

> ‘সামরিক শক্তি প্রয়োগ, দখলদারিত্ব ও দূরবর্তী উপনিবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদীয়মান সাম্রাজ্যগুলো বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি ও যৌক্তিক চিন্তার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে ম্লান হয়ে আসা পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যগুলোর ঝোঁক থাকে শক্তি প্রদর্শনের হঠকারী পদক্ষেপ আর কাল্পনিক কোনো সামরিক মহাকৌশলের মাধ্যমে এক ধাক্কায় হারানো সম্মান ও শক্তি ফিরে পাবার আকাশকুসুম স্বপ্নের দিকে।[৫৫৯]

অনিবার্য চক্র

ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো, সভ্যতা ভঙ্গুর। মানুষ পরম যত্নে সভ্যতার মিনার তৈরি করে, সময়ের স্রোতে সেই মিনার ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বসে পড়ে। মানবজাতির গত দশ হাজার বছরের ইতিহাসে সভ্যতার উত্থান ও পতনের এক অনিবার্য চক্র দেখা যায়। সিন্ধু নদের উপত্যকায় গড়ে ওঠা হরপ্পা-মহেনজদারো, ক্যারিবীয় সাগরের স্বচ্ছ নীল পানি আর রেইনফরেস্টের গাঢ় সবুজের গা ঘেঁষে থাকা চোখ ধাঁধানো মায়ান

---

[৫৫৯] ‘In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global Power’

সভ্যতা, দজলা আর ফোরাতের উর্বর মাটিতে রাজত্ব করা আসিরীয় আর ব্যাবিলনীয় সম্রাটরা, শুষ্ক মরুভূমি থেকে এবড়োখেবড়ো পর্বতমালা আর ঘন সবুজ উপত্যকা জুড়ে থাকা পারস্য সাম্রাজ্য, আনাতোলিয়ায় রুক্ষ মাটিতে রাজ্য খোদাই করে নেওয়া হিট্টাইট, আন্দিজ পর্বতমালা উচ্চতায় মাথা তোলা ইনকা—একে একে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে সবাই। হারিয়ে গেছে মরুভূমির বুকে ঔদ্ধত্য আর উচ্চাভিলাষের চিহ্ন একে দেওয়া মিশরীয় সভ্যতা। হারিয়ে গেছে নিরেট পাথর কেটে প্রাসাদ বানানো পেত্রার সুনিপুণ স্থপতিরা, হারিয়ে গেছে অ্যালেক্স্যান্ডার আর চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য, হারুনুর রশীদের বাগদাদ, আন্দালুসিয়ার দীর্ঘশ্বাস। সমৃদ্ধ সব সভ্যতা, পরাক্রমশালী সব সাম্রাজ্য, হাজার বছর স্থায়িত্বের স্বপ্ন দেখা রাজত্ব—পতন হয়েছে সবার।

ইতিহাসের দিকে তাকালে নিরন্তর প্রগতি দেখা যায় না; বরং চোখে পড়ে ভাঙ্গাগড়ার চক্র। আধুনিক মানুষ এই সত্যগুলো জানে। জেনেও উপেক্ষা করে। আমরা নিজেদের ব্যতিক্রম মনে করি। মনে করি, যা সবার সাথে হয়েছে আমাদের সাথে তা হবে না। আধুনিকতা সবকিছু বদলে দিয়েছে, সব সমীকরণ পালটে গেছে, আগেকার কিছুই এখন আর প্রযোজ্য না—এমন বিশ্বাস বুকে চেপে সময়ের স্রোতে ঘুরপাক খাই আমরা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু বোকা মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।

১৯৫৬ সালে পিটিরিম সরোকিন প্রশ্ন করেছিলেন,

> 'মানবজাতির অবনতি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে এখন আর কোনো প্রশ্ন নেই। এখন প্রশ্ন হলো মানবজাতি আত্মহত্যার এই পথে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে কি না?'[৫৬০]

এই প্রশ্নের উত্তর আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। হ্যাঁ, মানবজাতি এই পদক্ষেপ নেবে। নিয়ে ফেলেছে। তবে ঘুমের ঘোরে হাঁটা মানুষের মতো আধুনিক মানুষ এখনো বুঝে উঠতে পারেনি, সে ঠিক কোথায় যাচ্ছে। তার গন্তব্য কোথায়।

এ সভ্যতা—যা আমরা মুসলিমরা বেছে নিইনি, যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, যাকে ভালোবাসতে এবং এ ভালোবাসাকে উন্নতি ও প্রগতি মনে করতে শিখেছি আমরা— তা আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায়। পতনোন্মুখ এক সভ্যতার শেষ প্রান্তে অবস্থান করছি আমরা। পেছনে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস, রোম আর বাইনযেন্টাইনের ইতিহাস। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই একই চক্রের, একই প্যাটার্নের। কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত, এত অসুস্থভাবে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপরিচয়ের সংকটে এতটাই নিমগ্ন যে, পচনের গন্ধ আমরা টের পাই না। পতনের শব্দ শুনতে পাই না। আমরা এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি যে, ক্যানভাস, কাগজ আর রঙের খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মূল ছবিটা দেখতে

---

[৫৬০] Sorokin. The American sex revolution. (1956). p. 147.

পারছি না। আমাদের ঘোরলাগা চোখে রঙের বিস্ফোরণ ধরা পড়ে, কিন্তু ধরা দেয় না বাস্তবতার অবয়ব। কিন্তু অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।

পতন অনিবার্য। প্রশ্ন হলো, আমরা কি নিজেদের বাঁচাতে চাই? না কি পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে যেতে চাই ধ্বংস হবার আগ পর্যন্ত? আমরা মুসলিমরা কি মাঝ সমুদ্রে আগুন ধরে যাওয়া জাহাজের সাথে তলিয়ে যাবো? না কি আসমান ও জমিনের মালিকের ওপর ভরসা করে সমুদ্রে ভেলা ভাসাবো নিজেদের?

পরিশিষ্ট

একবার এইডস নিয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হলো ইউরোপের কোনো এক দেশে। বিভিন্ন দেশের ডাক্তাররা সেখানে বক্তব্য দিলেন। কনফারেন্সে কুয়েতের পক্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন ড. শিরবিনি। সবকিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু বিপত্তি বাঁধলো ড. শিরবিনির বক্তব্যের সময়। তিনি যখন এইডস মহামারির নৈতিক আর ধর্মীয় দিক নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, তখন পুরো অডিটোরিয়াম প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'নীতিবাক্য শোনাবেন না, নীতিবাক্য শোনাবেন না!' বিরক্ত হয়ে ড. শিরবিনি চেচিয়েই জবাব দিলেন,

'তোমাদের কাছে নীতিবাক্য কি এইডসের চেয়েও খারাপ নাকি?!'[৫৬১]

যৌন বিকৃতির আন্দোলনের সাথে আধুনিকতার সম্পর্ক এই একটা ঘটনা থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। আধুনিকতার ধর্ম হলো নাফসানিয়াতের ধর্ম। প্রবৃত্তির পূজা এই ধর্মের মূল মন্ত্র। যেকোনো মূল্যে নাফসকে খুশি করতে হবে, তার চাহিদায় বাধা দেওয়া যাবে না কিছুতেই। আধুনিকতা যে অধিকার আর স্বাধীনতার কথা বলে সেটা নাফসের অধিকার, নাফসের স্বাধীনতা। এ কারণেই সে নীতিবাক্য শুনতে রাজি না। আধুনিকতা এইডস রোগীর চিকিৎসা নিয়ে শত-সহস্র ঘণ্টা আলাপ করতে পারে, কিন্তু যে চিন্তা ও আচরণের কারণে এ ব্যাধির জন্ম, তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না। কোটি কোটি মানুষ মারা গেলেও এই মড়ক বন্ধ করার সত্যিকারের পথ নিয়ে সে কথা বলে না। আরেকজনকেও বলতে দেয় না।

আল্লাহ আর আখিরাতকে অস্বীকার করে মানুষ আর দুনিয়াকে কেন্দ্র বানানোর পর, সবকিছুই কেবল 'এখন' আর 'এখানে'-র সমীকরণে পরিণত হয়। মৃত্যুর ওপারে যদি কিছু না থাকে, তাহলে এই জীবনটাই তো সব। স্রষ্টা যদি গুরুত্বহীন হয়, তাহলে সবই তো বৈধ। তাই আধুনিকতা নাফসের পূজা করে। আধুনিক মানুষ ভোগের জন্য বাঁচে। শূন্যতায় বিশ্বাসী মানুষ দুনিয়া দিয়ে নিজের ভেতরের শূন্যতাকে পূরণ করতে চায়। কিন্তু শূন্যতা পূরণ হয় না। নাফসের চাহিদা মেটে না, তৃপ্তি আসে না। রাসূলুল্লাহ

---

[৫৬১] ড. শিরবিনির সাথে ব্যক্তিগত কথোপকথনের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন ড. মালিক আল-বাদরি। Badri, Malik. The AIDS crisis: A natural product of modernity's sexual revolution. Human Behaviour Academy, 1997. Ch 2.

ﷺ বলেছেন,

> 'আদম সন্তানকে যদি ধনসম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকা দেওয়া হয়, তবু সে তৃতীয় আরেকটি আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না।'[৫৬২]

মানুষের এই অসীম চাহিদার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। তাই নাফসের পূজায় মোক্ষ লাভ হয় না; বরং ক্রমাগত অবক্ষয় হতে থাকে। লাগামছাড়া প্রবৃত্তি মানুষকে নিয়ে যায় ক্রমাগত সীমালঙ্ঘনের দিকে। প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনের সাথে সাথে তার দাবি বাড়ে। আগে যেটুকুতে সাধ মিটতো, এখন আর তাতে মেটে না। নতুন কিছু লাগে।

কুরআনে কওমে লূতকে আল্লাহ বলেছেন 'সীমালঙ্ঘনকারী কওম'। তারা মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছিল। গতানুগতিক যৌনতায় তাদের মন ভরছিল না, ঝুঁকেছিল বিকৃতির দিকে। আধুনিকতাও ক্রমাগত সীমালঙ্ঘন করতে চায়। এই প্রবণতা একসময় বাতিকে পরিণত হয়। যৌন বিকৃতির আন্দোলন এই ধারাবাহিক সীমালঙ্ঘনের জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত। লাগামছাড়া প্রবৃত্তি বিকৃত যৌনাচারীকে তীব্র থেকে তীব্রতর বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়। গতকালের নতুন স্বাদ আজ পানসে মনে হয়। তখন তাকে নামতে হয় বিকৃতির নতুন নতুন অন্ধকারে।

সমকামিতা ছিল যৌন বিকৃতি। জীবনাচারের বিকৃতি। এরপর আসে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ; যৌন বিকৃতির সাথে যুক্ত হয় আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তনের প্রবণতা। বাস্তবতাকে পুনঃসজ্ঞায়িত করার স্পর্ধা। সীমালঙ্ঘনের ধারাবাহিকতা এখানেই থেমে যাবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং তা চলতেই থাকবে। একসময় পশুকাম, অজাচার এবং শিশুকামের মতো বিকৃতিগুলো 'স্বাভাবিক' হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তর মোটামুটি তৈরি হয়েই আছে।

কথাটা কারও কাছে হয়তো অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। তবে অতীতের দিকে তাকালে ব্যাপারটাকে অবাস্তব মনে হয় না। আজ থেকে বিশ বছর আগে যদি বলা হতো—বাংলাদেশের স্কুল বইয়ে শেখানো হবে, মানুষের 'দেহ পুরুষের কিন্তু মন মেয়ের'—তাহলে নির্ঘাত মানুষ হাসতো। কিন্তু আজ আর কেউ হাসছে না।

সীমালঙ্গনের তীব্রতা বাড়বে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে ফেলার ক্ষেত্রেও। লিঙ্গ পরিবর্তনের জায়গায় আসবে পুরো দেহকে বদলে ফেলার তাড়না। ট্র্যান্সহিউম্যানিসম (Transhumanism) নামের দর্শন তাই বলছে। এ দর্শনের অনুসারীরা বলে, এতদিন মানুষের বিবর্তন হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে, এখন বিবর্তন হবে মানুষের পরিকল্পনামাফিক। মানুষের ঠুনকো দেহকে জিনোমিকস, বায়োটেকনোলজি আর

---

[৫৬২] বুখারী, ৬৪৩৬

ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে বদলে ফেলা হবে। অস্থিতিশীল মস্তিষ্ককে মজবুত করা হবে সর্বাধুনিক এআই-এর সাথে যুক্ত করে। প্রযুক্তির সাথে মানুষের মিশেলে তৈরি হবে নতুন এক প্রজাতি। যে প্রজাতি অতিমানবীয় জ্ঞান, শক্তি আর আয়ুর অধিকারী। হিউম্যান থেকে পোস্ট-হিউম্যান। মানুষ থেকে উত্তর-মানুষ।

এই স্বপ্ন আপনার-আমার কাছে হাস্যকর ঠেকতে পারে, কিন্তু এর পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষেরা।[৫৬৩] ট্র্যান্সজেন্ডারের সাথে ট্র্যান্সহিউম্যানিসম শব্দের মিলটা কিন্তু কাকতালীয় না। ট্র্যান্সহিউম্যানিসমের জগতে প্রথম সারির খেলোয়াড়দের একজন হলো মার্টিন রথব্ল্যাট। ফিলিস ফ্রাইয়ের সাথে মিলে ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার আইনের খসড়া তৈরি করা সেই নারী সাজা পুরুষ। রথব্লাটের ২০১১ সালে প্রকাশিত বইয়ের নাম ছিল 'ফ্রম ট্র্যান্সজেন্ডার টু ট্র্যান্সহিউম্যান'। রথব্লাটের মতে, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ হলো ট্র্যান্সহিউম্যানিসমের আগের ধাপ।

নতুন নতুন মোড়কে সামনে আসলেও পেছনে সেই একই অসুখ। সেই একই নাফসকেন্দ্রিকতা, দুনিয়াকেন্দ্রিকতা। মানুষকে রব বানানোর প্রবণতা। দুনিয়াতে জান্নাত আবিষ্কারের মোহ। আর ধারাবাহিক সীমালঙ্ঘন। এলজিবিটি মতবাদ ও আন্দোলন কোনো দুর্ঘটনা না; বরং আধুনিক সভ্যতার যৌক্তিক উপসংহার। যৌন বিকৃতির আন্দোলন আধুনিকতার শরীরে বাসাবাঁধা মরণব্যাধি। কিন্তু শরীর কুরে কুরে খাওয়া এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য 'নীতিবাক্য' শুনতে রাজি না আধুনিক মানুষ। তাই পতন অনিবার্য। শত আলোচনার পর এটাই অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

***

করণীয় কী? অবক্ষয়কালে কীভাবে প্রস্তুতি নেবে বিশ্বাসীরা? যৌন বিকৃতির আন্দোলনের মোকাবিলা কীভাবে হবে? বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে?

কুরআনের আলোকে এবং ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা মোকাবিলার তিনটি ধাপ পাই।

১। বিশুদ্ধ আকীদাহ ও দ্বীনের ভিত্তি

দ্বীন ইসলামের ভিত্তি ছাড়া এলজিবিটি আগ্রাসনের মোকাবিলা করা সম্ভব না। গতানুগতিক রক্ষণশীলতা, কিংবা আধুনিকতার অন্য কোনো মতবাদ এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কাজে আসবে না। পাশ্চাত্যের রক্ষণশীলরা এই আন্দোলনের সামনে দাঁড়াতে পারেনি; কারণ, অধিকার আর স্বাধীনতার বড়ি আগেই তারা গুলে খেয়েছিল।

---

[৫৬৩] মাইক্রোসফটের বিল গেইটস, অ্যামাযনের জেফ বেইযোস, গুগলের ল্যারি পেইজ, ওরাকলের ল্যারি এলিসন, পেইপ্যালের পিটার থিলসহ আরও অনেকে।

২। এলজিবিটি মতবাদ ও আন্দোলনের বাস্তবতার ব্যাপারে জানা ও জানানো

সমস্যা সমাধানের আগে সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হয়। তার ব্যাপারে জানতে হয়। প্রতিপক্ষকে বুঝতে হয়, পর্যবেক্ষণ করতে হয় তার কৌশল। তা না হলে সমস্যার সমাধান করা যায় না।

৩। এক ও দুইয়ের ভিত্তিতে যথাযথ কর্মকৌশল (স্ট্র্যাটিজি) নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করা

এলজিবিটি আন্দোলনের বাস্তবতা সম্পর্কে না-জানার কারণে অনেকেই বিভ্রান্ত হন। অধিকারের মোড়কে বিকৃতির প্রচার, দাতা-এনজিও-অ্যাকটিভিস্টদের নেটওয়ার্ক আর কৌশলগুলো সম্পর্কে আমাদের সমাজ অজ্ঞ। এ অজ্ঞতার সুযোগ নেয় ওরা পুরোদমে। অজ্ঞতার সুযোগে আমাদের পাঠ্যবইয়েও চলে আসে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের গল্প। এই অজ্ঞতার কারণেই দেখা যায় মাওলানা সাহেব কিংবা মাসজিদের ইমাম গিয়ে এমন কোনো এনজিও'র অনুষ্ঠানে মোনাজাত ধরেছেন, যাদের প্রধান এজেন্ডাই হলো এলজিবিটির প্রসার। তাই এ আন্দোলনের বাস্তবতা ও হুমকি সম্পর্কে জানা এবং সমাজকে জানানো আবশ্যক।

ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মিশ্রণ আমাদের চোখের ওপর ছানি ফেলে রাখে। অধিকার, স্বাধীনতা আর প্রগতির বুলিতে মজে যাই আমরা। নতুন নতুন শব্দ আর আঙ্গিকে যখন বিকৃতির বয়ান তুলে আনা হয়, তখন তালগোল পাকিয়ে ফেলি। স্পষ্ট জিনিসও তখন অস্পষ্ট মনে হতে থাকে। এর আগে অনেক বিষয়ে এমন হয়েছে, হচ্ছে। দু চোখে দুই চশমার কাঁচ লাগিয়ে হাঁটতে থাকলে সামনেও হতে থাকবে। তাই মিশ্রণ বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ তাওহীদের লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাতে হবে দুনিয়ার দিকে।

নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) সব সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে প্রথমে তাদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছেন। এটি ছাড়া পরের ধাপগুলো অসম্ভব। এ-কারণে উপরে বলা প্রথম দুটি ধাপ হলো ভিত্তি, যা মজবুত না হলে পুরো কাঠামো ধ্বসে পড়বে। এই বইয়ের আলোচনা ছিল এই দুটি ধাপ নিয়ে। মানুষকে জাগানো, বহুদিনের শীতনিদ্রায় চোখের সামনে পড়ে যাওয়া পুরু ছানিটুকু সরিয়ে দেওয়া ছিল এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

তৃতীয় ধাপের আলোচনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দীর্ঘ। এর সাথে জড়িয়ে আছে অনেক প্রশ্ন, অনেক শাখা-প্রশাখা। এই বইয়ের সীমানার মধ্যে সেই আলোচনাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। সংক্ষেপে এটুকু এখানে বলা যায় যে, দেশি-বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠিত শক্তি এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেবে, এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এর পেছনে থাকা প্রবল শক্তিশালী অক্ষের মুখোমুখি হবার মতো নৈতিক এবং আদর্শিক শক্তি এদের নেই।

বুঝে না-বুঝে যারা সেক্যুলারিসম গ্রহণ করে নিয়েছে, তারাও অবধারিতভাবে এই মতবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করবে, আজ অথবা কাল।

তাই সাধারণ মানুষকেই এ আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে হবে। ঈমান ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে, দ্বীনের মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। আর তার জন্য আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার অসুখ কাটিয়ে উঠতে হবে। একাকী মানুষ অক্ষম, কিন্তু একটা সামষ্টিক সত্ত্বার অংশ হিসেবে সে শক্তিশালী। তাই ইসলামের আলোকে সংঘবদ্ধ হয়ে সোচ্চার ও সক্রিয় হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এই দানবের বিপরীতে আপনাআপনি কোনো শক্তি দাঁড়াবে না। মাটি ফুড়ে কোনো নেতা বের হয়ে আসবে না। এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকেই। সচেতনতা তৈরি করতে হবে, নাগরিক পরিসরে সোচ্চার হতে হবে, বিকৃতির ফেরিওয়ালাদের প্রতিরোধ করার জন্য সংগঠিত হতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে। অভিভাবক, শিক্ষক, পেশাদার শ্রেণি, বিশিষ্ট নাগরিক, আলেম সমাজ—নিজ নিজ জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে হবে সবাইকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তরুণদের। সর্বোপরি সামাজিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এর সম্ভাব্য পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি, আগ্রহী পাঠক সেটি দেখে নিতে পারেন।[৫৬৪]

***

কুরআন বা হাদীসে যদি এমন এক জাতির বর্ননা দেওয়া হতো, যারা নিজেরা বিকৃতিতে আসক্ত হবার পাশাপাশি দুনিয়াজুড়ে বিকৃতি ছড়িয়ে দিতে একের পর এক স্বর্ণের পাহাড় খরচ করেছে, তাহলে ব্যাপারটা হয়তো আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতো। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম, কীসের তাড়নায় মানুষ এমন করতে পারে? কোন চিন্তা, কী এমন বিশ্বাস মানুষকে এমন বিচিত্র আচরণের দিকে চালিত করে?

আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব আজ ঠিক এ কাজটাই করছে। কিন্তু ক্রমশ স্ফুটনাঙ্কের দিকে এগিয়ে যাওয়া পানির মধ্যে গা ডুবিয়ে বসা আমরা সেই সমস্যার সত্যিকারের মাত্রা আর তীব্রতা বুঝে উঠতে পারছি না। চেষ্টাও করছি না। আমাদের গা সয়ে গেছে।

কুরআনে বনী ইসরাইলের একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদিদের শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা কৌশলে এই নিষেধ অমান্য করে। মহান আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেন। এটি আসহাবুস সাবত বা শনিবাদের সীমালঙ্ঘনকারীদের ঘটনা হিসেবে পরিচিত। পবিত্র কুরআনের একাধিক সূরাতে এ ঘটনার আলোচনা এসেছে।[৫৬৫]

---

[৫৬৪] দেখুন, 'What Is To Be Done: ইসলামবিদ্বেষ, উগ্র-সেক্যুলারিসম এবং বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ভবিষ্যৎ', আসিফ আদনান। https://chintaporadh.com/what-is-to-be-done-0

[৫৬৫] দেখুন সূরা আল-বাকারা, ৬৫; সূরা আন-নিসা, ৪৭; সূরা আল-'আরাফ, ১৬৩-১৬৬

শনিবারের ঘটনার সময় বনী ইসরাইলের সবাই কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতায় অংশ নেয়নি। তাদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ ছিল। একদল সরাসরি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় দল, অবাধ্যতা থেকে বিরত ছিল, প্রথম দলকে বারবার মানা করেছিল।

আর আর তৃতীয় দল? তারা কী করেছিল?

কিছুই না। তারা নিষেধাজ্ঞা ভাঙ্গেনি, আবার এ কাজে মানাও করেনি। উলটো দ্বিতীয় দলকে বলেছিল, তোমরা কেন এদেরকে মানা করছো, যখন আল্লাহই তাদেরকে শাস্তি দেবেন? নিজেদেরকে তারা গুটিয়ে রেখেছিল নিজস্ব খোলসের ভেতর। এরা ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শক। সাইলেন্ট মেজরিটি। প্রত্যেক সমাজ ও সভ্যতায় এদের সংখ্যাই বেশি। হক-বাতিলের সংঘাত থেকে এরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এরা নিজেদের জীবন, নিজেদের সমস্যা নিয়ে মশগুল। এত চিন্তাভাবনা কিংবা আত্মজিজ্ঞাসার সময় তাদের নেই। শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চায় নিশ্চিন্তে। তবে হ্যাঁ, গতানুগতিকতাকে পরিবর্তনের চেষ্টাকে সাইলেন্ট মেজরিটি সাধারণত সমর্থন করে না। এরা গতানুগতিকতার সমর্থক।

যখন আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা'র পক্ষ থেকে আযাব আসলো, তখন কী হলো?

যারা অবাধ্য হয়েছিল আর যারা অবাধ্যতার ব্যাপারে চুপ ছিল, শাস্তি হলো দু দলেরই। নাযাত পেল কেবল দ্বিতীয় দল। কারণ, তারা সৎকাজের আদেশ করেছিল, অন্যায়ের বিরোধিতা করেছিল।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে হলে, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে, অবস্থান নিতে হবে বিকৃতির এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে। দিনশেষে এটি অস্তিত্বের প্রশ্ন, হক ও বাতিলের চিরন্তন লড়াইয়ের প্রশ্ন। এটি বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বীনের দ্বন্দ্ব। সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নবীদের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) পথের অনুসারীদের দ্বন্দ্বের অংশ। সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্ধকার, বিকৃতি ও ব্যাধির চক্রান্ত।

একে উপেক্ষা করার, আপস করার কিংবা পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। এ দ্বন্দ্বে মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। দুই নৌকায় পা দিয়ে এ প্লাবন পাড়ি দেওয়া যাবে না। হাত গুটিয়ে দর্শকের কাতারে বসে থাকার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল; ফলে আল্লাহ তাকে আত্মভোলা করে দেন। বস্তুত তারাই অবাধ্য। [তরজমা, সূরা আল-হাশর, ১৯]

পবিত্র কুরআনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা আল্লাহ আমাদের

জানিয়েছেন। তাদের সবার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—বারবার সতর্ক করার পরও তারা সত্যকে উপেক্ষা করেছিল। গোঁ ধরে আঁকড়ে ধরেছিল অবাধ্যতা আর সীমালঙ্ঘন। আজ আমরা এমন এক সভ্যতায় বসবাস করি, যা সীমালঙ্ঘনের দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে অতীতের সবাইকে। যে একেকটি অপরাধের কারণে আগেকার জনপদগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার সবগুলো একত্রিত করেছে আমাদের এই সভ্যতা নামের জাহিলিয়্যাহ। তারপরও আমরা নিশ্চিন্ত, বেখবর!

সডোম, গোমোরাহ, পম্পেই-এর অধিবাসীরাও নিশ্চিন্ত ছিল। অমোঘ বাস্তবতাকে ভুলে ছিল। এই ভুলে থাকা, এই উপেক্ষা, এই নিষ্ক্রিয়তা, হাসিঠাট্টা, গতানুগতিকতা, সাময়িক সুখের পিছে ছোটা, তিলে তিলে গড়া নিজের একান্ত বুদবুদ নিয়ে আদিখ্যেতা, আলো-অন্ধকারের বিভেদ ভুলে কেবল শান্তি আর নিরাপত্তা খুঁজে যাওয়ার এই যে অসুখ, তা শেষ পর্যন্ত তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আগুনের নদী আর পাথরের বৃষ্টির মুখোমুখি। সাজানো গোছানো জীবনের খেলাঘর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এক মুহূর্তে।

আল্লাহর পাকড়াও-এর ব্যাপারে এই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া কারো কোনো কাজে আসেনি। আমাদেরও আসবে না।

> 'জনপদের বাসিন্দারা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে যে, তারা যখন রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমার শাস্তি তাদের ওপর হানা দেবে না? জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে যে, তারা যখন দিনের ঝলমলে আলোতে খেলতামাশায় মজে থাকবে, তখন তাদের ওপর আমার শাস্তি হানা দেবে না? তারা কি আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে? আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে কেবল তারাই নিশ্চিন্ত থাকে, যারা নিশ্চিত ক্ষতির দিকে ধেয়ে চলছে।' [তরজমা, সূরা আল-আ'রাফ, ৯৭৯৯-]

> 'যিনি আকাশে আছেন, তাঁর ব্যাপারে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে, জমিন যখন ভীষণভাবে কাঁপতে থাকবে, সে-সময় তিনি তোমাদেরসহ সেটি ধ্বসিয়ে দেবেন না? নাকি তোমরা নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে পাথর-বহনকারী ঝড়ো বাতাস লেলিয়ে দেবেন না? তখন তোমরা টের পাবে আমার হুঁশিয়ারির পরিণাম কেমন! [তরজমা, সূরা মুলক, ১৬-১৮]

মহান আল্লাহ সাক্ষী—আমি পৌঁছে দিয়েছি; এবং সকল প্রশংসা তাঁরই।

লুইস ক্যারলের বিখ্যাত বই 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এ কোনো কিছুই স্বাভাবিক নিয়ম মতো হয় না। শুঁয়োপোকা হুক্কা খায়, নুড়ি পাথর কেক হয়ে যায়, আর ছোট্ট শিশু হয়ে যায় শূকরছানা। আজব দেশের রাণী বিচারের সময় চেঁচিয়ে ওঠে, 'শাস্তি আগে, রায় পরে'! অদ্ভুতুড়ে এক জগৎ!

আধুনিকতার রাজপথে হাঁটতে গিয়ে বিশ্ব যেন পথ ভুলে অ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো কোনো এক জগতে ঢুকে পড়েছে। যেখানে পুরুষ বিয়ে করে অন্য পুরুষকে, নারী বিয়ে করে নারীকে। ছয় বাচ্চার বাপ বর্ষসেরা নারীর খেতাব পায়, নিজেকে নারী দাবি করে মহিলা কারাগারে ঢুকে পড়ে পুরুষ কয়েদী, স্কুলের বাচ্চাদের শেখানো হয় 'যাহা নারী তাহাই পুরুষ' আর আইন, আদালত, সমাজ দিব্যি সেটা মেনেও নেয়।

প্রতিদিন যেন একটু একটু করে মৃত সাগরপাড়ের শহরগুলোর মতো হয়ে উঠে আমাদের পৃথিবী। অ্যালিসের জগতটা ছিল মজার। কিন্তু আমাদের এ জগৎ ভয়ঙ্কর বিভীষিকার।

কেন সবার একযোগে এই অবিশ্বাস্য রকমের পাগলামি? কীভাবে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো এতোসব বিকৃতি?

অ্যালিসের যাত্রা শুরু হয়েছিল এক সাদা খরগোশের পিছু নিতে গিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে তার গর্তে ঢুকে পড়েছিল অ্যালিস। সেই গর্ত তাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল আজব এক দুনিয়াতে। প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে আমাদেরও নামতে হবে খরগোশের গর্তে। দেখতে হবে এ গর্ত আসলে কতোটা গভীর!